প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকশ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে— যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোন শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ ঃ জুন, 2017

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী ও অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : ঐচ্ছিক বাণিজ্য সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম : পর্যায় : E.C.O : 06 : 35

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1	অধ্যাপক দেবাশিস মুখার্জী	অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায়
একক 2	ঐ	ঐ
একক 3	ঐ	ঐ
একক 4	ঐ	ঐ
একক 5	ঐ	ঐ

পাঠক্রম : পর্যায় : E.C.O : 06 : 36

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1	অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ভদ্র	অধ্যাপক ইন্দ্রানী সাহা
একক 2	ঐ	ঐ
একক 3	ঐ	ঐ
একক 4	ঐ	ঐ
একক 5	ঐ	ঐ

পাঠক্রম : পর্যায় : E.C.O : 06 : 37

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1	অধ্যাপক সুশীলকুমার বর্মন	অধ্যাপক অমরনাথ সেনগুপ্ত
একক 2	ঐ	ঐ
একক 3	ঐ	ঐ
একক 4	ঐ	ঐ

পাঠক্রম : পর্যায় : E.C.O : 06 : 38

রচনা	সম্পাদনা
অধ্যাপক অরুণ কুমার দত্তগুপ্ত	অধ্যাপক আশিস মিত্র

ঘোষণা

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনওভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবন্ধক

væçìèä ¼Ûì» âk èûxèûó÷ìÜú

ECO - 6

বাণিজ্য বিষয়ের ঐচ্ছিক পাঠক্রম

(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায়

35

একক	1	ব্যবস্থাপনা	**9–35**
একক	2	ব্যবস্থাপনার তত্ত্বসমূহ	**36–43**
একক	3	ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ	**44–51**
একক	4	ব্যবস্থাপনার স্তরসমূহ বা ব্যবস্থাপনার স্তরানুক্রম	**52–57**
একক	5	ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমন্বয় ও জ্ঞাতকরণ	**58–74**

পর্যায়

36

একক	1	বস্তুগত বা লজিস্টিক ব্যবস্থাপনা	**77–99**
একক	2	উৎপাদন ব্যবস্থাপনা	**100–110**
একক	3	বিপণন ব্যবস্থাপনা	**111–139**
একক	4	আর্থিক ব্যবস্থাপনা	**140–161**
একক	5	কর্মী ব্যবস্থাপনা	**162–206**

পর্যায়
37

একক	1	সম্পদ	**209–219**
একক	2	সম্পদরূপে মানুষ	**220**
একক	2A	জনসংখ্যার পরিমাণগত অবস্থা	**220–226**
একক	2B	জনসংখ্যার ব্যবধান	**227–232**
একক	2C	জনসংখ্যার সমস্যা	**233–237**
একক	3	সম্পদরূপে সংস্কৃতি	**238–241**
একক	4	সম্পদরূপে ভূমি	**242**
একক	4A	ভূমি প্রকৃতির প্রধান অভিব্যক্তি	**242–248**
একক	4B	বিশ্বের প্রধান প্রধান কৃষিপদ্ধতি	**249–261**
একক	4C	বিশ্বের খাদ্যশস্য ও অন্যান্য শস্য উৎপাদন	**262–276**
একক	4D	খাদ্য সম্ভাবনা	**277–281**
একক	4E	ভূমি ও বনভূমি	**282–293**
একক	4F	ভূমি ও পশুপালন	**294–303**
একক	4G	ভূমি ও খনিজ উত্তোলন	**304–315**
একক	4H	জীবাশ্ম জ্বালানি	**316–327**

পর্যায়
38

একক	1	সামুদ্রিক সম্পদ	**331–343**
একক	2	শক্তি সম্পদ	**344–355**
একক	3	শিল্প সম্পদ	**356–370**
একক	4	সম্পদ-হ্রাস ও সম্পদ-সংকট	**371–382**
একক	5	সম্পদ সংরক্ষণ	**383–388**

ই. সি. ও. - ৬

বাণিজ্য বিষয়ের

ঐচ্ছিক পাঠক্রম

পর্যায়

৩৫

একক ১ ❑ ব্যবস্থাপনা

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ সংজ্ঞা

১.৩ মৌলিক ধারণা

১.৪ ব্যবস্থাপনার তাৎপর্য

১.৫ ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ

১.৬ ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার বিভিন্ন মতবাদ

১.৬.১ সনাতন বা ধ্রুপদী ব্যবস্থাপনা মতবাদ

১.৬.২ আধুনিক ব্যবস্থাপনা মতবাদ

১.৬.৩ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা মতবাদ

—এফ. ডব্লু. টেলর

১.৬.৪ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা মতবাদ

—হেনরী ফেয়ল

১.৬.৫ মানবিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় মতবাদ

—এলটন মেয়ো

১.৬.৬ মানবিক আচরণ ভিত্তিক মতবাদ

—ডগলাস ম্যাকগ্রেগর, হারবার্ট এ. সাইমন

১.৬.৭ পরিমাণসূচক ব্যবস্থাপনা মতবাদ

—আর. এল. এক্রুফ্

১.৭ সারাংশ

১.৮ প্রশ্নাবলী

১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে আমরা জানতে পারব

- ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়
- ব্যবস্থাপনার মৌলিক ধারণা
- ব্যবস্থাপনার মৌলিক ধারণা
- ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বা তাৎপর্য
- ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার বিবর্তন
- সনাতন ও আধুনিক মতবাদ বলতে কী বোঝায়
- ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারায় এফ. ডব্লু. টেলর এবং হেনরী ফেয়লের অবদান
- মানবিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় মতবাদ ও মানবিক আচরণভিত্তিক মতবাদসমূহ
- আর. এল. এক্কফে্র পরিমাণ সূচক ব্যবস্থাপনা মতবাদ।

১.১ প্রস্তাবনা

বর্তমানে ব্যবস্থাপনা শব্দটি প্রায় সর্বস্তরের মানুষের কাছে অতি পরিচিত। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ব্যবস্থাপনা নিয়ে কারবারি জগতের মানুষ খুব সচেতনভাবে ভাবতে শুরু করেছে। এখন এই শব্দটি অতি জনপ্রিয়। বস্তুত মানুষ যেদিন থেকে যৌথভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে সেদিন থেকেই সে ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। কারণ কালক্রমে বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলি মানুষ নিজে একা একা সম্পাদন করতে না পারায় অপরের সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করতে থাকে। ফলে যৌথভাবে বসবাস এবং যৌথ প্রয়াস ও সহযোগিতার দ্বারা মানুষ তার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করে নিজের জীবনযাপন প্রণালীকে উন্নততর করার পথে অগ্রসর হতে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সভ্যতার বিকাশের ফলে মানুষের চাহিদার পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই কারণে বৃহদায়তন উৎপাদন (large scale production) ও বিশেষীকরণের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে প্রযুক্তিগত কলা-কৌশল উদ্ভাবন ও উন্নয়নের প্রয়াস সর্বদাই চলছে। তাই অধিকতর সহযোগিতা ও সংগঠিত যৌথ প্রয়াসের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু যৌথ প্রয়াস সমন্বিত এবং একমুখী না হলে উদ্দেশ্যসাধনে ব্যর্থ হয়। বিভিন্ন মানুষের বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা ও উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা যৌথপ্রয়াসকে একমুখী করার পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এইসব বিভিন্নতাকে অপসারিত করে সকলের পৃথক পৃথক প্রচেষ্টার সমন্বয়ে যৌথ প্রয়াসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এই সমন্বয় সাধনের জন্য প্রয়োজন হয় একজন দক্ষ নেতার, তিনিই হলেন ব্যবস্থাপক (Manager)। কারবারী প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিশেষায়িত কার্যাবলি আছে, যেমন—ক্রয়, উৎপাদন, বিক্রয়, হিসাব-নিকাশকরণ প্রভৃতি। ব্যবস্থাপকের কার্য হল এই সব কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন এবং প্রতিষ্ঠানের সকল ব্যক্তিকে দিয়ে কার্যসম্পাদন করা। ব্যবস্থাপকের এই সব কার্যাবলিকেই বলা হয় ব্যবস্থাপনা (Management)।

১.২ সংজ্ঞা

ব্যবস্থাপনার পরিধি বিস্তৃত হওয়ার কারণে ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য আছে। তাই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোনও সাধারণ তত্ত্ব পাওয়া যায় না। বিশেষজ্ঞদের মতামত বিশ্লেষণ করে ও সমন্বিত করে আমরা দেখি ব্যবস্থাপনা বিষয়টির অন্তত তিনটি অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিকোণ আছে। সেগুলি যথাক্রমে,

(১) ব্যবস্থাপনা হল একটি নীতিনির্ধারক ও প্রশাসনিক বিশেষ কর্মপ্রক্রিয়া

(২) ব্যবস্থাপনা হল কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি

(৩) ব্যবস্থাপনা হল একটি বিদ্যাবিভাগ (academic discipline)

Kohler's Dictionary ব্যবস্থাপনা (Management) শব্দের দুটি অর্থ নির্দেশ করেছে যেগুলি উপরিউক্ত (১) ও (২) অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিকোণকে সমর্থন করে।

Kohler's Dictionary ব্যবস্থাপনার (Management) অর্থ এইরূপ দিয়েছে ঃ

(১) ব্যবস্থাপনা বলতে আমরা কার্যনির্বাহী কর্তৃত্বকে বুঝি। এটি হ'ল নীতি নিধারণ ও প্রশাসনের একটি সমন্বিত ক্ষেত্র সেখানে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা সমার্থক।

(২) ব্যবস্থাপনা হ'ল কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি যেমন,

(ক) কোনও প্রতিষ্ঠানের প্রধান

(খ) যৌথভাবে সকল ব্যক্তিত্ব যাদের নির্দেশদানের কর্তৃত্ব আছে

(গ) বৃহত্তর অর্থে সকল ব্যক্তিত্ব যারা একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লেনদেনের সৃষ্টি করেন।

আলোচিত বিষয়টিকে একটি ছকের মাধ্যমে বোঝান যায় :

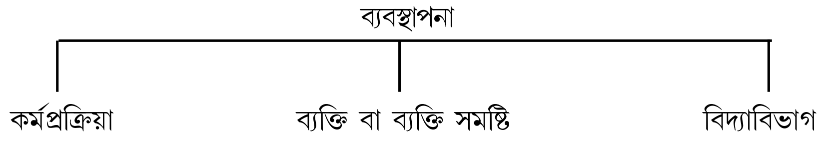

আমাদের আলোচনায় ব্যবস্থাপনার কর্মপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত দিকটি গুরুত্ব পাবে। ব্যবস্থাপনার কর্মপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত সংজ্ঞাটি এইরূপ ঃ

ব্যবস্থাপনা হল একটি নীতিনির্ধারক ও প্রশাসনিক বিশেষ কর্মপ্রক্রিয়া। এই কর্মপ্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হল সেই সমস্ত কার্যাবলি যা প্রতিষ্ঠানের অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য পরিকল্পনা রচনা করে, উদ্দেশ্য ও নীতি স্থির করে, কর্ম সম্পাদনের জন্য কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, অর্থ ও কর্মী সংগ্রহ করে, বস্তুগত ও মানসিক সন্তুষ্টি বিধানের সাহায্যে কর্মীদের অনুপ্রেরণা জোগায় এবং বিভিন্ন কার্যের সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করে।

১.৩ মৌলিক ধারণা

ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ বিভিন্ন ধারণা পোষণ করেন। ব্যবস্থাপনার মৌলিক ধারণাকে তিনদিক থেকে বিচার করা যেতে পারেঃ (ক) অর্থনীতিবিদ্দের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যবস্থাপনা (খ) প্রশাসন ও সংগঠন বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যবস্থাপনা এবং (গ) সমাজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যবস্থাপনা।

(ক) অর্থনীতিবিদ্দের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যবস্থাপনা হল জমি, শ্রম ও মূলধনের মতো একটি অর্থনৈতিক উপাদান। এদের মতে ব্যবস্থাপনা হল উৎপাদনের উপায় এবং উৎপাদনের যথাযোগ্য ও কার্যকরী পরিচালনা। স্বল্প খরচে উৎপাদনের উপাদানগুলি সংগ্রহ করে তা সুনিপুণভাবে ব্যবহার করে সর্বাধিক উৎপাদন সংগঠিত করতে হবে। উৎপাদনের উপাদানগুলি এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে সর্বনিম্ন খরচে উৎপাদন করা সম্ভব হয়। একই সাথে উন্নত মূলধন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সর্বাধিক সুবিধায় মূলধন ব্যবহার করে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করতে হবে। এছাড়া বাজারের বিভিন্ন রূপ অনুসারে পণ্য বা সেবার দাম স্থির করা দরকার। যেমন, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের দাম নির্ধারণে যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের দাম নির্ধারণে সেই পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় না। অর্থনৈতিক ব্যাপারে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণও ব্যবস্থাপনার কার্য।. এই সব কার্যাবলি সঠিক পরিচালনার দ্বারা কারবারকে উৎপাদনশীল ও লাভজনক অবস্থায় উন্নীত করাই হল অর্থনীতিবিদ্দের ধারণায় ব্যবস্থাপনা।

(খ) প্রশাসন ও সংগঠন বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যবস্থাপনা হল একটি বিধিসম্মত ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব প্রয়োগের ব্যবস্থা (a system of authority)। তাদের মতে অপরকে দিয়ে কার্য সম্পাদন করানোর কৌশলই ব্যবস্থাপনা। আর তার জন্য প্রয়োজন হয় কর্তৃত্বের। তাই কর্তৃত্বই হল ব্যবস্থাপনার মূল বিষয়। এর জন্য ব্যবস্থাপকগণকে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তোলা, শ্রমিক ও কর্মচারী নিয়োগ, তাদের নির্দেশদান এবং সকল কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এইসব কার্যের জন্য কর্তৃত্বগ্রহণ ও কর্তৃত্ব প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। কর্তৃত্বই ব্যবস্থাপকদের অস্তিত্ব বজায় রাখে। ব্যবস্থাপকদের কর্তৃত্ব না থাকলে ব্যবস্থাপনা অচল। সব কারবারি প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তুলতে হয়। বিভিন্ন বিভাগ সৃষ্টি করে এক একজন ব্যবস্থাপকের উপর এক একটি বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং যথাবিহিত কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়। ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক তাঁর অধস্তনকে নির্দেশদান করেন। অধস্তন কর্মীগণ ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকের আদেশ অনুসারে কার্য সম্পাদন করে ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকের কাছে কার্যের প্রতিবেদন (report) পেশ করেন। কর্তৃত্ব ছাড়া ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকদের পক্ষে অধস্তন কর্মীদের সংশ্লিষ্ট কার্যের দায়িত্ব অর্পণ ও তাদের কার্যের মূল্যায়ন করা সম্ভব হত না। ফলে ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের সকল ব্যক্তিদের দিয়ে কার্য সম্পাদন করা ব্যবস্থাপনার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা গ্রহণ ও প্রয়োগই ব্যবস্থাপনার মুখ্য বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র।

(গ) সমাজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশেষ জ্ঞান ও গুণের অধিকারী ব্যবস্থাপকদের একটি শ্রেণী হিসাবে গণ্য করাই হল ব্যবস্থাপনা। কারণ কর্তৃত্ব প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজন বিশেষ জ্ঞান, দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা। এজন্য ব্যবস্থাপনা এই বিশেষ গুণসম্পন্ন শ্রেণী বা দলের ব্যক্তিবর্গ নিয়ে গঠিত। ব্যবস্থাপকগণ কারবার পরিচালনার সকল দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেন, শ্রমিক ও কর্মচারীদের এবং কারবারি কার্যাবলি পরিচালনা করেন। বড়ো প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনাকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়। উচ্চতর, মধ্যবর্তীস্তর এবং নিম্নস্তর। পরিচালক মণ্ডলী, সভাপতি, মুখ্য নির্বাহী প্রভৃতিদের নিয়ে ব্যবস্থাপনার উচ্চস্তর গঠিত হয়। এই স্তরের ব্যবস্থাপকগণ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেন, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান যেমন, বিক্রয় ব্যবস্থাপক,

ক্রয় ব্যবস্থাপক, উৎপাদন ব্যবস্থাপক, মুখ্য হিসাবরক্ষক, সচিব এবং তত্ত্বাবধায়কগণ প্রমুখদের নিয়ে ব্যবস্থাপনার মধ্যবর্তী স্তর গঠিত হয়। উচ্চস্তর ব্যবস্থাপনার গৃহীত সিদ্ধান্ত, নীতি ও পরিকল্পনা কার্যে রূপদান করে ব্যবস্থাপনার মধ্যবর্তী স্তর। নিম্নস্তর ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থাপকগণ হলেন অফিস তত্ত্বাবধায়ক, পর্যবেক্ষক, আঞ্চলিক বিক্রয় ব্যবস্থাপক, শাখা-অধিকর্তা প্রভৃতি। এরা ব্যবস্থাপনার মধ্যবর্তী স্তরের আদেশ ও নির্দেশ অনুসারে শ্রমিক ও কর্মচারীদের দিয়ে কার্য সম্পাদন করান। এইভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব ধাপে ধাপে উচ্চস্তর থেকে মধ্যবর্তীস্তর এবং মধ্যবর্তীস্তর থেকে নিম্নস্তরে প্রবাহিত হয়। ব্যবস্থাপনার এই তিনটি স্তরকে সাধারণ শ্রমিক ও কর্মচারীদের থেকে পৃথক করে, 'ব্যবস্থাপনা' বলে অভিহিত করা হয়। যেমন সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট কোম্পানিতে মালিকানা ও ব্যবস্থাপনাকে পৃথক করে, 'ব্যবস্থাপনা' বলে অভিহিত করা হয়। যেমন সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট কোম্পানিতে মালিকানা ও ব্যবস্থাপনাকে পৃথক করা হয়। শেয়ার গ্রহীতাগণকে কোম্পানির সদস্য বা মালিক শ্রেণী এবং বিশেষ গুণের আধিকারী ব্যববস্থাপকগণকে সমষ্টিগতভাবে বা শ্রেণী হিসাবে বলা হয় ব্যবস্থাপনা।

ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণার ভিন্নতা থাকলেও প্রত্যেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন বিভিন্নতার মধ্যে একতা সৃষ্টি করাই ব্যবস্থাপনার মূলমন্ত্র। কারণ কারবারি প্রতিষ্ঠানের মালিক, কর্মী, ক্রেতা, সমাজ এবং সরকার, কারবার সম্পর্কে প্রত্যেকের স্বার্থ ভিন্ন। আবার ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গি এদের প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথক। এই পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাপনার ধারণা হল সকল স্বার্থের মধ্যে সুসামঞ্জস্য বিধান করা।

১.৪ ব্যবস্থাপনার তাৎপর্য

বর্তমান যুগের জটিল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার যে কোনও কারবারি প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার তাৎপর্য অনস্বীকার্য। যে কারবারের ব্যবস্থাপনা যত বেশি দক্ষ সেই কারবার তত বেশি সফল। কারণ ব্যবস্থাপনা হল উদ্দেশ্যপূরণের চাবিকাঠি। দক্ষ ব্যবস্থাপনাই স্বল্প প্রয়াসে সীমাবদ্ধ মানবিক এবং অমানবিক সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে বহুল উৎপাদনের ব্যবস্থা করে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে সফল হয়। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে দেশ ব্যবস্থাপনা বিদ্যায় যত বেশি উন্নত সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও তত বেশি সুদৃঢ়। ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার জন্যই বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। কারবার পরিচালনায় ব্যবস্থাপনার তাৎপর্য নীচে আলোচনা করা হল।

(১) জীবনী শক্তির সঞ্চার (Provides vitality for life) :

ব্যবস্থাপনা কারবারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জীবনীশক্তি সঞ্চার করে প্রতিষ্ঠানকে সজীব, প্রাণবন্ত ও সক্রিয় করে তোলে। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার ভূমিকা হল মানবদেহের মস্তিষ্কের মতো। মস্তিষ্ক যেমন দেহকে চালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে তেমনি ব্যবস্থাপনা কারবারকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কারবারি উদ্দেশ্য সফল করে। মস্তিষ্ক না থাকলে জীবদেহ যেমন অচল তেমনি ব্যবস্থাপনা ব্যতিরেকে কারবারও নির্জীব ও নিশ্চল।

(২) বৃহৎ কর্মপ্রক্রিয়া (Massive work process) :

ব্যবস্থাপনা হল একটি বৃহৎ কর্মপ্রক্রিয়া, অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার পথ বা হাতিয়ার। উৎপাদনের আটটি উপাদান আছে। এগুলো হল মানুষ (man), অর্থ (money), কাঁচামাল (materials), যন্ত্রপাতি (machines), পদ্ধতি (method), বাজার (market), প্রেরণা (motives) এবং ব্যবস্থাপনা (management)। এদের মধ্যে ব্যবস্থাপনা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ব্যবস্থাপনাই উপাদানগুলোর শীর্ষে অবস্থান করে এদের পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশদান, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন করে পণ্য বা সেবা উৎপাদন এবং বণ্টন করে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যপূরণ করে।

(৩) বিভিন্ন স্বার্থের সমন্বয় সাধন (Co-ordination of various interest) :

কারবারি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী আছে। যেমন শ্রমিক, ক্রেতা, দেনাদার, পাওনাদার, মালিক, সরকার, সমাজ প্রভৃতি। এদের একের স্বার্থ অপরের স্বার্থের ঠিক বিপরীত। ব্যবস্থাপনা কারবারের সঙ্গে জড়িত এই বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে, বিভিন্ন চাহিদা ও লক্ষ্যের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করে। পি. এফ. ড্রাকারের মতে "কারবার ব্যবস্থাপনা হল বিভিন্ন চাহিদা ও লক্ষ্যের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি।"

(৪) সৃজনী শক্তি বৃদ্ধি করে (increase creativity) :

কারবারি ক্ষেত্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন, মানুষের চাহিদার পরিবর্তন, স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রভৃতি কারণে কারবারি ক্ষেত্র ক্রমশই জটিল আকার ধারণ করেছে। পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন পণ্য উন্নয়ন (new product development), নতুন উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রণয়ন (formulation of new manufacturing process), নতুন বাজার আবিষ্কার (exploration of new markets) প্রভৃতির মাধ্যমেই এই জটিলতা থেকে কারবারি প্রতিষ্ঠান রেহাই পেতে পারে। নতুন পণ্য উন্নয়ন, নতুন উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রণয়ন ও নতুন বাজার আবিষ্কার প্রভৃতির জন্য প্রয়োজন সৃজনী শক্তির। ব্যবস্থাপনাই কারবারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সৃজনী শক্তি বৃদ্ধি করে প্রতিষ্ঠানকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হতে প্রেরণা জোগায়।

(৫) বিভিন্ন সমস্যার সমাধান (solution of various problems) :

কারবারের বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার ভূমিকা হল বন্ধু, দার্শনিক ও পথ প্রদর্শকের (friend, philosopher and guide)। জটিল কারবারি জগতে প্রতিষ্ঠান কারবার পরিচালনার ক্ষেত্রে অসংখ্য সমস্যার মুখোমুখি হয়। শ্রমিক সঙ্কট, আর্থিক সঙ্কট, পণ্য-মুল্যের হ্রাসবৃদ্ধি, বাজারের অস্থিরতা, প্রতিযোগিতা প্রভৃতি কারবারের নিত্যকার সমস্যা। ব্যবস্থাপনা ধৈর্য, কুশলতা ও সহনশীলতার সঙ্গে এই সব সমাধানের বাস্তব সম্মত পথ নির্দেশ করে।

(৬) শিল্পে শান্তি বজায় রাখা (maintenance of industrial peace) :

দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই শিল্প প্রতিষ্ঠানে শান্তি বজায় রাখা এবং বাজারে সুনাম অর্জন করা সম্ভব হয়। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের নিয়োগ করা, তাদের যোগ্যতা অনুসারে উপযুক্ত কার্যে সংস্থাপন করা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের দ্বারা পদোন্নতির ব্যবস্থা করা, পরিশ্রম অনুযায়ী পারিশ্রমিক প্রদান করা, তাদের বহুবিধ সমস্যা সমাধান করে এবং সদ্ আচরণের মাধ্যমে কর্মীদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

(৭) সার্বজনীন প্রয়োগ (Universal application) :

ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা কেবল কারবারি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। এর প্রয়োজনীয়তা সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও সমানভাবে পরিব্যপ্তি। জি. আর. টেরি (G. R. Terry) তার 'Principles of Management' (১৯৮৪) গ্রন্থে বলেছেন "ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সার্বজনীন প্রয়োগ করা যায়। ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর অর্থ হল, পরিকল্পনা, সংগঠন, রূপায়ণ ও নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত প্রধান প্রধান কার্যাবলি মৌলিক ধরনের এবং এগুলি প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে ব্যবস্থাপকগণ সম্পন্ন করেন। সাধারণ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য একাধিক মানুষ কার্য করেন, তখনই এর সার্বজনীনতা অনুভব করা যায়।"

(৮) সামাজিক কল্যাণ (social welfare) :

কারবারি প্রতিষ্ঠান সম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্র। প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও গুণ-সম্পন্ন দ্রব্য সরবরাহের মাধ্যমে ক্রেতাদের সন্তুষ্টি বিধান, উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা ও উপযুক্ত বন্টন ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলি সামাজিক কল্যাণের এক একটি সূচক। দক্ষ ব্যবস্থাপনার সাহায্যে এইসব লক্ষ্যে উপনীত হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার গুণগতমানের উপর কারবারের উন্নতি এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণ নির্ভর করে। উৎপাদনের গুণগতমান বৃদ্ধি, চাহিদা অনুসারে দ্রব্য উৎপাদন, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সব স্তরে আয় বৃদ্ধি, সরকারকে কর প্রধান, কর্মচারীদের ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়।

(৯) উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে অবদান (contribution towards developing economy) :

বিকাশশীল দেশের অর্থনীতিতে উত্তম ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের একটি হাতিয়ার। উন্নয়নশীল দেশে সম্পদ চিহ্নিতকরণ, মানবিক ও অমানবিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার কার্যকরী রূপদান প্রভৃতি বিষয় অতি গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়ে মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা একমাত্র সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার দ্বারাই সম্ভব। উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে ব্যবস্থাপনা কারবারি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন থেকে বণ্টন প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। প্রখ্যাত শিল্পপতি জে. আর. ডি. টাটা (J.R.D. Tata) বলেছেন "বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপকগণ উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।" উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ভারতের কৃষিতে প্রযুক্তিগত কৌশল প্রয়োগ, যোগাযোগ ব্যবস্থার (tele communication) উন্নতিতে ব্যবস্থাপনার কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে।

(১০) ব্যবস্থাপনার অগ্রগতির যুগ (era of managerial advancement) :

বর্তমান যুগ ব্যবস্থাপনার যুগ। আর্থ-সামাজিক বিকাশের প্রয়োজনে দেশের সীমিত সম্পদকে ব্যবহার করে লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হবার জন্য, জীবনের সবক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির কারণে বর্তমানে যে হারে সম্পদের ব্যবহার হচ্ছে মানব সভ্যতায় এর আগে তা কখনও দেখা যায়নি। মানুষের অভাব প্রকট ও চাহিদা ক্রমবর্ধমান। তারা উচ্চাশার বিপ্লবের (revolution of rising expectations) মধ্য দিয়ে চলছে। তাই যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনাই এই নিরন্তর চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এবং জটিল ও পরিবর্তনশীল সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় এক সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে।

১.৫ ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ

মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ দেখা যায়। সুদীর্ঘকাল ধরে ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার যে বিবর্তন দেখা যায় তাকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়—(ক) প্রাচীন যুগ (Ancient Age) (খ) মধ্যযুগ (Middle Age) এবং (গ) আধুনিক যুগ (Modern Age)।

(ক) প্রাচীন যুগ ঃ প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগে মানুষ খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য এবং শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য দলবদ্ধভাবে বসবাস করত। এইভাবে সৃষ্টি হল অপরিণত দল বা সমাজ। দলে বয়স্ক ব্যক্তিগণই ছিলেন সম্মানিত। তাঁরা নিয়ম কানুন প্রণয়ন করে দলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। এইভাবে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। কৃষিকার্য আবিষ্কারের পর মানুষ যাযাবরবৃত্তি পরিত্যাগ করে একই জায়গায় বসবাস শুরু করল। গড়ে উঠল গ্রামীণ সমাজ। গ্রামীণ সমাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন নিয়ম-কানুন, রীতি-পদ্ধতি প্রণয়ন করা হল। গ্রামীণ সমাজে কর ব্যবস্থা, শ্রম বিভাজন (division of labour) প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। সূত্রপাত হল ব্যবস্থাপনার।

প্রাচীন ব্যাবিলন, মিশর, গ্রিস, মেসোপটেমিয়া ও ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে উত্তম ব্যবস্থাপনার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য, মিশরের পিরামিডগুলি, ভারতের মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পার শহর ও রাস্তাঘাটগুলি সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রায় ১৮০০ খিস্ট-পূর্বাব্দে ব্যাবিলনের সম্রাট হামুরাবির (Hammurabi) রাজত্বকালে একটি বিধি-পুস্তিকা (Code) তৈরি করা হয়েছিল। তাতে সরকারি প্রশাসন সংক্রান্ত আইন-কানুন সহ প্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়মাবলীরও উল্লেখ ছিল।

প্রাচীন চীনে খ্রিস্টপূর্ব ১,১০০ সময়ে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মতবাদ ছিল যে কর্মী কার্যে দক্ষ তাকে পুরস্কার দাও আর অযোগ্য কর্মীকে তিরস্কার কর। প্রাচীন চীনের এই মতবাদ বর্তমান দিনের ব্যবস্থাপনায়ও খুবই প্রাসঙ্গিক।

সম্ভবত সে যুগে গ্রিকদের অবদানই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দে সক্রেটিস ব্যবস্থাপনার ব্যাপকতার কথা স্বীকার করেন। সক্রেটিসের শিষ্য জেনোফনের (Xenophon) লেখায় কর্মী নির্বাচন, বিশেষীকরণ, ক্ষমতাঅর্পণ, গতি-সমীক্ষা (motion study) প্রভৃতির আলোচনা পাওয়া যায়। তিনি ব্যবস্থাপনাকে কলা হিসাবে বর্ণনা করেন। দার্শনিক প্লেটো (Plato) তাঁর 'Republic' বইটিতে শ্রমবিভাজন ও বিশেষীকরণ নীতির উল্লেখ করেছেন।

৩১২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারতবর্ষে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রকাশিত হয়। এই বইটিতে তৎকালীন অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিল।

তবে প্রাচীনযুগে ব্যবস্থাপনার কোনও সুস্পষ্ট তত্ত্ব ছিল না। যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থাপনার অভাবে ধ্যান-ধারণার আদান-প্রদান হত না। সেকালে পরীক্ষা ও ভুলের (trial and error) মধ্য দিয়ে ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা অগ্রসর হয়েছিল।

খ্রিস্টপূর্ব যুগে ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের অবদান নিম্নলিখিত একটি ছকের মাধ্যমে দেখান হল।

আনুমানিক সময়	**ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি**	**প্রধান অবদান**
৫০০০ খ্রি. পূ.	সুমেরু প্রজাতি	নথিরক্ষণ
৪০০০ খ্রি. পূ.	ইমিন্সির	পরিকল্পনা, সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা
১৮০০ খ্রি. পূ.	হামুরাবি	সাক্ষ্যের ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণজনিত লিখন, ন্যূনতম মজুরি, দায়িত্বের স্থিরতা
১১০০ খ্রি. পূ.	চীন	সংগঠন, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা
৪০০ খ্রি. পূ.	সক্রেটিস	ব্যবস্থাপনার ব্যাপকতার স্বীকৃতি।

৪০০ খ্রি. পূ.	জেনোফন (Xenophon)	ব্যবস্থাপনাকে পৃথক কলা হিসেবে স্বীকৃতি
৩৫০ খ্রি. পূ.	প্লেটো	বিশেষায়ণের নীতির স্বীকৃতি
৩২৫ খ্রি. পূ.	আলেকজান্ডার	কর্মীব্যবহার
৩২১ খ্রি. পূ.	কৌটিল্য	অর্থশাস্ত্র

(খ) মধ্যযুগ ঃ সাধারণত মধ্যযুগ বলতে রোম সাম্রাজ্যের পরবর্তী ৪০০ বছর বোঝায়। মধ্যযুগে ব্যবস্থাপনার বিশেষ কোনও অগ্রগতি না হওয়ার কারণে অনেকে এই যুগকে অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করেছেন। এই যুগের দুজন বিখ্যাত ব্যবস্থাপনা চিন্তাবিদ্ ছিলেন ইংল্যান্ডের স্যার টমাস মুর (Sir Thomas More, 1477-1535) এবং ইতালির নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি (Niccolo Machiavelli 1469)। স্যার টমাস মুর তাঁর বিখ্যাত ইউটোপিয়া (Utopia) বইটিতে তৎকালীন ইংল্যান্ডের মানুষের দুর্দশার জন্য অভিজাত শাসকশ্রেণীর অদক্ষ ব্যবস্থাপনাকেই দায়ী করেন। কূটনীতিজ্ঞ ম্যাকিয়াভেলি তাঁর দি প্রিন্স (The Prince) বইতে নেতৃত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন ‘‘নেতা (বা ব্যবস্থাপক) দুই ধরনের একজন জন্মসূত্রেই সৃষ্ট, আর একজন গুণাবলি অর্জন করে নেতা।’

(গ) আধুনিক যুগ ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে ব্যবস্থাপনার অনেক রীতি-পদ্ধতি গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত এবং প্রচারিত হয়েছিল। ব্যবস্থাপনার নীতি, কলাকৌশল ও প্রক্রিয়ার সন্ধানে যে সব ব্যক্তি নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন কারবারি জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনাতত্ত্ব বিশ্লেষণে সমর্থ হন। তারা ব্যবস্থাপনাকে একটি বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেন। আধুনিক ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি মতবাদ বা স্কুলের (school) সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশেষজ্ঞগণ ব্যবস্থাপনা শিক্ষায় যে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন তাকেই ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার মতবাদ বা স্কুল বলা হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটেছিল যে সব চিন্তাবিদ্দের দ্বারা তাঁদের মধ্যে ইংল্যান্ডের জেমস ওয়াট (James Watt) এবং ম্যাথু বোল্টন (Boulton), রবার্ট আওয়েন (Robert Owen), চার্লস ব্যাবেজ (Charles Babbage)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় ব্রিটেনের দুই ব্যবস্থাপক জেমস ওয়াট এবং ম্যাথু বোল্টন ব্যবস্থাপনার বহুবিধ কৌশল উদ্ভাবন করেন। যেমন বাজার সংক্রান্ত গবেষণা, পূর্বানুমান, উৎপাদন পরিকল্পনা, কমিটি দ্বারা শ্রমিক নিয়োগ, শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা, কার্যপর্যবেক্ষণ ও ফলানুসারে পারিশ্রমিক প্রদান, কল্যাণমূলক প্রকল্প প্রভৃতি।

কর্মী ব্যবস্থাপনার (Personnel Management) জনক শিল্পপতি রবার্ট আওয়েনই (১৭৭১-১৮৫৮) সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রাণহীন যন্ত্রের প্রতি যতখানি দৃষ্টি দেওয়া হয় ‘মানবিকযন্ত্রের’ (শ্রমিক ও কর্মচারী) কল্যাণের প্রতিও ঠিক ততখানি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

গণিতের অধ্যাপক চার্লস ব্যাবেজ (১৭৯২-১৮৭১) ১৮৩২ সালে তার বিখ্যাত বই ‘‘On the Economy of Manufactures’’-তে উল্লেখ করেন ‘‘ব্যাপক অনুসন্ধানের দ্বারা সঠিক তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হবে। দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা অনুসারে কর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন কার্যসমূহ বণ্টন করতে হবে।’’

প্রকৃতপক্ষে ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানের জন্ম হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। যে দুজন পথ প্রদর্শক এই বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তাঁরা হলেন আমেরিকার এফ. ডব্লু. টেলর (F.W. Taylor, 1856-1915) এবং ফ্রান্সের হেনরী ফেয়ল (H. Fayol, 1841-1925)। টেলরকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক এবং ফেয়লকে সাধারণ ব্যবস্থাপনার আদিগুরু বলা হয় ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে এদের অবদান অবিস্মরণীয়। এছাড়াও যাঁরা ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁরা হলেন এইচ. এমারসন (H. Emerson, 1853-1931), এইচ. এল. ন্যাট (H. L. Gantt, 1861-1919), এফ. বি. গিলব্রেথ (F. B. Gilbreth, 1868-1924), এল্টন মেয়ো (Elton Mayo, 1880-1949) প্রভৃতিরা।

১.৬ ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার বিভিন্ন মতবাদ

ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারায়, ব্যবস্থাপনার নীতি, প্রক্রিয়া, কলাকৌশল প্রভৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনাবিদ্, চিন্তাবিদ্ ও গবেষক যে সব দৃষ্টিভঙ্গি বা মতাদর্শ প্রকাশ করেছেন বিশ্লেষণের তাগিদে তাদের কয়েকটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ে ভাগ করা যায়।

(১) সনাতন বা ধ্রুপদী ব্যবস্থাপনা মতবাদ

(Classical Management School)

(২) আধুনিক ব্যবস্থাপনা মতবাদ

(Modern Management School)

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মতবাদ সমূহকে সম্যক অবহিতির জন্য এদেরকে কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা হল :

(১) সনাতন বা ধ্রুপদী ব্যবস্থাপনা মতবাদ

(ক) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা মতবাদ—এফ. ডব্লু. টেলর

(খ) প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা মতবাদ—হেনরী ফেয়ল

(২) আধুনিক ব্যবস্থাপনা মতবাদ

(ক) মানবিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় মতবাদ (Human Relation School)—এলটন মেয়ো

(খ) মানবিক আচরণ ভিত্তিক মতবাদ

(Human Behavioural School)—ডগলাস ম্যাকগ্রেগর, হারবার্ট এ. সাইমন

(গ) পরিমাণসূচক ব্যবস্থাপনা মতবাদ

(Quantitative Management School)—এল. এক্কফ্ (L. Ackoff)

১.৬.১ সনাতন বা ধ্রুপদী ব্যবস্থাপনা মতবাদ

এই মতবাদের প্রবক্তাগণ ব্যবস্থাপনার কার্যসমূহ ও নীতি নির্ধারণে বেশি মনোনিবেশ করেছেন। এই মতবাদের চিন্তাবিদ্গণ সংগঠনকে একটি যন্ত্র হিসাবে মনে করেন এবং প্রত্যেক কর্মীকে কার্যে দক্ষ করে তোলার মাধ্যমে সংগঠনের দক্ষতা বাড়ানো যায় বলে মনে করেন। এই মতবাদে বিভিন্ন কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় ও বিশেষায়ণের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই মতবাদ কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছে তা হল—কার্যের

পরিমাণ, শ্রমবিভাগ, ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি, বিশেষীকরণ (specialisation), সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ প্রভৃতি।

এই মতাবলম্বীদের একদল ব্যক্তিগত দক্ষতা এবং অন্য দল সমষ্টিগত দক্ষতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ফলে দুইটি চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটেছে—(ক) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা মতবাদ—যার জনক হলেন এফ. ডব্লু. টেলর (খ) প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা মতবাদ—যার প্রবক্তা হলেন হেন্‌রী ফেয়ল।

১.৬.২ আধুনিক ব্যবস্থাপনা মতবাদ

ব্যবহারিক বিশেষজ্ঞ ও গবেষকগণ ব্যবস্থাপনার যে সব আধুনিক মতাদর্শ প্রকাশ করেছেন সেগুলিকে আধুনিক ব্যবস্থাপনা মতবাদ বলা হয়। আধুনিক ব্যবস্থাপনা মতবাদের বৈশিষ্ট্য হল ঃ গতিশীলতা, বহুস্তর ও বহুমাত্রিকতা (Multi-level and Multi-dimentional), বহু উদ্দেশ্যমুখীতা, বহুমুখী শিক্ষা-বিষয়ক (Multi-disciplinary), অভিযোজনক্ষম (Adaptive) এবং বহুচালক (Multi-variable)।

এই মতবাদের বিভিন্ন চিন্তাবিদ্‌গণ বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে মানবিক সংগঠন ও মানবিক সম্পর্কের ভারসাম্য, গতিশীল বিশ্লেষণ এবং সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের মতে বিশ্লেষণ করার জন্য গাণিতিক ও ফলপ্রসূ গবেষণার (Operational research) সাহায্য নিতে হবে। ব্যবস্থাপনায় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিষয়গুলিকে উপযুক্ত বিচার বিবেচনার মাধ্যমে কারবারের বহুমুখী উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভবপর হবে।

এই মতবাদে বেশ কয়েকটি তত্ত্ব আছে। এদের কয়েকটি হল (১) মানবিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় মতবাদ (Human Relat ons School) (২) মানবিক আচরণ ভিত্তিক মতবাদ (Human Behavioural School) (৩) পরিমাণ সুচক ব্যবস্থাপনা মতবাদ (Quantitative Management School) (৪) পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি (Systems Approach) (৫) পরিস্থিতিসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি (Contingency Approach) (৬) সিদ্ধান্ত দৃষ্টিভঙ্গি (Decision Approach) প্রভৃতি।

এদের মধ্যে পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত হল প্রথম তিনটি মতবাদ।

১.৬.৩ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা মতবাদ—এফ. ডব্লু. টেলর

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা মতবাদের মূল সূত্র হল ব্যবস্থাপনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ অর্থাৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তথ্য অনুসন্ধান, সংগ্রহ, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও গবেষণার দ্বারা ব্যবস্থাপনার প্রধান প্রধান রীতি-নীতি ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত হবে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা মতবাদের প্রবর্তক হলেন এফ. ডব্লু. টেলর। এই মতবাদের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সমর্থকরা হলেন এইচ. এল ন্যাট (H. L. Gantt), এফ. বি. গিলব্রেথ (F. B. Gilbreth), এম. এল. কুক (M. L. Cooke) এবং এইচ. এমারসন (H. Emerson) প্রভৃতি।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার এফ. ডব্লু. টেলর (১৮৫৬-১৯২৫) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শিল্প সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এক বিশেষ ধরনের ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন করে জগৎ-বিখ্যাত হন, যার নাম বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা। তিনি ১৮ বছর বয়সে যন্ত্র নির্মাতা (machinist) এবং লেদ চালানোর কার্যে শিক্ষানবীশ হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। তারপর ২২ বছর বয়সে মিডভেল স্টিল ওয়ার্কস (Midvale Steel Works) কোম্পানিতে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে তাঁর যোগ্যতার জন্য ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার পদে

উন্নীত হন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত বই "The Principles of Scientific Management" প্রকাশিত হয়। যা ব্যবস্থাপনার জগতে ঐতিহাসিক সাড়া জাগায়। আজও তাঁর বইটি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার গীতা স্বরূপ।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা কী?

এফ. ডব্লু. টেলর বলেছেন "তোমার কর্মীদের দিয়ে তুমি কী কী কার্য করাতে ইচ্ছুক তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা এবং কর্মীগণ উৎকৃষ্ট উপায়ে ও ন্যূনতম ব্যয়ে তোমার দেওয়া কার্য সম্পন্ন করছে কিনা তা তত্ত্বাবধান করা হল বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা।"

ওয়াই কে. ভূষণ (Y. K. Bhusan)-এর মতে "শিল্প ব্যবস্থাপনার নানারকম সমস্যা সমাধানের জন্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রাপ্ত রীতিসমূহের অবলম্বন ও প্রয়োগকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বলা হয়।"

সাধারণভাবে একে সংজ্ঞায়িত করা যায় নিম্নরূপে ঃ

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা হল চিন্তার একটি ধারা বা মনোভাব যা বৈজ্ঞানিক গবেষণা, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের দ্বারা আবিষ্কৃত বিভিন্ন পদ্ধতি এবং কর্মনীতি ব্যবস্থাপনায় প্রয়োগ করার চেষ্টা করে।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ঃ

টেলর শিল্প সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করেন। কয়েকটি বিজ্ঞানসম্মত মৌলিক নীতি ব্যবস্থাপনায় প্রয়োগ করার জন্য এরূপ ব্যবস্থাপনার নাম দেওয়া হয় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় প্রচলিত হওয়ার আগে কারবারি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হত সাধারণ বিচার-বুদ্ধি ও নিয়ম-নীতি প্রয়োগের দ্বারা। ফলে অনেক ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফললাভ সম্ভব হত না। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রচলনের পর বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা প্রতিটি কার্যেই প্রয়োগ কর হয়। ফলে সময়, অর্থ, শ্রম, যন্ত্রের উপযুক্ত ও কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের দক্ষতাবৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস পেতে থাকে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সারবস্তু বোঝাতে টেলর বলেছেন "এটি এমন এক দর্শন যার মধ্যে ব্যবস্থাপনার চারটি মহৎ নীতির মিলন হয়েছে। প্রথমতঃ প্রকৃত বিজ্ঞানের বিকাশ (প্রতিটি কার্যের সুশৃঙ্খল অনুধাবন ও বিশ্লেষণ) ; দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শ্রমিক নির্বাচন; তৃতীয়তঃ তাদের বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ; চতুর্থতঃ ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা স্থাপন।"

ব্যবস্থাপক এবং শ্রমিকদের চিন্তাধারা ও কার্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে উভয়ের সর্বাধিক উন্নতি সাধনই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য। এর দ্বারা মালিকের পক্ষে উৎপাদিকা শক্তির চরম উৎকর্ষ সাধন এবং শ্রমিকদের পক্ষে কর্মদক্ষতার সর্বাধিক উন্নয়ন সাধন সম্ভবপর হয়। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে টেলরের দান অপরিসীম ও অবিস্মরণীয়। তার প্রবর্তিত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ঃ

(ক) সর্বাত্মক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ। ব্যবস্থাপক ও শ্রমিক উভয়কেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুসন্ধান দ্বারা নির্ধারিত বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যাকে বলা যায় কর্মপদ্ধতিগত বিপ্লব।

(খ) শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি অটল বিশ্বাস, আস্থা ও সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের মধ্য দিয়ে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে যা অন্য ভাষায় মানসিক বিপ্লব (mental revolution)।

টেলর ও অন্যান্য চিন্তাবিদদের প্রধান লক্ষ্য ছিল উৎপাদনে অদ্বিতীয় পন্থার সন্ধান এবং তার মাধ্যমে শিল্প জগতের উৎকর্ষ বর্ধন। তাই অনেকের মতে, কেবলমাত্র শিল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেই এই নীতিগুলি প্রযোজ্য। তবে

বর্তমান কালের উন্নত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতি ও পদ্ধতিগুলির উৎস যে টেলর প্রবর্তিত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তা অনস্বীকার্য।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতি বা উপাদান সমূহ ঃ

যে সকল অবস্থার উপর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সাফল্য নির্ভরশীল, সেই সব অবস্থাকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতি বা উপাদান বলা হয়। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতি বা উপাদানগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) মানবিক দিক (human aspects) এবং (খ) অমানবিক (non-human aspects)।

(ক) মানবিক দিক ঃ

(১) বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শ্রমিক নির্বাচন ঃ (Selection of workers on scientific basis)

উৎপাদনের একটি অপরিহার্য উপাদান হল শ্রমিক। শ্রমিক নিয়োগ ব্যবস্থাপনার অতি গুরুত্বপূর্ণ কার্য। প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত শ্রমিক নিয়োগ করার আগে তার মানসিক ও শারীরিক দক্ষতা বিচার করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ দক্ষ ও যোগ্য শ্রমিক নির্বাচন ও নিয়োগের উপর প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভরশীল।

(২) শ্রমিক সংস্থাপন (Placement of workers) ঃ

যোগ্য শ্রমিককে যোগ্য কার্যে নিয়োগ করাকেই (right man in the right place) শ্রমিক সংস্থাপন বলা হয়। প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি কার্যের প্রকৃতি ও দায়িত্ব সঠিকভাবে বিবেচনা করে কার্য উপযোগী শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে। শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে শ্রমিকের যোগ্যতা, দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞতা বিবেচনা করা দরকার। শ্রমিক নিয়োগের পর নির্দিষ্ট কার্যের জন্য উপযুক্ত শ্রমিক সংস্থাপন ব্যবস্থাপনার একটি গুরুদায়িত্ব।

(৩) শ্রমিক প্রশিক্ষণ (Training of workers) ঃ

কার্যের প্রতি শ্রমিকের আগ্রহ বা নিষ্ঠা থাকলেও কার্যের গুণগত মান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণের। প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে উৎপাদন পদ্ধতিতে নিত্যনতুন পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শ্রমিকদের নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ শ্রমিকদের মান উন্নয়নে এবং নির্দিষ্ট মানানুসারে নিজ নিজ কার্যসম্পাদনে সাহায্য করে।

(৪) বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কার্য বিশ্লেষণ (Analysis of work on scientific principles) ঃ

গতানুগতিক প্রথার বদলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কার্য বিশ্লেষণ করে কোনও নির্দিষ্ট কার্যের আঙ্গিক উপাদানগুলি চেনা যায় এবং তাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝা যায়। এর ফলে বিজ্ঞান ভিত্তিক কার্যবণ্টন সম্ভব হয়। সময় ও শ্রমের অপচয় বন্ধ করা যায়। এজন্য প্রয়োজন তিন ধরনের সমীক্ষার। যেমন (ক) সময় সমীক্ষা (time study) (খ) গতি সমীক্ষা (motion study) (গ) ক্লান্তি সমীক্ষা (fatigue study)।

(ক) **সময় সমীক্ষা ঃ** শ্রমিকের কার্যক্রমের প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে কতটা সময়ের প্রয়োজন তার সমীক্ষা ও লিপিবদ্ধ করাকে সময় সমীক্ষা বলা হয়। কোনও কার্যের বিভিন্ন অংশ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সময় আলাদাভাবে সময় সমীক্ষা দ্বারা পরিমাপ করা হয়। এতে সময়ের অপচয় বন্ধ হয় এবং কার্যের সময়ও সংক্ষিপ্ত হয়।

(খ) **গতি সমীক্ষা ঃ** যে সমীক্ষার দ্বারা কার্য সম্পাদন করার সময় শ্রমিকের (যন্ত্রচালকের) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনার বিভিন্ন অংশের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হয় তাকে গতি সমীক্ষা বলা হয়। গতি সমীক্ষার উদ্দেশ্য হল অনুৎপাদনক্ষম

অঙ্গ সঞ্চালন বন্ধ করে শ্রমশক্তির অপচয় রোধ করা। গতি সমীক্ষা শ্রমিকের শ্রান্তি দূর করে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং শ্রমিকের মনে কর্মপ্রেরণা সৃষ্টি করে।

(গ) **ক্লান্তি সমীক্ষা ঃ** অতিরিক্ত পরিশ্রম করার জন্য এবং বিশ্রামের অভাবে শ্রমিকের দেহে ও মনে ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা দেয়। ফলে কার্যের পরিমাণগত, গুণগত মান হ্রাস পায় ও দুর্ঘটনার সংখ্যাও বেড়ে যায়। ক্লান্তি সমীক্ষা কার্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে শ্রমিককে নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিশ্রামের নির্দেশ দেয়। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির রাখার জন্য এবং উৎপাদনের উৎকর্ষতা বজায় রাখার জন্য ক্লান্তি সমীক্ষার প্রয়োজন হয়।

(৫) প্রেরণামূলক মজুরি ব্যবস্থা (Incentive wage system) ঃ

দক্ষতার সঙ্গে বেশি কার্য সম্পাদন করলে যাতে শ্রমিক বেশি মজুরি পায় সেই ব্যবস্থা করাই হল প্রেরণামূলক মজুরি ব্যবস্থা। টেলরের মতে, যে সব শ্রমিক মান-সময়ের (standard time) মধ্যে মান-উৎপাদন (standard output) করতে পারে তাকে উচ্চহারে মজুরি দিতে হবে এবং যারা মান-সময়ের মধ্যে মান-উৎপাদন করতে পারে না, তাদের কম হারে মজুরি দিতে হবে। টেলরের এই মজুরি প্রদান ব্যবস্থাকে পার্থক্যমূলক কার্যহার পদ্ধতি (differential piece rate system) বলা হয়। এতে দক্ষ শ্রমিকদের কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি পায়।

(৬) কার্যভিত্তিক কর্মনায়ক নিয়োগ (Appointment of functional bosses) ঃ

শ্রমিকদের কার্যাবলি তদারকির জন্য কয়েকটি নিপুণ ও বিশেষায়িত তদারক বিভাগ গঠন করা হয় এবং ঐ বিভাগগুলিতে একজন করে কর্মনায়ক নিয়োগ করা হয়। টেলর আট রকমের কার্যভিত্তিক কর্মনায়ক নিয়োগের প্রস্তাব দেন। যেমন, গ্যাং বস (Gang Boss), স্পিড বস (Speed Boss), রিপেয়ার বস (Repair Boss), পরিদর্শক (Inspector), কারখানার শৃঙ্খলা রক্ষাকারি করণিক (Shop disciplinarian), রুট করণিক (Route clerk), নির্দেশ রচনাকারী কার্ড করণিক (Instruction Card Clerk) এবং সময় ও পরিব্যয় করণিক (Time and Cost clerk)। এই বিশেষজ্ঞ কর্মনায়কদের তার কর্তব্য পালনের জন্য পূর্ণ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দেওয়া হয়। তারা নিজ নিজ কার্য বিষয়ে শ্রমিকদের সরাসরি নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

(৭) শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে সহযোগিতা ও বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক (Co-operation and friendship between labour and management) ঃ

উৎপাদনে উৎকর্ষতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন অত্যন্ত জরুরি। এই সম্পর্ক নির্ভর করে শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ প্রভৃতি দিকে দৃষ্টি দেওয়া, শ্রমিকদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া, তাদের আদেশ পালনকারী যন্ত্র হিসাবে গণ্য না করা এবং তাদের মঙ্গল সাধন করা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অঙ্গ।

(খ) অমানবিক দিক ঃ

(১) কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও কার্যের বৈজ্ঞানিক বণ্টন (Central planning and scientific allotment of task) ঃ

প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনের জন্য একটি পৃথক কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বিভাগ থাকবে। কী কাজ, কীভাবে করা হবে, কখন করা হবে, কোথায় করা হবে এবং কে করবে প্রভৃতি বিষয় নির্দিষ্ট করে তা পরিকল্পনা বিভাগ ঠিক করবে। শ্রমিকদের শিক্ষা, দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞতা বিবেচনা করে তাদের বিজ্ঞানসম্মতভাবে কার্যবণ্টন করতে হবে যাতে কার্য ও শ্রমিকের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়।

(২) কারখানার স্থান নির্বাচন ও পরিবেশ (Selection of factory location and environment) ঃ

উপযুক্ত স্থানে কারখানার স্থান নির্বাচন করা দরকার। এতে ব্যয় সংকোচ করা যায়। কারখানার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে হবে। শ্রমিকদের জন্য সুলভ ক্যান্টিন, বিশ্রামাগার, শৌচাগার, পানীয় জল প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতি হল এসব বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া।

(৩) প্রমিতকরণ (Standardisation)

কার্য সম্পাদনের উপযুক্ত বিভিন্ন উপাদানগুলি নির্দিষ্ট মানের হতে হবে। তাতে শ্রমিকদের কার্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম, কাঁচামাল প্রভৃতি নির্দিষ্ট মানের ও যথাযথ হওয়া চাই। বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা বিভিন্ন উপকরণের মান স্থির করতে হবে। যেমন—**যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম** (machines and tools) ঃ পুরোনো যন্ত্রপাতির পরিবর্তে সর্বাধুনিক ও নির্দিষ্ট মানের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কথা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় বলা হয়েছে। কারণ তার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়, ব্যয়ও হ্রাস পায়। **কাঁচামাল ঃ** উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত মানের কাঁচামাল প্রয়োজন। উপযুক্ত কাঁচামাল ছাড়া উৎপাদনের গুণগত মান বজায় রাখা ও অপচয় রোধ সম্ভব নয়।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সুবিধাসমূহ ঃ

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতিগুলি অনুসৃত হবার ফলে যে সব সুবিধা পাওয়া যায় সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা গতানুগতিক পন্থা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বর্জন করে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রতিটি শ্রমিকের জন্য কার্য ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে এবং কার্যের প্রত্যেকটি স্তরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তন করে।

(২) শ্রমিকদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নির্বাচন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য শ্রমিকদের দক্ষতা, কর্ম নিপুণতা বৃদ্ধি পায়।

(৩) যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য কার্যে নিযুক্ত করার ফলে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

(৪) এই ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তিগতভাবে সকল শ্রমিকের এবং সামগ্রিকভাবে শিল্পের দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

(৫) গবেষণা ও সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের ফলে উৎপাদিত দ্রব্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায় ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় ফলে সুলভমূল্যে উন্নতমানের দ্রব্য সামগ্রী ক্রেতাদের সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

(৬) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োগের ফলে শ্রমিকদের ও ব্যবস্থাপকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন হয়। উভয়পক্ষের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতা ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। রক্ষণশীল মনোভাবের পরিবর্তে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটে।

(৭) প্রেরণামূলক মজুরি ব্যবস্থার প্রবর্তন করে দক্ষ শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা কার্যে উৎসাহিত হয়।

(৮) সময় সমীক্ষা, গতি সমীক্ষা ও ক্লান্তি সমীক্ষার দরুন শ্রমিকদের অপ্রয়োজনীয় দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম কমে। তারা স্বল্প সময়ে অধিক হারে উৎপাদন করতে সক্ষম হয়।

(৯) গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।

(১০) অধিক মজুরি পাওয়ার ফলে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অসুবিধাসমূহ ঃ

শিল্পজগতে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার দর্শন যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। প্রথমদিকে বহু শিল্পপতি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার দর্শনে মুগ্ধ হন এবং এর প্রয়োগে উৎসাহী ও যত্নশীল হন। কিন্তু এই নীতির পরস্পর বিরোধিতা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নিম্নলিখিত সমালোচনা করা হয় ঃ

(১) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম অনুসরণ করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং এই ব্যয়বহুল পদ্ধতির প্রয়োগ ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্পের পক্ষে সম্ভব নয়।

(২) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনাকে উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যাবলির ব্যবস্থাপনাতে সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা যায়। প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ বিপণন ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি এই নীতিতে উপেক্ষিত।

(৩) প্রেরণামূলক মজুরি ব্যবস্থায় শ্রমিকদের মজুরির তারতম্য ঘটে। ফলে শ্রমিকের মধ্যে ঈর্ষা ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

(৪) ইহাতে অবিরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নতুন যন্ত্রপাতি প্রবর্তন ও গবেষণার দ্বারা নতুন পদ্ধতি ও কৌশল উৎপাদনে প্রয়োগ করা হয়। ঘন ঘন উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয় এবং শিল্পে বিশৃঙ্খলা দেখা যায়।

(৫) এই ব্যবস্থাপনায় যে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বিভাগ থাকে তাতে শ্রমিকদের মতামত প্রকাশের অবকাশ থাকে না। ইহা শ্রমিক কল্যাণব্যবস্থার পরিপন্থী ও অগণতান্ত্রিক।

(৬) বিশেষায়নের জন্য কার্যের বৈচিত্র্য থাকে না। শ্রমিকরা একঘেয়েমির শিকার হয়। এতে শ্রমিকদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা নষ্ট হয়।

(৭) একদিকে কার্যভিত্তিক কর্মনায়কত্ব ব্যবস্থার প্রয়োগ ও অন্যদিকে পরিকল্পনা রচনা থেকে ইহার পৃথকীকরণ অবাস্তব বলে পরিগণিত হয়েছে। এদের মধ্যে সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভব নয়। আটজন কর্মনায়ক নিয়োগের ফলে বহু ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয়।

(৮) উন্নত যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল উৎপাদনে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পেলেও ধীরে ধীরে শ্রমিকের প্রয়োজন কমতে থাকে। ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়।

(৯) এরূপ ব্যবস্থাপনায় কার্যের গতিবেগ বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিকের শরীর ও মনের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে। এজন্য শ্রমিকগণ ও শ্রমিক সংঘ এই ব্যবস্থায় বিশেষ আগ্রহী নয়।

(১০) এই ব্যবস্থাপনায় অনুমান করা হয়েছে যে মানুষ স্বভাবতই কর্মবিমুখ, ফাঁকিবাজ, লোভী ও পরশ্রীকাতর। তদারকি (supervision) ছাড়া কোনও শ্রমিককে দিয়ে কার্য সম্পাদন সম্ভব নয়। মানব-চরিত্র সম্পর্কে এই ধারণা ভ্রান্ত এবং হতাশাব্যঞ্জক। সমালোচকদের মতে এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে যে নীতিগুলি স্থির করা হয়েছে সেগুলি ভুল পথনির্দেশ করতে বাধ্য।

সমালোচনা সত্ত্বেও শিল্প ব্যবস্থাপনায় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ অপরিহার্য। কারণ এর সাহায্য ছাড়া শিল্পে অগ্রগতি সম্ভব নয়। প্রয়োজন অনুসারে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন সাধন করে শিল্প প্রতিষ্ঠানে এর প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

১.৬.৪ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা মতবাদ—হেনরী ফেয়ল

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কারবারি প্রতিষ্ঠানের আকার ও জটিলতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার সমস্যা পর্যালোচনা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। টেলরের সমসাময়িক এক ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ও কার্য নির্বাহক হেনরী ফেয়ল (১৮৪১-১৯২৫) এই দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম 'প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা মতবাদ' উদ্ভাবন করেন। তাকে ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানের প্রবর্তক হিসাবে গণ্য করা হয় এবং এই মতবাদের গুরু বলা হয়। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা মতবাদে ব্যবস্থাপকদের কার্যাবলি এবং সেগুলি সম্পাদন করতে তারা কী কী সাধারণ নীতি ও নিয়মকানুন অনুসরণ করেন তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রে ফেয়লের বিখ্যাত বই 'General And Industrial Management' ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়। এই বইটির ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। ফেয়লের বক্তব্য তারপরেই সর্বজনগ্রাহ্য হয়। হেনরী ফেয়ল হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি সংগঠিতভাবে ব্যবস্থাপনার নীতি ও কার্যাবলি উল্লেখ করেন। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা মতবাদকে অনেক চিন্তাবিদ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া (Management Process School) বলে উল্লেখ করেছেন। এই মতবাদের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সমর্থকরা হলেন জে. ডি. মুনী (J. D. Moony), হ্যারোল্ড কুনজ (Harold Koontz), জর্জ. আর. টেরী (George. R. Terry), ডব্লু. এইচ. নিউম্যান (W. H. Newman), এল. এফ. আরউইক (L. F. Urwick), ই. এফ. এল ব্রেচ (E. F. L. Brech), আরনেস্ট ডেল (Ernest Dale) প্রমুখ।

এই মতবাদে ব্যবস্থাপনাকে একটি প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যখন কোনও প্রতিষ্ঠানের কোনও সাধারণ উদ্দেশ্য পূরণ করতে কয়েকজন ব্যক্তির সহযোগিতার দরকার তখনই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি সার্বজনীন। সব ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য। যেমন কারবারি প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, লাইব্রেরি বা পৌর প্রতিষ্ঠান।

ফেয়ল বিভিন্ন শিল্পের সাংগঠনিক কার্যসমূহকে ব্যবস্থাপকের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি এই কার্যসমূহকে ছয়টি ভাগে ভাগ করেন। যেমন ঃ—

(১) কারিগরি (technical)—উৎপাদন সংক্রান্ত।

(২) ব্যবসায়িক—ক্রয় ও বিক্রয় সংক্রান্ত।

(৩) আর্থিক—মূলধনের অনুসন্ধান ও তার কাম্য ব্যবহার।

(৪) নিরাপত্তা—মানবিক ও অমানবিক সম্পদের সংরক্ষণ।

(৫) হিসাবনিকাশ—উদ্বর্তপত্র, ব্যয় ও পরিসংখ্যান প্রভৃতি।

(৬) ব্যবস্থাপনা—পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশদান, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ।

ফেয়ল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য চোদ্দটি সাধারণ নীতির কথা বলেছেন। হ্যারল্ড কুন্‌জ এবং ও' ডোনেল (O'Donnel)-এর মতে ব্যবস্থাপনার নীতি প্রয়োগের প্রয়োজন হয় চারটি কারণে। এই কারণগুলি হল ঃ

(১) দক্ষতা বৃদ্ধি (২) নির্দিষ্ট ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলা (৩) সম্পদের কাম্য ব্যবহার (৪) গবেষণার উন্নয়ন। নিম্নে নীতিগুলি উল্লেখ করা হল ঃ

ব্যবস্থাপনার সাধারণ নীতি

(General Principles of Management)

(১) কার্য বিভাজন (Division of work) ঃ

কার্য বিভাজনের মূল উদ্দেশ্য হল শ্রমবিভাগ বা বিশেষায়ণ। কারবারের যাবতীয় কার্যাবলিকে ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করে প্রতিটি ছোটো অংশের ভার একজন ব্যক্তিকে দিতে হবে। এতে ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ও বিশেষজ্ঞ কর্মী গড়ে ওঠে।

(২) কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব (Authority and responsibility) ঃ

কর্তৃত্ব শব্দটির অর্থ হল বিধিসঙ্গত অধিকার। কর্তৃত্বের দ্বারা কোনও ব্যবস্থাপক আদেশদানের ও অধস্তন কর্মীকে কার্যে বাধ্য করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভ করেন। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত ব্যবস্থাপকগণকে উপযুক্ত কর্তৃত্ব দিতে হবে যাতে তারা আপন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাদের উপর ন্যস্ত কার্য সম্পাদনে সক্ষম হন। ব্যবস্থাপকদের কর্তৃত্বদানের অর্থই হল তাদের উপর অর্পিত কার্যের জন্য তাদের দায়িত্বশীল করা। যিনি কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন এবং যার উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হয়, উভয়ই সংশ্লিষ্ট কার্যের জন্য দায়ী হন। 'কর্তৃত্ব ব্যতীত দায়িত্ব' অর্থহীন। কারণ কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব তাই সমানুপাতিক হওয়া প্রয়োজন।

(৩) শৃঙ্খলা (Discipline) ঃ

শৃঙ্খলা হল বশ্যতা, শ্রমিক-মালিকের চুক্তি অনুসারে একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন ও ব্যবস্থাপনার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা। ফেয়লের মতে কারবারি প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দরকার ব্যবস্থাপনার প্রত্যেক স্তরে দক্ষ ব্যবস্থাপক নিয়োগ, ভালো কার্যের জন্য পুরস্কার এবং অন্যায়ের জন্য বিধিসম্মত শাস্তির বিধান। কারবারি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য এবং কারবারের বিভিন্ন কার্যের সমন্বয়ের জন্য সার্বিক শৃঙ্খলার একান্ত প্রয়োজন।

(৪) আদেশের একতা (Unity of command) ঃ

একজন অধস্তন কর্মচারী শুধুমাত্র একজন ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকের কাছ থেকে আদেশ গ্রহণ করবেন। বিভিন্ন ব্যবস্থাপকদের কাছ থেকে একই কার্যের জন্য বিভিন্ন ধরনের আদেশের ফলে অধস্তন কর্মী অসহায় বোধ করেন। আদেশদানের একতা না থাকলে দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অবহেলিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়।

(৫) নির্দেশদানের একতা (Unity of direction) ঃ

এই নীতির উদ্দেশ্য হল একই উদ্দেশ্যের একশ্রেণীভুক্ত কার্যকলাপ সম্পাদনের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং গৃহীত পরিকল্পনা রূপায়ণে সমগ্র প্রতিষ্ঠান ও প্রতিটি বিভাগের নির্দেশদানের সামঞ্জস্য বিধান করা। কারণ নির্দেশদানের একতার অভাবে প্রতিষ্ঠানের অবসায়ন হতে পারে।

(৬) ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধারণ স্বার্থের অধীনে থাকবে (Subordination of individual interest to general interest) ঃ

সাধারণ বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সর্বদা ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা বড়। যে কোনও প্রতিষ্ঠানেই ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়। সাধারণ ও ব্যক্তি স্বার্থের সমন্বয় করতে হবে। এই নীতিকে কার্যকর করার

জন্য ফেয়ল কতকগুলি উপায়ের কথা বলেছেন। যেমন ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকের সততা ও কঠোরতা, শ্রমিক মালিকের মধ্যে উপযুক্ত চুক্তি কিংবা নিরবিচ্ছিন্ন তদারকী প্রভৃতি।

(৭) পারিশ্রমিক (Remuneration) ঃ

শ্রমিকদের পারিশ্রমিক ন্যায্য ও উপযুক্ত হওয়া প্রয়োজন যাতে শ্রমিকরা সন্তুষ্ট হয়। জীবনযাত্রার মান, কারবারের আর্থিক অবস্থা, শ্রমিক সরবরাহের স্বল্পতা বা প্রাচুর্য প্রভৃতি অবস্থার উপর পারিশ্রমিকের হার নির্ভরশীল।

(৮) কেন্দ্রীকরণ (Centralisation) ঃ

ফেয়লের মতে যা কিছু প্রতিষ্ঠানে অধস্তন কর্মচারীদের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করে তা হল কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ এবং যা কিছু প্রতিষ্ঠানে অধস্তন কর্মচারীদের কর্তৃত্ব সঙ্কুচিত করে, তা হল কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ। কারবারি প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ বা বিকেন্দ্রীকরণ নীতি প্রবর্তন করতে হবে। বৃহৎ কারবারি সংস্থায় একজন ব্যবস্থাপকের পক্ষে সব বিষয়ে নজর দেওয়া সম্ভব হয় না, তখনই বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন হয়। দক্ষ ব্যবস্থাপনার কার্য হল কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্য গড়ে তোলা।

(৯) কর্তৃত্ব প্রবাহের শৃঙ্খল (Scalar chain of authority) ঃ

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে কারবারি সংস্থার প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ধাপে ধাপে ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে দেওয়া হয়। কর্তৃত্ব অর্পণের দ্বারা প্রশাসনে একটি শৃঙ্খল (chain) রচনা করা হয়। প্রত্যেক কর্মচারীকে ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকের আদেশ পালন করতে হবে। শৃঙ্খলের দ্বারা ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্তৃত্বের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আদেশ প্রবাহ নিম্নগামী অপরদিকে কার্যের প্রতিবেদন ঊর্ধ্বগামী।

(১০) বিন্যাস (Order) ঃ

বিন্যাস নীতির অর্থ হল বস্তু এবং ব্যক্তির যথাযথ সমাবেশ। প্রতিটি বস্তু সঠিক স্থানে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপযুক্ত কার্যে নিযুক্ত করতে হবে যাতে বস্তু এবং কর্মীদের অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়।

(১১) সমদর্শিতা (Equity) ঃ

প্রতিষ্ঠানের সবক্ষেত্রে ন্যায় ও সমতা প্রবর্তন করা ব্যবস্থাপনার অন্যতম নীতি। অধস্তন কর্মচারীর দায়িত্ববোধ জাগানোর জন্য এবং তাদের কাছ থেকে আনুগত্য আদায় করার জন্য তাদের সকল অভাব-অভিযোগ সহৃদয়তা ও ন্যায্যতার সঙ্গে ব্যবস্থাপকদের বিচার-বিবেচনা করতে হবে এবং সমদর্শিতা প্রদর্শন করতে হবে।

(১২) কর্মীদের কার্যকলাপের স্থায়িত্ব (Stability of tenure of personnel) ঃ

কোনও কার্যে অভ্যস্ত ও দক্ষতা লাভের জন্য কর্মীদের সময়ের প্রয়োজন হয়। সেই কার্যে অভ্যস্ত হবার আগেই যদি তাকে বদলি করা হয়, তাহলে তার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে না। তাই প্রতিটি কর্মীর কার্যকালের স্থায়িত্বের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া ব্যবস্থাপনার কর্তব্য।

(১৩) উদ্যম (Initiative) ঃ

কর্মীরা যাতে আপন উৎসাহ ও উদ্যমে কার্যসম্পাদন করতে পারেন তার জন্য তাদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবে রূপায়ণের ক্ষমতা দিতে হবে। উদ্যম কর্মপ্রচেষ্টায় উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

(১৪) দলের একতা (Espirit de corps) ঃ

এই নীতি দলীয় কার্যসম্পাদন এবং সবক্ষেত্রে যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের একতা এবং তাদের কার্যসমূহের সমন্বয় কারবারি সংস্থার শক্তি বৃদ্ধি করে। ব্যবস্থাপনাকে তাই দলীয় উদ্যোগ ও সচেতনতার মাধ্যমে কর্মীদের মনে একতার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।

ফেয়লের মতে ব্যবস্থাপনার নীতিগুলি পরিবর্তনশীল। ব্যবস্থাপনা হল একটি সমাজবিজ্ঞান। সুতরাং সামাজিক বিবর্তনে ও পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই নীতিগুলিকে পরিমার্জিত করে অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োগ করলে ব্যবস্থাপনার সাফল্য লাভ সম্ভব।

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সুবিধাসমূহ ঃ

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার নীতিগুলি প্রয়োগের ফলে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যায় ঃ

(১) এই নীতিগুলি ব্যবস্থাপনার কার্য-সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

(২) নীতিগুলির সঠিক প্রয়োগের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের কার্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়।

(৩) সমদর্শিতার নীতি গ্রহণের ফলে প্রতিষ্ঠানের সকল ক্ষেত্রে ন্যায় ও সমতা প্রবর্তন করা যায়।

(৪) এই নীতিগুলি উৎপাদন প্রক্রিয়া ছাড়াও ব্যবস্থাপনার অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিস্তৃত।

(৫) এই মতবাদের চিন্তাধারা অনেক ব্যাপক। ইহা কারবারি প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার উন্নতি সম্পর্কে আলোকপাত করে।

(৬) শ্রমিকদের উপযুক্ত যোগ্যতার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ব্যবস্থাপনার কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়।

(৭) এই নীতিগুলি অনেকটাই বাস্তবসম্মত। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কয়েকটি নীতির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় যা অনেক ব্যবস্থাপকই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন।

(৮) এই নীতিগুলি নমনীয়। দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করে এই নীতিগুলির পরিমার্জিত রূপ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়।

(৯) শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের একতা বৃদ্ধির ফলে প্রতিষ্ঠানের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

(১০) মানবিক ও অমানবিক সম্পদের উপযুক্ত বিন্যাসের ফলে সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত হয় ও সম্পদের অপচয় বন্ধ হয়।

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার অসুবিধাসমূহ ঃ

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার যে সমালোচনা করা হয় তা নিম্নরূপ ঃ

(১) এই মতবাদ সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমালোচনা হল, ব্যবস্থাপনার উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবস্থাপনার বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার মধ্যবর্তী ও নিম্নস্তরের কর্মীরা উপেক্ষিত।

(২) প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় মানসিক সম্পর্কের দিকটি উপেক্ষিত। অথচ কারবার ব্যবস্থাপনায় মানবিক সম্পর্কের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) বর্তমান যুগে যৌথ ব্যবস্থাপনা দেখা যায় অর্থাৎ ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে শ্রমিকগণও ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু এই তত্ত্বে সংগঠন পরিচালনা করে ব্যবস্থাপকগণ, সেখানে যৌথ ব্যবস্থাপনার কোনও স্থান নেই।

(৪) অনেকের মতে এই ব্যবস্থাপনার অধিকাংশ নীতিই বাস্তবসম্মত নয়। যেমন কার্য বিভাজনের নীতি অনুসৃত হওয়ায় কার্যে বৈচিত্র্য হীনতার ফলে শ্রমিকদের কর্মবিমুখতা বা অলসতা দেখা যায়।

(৫) ব্যবস্থাপনার সার্বজনীনতা বিতর্কমূলক। ফেয়লের মতে ব্যবস্থাপনার নীতিগুলি সমাজের সকল স্তরে সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু এই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। একটি ক্লাব পরিচালনার জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন, একটি বিশাল কারবারি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক বেশি যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। যোগ্যতার তারতম্য শুধু পরিমাণগত নয়, গুণগতও।

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা মতবাদ কারবারি প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক দিকের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে, মানবিক সম্পর্কের গুরুত্বকে অবহেলা করে। তা সত্ত্বেও এই নীতিগুলির ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের যথার্থতা স্বীকৃত হয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে নতুন বহু তত্ত্ব বা মতবাদের উদ্ভাবন হলেও ফেয়লের তাত্ত্বিক কাঠামোকে বর্তমান যুগে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা যায়নি। আজও তা মূল্যবান। এখানেই প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব।

১.৬.৫ মানবিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় মতবাদ—এলটন মেয়ো

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও কর্মীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গি মানবিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। মানবিক সম্পর্ক ভাল হলে তা উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে ও মান উন্নয়নে সাহায্য করে। অপরপক্ষে মানবিক সম্পর্ক খারাপ হলে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মনোবল ও দক্ষতা হ্রাস পায় যার ফলে পণ্য উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে। মানবিক সম্পর্ক মতবাদের মূল ভিত্তি হল কারবারি সংস্থায় কর্মীদের সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অভিযোগ প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি দিলে ব্যবস্থাপনার কার্য আরও ফলপ্রসূ হয়। যেখানে অনেক মানুষ একসঙ্গে কার্য করেন, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই গড়ে ওঠে ছোটো ছোটো ঘরোয়া গোষ্ঠী (informal groups)। প্রত্যেক কারবারে নিয়মভিত্তিক সংগঠনের (formal organisation) মধ্যে লুকানো থাকে—অনেকগুলি ছোটো ছোটো ঘরোয়া গোষ্ঠী। ব্যবস্থাপনাকে যে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে এই সব ছোটো ঘরোয়া গোষ্ঠীগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে কর্মীদের মনে আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারলে নিয়মভিত্তিক সংগঠনকে আরও বেশি শক্তিশালী করা যাবে।

এই মতবাদের সমর্থক হলেন এলটন মেয়ো, রোয়েথলিস বার্জার, মেরি পার্কার ফলেট, চেস্টার. আই. বানার্ড (Chester I. Barnard), আব্রাহাম মাসলো, ফ্রেডরিক হার্জবার্গ প্রমুখ চিন্তাবিদগণ।

এলটন মেয়ো (Elton Mayo) [১৮৮০-১৯৪৯] ঃ

মানবিক সম্পর্ক মতবাদের জনক হলেন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ও মনস্তত্ত্ববিদ অধ্যাপক এলটন মেয়ো। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো শহরের অয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানির হথর্ণ প্লান্টে (Hawthorne Plant) এলটন মেয়ো এবং তার সঙ্গী সমাজবিজ্ঞানী রোয়েথলিস বার্জার (Roethlis Berger), টি. এন. হোয়াইট

হেড এবং কোম্পানি প্রতিনিধি উইলিয়াম. জে. ডিকসন গবেষণা শুরু করেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গবেষণা চালানো হয়। তাঁরা গবেষণাকে চারটি অংশে ভাগ করেছিলেন। (১) আলোকিতকরণের পরীক্ষা (illumination experiments) (২) দলগত সম্মিলন পরীক্ষা (relay assembly test) (৩) পর্যবেক্ষণ কক্ষ সমীক্ষা (observation room study) (৪) গণ-সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (massive interviewing programme)।

হথর্ন গবেষণা ঃ অবদানসমূহ

(১) অ-বিধিবদ্ধ সম্পর্ক ও সংগঠন (Informal relations and organisation) ঃ

মানুষ সামাজিক জীব। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিয়মভিত্তিক (formal) সংগঠনের মধ্যে কর্মীদের রুচি-পছন্দ, অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক এবং তার ফল হল ছোটো ছোটো ঘরোয়া গোষ্ঠী বা অবিধিবদ্ধ সংগঠন (informal organisation)। এই অবিধিবদ্ধ সংগঠন বা গোষ্ঠীগুলি বিধিবদ্ধ সংগঠনের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। তাই ব্যবস্থাপনাকে কার্যকরী করার জন্য ঘরোয়া গোষ্ঠীগুলিকে ভালোভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং বিধিবদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে ভারসাম্য গড়ে তুলতে হবে।

(২) উৎপাদনে সামাজিক উপাদান (Social factors in output) ঃ

একটি সংগঠন মূলত সামাজিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। উৎপাদনের মাত্রা সামাজিক মানদণ্ডে নির্ধারিত হয়, শারীরিক ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল নয়। সামাজিক ও মানসিক উপাদানে গড়া জীব হল মানুষ। মানুষের এই বৈশিষ্ট্যের উপরই সংগঠনের উৎপাদন ও দক্ষতা নির্ভর করে। অর্থনৈতিক সন্তুষ্টিবিধান ও উৎপাদনবৃদ্ধি একই সাথে নাও হত পরে। অর্থনৈতিক পুরস্কার ও দাবি মিটিয়েও কর্মীদের আচরণকে প্রভাবিত করা যায়।

(৩) কর্মীর আচরণ (Employee behaviour) ঃ

কর্মীদের ব্যক্তিগত আচরণের কারণ এবং তার বহিঃপ্রকাশের মধ্যে পার্থক্য করা দরকার। যখন কোনও কর্মীর মনে ক্ষোভ বা অসন্তোষ দানা বাধে, তখন তার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে কতকগুলি চিহ্ন ধরা পড়ে। যেমন অনিয়মিত হাজিরা, স্বল্প উৎপাদন প্রভৃতি। ব্যবস্থাপনাকে গভীরভাবে এর কারণ অনুসন্ধান করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) তদারকি (Supervision) ঃ

উৎপাদনের হার ও পরিমাণের উপর তদারকির প্রভাব অনস্বীকার্য। তদারকিকে ফলপ্রসূ করতে হলে ব্যবস্থাপককে কর্মীদের প্রতি আন্তরিক ও সহৃদয় আচরণ করতে হবে।

(৫) প্রণোদনা (Incentives) ঃ

আগে মনে করা হত অর্থনৈতিক প্রণোদনার দ্বারাই কর্মীদের কার্যে উৎসাহিত করা যায়। হথর্ন গবেষণার ফলাফল থেকে জানা গেল কর্মীদের প্রভাবিত করার জন্য অর্থনৈতিক প্রণোদনার থেকেও অনর্থনৈতিক প্রণোদনার গুরুত্ব ও প্রভাব অনেক বেশি। তাই ব্যবস্থাপনার নীতি নিধারণের ক্ষেত্রে এই জাতীয় প্রণোদনার কথা বিচার করা প্রয়োজন।

(৬) যোগাযোগ (Communication) ঃ

এই গবেষণার মাধ্যমে জানা যায় যে, সংগঠনে যোগাযোগের গুরুত্ব অসীম। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবস্থাপকদের মনোভাব কর্মীরা জানতে পারেন অপর দিকে কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব ব্যবস্থাপকগণ জানতে পারেন। ফলে সংগঠনে বিভিন্ন কার্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সহজসাধ্য হয়।

১.৬.৬ মানবিক আচরণ ভিত্তিক মতবাদ—ডগলাগ ম্যাকগ্রেগর, হারবার্ট এ. সাইমন

আচরণ ভিত্তিক মতবাদের মূল কথা হল মানুষের আচরণের পেছনে যে সব কারণ আছে যেমন অবেগ, অনুভূতি, প্রেরণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি সঠিকভাবে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করে সেই অনুসারে কার্য করাই হল ব্যবস্থাপনা। এই মতবাদে মানুষের আচরণকে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলির কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মনে করা হয় মানুষের আচরণ সম্পর্কে ধারণা না থাকলে ব্যবস্থাপক অন্যকে দিয়ে কর্মসম্পাদনে অসফল হবে।

মানবিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় মতবাদ এবং মানবিক আচরণ ভিত্তিক মতবাদের মূল পার্থক্য হল, প্রথমটি অর্থনৈতিক উপাদানকে উপেক্ষা করে। কিন্তু মানবিক আচরণ মতবাদ অর্থনৈতিক উপাদানের উপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে।

এই মতবাদের সমর্থক হলেন ডগলাস ম্যাকগ্রেগর (Douglas Mc Gregor), হারবার্ট এ. সাইমন (Herbert A. Simon), রেনসিস লিকার্ট (Rensis Likert), কার্ট লিউইন, (Kurt Lewin), ক্রিস. আরগাইরিস (Chris Argyris) প্রমুখ পণ্ডিতগণ।

ডগলাস ম্যাকগ্রেগর (১৯০১-১৯৬৪)

সাংগঠনিক মানবিকতাবাদের (organisational humanism) অন্যতম প্রবক্তা ডগলাস ম্যাকগ্রেগর মানবিক আচরণ সম্পর্কে কতকগুলি মৌলিক অনুমান বিশ্লেষণ করে X তত্ত্ব ও Y তত্ত্ব নামে দুটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। কর্মীকে প্রণোদিত করে তাকে দিয়ে সুচারুভাবে কার্য করানোর জন্য যে সমস্ত প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেই সম্পর্কে এই তত্ত্ব দুটি আলোকপাত করেছে।

X তত্ত্বে ম্যাকগ্রেগর বলেছেন, আগে ব্যবস্থাপকগণ মনে করতেন যে কর্মীগণ স্বভাবতই অলস, উদ্ধত, কর্মবিমুখ, দায়িত্বগ্রহণ অপছন্দ করে, যে কোনও পরিবর্তনে প্রতিবাদ করে প্রভৃতি। সেই কারণে কর্মীদের আর্থিক পুরস্কার বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রণোদিত করতে হয়।

X তত্ত্বের অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য ম্যাকগ্রেগর একটি বিকল্প তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। নাম দেন Y তত্ত্ব। এই তত্ত্বে বলা হল যে দৈহিক ও নিরাপত্তার অভাব মেটাতে আর্থিক প্রণোদনার প্রয়োজন। অন্যান্য অভাব মেটাতে আর্থিক প্রণোদনা কর্মীকে কার্যে প্রলুব্ধ করতে সমর্থ হয় না। ম্যাকগ্রেগর বললেন, কর্মীগণ কর্মবিমুখ নয়, তারা দায়িত্ব পালনে আগ্রহী। তারা কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে চায় না। সবাই নিজ নিজ কার্য সম্পন্ন করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়। তাই সব ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব হল প্রতিষ্ঠানে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে সব কর্মী নিজ প্রচেষ্টায় সব কার্য সম্পন্ন করতে পারে।

Y তত্ত্ব প্রয়োগের ফলে অংশগ্রহণকারী ও পরামর্শকারী ব্যবস্থাপনা প্রবর্তিত হয়। ইহা কর্মীদের দৈহিক এবং সামাজিক চাহিদা পূরণে যথেষ্ট যাহায্য করে। ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের অংশগ্রহণের ফলে সংগঠনের উদ্দেশ্য সাধন সহজসাধ্য হয়। অধিকাংশ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে Y তত্ত্বটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

হারবার্ট এ. সাইমন (Herbert A. Simon)

সাংগঠনিক মানবিকতাবাদের আরেক প্রবক্তা সমাজবিজ্ঞানী হারবার্ট এ. সাইমনের বিখ্যাত বই ‘Administrative Behavior’ ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। বইটিতে উল্লেখিত সংগঠনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মানবিক আচরণের গুরুত্ব ব্যবস্থাপনার ইতিহাসে নতুন পথ নির্দেশ করে। তাঁর মতে ব্যক্তিগত এবং

গোষ্ঠীর (groups) আচরণ উৎসাহিত করেছে মানবিক আচরণ সম্বন্ধীয় সহযোগিতামূলক সামাজিক পদ্ধতি (Co-operative social system) সম্পর্কে গবেষণার জন্য। সহযোগিতামূলক সামাজিক পদ্ধতির ধারণা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক। এই পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির ধারণা ও চিন্তা-ভাবনার পারস্পরিক আদান-প্রদান থেকে।

সাইমন ও অন্য কয়েকজন চিন্তাবিদগণ এই ধারণাকে প্রসারিত করে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত গোষ্ঠী বা মানবিক আচরণ সম্বন্ধীয় অন্য পদ্ধতিতে এর প্রয়োগের কথা বলেছেন। একে তারা সংগঠন তত্ত্ব হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সাইমনের মতে সংগঠন হল পরস্পর নির্ভরশীল কার্যাবলির এমন একটি পদ্ধতি, যা বিভিন্ন প্রাথমিক গোষ্ঠী (primary groups) নিয়ে গঠিত, গোষ্ঠীগুলির আচরণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণকারীদের সচেতনা বৃদ্ধি করে এবং যুক্তি সম্মত নির্দেশদানকে প্রভাবিত করে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাস্তবে আমরা সব সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরোপুরি যুক্তিবাদী হতে পারি না। অন্য কোনও বিকল্প না থাকায় অনেক সময় ব্যবস্থাপকগণ বাধ্য হয়ে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যা সংগঠনের পক্ষে আবশ্যিক হলেও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সাইমন বলেছেন ঐ পরিস্থিতিতে ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত। সবক্ষেত্রেই ঝুঁকির প্রকৃতি ও পরিমাণ যুক্তিসঙ্গতভাবে বিবেচনা করে সর্বাধিক উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে ব্যবস্থাপনাকে। সাইমনের মতে ব্যবস্থাপনার কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের রীতিনীতি ও কার্যকারণ সম্পর্ক জানা থাকা দরকার এবং সেক্ষেত্রে মানবিক আচরণ সম্পর্কে ধারণা না থাকলে ব্যবস্থাপনা ফলপ্রসূ হবে না।

কিন্তু সমালোচকরা মনে করেন সিদ্ধান্ত গ্রহণই ব্যবস্থাপনার একমাত্র বিচার্য বিষয় নয়। আর সাইমনের সহযোগিতামূলক সামাজিক পদ্ধতির ধারণা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হলেও, এই ধারণা ব্যবস্থাপনার বেশ কিছু জরুরি ধারণা, নীতি ও পদ্ধতিকে উপেক্ষা করেছে।

১.৬.৭ পরিমাণসূচক ব্যবস্থাপনা মতবাদ—আর. এল. এক্কফ্

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই মতবাদ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই মতবাদের মূল বিষয় হল জটিল সমস্যার সমাধানে পরিমাণগত বা গাণিতিক (mathematical) মডেলের (model) প্রয়োগ। গণিত, রাশিবিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্থনীতি প্রভৃতির সমন্বয়ে কয়েকটি পরিমাণসূচক প্রণালী আবিষ্কৃত হয়েছে। যাদের সমষ্টিকে বলা হয় ফলপ্রসূ গবেষণা (operational research)। বাস্তবে এটি হল অতি উচ্চমানের গাণিতিক সূত্র ধরে জটিল সমস্যার সমাধান। রৈখিক পরিকল্পনা (Linear Programming), মূল্যতত্ত্ব (Value Theory), ক্রীড়া তত্ত্ব (Game Theory), মজুত নিয়ন্ত্রণ (Inventory Control) প্রভৃতি এই মতবাদের বিভিন্ন হাতিয়ার। এই মতবাদে মনে করা হয় ব্যবস্থাপনার সমস্যা গাণিতিক নিয়মেই সমাধান করা সহজসাধ্য। ব্যবস্থাপনার সমস্যাগুলিকে গাণিতিক চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করা যায় এবং সমীকরণের সাহায্যে তার সমাধান করা সম্ভব। এই মতবাদের পথপ্রদর্শক ও প্রবক্তাদের মধ্যে আর. এল. এক্কফ্ (R. L. Ackoff), জোয়েল ডিন (Joel Dean), এফ. ডব্লু. হ্যারিস (F. W. Haris), সি. ডব্লু. চার্চম্যান (C. W. Churchman), আর ডর্ফম্যান (R. Dorfman) প্রমুব বিশেষজ্ঞর নাম উল্লেখযোগ্য।

ব্যবস্থাপনায় এই মতবাদের দান চমকপ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী। ইহা ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে এবং সঠিকতার নির্দেশ দেয়। তবে পরিমাণসূচক ব্যবস্থাপনা মতবাদ কখনই ব্যবস্থাপকের উত্তম বিচার বুদ্ধির পরিবর্ত হতে পারে না। ইহা শুধুমাত্র বিশ্লেষণের কৌশল এবং হাতিয়ার রূপে গণ্য করা যায়।

আর এল. এক্কফ্ ঃ

ফলপ্রসূ গবেষণার অন্যতম প্রবক্তা আর. এল. এক্কফ্ তার অন্য সহযোগী সি. ডব্লু চার্চম্যান এবং ই. এল. আর্নফ (E. L. Arnoff) ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাদের বিখ্যাত 'Introduction to Operations Research' বইটিতে বিভিন্ন গাণিতিক মডেলের উল্লেখ করেছেন এবং সেই গাণিতিক মডেলগুলি গঠনের কারণও তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন।

ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন জটিল সমস্যার সাধারণত অনেকগুলি চলক বা পরিবর্তনশীল উপাদান (variables) থাকে। অনেক সমস্যার ক্ষেত্রে চলকগুলি অসংখ্য (numerous) থাকায় তাদের মধ্যে সম্পর্ক গাণিতিক সংখ্যায় প্রকাশ করা বেশ জটিল। তবুও অন্য কোনও পদ্ধতি অপেক্ষা গাণিতিক পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেক সহজসাধ্য হয় এবং সময়ও কম লাগে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একটি গাণিতিক মডেলের দ্বারা একটি কোম্পানির একটি দ্রব্যের অর্থসাশ্রয়কারী ক্রয়ের পরিমাণ (Economic Order Quantity) নির্ণয় করা অনেক সহজ। এখানে প্রধান চলকগুলি হল সারা বছরের দ্রব্যটির ব্যবহারের পরিমাণ, প্রতি এককের পরিব্যয় (unit cost), দ্রব্যের পরিবহন ব্যয় (inventory carrying cost), প্রতিটি সংগ্রহের ব্যয় (set up costs per order)। এক্কফ্ দেখালেন ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সমস্যার চলকগুলি সংখ্যায় বেশি থাকলেও গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে তার সমাধান অনেক সহজসাধ্য। নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে ব্যবস্থাপনা কোনও দ্রব্যের অর্থ সাশ্রয়কারী ক্রয়ের পরিমাণ (EOQ) স্থির করতে পারে।

$$Q_e = \sqrt{\frac{2RS}{I}}$$

যেখানে —

Q_e = অর্থসাশ্রয়কারী ক্রয়ের পরিমাণ

R = সারা বছরের ব্যবহারের পরিমাণ

S = প্রতিটি সংগ্রহের ব্যয়

I = দ্রব্যের পরিবহন ব্যয়

বিশ্লেষকগণ (analysis) ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে এই ধরনের গাণিতিক সূত্রের উপযোগিতা স্বীকার করলেও, এই সূত্রগুলির সাহায্যে ব্যবস্থাপনার সব রকমের জটিল সমস্যার সমাধান অনেকক্ষেত্রে সম্ভব নয় বলে মনে করেন। কারণ ব্যবস্থাপনার অনেক জটিল চলক আছে যা সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না (can not be quantified)। ফলে গাণিতিক সূত্রের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানও সেক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

১.৭ সারাংশ

কারবারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যাবলি যেমন, ক্রয়, বিক্রয়, উৎপাদন, হিসাব নিকাশকরণ প্রভৃতি সমবেত প্রচেষ্টায় করা হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি বা দল এসব কার্য সম্পন্ন করেন। এসব কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজন হয় ব্যবস্থাপনার। অপর ব্যক্তিকে দিয়ে কার্য করানোর কৌশলকেই ব্যবস্থাপনা বলে। মানব সভ্যতার শুরু থেকেই ব্যবস্থাপনার অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

ইহা লক্ষ করার বিষয় যে ব্যবস্থাপনার চিন্তাধারা বহুলাংশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো, সামাজিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক চিন্তাধারার বিকাশের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্বন্ধযুক্ত। শিল্পোন্নয়ন, প্রযুক্তি বিদ্যা ও উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাপনার ধারা পরিবর্তিত হয় এবং বিভিন্ন চিন্তাধারার বিকাশ লাভ ঘটে। ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার যে ক্রমবিকাশ ঘটেছে, তাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যেমন প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ।

সময়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করা হয়, তবে দেখা যাবে যে ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার উন্নয়নে সংগঠিত গোষ্ঠী হিসাবে গবেষকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে অতীতের গবেষণালব্ধ মতবাদগুলি অনুধাবন করা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ অতীতের এবং বর্তমানকালের জ্ঞানের আলোয় ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ভবিষ্যৎ উদ্ভাসিত হবে।

১.৮ প্রশ্নাবলী

(১) ব্যবস্থাপনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

[উত্তর সংকেত : ব্যবস্থাপনার তাৎপর্য]

(২) ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দিন।

(৩) হেনরী ফেয়ল প্রর্বতিত ব্যবস্থাপনার সাধারণ নীতিগুলি আলোচনা করুন।

[উত্তর সংকেত : ব্যবস্থাপনার সাধারণ নীতি]

(৪) ব্যবস্থাপনার চিন্তাধারার ইতিহাসে এফ. ডব্লু. টেলরের অবদান আলোচনা করুন।

[উত্তর সংকেত : বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা মতবাদ]

(৫) গতি সমীক্ষা কী?

(৬) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক কাকে বলা হয়?

(৭) ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

[উত্তর সংকেত : ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ]

(৮) মানবিক সম্পর্ক মতবাদে এলটন মেয়োর অবদান বর্ণনা করুন।

[উত্তর সংকেত : মানবিক সম্পর্ক মতবাদ ও হথর্ন গবেষণা]

(৯) পরিমাণ সূচক ব্যবস্থাপনা মতবাদ বলিতে কী বোঝায়?

(১০) ব্যবস্থাপনার মৌলিক ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

[উত্তর সংকেত : মৌলিক ধারণা]

১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Management — Peter F. Drucker (১৯৭৫)

(২) Essentials of Management, Massie, Prentice Hall

(৩) Essentials of Management, Koontz, Tata McGraw Hill

(৪) Essentials of Modern Management — Mrityunjoy Banerjee (১৯৯২)

(৫) কারবার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার নীতি — পদ্মলোচন গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৯২)

(৬) ব্যবস্থাপনার নীতি ও উদ্যোগ উন্নয়ন — জয়দেব সরখেল, দেবাশিস ব্যানার্জী ও মদনমোহন কর্মকার (২০০০)

একক ২ ❑ ব্যবস্থাপনার তত্ত্বসমূহ

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ ম্যাকগ্রেগরের তত্ত্ব

২.৩ শ্যেইনের তত্ত্ব

২.৪ লিকার্টের তত্ত্ব

২.৫ সারাংশ

২.৬ প্রশ্নাবলী

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে আমরা জানতে পারব

- ডগলাস ম্যাকগ্রেগরের বিখ্যাত X তত্ত্ব ও Y তত্ত্ব
- এডগার এইচ. শ্যেইনের জটিল মানুষ সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত অর্থনৈতিক মতবাদ
- রেনসিস লিকার্টের ব্যবস্থাপনার চারটি পদ্ধতি।

২.১ প্রস্তাবনা

ব্যবস্থাপনার তত্ত্বসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা শুরুর আগে তত্ত্ব বলতে কী বোঝায় তা স্পষ্ট হওয়া দরকার। বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণ (observation) বা নিরীক্ষার (experiment) মাধ্যমে প্রমাণিত বা সত্য বলে স্বীকৃত প্রকল্পকে (hypothesis) তত্ত্ব বলে। অন্যভাবে বলা যায়, কোনও ঘটনা, আচরণ বা কাজের পিছনে কার্যকর কারণ বা এর কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে মানুষের গভীর পর্যবেক্ষণ ও চিন্তা থেকে সৃষ্ট সে যুক্তিভিত্তিক ব্যাখ্যা সমাজে সাধারণভাবে গৃহীত হয় তাকেই তত্ত্ব বলা হয়। ঘটনা বা বিষয়গুলি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে সাধারণীকরণের (generalization) মাধ্যমে এদের মধ্যে কার্যকারণ সূত্র বার করা গেলে ঐ সূত্রের সাহায্যে ঐ সব ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করা যায় এবং ভবিষ্যতে একই অবস্থায় কী ঘটবে সে সম্বন্ধে পূর্বাভাস দেওয়া যায়। অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত-গণ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য বাস্তব সমস্যা পর্যবেক্ষণ করে তার কার্যকারণ সম্পর্ক বিষয়ে প্রথমে কিছু

প্রকল্প রচনা করেন। ঐসব প্রকল্প নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরই সেটি তত্ত্বে রূপান্তরিত হয়। তাই সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত প্রকল্পকেই তত্ত্ব বলে। প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয়। কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সব বিষয়কে নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না, বা ঘটনাগুলি সম্পর্কে সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া যায় না। তাই বলে এসব তত্ত্বের কোনও প্রয়োজন নেই তা বলা চলে না। তত্ত্বের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞাটি এইরূপ ঃ তত্ত্ব হল পরস্পর সম্পর্কিত কিছু ধারণা সংজ্ঞা, অনুমান ও সিদ্ধান্তের একটি যুক্তিনির্ভর ও সংযোগশীল সমন্বয় যেগুলি অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে কোনো ঘটনা বা আচরণ বা কাজকে রীতিবদ্ধ ও সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে। ব্যবস্থাপনার সমস্যা পর্যালোচনা করতে গিয়েই ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। অন্যান্য বিদ্যার মতো ব্যবস্থাপনায়ও পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, অনুমান বা প্রকল্প গ্রহণ ও তার প্রমাণ, গবেষণার এই বিভিন্ন পর্যায় অনুসরণ করে এই সব তত্ত্বসমূহ বা মতবাদগুলি রচনা করা হয়েছে। সময়ের প্রেক্ষাপটে যদি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যাবে যে ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে এই সব গবেষকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

২.২ ম্যাকগ্রেগরের তত্ত্ব

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত আমেরিকান ব্যবস্থাপনাবিদ্ ডগলাস ম্যাকগ্রেগর (Douglas Mc Gregor, 1901-1964) মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি ও প্রবণতার সম্পর্কে কিছু অনুমানের উপর ভিত্তি করে সংগঠনের কর্মীদের অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে তাদের দিয়ে সুচারুভাবে কার্য করানোর জন্য একটি নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন যা X তত্ত্ব ও Y তত্ত্ব (Mc Gregor’s Theory X and Theory Y) নামে বিখ্যাত। তাঁর মতে মানুষের প্রকৃতির দুটি দিক আছে। একটি হল নেতিবাচক দিক, অপরটি হল ইতিবাচক দিক। মানুষের প্রকৃতির নেতিবাচক দিককে তিনি X তত্ত্ব ও ইতিবাচক দিককে Y তত্ত্ব আখ্যা দিয়েছেন। নীচে এই X তত্ত্ব ও Y তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

X তত্ত্ব (X-Theory) ঃ নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের গতানুগতিক ধরনকে তিনি X তত্ত্বে ব্যবহার করেছেন। এই তত্ত্বে কর্মীদের ব্যবহার ও প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি অনুমান করা হয়েছে। তা হল নিম্নরূপ ঃ

(১) সাধারণ কর্মীগণ মূলতঃ কর্মবিমুখ এবং সুযোগ পেলেই কার্যে ফাঁকি দেয়।

(২) বেশিরভাগ কর্মী পরনির্ভরশীল, দায়িত্বগ্রহণে অনিচ্ছুক ও ব্যবস্থাপকদের নির্দেশে পরিচালিত হতে পছন্দ করে।

(৩) সাংগঠনিক সমস্যা সমাধানের জন্য যে উদ্ভাবন ক্ষমতা, সৃজনশীলতা ও কল্পনা শক্তির প্রয়োজন তা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

(৪) সাধারণ কর্মীগণ সহজাত কারণে আত্মকেন্দ্রিক ও সাংগঠনিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে উদাসীন।

(৫) সাধারণ মানুষ বা কর্মীগণ সরল প্রকৃতির। তাই তারা সহজেই চক্রান্তের শিকার হন।

উপরিউক্ত অনুমানগুলির উপর নির্ভর করে ব্যবস্থাপনার প্রথাগত চিন্তাভাবনা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যে প্রস্তাব দেয় তা হল নিম্নরূপ ঃ

(ক) ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান যেমন মানুষ, মূলধন, কাঁচামাল, যন্ত্র ইত্যাদি সংগঠিত করা।

(খ) সংগঠনের কর্মীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে হবে। তাদের কার্যসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে, সংগঠনের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের ব্যবহারের প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও পরিবর্তন করতে হবে।

(গ) ব্যবস্থাপনার সক্রিয় হস্তক্ষেপ ছাড়া সাধারণত সংগঠনের কর্মীগণ নিষ্ক্রিয় ও প্রতিরোধী হয়। তাই তাদেরকে আর্থিক পুরস্কার, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এবং শাস্তিদানের ভয় দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে হবে।

X তত্ত্বের অনুমানগুলি হল মানুষের প্রকৃতির ঋণাত্মক (negative) দিক। সেই কারণে এই অনুমানগুলি সার্বজনীনভাবে প্রয়োগ করতে গেলে দেখা যাবে যে, ব্যবস্থাপনা কর্মীদের অনুপ্রাণিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে, কারণ নির্দেশদান ও নিয়ন্ত্রণের ভয় দেখিয়ে কর্মীদের সব ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব নয়। সাধারণত দৈহিক ও নিরাপত্তার অভাববোধ তৃপ্তির জন্য আর্থিক প্রণোদনার প্রয়োজন হয়। অনুপ্রাণিতকরণের ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যবস্থাপনা খুবই সাধারণ এবং অনেক ক্ষেত্রে সফলও হয়, কিন্তু সবক্ষেত্রে কার্যকরী হয় না। বর্তমান দিনেও অনেক অনুন্নত দেশে X তত্ত্বের ব্যবহার দেখা যায়।

Y তত্ত্ব (Y-Theory) : মানব প্রকৃতি সম্পর্কে ত্রুটিপূর্ণ ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে X তত্ত্ব। X তত্ত্বের অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য ম্যাকগ্রেগর একটি বিকল্প তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন এবং তার নাম দেন Y তত্ত্ব। এই তত্ত্বটি মানুষের আচরণ সম্পর্কে সঠিক অনুমানের ভিত্তিতে গড়ে তোলা। তিনি Y তত্ত্বে যে সব অনুমান করেছেন সেগুলি হল ঃ

(১) মানুষ প্রকৃতিগত দিক থেকে অলস নয়। বিশেষ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে তারা কার্যসম্পাদন পছন্দ করেন।

(২) কারবারি উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াসে মানুষ নিজেকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নিজের নির্দেশিত পথে চলতে ভালোবাসে।

(৩) বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ বা শাস্তির ভয় কর্মীগণকে কার্যে উৎসাহিত করতে পারে না।

(৪) কারবারের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে যেমন দক্ষতা দেখাবে তাকে সেভাবে পুরস্কৃত করা হবে।

(৫) সাধারণ মানুষ সঠিক পরিবেশে দায়িত্ব গ্রহণ করতে চায়। দায়িত্ব এড়িয়ে চলা মানুষের অন্তর্নিহিত স্বভাব নয়। সাধারণত তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য সে দায়িত্বগ্রহণ করতে চায় না।

(৬) কারবারি প্রতিষ্ঠানের সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তাশক্তি, কর্মকুশলতা এবং সৃজনশীলতার প্রয়োগ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠানের সব কর্মীর মধ্যে দেখা যায়।

(৭) বর্তমানে শিল্পক্ষেত্রে মানুষের সম্ভাব্য বুদ্ধিগত ক্ষমতাকে (intellectual potentialities) সদ্ব্যবহার করা হয় না।

Y তত্ত্বের প্রস্তাবগুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হল প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যপূরণের জন্য সংগঠিত করা।

(খ) ব্যবস্থাপকদের দায়িত্ব হল প্রতিষ্ঠানে এমন কার্য পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে কর্মীগণ নিজের প্রচেষ্টায় কার্য সম্পাদন করতে পারেন।

(গ) অংশগ্রহণকারী ও পরামর্শকারী ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের দ্বারা কর্মীদের অনুপ্রাণিত করা।

(ঘ) উত্তম সাংগঠনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলে কর্মরত ব্যক্তিদের নিজ নিজ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে সর্বাধিক প্রয়াসের মাধ্যমে সাংগঠনিক লক্ষ্যপূরণ করা।

Y তত্ত্বের অনুমানগুলি হল মানুষের প্রকৃতির ধনাত্মক (positive) দিক। এই তত্ত্বের বাস্তব সম্মত অনুমানগুলি মানুষের প্রকৃতির আধুনিকতা ও গতিশীলতার সন্ধান দেয়। Y তত্ত্বে ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা সর্বনিম্ন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সর্বোত্তম ফললাভ সম্ভব হয়। অধিকাংশ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এই তত্ত্বের ব্যবহার দেখা যায়। Y তত্ত্ব সেই সব সংগঠনে কার্যকরী, যেখানে কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ, গণতান্ত্রিক ও পরামর্শদানমূলক নেতৃত্বদান ও দ্বি-মুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা (two way communication) দেখতে পাওয়া যায়। এই তত্ত্বে আর্থিক পুরস্কারের উপর বিশেষ গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে সাধারণ কর্মীরা অনুপ্রাণিত হতে পারেন না।

২.৩ শ্যেইনের তত্ত্ব

এডগার. এইচ. শ্যেইন (Edgar. H. Schein) মানবিক আচরণ সম্পর্কিত একটি তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন যা 'জটিল মানুষ সম্বন্ধে যুক্তিসংগত-অর্থনৈতিক মতবাদ' (From the Rational-Economic View to the Complex Person) নামে খ্যাত। এই তত্ত্বে শ্যেইন মানুষের আচরণ সম্পর্কে চার রকমের ধারণা (conception) করেছেন।

প্রথমত তাঁর যুক্তিসঙ্গত-অর্থনৈতিক অনুমানটি (rational-economic assumption) এই ধারণার উপর গড়ে উঠেছে যে মানুষ অর্থনৈতিক পুরস্কার দ্বারাই প্রাথমিকভাবে অনুপ্রাণিত হয়। যেহেতু এইসব আর্থিক পুরস্কারগুলি প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাই মানুষ সাধারণত নিষ্ক্রিয়। তাই কারবারি প্রতিষ্ঠান কর্মীকে নিজ উদ্দেশ্যের উপযোগী করে গড়ে তোলে, অনুপ্রাণিত করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে। ম্যাকগ্রেগরের X তত্ত্বের সঙ্গে এই অনুমানগুলির সাদৃশ্য আছে।

দ্বিতীয় ধারণাটি এলটন মেয়োর হথর্ন গবেষণার সামাজিক অনুমানগুলির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যেমন মানুষ সামাজিক চাহিদার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা সামাজিক প্রভাব (forces) অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় ধারণাটি আত্ম-উপলব্ধির অনুমানের (self-actualizing assumption) সঙ্গে সম্পর্কিত। আমেরিকার প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ আব্রাহাম মাস্লো (Abraham Maslow) মানুষের প্রয়োজনকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করেছেন। মাস্লোর স্তরানুক্রমিক প্রয়োজনগুলি হল ঃ (১) দৈহিক প্রয়োজন (২) নিরাপত্তার প্রয়োজন (৩) সামাজিক প্রয়োজন (৪) শ্রদ্ধা বা সম্মান লাভের প্রয়োজন এবং (৫) আত্মোপলব্ধির প্রয়োজন।

শ্যেইনের মতে মাস্লোর স্তরানুক্রমিক প্রয়োজনগুলির মতো মানুষের উদ্দেশ্যগুলি (motives) নির্ভর করে দৈহিক প্রয়োজন থেকে শুরু করে সর্বশেষ আত্মোপলব্ধির প্রয়োজন মেটানোর জন্য। এই ধারণা অনুসারে মানুষ নিজেই নিজেকে অনুপ্রাণিত করতে (self motivated) চায় ও নিজেকে দক্ষ করে তুলতে ভালোবাসে।

চতুর্থ ধারণাটি জটিল অনুমান (complex assumptions) থেকে। এখানে শ্যেইন মানুষ সম্পর্কে তার নিজের ধারণা ব্যক্ত করেছেন। তার অন্তর্নিহিত বিষয় হল মানব প্রকৃতি ভীষণ জটিল ও পরিবর্তনশীল। মানুষের

বিভিন্ন অভিপ্রায় বা ইচ্ছা থাকে যা তার অভিপ্রায়ের কাঠামোকে (pattern) আরও জটিল করে তোলে। ফলে ব্যবস্থাপকগণ বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা সত্ত্বেও মানুষের নিত্য নতুন অভিপ্রায়ের সৃষ্টি হয়।

যদিও বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ শ্যেইনের এই ধারণাগুলির সমালোচনা করেছেন। যেমন যুক্তিসঙ্গত মত অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষ যুক্তিবাদী ধরা হয়। তারা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে তা যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে মূল্যায়ন করে এবং বিভিন্ন বিকল্পগুলিকে বিশ্লেষণ করে। যেমন একজন ব্যবস্থাপক এই মতানুযায়ী কর্মীদের সঙ্গে যুক্তিসম্মত আলোচনা করে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় কর্মীদের ব্যক্তিগত আবেগ, অনুভূতি, উচ্ছ্বাস প্রভৃতি উপেক্ষা করেন।

অর্থনৈতিক অনুমান অনুসারে মনে করা হয় কর্মীগণ অনুপ্রাণিত হন শুধুমাত্র অর্থের দ্বারা। কিন্তু অর্থ ছাড়াও কর্মীরা অনেক ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত হন। যদি ব্যবস্থাপকগণ প্রতিযোগিতামূলক কার্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে কর্মীগণ প্রাথমিকভাবে স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনুপ্রাণিত বা উৎসাহিত হন।

২.৪ লিকার্টের তত্ত্ব

অধ্যাপক রেনসিস লিকার্ট (Rensis Likert) এবং তার সহযোগী গবেষকগণ আমেরিকার মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় তিন দশক ধরে নেতৃত্বের ধরনের (Leadership styles) উপর গবেষণা চালান। এই গবেষণার মাধ্যমে লিকার্ট নেতৃত্বের আচরণ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি দেখান একজন কার্যকরী ব্যবস্থাপক তার নিম্নপদস্থদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কার্যের যোগ্য করে তোলেন। কর্মীদের মধ্যে উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলে তাদের একটি দল হিসাবে কর্ম সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করেন। কর্মীদের সবার আবেগ, অনুভূতি, চাহিদা, মূল্যবোধ, উদ্দেশ্য প্রভৃতির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্টি বিধানের দিকে লক্ষ রাখেন। তার ফলে এদের অনুপ্রাণিত করা সহজ হয়। লিকার্টের মতে এটি হল একটি দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার সর্বাধিক কার্যকরী পদ্ধতি।

লিকার্ট তার ধারণাকে ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবস্থাপনার চারটি পদ্ধতির (four systems of management) কথা উল্লেখ করেন তা ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হিসাবে সমাদৃত। নীচে এই চারটি পদ্ধতি আলোচনা করা হল।

লিকার্টের ‘ব্যবস্থাপনার চারটি পদ্ধতি’

পদ্ধতি ১	পদ্ধতি ২	পদ্ধতি ৩	পদ্ধতি ৪
শোষণমূলক স্বৈরতান্ত্রিক (Exploitive-authoritative)	দয়াশীল-স্বৈরতান্ত্রিক (Benevolent authoritative)	পরামর্শমূলক (Consultative)	অংশগ্রহণমূলক (Participative)

পদ্ধতি ১

এই পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনাকে শোষণমূলক স্বৈরতান্ত্রিক হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে ব্যবস্থাপকগণ হলেন স্বৈরাচারী। তারা খুব সামান্যই তাদের অধস্তন কর্মীদের উপর আস্থা রাখেন। কদাচিৎ পুরস্কার, ভয় ও শাস্তিদানের মাধ্যমে কর্মীদের অনুপ্রাণিত করেন। এই পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্তগ্রহণ উচ্চ পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দায়িত্ব বর্তায় অধস্তন কর্মচারীদের উপর।

পদ্ধতি ২

এখানে ব্যবস্থাপনাকে বলা হয় দয়াশীল--স্বৈরতান্ত্রিক। এই ধরনের ব্যবস্থাপকগণ অধস্তন কর্মীদের উপর বিশ্বাস বা আস্থা রাখেন। পুরস্কারের মাধ্যমে কর্মীদের অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেন। কখনও কখনও ভয় ও শাস্তিপ্রদান করে থাকেন। অধস্তন কর্মীদের কিছু কিছু মতামত, চিন্তা-ভাবনা বা ধারণা গ্রহণ করেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা অধস্তন কর্মীদের মধ্যে অর্পণ করেন। যদিও কর্তৃত্ব উচ্চস্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে।

পদ্ধতি ৩

এই জাতীয় ব্যবস্থাপনাকে বলা হয় পরামর্শমূলক ব্যবস্থাপনা। এই পদ্ধতির ব্যবস্থাপকগণ পুরোপুরি না হলেও অনেকাংশে নির্ভর করেন ও আস্থা রাখেন অধস্তন কর্মীদের উপর। অধস্তনের ধ্যান-ধারণা, মতামত, অভিপ্রায় প্রভৃতিকে উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। পুরস্কার ও কদাচিৎ শাস্তিদানের মাধ্যমে কর্মীদের অনুপ্রাণিত করা হয়। জ্ঞাতকরণ প্রক্রিয়া এক্ষেত্রে নিম্নগামী ও ঊর্ধ্বগামী দুই প্রকারেরই হয়। ব্যবস্থাপনার মৌলিক সিদ্ধান্তগুলি উচ্চস্তরেই হয়। নিম্নস্তরে কিছু কিছু সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্পিত হয় এবং উচ্চ ও নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপকদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এই জাতীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পদ্ধতি ৪

এই ধরনের ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপনার সব স্তরের কর্মীদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। এই জাতীয় ব্যবস্থাপকগণ সব বিষয়ে পুরোপরি তাদের অধস্তনদের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখেন। সব সময়ে অধস্তনদের গঠনমূলক চিন্তা-ভাবনা, মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন। প্রত্যেকটি কার্যভিত্তিক দলের লক্ষ্য স্থির করা হয়। লক্ষ্য পূরণের মূল্যায়ন করে অর্থনৈতিক পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকে। এক্ষেত্রেও জ্ঞাতকরণ প্রক্রিয়া নিম্নগামী ও ঊর্ধ্বগামী হয়। সবাইকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে উৎসারিত করা হয়।

সাধারণভাবে লিকার্ট দেখেন যে সমস্ত ব্যবস্থাপক পদ্ধতি ৪ অনুযায়ী কার্য করেন তারা কার্যক্ষেত্রে নেতা হিসাবে অত্যন্ত সফল। এই ধরনের ব্যবস্থাপকগণই হলেন আদর্শ এবং অত্যন্ত কার্যকরী। এছাড়া তিনি দেখেন যে সব বিভাগগুলি ও কোম্পানিগুলি পদ্ধতি ৪ দ্বারা পরিচালিত তারাই লক্ষ্য স্থির করার ক্ষেত্রে এবং লক্ষ্যপূরণে অত্যন্ত সফল হয়। তিনি মনে করেন এই সফলতা মূলত নির্ভর করে অংশগ্রহণের মাত্রার উপর এবং অধস্তনদের গঠনমূলক মতামত, ধ্যান-ধারণার প্রতি ব্যবস্থাপকদের সমর্থন ও আস্থাজ্ঞাপনের উপর।

যদিও পেশাদার ব্যবস্থাপকদের (parcticing managers) মতে, লিকার্টের 'পদ্ধতি ৪' তত্ত্বটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্ভব শুধুমাত্র সেই সব প্রতিষ্ঠানেই, যে প্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও প্রচুর মনুফা করে। তারা মনে

করেন কিছু সাবধানতা অবলম্বন করে যদি পদ্ধতি ৪ প্রয়োগ করা যায় তবেই তার থেকে ব্যবস্থাপনা সুবিধা পেতে পারে। কারণ সব ব্যবস্থাপকগণ সমান হন না। ক্ষমতা হারানোর ভয়ে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অধস্তন কর্মীদের পরামর্শ গ্রহণের বিরোধী। আবার সব ক্ষেত্রে অধস্তনদের পরামর্শের গুণগত মান ভালো নাও হতে পারে। অনেকক্ষেত্রে অধস্তন কর্মীরা বা দলগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতার অপব্যবহার করেন। আবার অনেকে উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকদের দ্বারা পরিচালিত হতে পছন্দ করেন।

২.৫ সারাংশ

বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন থেকেই ব্যবস্থাপনার তত্ত্বগুলির সৃষ্টি। এই তত্ত্বগুলি সম্পর্কে ধারণা থাকলে প্রচলিত ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত যুক্তিগুলি জানা যায়। ফলে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে বোঝাতে এবং সেই অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যবস্থাপনার সুবিধা হয়। ব্যবস্থাপনার চলতি পদ্ধতির পরিবর্তন অপরিহার্য বলে মনে হলে এই সব তত্ত্বজ্ঞান প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিকল্প পদ্ধতির মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতিটি নির্বাচনে ব্যবস্থাপনাকে সাহায্য করে। তত্ত্বগুলির সাহায্যে নিত্য-নতুন প্রতিদ্বন্দ্বিতার (New Challenges) মোকাবিলা করাও সম্ভব হয়।

ব্যবস্থাপনার তত্ত্বসমূহের নির্ভুলতা সম্বন্ধে প্রশ্ন থাকলেও, ব্যবস্থাপনা-চিন্তার উন্নতিতে ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞদের এইসব তত্ত্বগুলি বর্তমান দিনেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

২.৬ প্রশ্নাবলী

(১) তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়

[উত্তর সংকেতন : প্রস্তাবনা]

(২) ডগলাস ম্যাকগ্রেগরের X তত্ত্ব ও Y তত্ত্বটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

[উত্তর সংকেত : ম্যাকগ্রেগরের তত্ত্ব]

(৩) এডগার. এইচ. শ্যেইনের মানবিক আচারণগত তত্ত্বটি আলোচনা করুন।

[উত্তর সংকেত : শ্যেইনের তত্ত্ব]

(৪) সংক্ষেপে রেনসিস লিকার্টের নেতৃত্ব প্রদানের চারটি পদ্ধতি সম্বলিত তত্ত্বটি আলোচনা করুন।

[উত্তর সংকেত : লিকার্টের তত্ত্ব]

(৫) ব্যবস্থাপনা তত্ত্বগুলির প্রয়োজনীয়তা কী?

[উত্তর সংকেত : সারাংশ]

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Management—Harold Koontz and Heinz Weihrich (1988)
(২) Essentials of Modern Management—Mrityunjoy Banjerjee (1992)
(৩) Principles of Management and Entrepreneurship Development—W. Haynes (1999)
(৪) আধুনিক ব্যবস্থাপনা–বিলাস কুমার বিশ্বাস (১৯৯৫)
(৫) ব্যবস্থাপনার রীতি-নীতি ও উদ্যোগ উন্নয়ন – প্রণব কুমার চক্রবর্তী (১৯৯৯)

একক ৩ ❑ ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

৩.৩ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপনার নীতি প্রণয়ন

৩.৪ ব্যবস্থাপনায় মূল্যবোধ ও নীতি সম্মত বিচারশক্তি

৩.৫ সারাংশ

৩.৬ প্রশ্নাবলী

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে আমরা জানতে পারব–

- ব্যবস্থাপনার নীতি বলতে কী বোঝায়
- ব্যবস্থাপনার নীতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ
- ব্যবস্থাপনার দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থাপনার নীতি প্রণয়ন
- ব্যবস্থাপনার মূল্যবোধ ও নীতিসম্মত বিচারশক্তির প্রাসঙ্গিকতা।

৩.১ প্রস্তাবনা

নীতি হল মৌলিক বা সাধারণ সত্য যা চিন্তা, কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের প্রতিটি কার্যই একটি নীতির উপর দাঁড়িয়ে থাকে। সমাজ বিজ্ঞানের নিজস্ব নীতি আছে যা মানুষ মেনে চলে। ব্যবস্থাপনা হল একটি সমাজ বিজ্ঞান। স্বাভাবিকভাবেই ব্যবস্থাপনারও নির্দিষ্ট নীতি, নিয়ম ও তত্ত্ব আছে। তবে ব্যবস্থাপনার নীতি, বিজ্ঞানের নীতির মতো অনমনীয় নয়, উপরন্তু নমনীয় ও পরিবর্তনশীল। ব্যবস্থাপনাকে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করার জন্য সর্বজনগ্রাহ্য কয়েকটি নীতির সাহায্য গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়। ব্যবস্থাপনার মূল সূত্রগুলিকে ব্যবস্থাপনার নীতি বলে। ব্যবস্থাপনার নীতিগুলি নিম্নোক্ত কারণে বিশেষ প্রয়োজনীয় ঃ

(১)ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি;

(২)ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানের উন্নতি;

(৩)ব্যবস্থাপকদের কর্ম উপযোগী করে গড়ে তোলা;

(৪)ব্যবস্থাপনার কার্যে গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি;

(৫)সম্পদ বা উপকরণগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি করে সমাজ কল্যাণমূলক উদ্দেশ্য পূরণ এবং

(৬)নির্দিষ্ট ও সুষ্ঠু সাংগঠনিক কাঠামো গঠন।

যে কোনও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, সে কারবারি প্রতিষ্ঠান হোক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হোক, ব্যবস্থাপনার নীতির প্রয়োগ সবক্ষেত্রেই প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনার নীতিগুলি ব্যবস্থাপকদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়। তাই আরনেস্ট ডেল (Earnest Dale) ব্যবস্থাপনার নীতিকে 'নির্ণয়মূলক নির্দেশ' বলে অভিহিত করেছেন। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি ব্যবস্থাপনার নীতিগুলিকে প্রভাবিত করে।

যদিও কিছু চিন্তাবিদ্ মনে করেন ব্যবস্থাপনার নীতিগুলি সাধারণ জ্ঞানের বিষয়; এদের সঠিক কোনও ভিত্তি নেই। নীতিগুলির মধ্যে কিছু কিছু নীতি স্ব-বিরোধী। তবুও বলা যায় ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য এই নীতিগুলি বিশেষ প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনার নীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলেই ব্যবস্থাপকগণ দক্ষতার সঙ্গে কারবার পরিচালনা করতে পারেন।

৩.২ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

ব্যবস্থাপনার নীতিগুলি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করলে কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। নীচে তা আলোচিত হল।

(১) সার্বজনীনতা (Universality) ঃ

ব্যবস্থাপনার মূলনীতিগুলি শুধুমাত্র কারবারি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা নয়। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান যেখানে ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন সেখানে ব্যবস্থাপনার নীতিগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য। কারণ একাধিক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় যখন কোনও কার্যসম্পাদন করা হয়, তখনই ব্যবস্থাপনার নীতিগুলির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। প্রতিটি মানবিক সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হল সুসংহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফললাভ। তাই ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে ব্যবস্থাপনার নীতিগুলিকে সমান গুরুত্ব সহকারে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(২) গতিশীল (Dynamic) ঃ

ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ অবশ্যই গতিশীল হবে। যাতে নীতিগুলি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিত্য-নতুন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়।

(৩) নমনীয়তা (Flexibility) ঃ

ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ নমনীয় হওয়া প্রয়োজন। বাজারের অবস্থা সবসময়ই পরিবর্তনশীল। ক্রেতার চাহিদা ও রুচি, পণ্যের দামের পরিবর্তন সর্বদাই হচ্ছে। কিন্তু পণ্যের ক্ষেত্রে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি হচ্ছে। আবার কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে বাজার সঙ্কুচিত হচ্ছে। বাজারের এই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য ব্যবস্থাপনার নীতি নমনীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৪) উদ্দেশ্যমূলক (Objective) ঃ

ব্যবস্থাপনার নীতিগুলি লক্ষ্যপূরণে অবশ্যই সক্ষম হবে। কারণ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন দলগত কর্মপ্রচেষ্টা(group

efforts) নির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণের জন্য অগ্রসর হয়। বিভিন্ন দলের লক্ষ্যগুলি প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যেই তৈরি হয়। ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণের জন্য দিক নির্দেশ করে ব্যবস্থাপনাকে সফল করে।

(৫) **দলগত কর্মপ্রচেষ্টা (Group efforts) ঃ**

বড়ো প্রতিষ্ঠানে প্রচুর সংখ্যক কর্মীর সমাবেশ ঘটে। স্বাভাবিকভাবে তারা পরস্পর মেলামেশা করে ছোটো ছোটো ঘরোয়া দল (informal group) সৃষ্টি করে। ব্যবস্থাপনাকে তাই অনেকে ঘরোয়া সংগঠিত দল (informal organised group) বলে অভিহিত করেন। এছাড়া বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগের কার্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর নির্ভর করে পৃথক পৃথক বিধিবদ্ধ দল (formal group) গঠিত হয়। ব্যবস্থাপনার নীতিই হল এই সব ঘরোয়া দল ও বিভিন্ন বিধিবদ্ধ দল গঠনে গুরুত্বদান এবং দলগত কর্মপ্রচেষ্টাকে উদ্বুদ্ধ করা। কারণ, ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টার থেকেও দলগত কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধন সহজে হয়।

(৬) **সামঞ্জস্য বিধান (Harmony) ঃ**

কারবারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অনেক পক্ষের স্বার্থ জড়িত। মালিক, পাওনাদার, দেনাদার, ঋণদাতা, সরকার, সমাজ প্রভৃতির প্রত্যেকের স্বার্থ অন্যের স্বার্থের থেকে পৃথক। ব্যবস্থাপনার নীতি হল এই সব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির চাহিদা ও লক্ষ্যের বিভিন্নতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা।

(৭) **সরল (Simple) ঃ**

ব্যবস্থাপনার নীতি সহজ ও সরল হবে। যাতে ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সকল ব্যবস্থাপকগণ ব্যবস্থাপনার জটিল সমস্যার সমাধানে নীতিগুলি সহজেই প্রয়োগ করতে পারেন। সাধারণ কর্মীগণ ব্যবস্থাপকদের গৃহীত নীতিগুলি সহজে বুঝতে পারেন ও কারবারি উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবস্থাপনাকে সহযোগিতা করতে পারেন।

(৮) **ব্যাপ্তিশীলতা (Pervasiveness) ঃ**

ব্যবস্থাপনার নীতি দেশ, কাল, পাত্রভেদে প্রয়োগ করা সম্ভব। বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিভিন্ন রকমের। আবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, রূপ ও সমস্যা বিভিন্ন ধরনের হয়। তাই নীতিগুলির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রয়োগ করতে পারলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করা যাবে। এছাড়া নীতিগুলির প্রয়োগ কারবারি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন থেকে বণ্টন প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়াও প্রয়োজন।

৩.৩ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপনার নীতি প্রণয়ন

ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নীতি প্রণয়নের জন্য অনেক ব্যবস্থাপনাবিদকে উৎসাহিত করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন ব্যবস্থাপনাবিদ বিভিন্নভাবে ব্যবস্থাপনার নীতি প্রণয়ন করেছেন। ব্যবস্থাপনার নীতির প্রবর্তকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন এফ. ডব্লু, টেলর, হেনরী ফেয়ল, হ্যারল্ড কুন্‌জ, আরনেস্ট ডেল প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য নীতি প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নীচে সর্বজনগ্রাহ্য ব্যবস্থাপনার নীতিগুলি আলোচিত হল।

(১) **কার্য বিভাজন (Division of work) ঃ**

কার্য বিভাজনের মূল উদ্দেশ্য হল শ্রমবিভাগ বা বিশেষায়ণ। কারবারের যাবতীয় কার্যাবলিকে ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করে প্রতিটি ছোটো অংশের ভার একজন ব্যক্তিকে দিতে হবে। এতে ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ও বিশেষজ্ঞ কর্মী গড়ে ওঠে।

(২) **কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব (Authority and responsibility) ঃ**

কর্তৃত্ব শব্দটির অর্থ হল বিধিসম্মত অধিকার। কর্তৃত্বের অধিকার। কর্তৃত্বের দ্বারা কোনও ব্যবস্থাপক আদেশ দানের ও অধস্তন কর্মীকে কার্যে বাধ্য করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভ করেন। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত ব্যবস্থাপকগণকে উপযুক্ত কর্তৃত্ব দিতে হবে যাবে তাঁরা আপন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাঁদের উপর ন্যস্ত কার্য সম্পাদনে সক্ষম হন। ব্যবস্থাপকদের কর্তৃত্বদানের অর্থই হল তাদের উপর অর্পিত কার্যের জন্য তাদের দায়িত্বশীল করা। যিনি কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন এবং যার উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হয়, উভয়ই সংশ্লিষ্ট কার্যের জন্য দায়ী হন। 'কর্তৃত্ব ব্যতীত দায়িত্ব' অর্থহীন। কারণ কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব তাই সমানুপাতিক হওয়া প্রয়োজন।

(৩) **শৃঙ্খলা (Discipline) ঃ**

শৃঙ্খলা হল বশ্যতা, শ্রমিক-মালিকের চুক্তি অনুসারে একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশপালন ও ব্যবস্থাপনার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা। ফেয়লের মতে কারবারি প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দরকার ব্যবস্থাপনার প্রত্যেক স্তরে দক্ষ ব্যবস্থাপক নিয়োগ, ভালো কার্যের জন্য পুরস্কার এবং অন্যায়ের জন্য বিধিসম্মত শাস্তির বিধান। কারবারি প্রতিষ্ঠানের অব্যাহত রাখার জন্য এবং কারবারের বিভিন্ন কার্যের সমন্বয়ের জন্য সার্বিক শৃঙ্খলা একান্ত প্রয়োজন।

(৪) **আদেশের একতা (Unity of command) ঃ**

একজন অধস্তন কর্মচারী শুধুমাত্র একজন ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকের কাছ থেকে আদেশ গ্রহণ করবেন। বিভিন্ন ব্যবস্থাপকদের কাছ থেকে একই কার্যের জন্য বিভিন্ন ধরনের আদেশের ফলে অধস্তন কর্মী অসহায় বোধ করেন। আদেশদানের একতা না থাকলে দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অবহেলিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়।

(৫) **নির্দেশদানের একতা (Unity of direction) ঃ**

এই নীতির উদ্দেশ্য হল একই উদ্দেশ্যের একশ্রেণীভুক্ত কার্যকলাপ সম্পাদনের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং গৃহীত পরিকল্পনা রূপায়ণে সমগ্র প্রতিষ্ঠান ও প্রতিটি বিভাগের নির্দেশদানের সামঞ্জস্য বিধান করা। কারণ নির্দেশদানের একতার অভাবে প্রতিষ্ঠানের অবসায়ন হতে পারে।

(৬) **ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধারণ স্বার্থের অধীনে থাকবে (Subordination of individual interest to general interest) ঃ**

সাধারণ বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সর্বদা ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা বড়। যে কোনও প্রতিষ্ঠানেই ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়। সাধারণ ও ব্যক্তিস্বার্থের সমন্বয় করতে হবে। এই নীতিকে কার্যকর করার জন্য ফেয়ল কতকগুলি উপায়ের কথা বলেছেন। যেমন ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকের সততা ও কঠোরতা, শ্রমিক-মালিকের মধ্যে উপযুক্ত চুক্তি কিংবা নিরবিচ্ছিন্ন তদারকি প্রভৃতি।

(৭) **পারিশ্রমিক (Remuneration) ঃ**

শ্রমিকদের পারিশ্রমিক ন্যায্য ও উপযুক্ত হওয়া প্রয়োজন যাতে শ্রমিকরা সন্তুষ্ট হয়। জীবনযাত্রার মান, কারবারের আর্থিক অবস্থা, শ্রমিক সরবরাহের স্বল্পতা ও প্রাচুর্য প্রভৃতি অবস্থার উপর পারিশ্রমিকের হার নির্ভরশীল।

(৮) **কেন্দ্রীকরণ (Centralisation) ঃ**

ফেয়লের মতে যা কিছু প্রতিষ্ঠানে অধস্তন কর্মচারীদের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করে তা হল কর্তৃত্বের

বিকেন্দ্রীকরণ এবং যা কিছু প্রতিষ্ঠানে অধস্তন কর্মচারীদের কর্তৃত্ব সঙ্কুচিত করে, তা হল কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ। কারবারি প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ বা বিকেন্দ্রীকরণ নীতি প্রবর্তন করতে হবে। বৃহৎ কারবারি সংস্থায় একজন ব্যবস্থাপকের পক্ষে সব বিষয়ে নজর দেওয়া সম্ভব হয় না, তখনই বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন হয়। দক্ষ ব্যবস্থাপনার কার্য হল কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্য গড়ে তোলা।

(৯) **কর্তৃত্ব প্রবাহের শৃঙ্খল (Scalar chain of authority) ঃ**

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে কারবারি সংস্থার প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ধাপে ধাপে ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে দেওয়া হয়। কর্তৃত্ব অর্পণের দ্বারা প্রশাসনে একটি শৃঙ্খল (chain) রচনা করা হয়। প্রত্যেক কর্মচারীকে ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকের আদেশ পালন করতে হবে। শৃঙ্খলের দ্বারা ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্তৃত্বের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আদেশ প্রবাহ নিম্নগামী অপরদিকে কার্যের প্রতিবেদন ঊর্ধ্বগামী।

(১০) **বিন্যাস (Order) ঃ**

বিন্যাসনীতির অর্থ হল বস্তু এবং ব্যক্তির যথাযথ সমাবেশ। প্রতিটি বস্তু সঠিক স্থানে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপযুক্ত কার্যে নিযুক্ত করতে হবে যাবে বস্তু এবং কর্মীদের অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়।

(১১) **সমদর্শিতা (Equity) ঃ**

প্রতিষ্ঠানের সবক্ষেত্রে ন্যায় ও সমতা প্রবর্তন করা ব্যবস্থাপনার অন্যতম নীতি। অধস্তন কর্মচারীর দায়িত্ববোধ জাগানোর জন্য এবং তাদের কাছ থেকে আনুগত্য আদায় করার জন্য তাদের সকল অভাব-অভিযোগ সহৃদয়তা ও ন্যায্যতার সঙ্গে ব্যবস্থাপকদের বিচার বিবেচনা করতে হবে এবং সমদর্শিতা প্রদর্শন করতে হবে।

(১২) **কর্মীদের কার্যকালের স্থায়িত্ব (Stability of tenure of personnel) ঃ**

কোনও কার্যে অভ্যস্ত ও দক্ষতা লাভের জন্য কর্মীদের সময়ের প্রয়োজন হয়। সেই কার্যে অভ্যস্ত হবার আগেই যদি তাকে বদলি করা হয়, তাহলে তার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে না। তাই প্রতিটি কর্মীর কার্যকালের স্থায়িত্বের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া ব্যবস্থাপনার কর্তব্য।

(১৩) **উদ্যম (Initiative) ঃ**

কর্মীরা যাতে আপন উৎসাহ ও উদ্যমে কার্যসম্পাদন করতে পারেন তার জন্য তাদেরকে সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং তা বাস্তবে রূপায়ণের ক্ষমতা দিতে হবে। উদ্যম কর্মপ্রচেষ্টায় উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

(১৪) **দলের একতা (Espirit decrops) ঃ**

এই নীতি দলীয় কার্যসম্পাদন এবং সবক্ষেত্রে যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের একতা এবং তাদের কার্যসমূহের সমন্বয় কারবারি সংস্থার শক্তি বৃদ্ধি করে। ব্যবস্থাপনাকে তাই দলীয় উদ্যোগ ও সচেতনার মাধ্যমে কর্মীদের মনে একতার মনোভাব গড়ে তুলবে হবে।

(১৫) **নমনীয়তার নীতি (Principle of flexibility) ঃ**

দ্রব্যসামগ্রীর দাম, ক্রেতার রুচি-পছন্দ ও চাহিদার প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। নতুন নতুন দ্রব্য উৎপাদিত হচ্ছে। পারোনো দ্রব্যের বাজার সঙ্কুচিত হচ্ছে। আবার কিছু দ্রব্যসামগ্রীর নতুন বাজার সৃষ্টি হচ্ছে। উৎপাদন সামগ্রীর বিভিন্নতার (diversification of product lines) নীতি প্রতিষ্ঠানগুলি অনুসরণ করছে। ফলে উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনও প্রয়োজন হচ্ছে। বাজারের এই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য ব্যবস্থাপনার নীতি নমনীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(১৬) **সুদৃঢ় সংগঠন (Sound organisation) ঃ**

সংগঠন হল প্রতিষ্ঠানের কার্যভিত্তিক কাঠামো। প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সুদৃঢ় সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। সাংগঠনিক কাঠামো নির্ভর করে কারবারের প্রকৃতি, ধরন, আকার, উৎপাদন পদ্ধতি প্রভৃতির উপর। ব্যবস্থাপনার অন্যতম নীতি হল প্রতিষ্ঠানের সাফল্য সুনিশ্চিত করার জন্য সুদৃঢ় সংগঠন গড়ে তোলা।

৩.৪ ব্যবস্থাপনায় মূল্যবোধ ও নীতিসম্মত বিচারশক্তি

মূল্যবোধ (moral) শব্দটির অর্থ হল আচরণগত রীতি-নীতি যার মাধ্যমে ভালো-মন্দের বিচার করা যায়। যা সেই ভালো-মন্দ নিয়ে আলোচনা করে বা ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে। নীতিসম্মত (ethical) শব্দটির অর্থ জানার আগে দরকার নৈতিকতা (ethics) শব্দটির অর্থ জানা। নৈতিকতা হল ব্যক্তির মূল্যবোধ সংক্রান্ত মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি যার দ্বারা ব্যক্তির আচার-আচরণ, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয় কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ বা কোনটা ঠিক বা কোনটা ভুল ইত্যাদি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোনও কার্য যদি নৈতিকতার ভিত্তিতে সম্পাদন করা হয়, তবে সেই কার্য হবে যথাযথ বা নীতিসম্মত। ব্যক্তিগত চরিত্র ও নৈতিকতা, চিরাচরিত বিশ্বাস, সমষ্টিগত আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব প্রভৃতি গুণাবলির সমন্বয়ে মূল্যবোধ ও নীতিসম্মত বিচারশক্তি তৈরি হয়। সমাজে ও ব্যবস্থাপনায় যার গুরুত্ব অসীম।

ব্যবস্থাপনার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য মূল্যবোধ ও নীতি সম্মত বিচার শক্তির প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান দিনে অনস্বীকার্য। কারণ বর্তমান যুগ পেশাদারী ব্যবস্থাপনার যুগ। ফলে অসম্ভব প্রতিযোগিতার মধ্যে ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্তগ্রহণ অনেক সময়ই নীতিসম্মত হয় না। অবশ্য নীতিসম্মত শব্দটি আপেক্ষিক (relative)। কারণ নৈতিক মূল্যবোধ (ethical value) স্থান, কাল ও পাত্রভেদে বিভিন্ন হতে পারে। বর্তমানে ব্যবস্থাপনায় মূল্যবোধ ও নীতিসম্মত বিচারশক্তির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ব্যবস্থাপনা সমষ্টিগত মূল্যবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সাংগঠনিক নৈতিকতা সম্পর্কে চেতনাবোধ সৃষ্টি করে, কারবারের সামাজিক দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সামাজিক ন্যায় বিচারের দৃষ্টিভঙ্গিতে সংগঠনের জন্য নীতি প্রণয়ন করে। ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপনায় মূল্যবোধ ও নীতিসম্মত বিচার শক্তির প্রবর্তনের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা প্রয়োজন :

(১) **কারবারি নৈতিকতা প্রণয়ন ঃ**

কারবারি নৈতিকতা হল প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সংগঠনের সামাজিক দায়িত্ববোধের ফলাফলের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় এই নৈতিকতা নির্ধারিত হয়। ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের জন্য কারবার-সংক্রান্ত নীতিবোধ নিরূপণ করবে এবং সেগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করবে।

(২) **সমাজের অঙ্গ হিসাবে কারবার ঃ**

কারবারি প্রতিষ্ঠানকে সমাজের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হয়। কারণ নতুন কারবার পত্তন পুরোনো কারবারের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সবই ঘটে সামাজিক পরিবেশে। সমাজ ও কারবার একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই কারবারের সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। ব্যবস্থাপনার কর্তব্য হল এই বিচারধারা বা নৈতিক মূল্যবোধ ব্যবস্থাপনায় জড়িত সকল কর্মীর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যাতে কারবারের সামাজিক উদ্দেশ্য সফল হয় এবং সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন সম্ভব হয়।

(৩) **আয়ের ন্যায্য বণ্টন ঃ**

কারবারি প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কারবারি ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার মাধ্যমে কারবার মুনাফা অর্জন করে। অর্জিত আয় উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ন্যায়সম্মত বণ্টন করা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। অর্জিত আয় থেকে জমির মালিককে খাজনা, শ্রমিককে মজুরি বা বিনিয়োগকারীদের সুদ দেওয়া হয়। অবশিষ্ট অংশ ঝুঁকিবহনের পুরস্কার হিসাবে প্রতিষ্ঠানের থাকে, যাকে আমরা মুনাফা বলি।

(৪) **কর্মীদের কার্যের উপর নৈতিক মূল্যবোধের প্রয়োগ ঃ**

ব্যবস্থাপনা সংগঠনের মূল্যবোধ ও নীতিসম্মত বিচারশক্তির প্রয়োগ করবে। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগুলির কার্য সম্পাদনের উঁচু মান স্থির করে তাদের কার্যসম্পাদনে উৎসাহিত করবে। কার্যসম্পাদন সব সময় সফল হয় না। ভুল হতে পারে, ব্যর্থ হতে পারে। কিন্তু কখনই কার্যসম্পাদন নিচু মানের না হয়, ব্যবস্থাপনা সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। এই মূল্যবোধ সংগঠনে প্রয়োগের মাধ্যমে কর্মীদের কার্য সম্পাদনের দক্ষতার (performance) উপর প্রভাব সৃষ্টি করে প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা সুনিশ্চিত করতে পারে।

(৫) **ক্রেতা ও জনগণের সন্তুষ্টি বিধান ঃ**

ব্যবস্থাপনাকে কারবার পরিচালনার জন্য অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়, প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিযোগিতার মোকাবিলা করতে হয়। এসব সহজেই সম্ভব হয় যদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ক্রেতা ও সাধারণ মানুষের সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করে। ক্রেতা ও সাধারণ মানুষ প্রতিষ্ঠানটিকে তখনই সমর্থন জানায় যখন সেই প্রতিষ্ঠানটি মানুষের প্রয়োজন, চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুসারে ভালমানের পণ্য উৎপাদন করে সঠিক মূল্যে ক্রেতাদের সরবরাহ করে। বিক্রয়োত্তর পরিষেবাও এক্ষেত্রে বিচার্য বিষয়।

(৬) **পক্ষপাতহীনতা ঃ**

কারবারি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পক্ষ থাকে। সব পক্ষের স্বার্থ একে অপরের স্বার্থ থেকে পৃথক। ব্যবস্থাপনাকে সব পক্ষের সঙ্গে সমান ও পক্ষপাতহীন আচরণ করতে হবে এবং পরস্পর বিরুদ্ধ স্বার্থের গোষ্ঠীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক উদ্দেশ্যসাধন করতে হবে।

বর্তমানে ব্যবস্থাপনায় মূল্যবোধ ও নীতিসম্মত বিচার শক্তি বহু আলোচিত। প্রতিষ্ঠানের সফলতার জন্য ব্যবস্থাপনাকে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয়। এসব ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে মূল্যবোধ ও নীতির প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। কোনও ক্রেতার বা পাওনাদারের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ, মজুতদারি, কোনও আত্মীয় বা বন্ধুকে অন্যায্য সুবিধাদান, হিসাবের কারচুপি, প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি আত্মসাৎ, প্রয়োজনীয় তথ্য প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের কাছে ফাঁস করা প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ ব্যবস্থাপনার অনৈতিকতার দৃষ্টান্ত। ব্যবস্থাপনাকে এইসব অনৈতিক কার্যাবলি থেকে দূরে থাকতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় সংগঠনের সংস্কৃতি (organisational culture) ব্যবস্থাপনায় মূল্যবোধ ও নৈতিক আচরণে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। সুষ্ঠু ও সচল সংস্কৃতি ব্যবস্থাপনায় নীতিসম্মত বিচারশক্তিতে শক্তিশালী ও ধনাত্মক প্রভাব বিস্তার করে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সফলতা সুনিশ্চিত করে।

৩.৫ সারাংশ

দেশের সম্পদ বিবেচনা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করে সমাজের হিতকর ও প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কারবারি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। কারবারি প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপনার নীতি প্রণয়ন অপরিহার্য। ব্যবস্থাপনার নীতি বিভিন্ন কার্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি করে। ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে মূল্যবোধ ও নীতিসম্মত বিচারশক্তির যোগ অচ্ছেদ্য। এর প্রয়োগের মাধ্যমেই ব্যবস্থাপনা সমাজের কল্যাণ সাধনে কার্যকরী ও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে। কারণ ব্যবস্থাপনার নৈতিক দায়িত্ব (ethical responsibility) অনস্বীকার্য। তাই ব্যবস্থাপনার উচিত সংগঠনে উচ্চমানের মূল্যবোধ ও নৈতিক মান (standard) স্থির করা যাতে প্রতিষ্ঠানটি সামাজিক কর্তব্য পালন করতে পারে।

ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ নমনীয় ও পরিবর্তিত অবস্থায় পরিবর্তনের মাধ্যমে উপযোগী করে তোলা যায়। এই নীতিসমূহ প্রয়োজন অনুসারে সামান্য পরিবর্তন করে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে প্রয়োগ করলে ব্যবস্থাপনা কাম্য ফললাভ করতে পারে।

৩.৬ প্রশ্নাবলী

(১) ব্যবস্থাপনার নীতিগুলির প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [উত্তর সংকেত : প্রস্তাবনা]

(২) ব্যবস্থাপনার নীতিগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। [উত্তর সংকেত : গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য]

(৩) বর্তমান দিনে ব্যবস্থাপনায় মূল্যবোধ ও নীতিসম্মত বিচারশক্তির প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করুন।
[উত্তর সংকেত : ব্যবস্থাপনায় মূল্যবোধ ও নীতি সম্মত বিচারশক্তি]

(৪) ব্যবস্থাপনার নীতিগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করুন।
[উত্তর সংকেত : ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপনার নীতি প্রণয়ন]

(৫) ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহের সার্বজনীনতা বলিতে কী বোঝেন?

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Principles of Management and Entrepreneurship Development—W. Haynes (1999)

(২) Principles of Business Management—Sharlekar & Sharlekar, Himalays Pubs. 1985.

(৩) Business Organisation and Principles of Management—R. K. Sharma and S.K. Gupta (1992)

(৪) ব্যবস্থাপনার নীতি এবং উদ্যোগ উন্নয়নের ভূমিকা—পদ্মলোচন গঙ্গোপাধ্যায় (২০০০)

একক ৪ ❑ ব্যবস্থাপনার স্তরসমূহ বা ব্যবস্থাপনার স্তরানুক্রম

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য
৪.১ প্রস্তাবনা
৪.২ ব্যবস্থাপনার স্তরসমূহ
  ৪.২.১ উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপনা
  ৪.২.২ মধ্যবর্তী স্তরের ব্যবস্থাপনা
  ৪.২.৩ নিম্নতর স্তরের ব্যবস্থাপনা
৪.৩ সারাংশ
৪.৪ প্রশ্নাবলী
৪.৫ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে আমরা জানতে পারব–

- ব্যবস্থাপনার স্তর কী
- ব্যবস্থাপনার উচ্চস্তর, মধ্যবর্তী স্তর ও নিম্নস্তর বলতে কী বোঝায়
- ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরের কার্যাবলি

৪.১ প্রস্তাবনা

বৃহৎ কারবারি প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্ত কার্যকে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত কর্মীদের মধ্যে ভাগ করার প্রয়োজন হয়। শ্রমবিভাগের নীতি অনুসারে এই স্তর বিভাজন হয়। এই বিভাজিত স্তরগুলির ক্রমানুগ ধারাকে ব্যবস্থাপনার স্তরসমূহ বা ব্যবস্থাপনার স্তরানুক্রম বলা হয়। ব্যবস্থাপনার স্তরসমূহ বলতে বোঝায় ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক যন্ত্রকে। এই প্রশাসনিক যন্ত্র ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের নিয়ে গঠিত। ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত কর্মী বলতে বোঝায় পরিচালকমণ্ডলী, কার্যনির্বাহী পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব, বিভাগীয় ব্যবস্থাপকগণ প্রভৃতি। তাঁরা ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলীর একদিকে থাকে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী যেমন পরিকল্পনা, সংগঠন, আদেশদান, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যদিকে থাকে ক্রিয়াগত কার্যাবলী যেমন কারিগরী, বাণিজ্যিক, আর্থিক, নিরাপত্তা, হিসাব নিকাশকরণ প্রভৃতি।

৪.২ ব্যবস্থাপনার স্তরসমূহ

ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কার্য বিভিন্ন স্তরে সম্পাদিত হয়। ই. এফ. এল. ব্রিচ (E. F. L. Brech) ব্যবস্থাপনাকে নিম্নলিখিত স্তরে বিভক্ত করেছেন।

(ক) উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপনা

(খ) মধ্যবর্তী স্তরের ব্যবস্থাপনা

(গ) নিম্নতর স্তরের ব্যবস্থাপনা

ব্যবস্থাপনার স্তরসমূহ বা স্তরানুক্রম

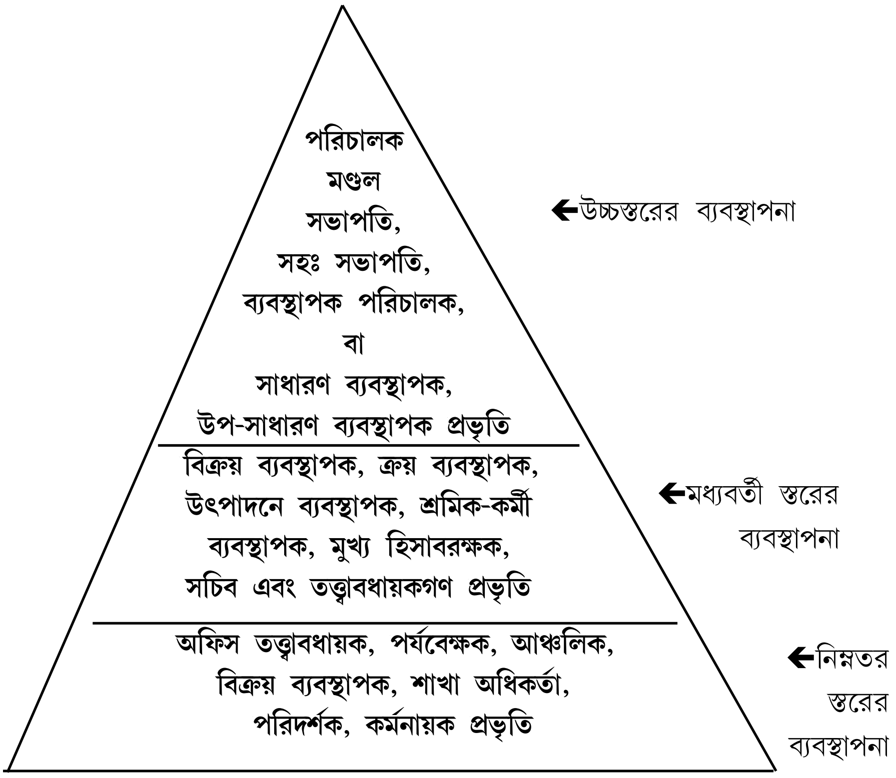

৪.২.১ উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপনা ঃ

ব্যবস্থাপনার উচ্চস্তরের পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors), সভাপতি President), ব্যবস্থাপক পরিচালক (Managing Director) অথবা সাধারণ ব্যবস্থাপক General Manager), উপ-সাধারণ ব্যবস্থাপক (Deputy General Manager) প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় ব্যবস্থাপকগণ থাকেন। পরিচালকমণ্ডলী মুখ্যত নীতি নির্ধারণকারী সংস্থা। পরিচালকমণ্ডলীর গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্তকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার দায়িত্ব মুখ্য কার্যনির্বাহীর (Chief Executive) উপর ন্যস্ত করা হয়। এই মুখ্য কার্যনির্বাহী 'ব্যবস্থাপক পরিচালক' বা 'সাধারণ ব্যবস্থাপক' যে কেউ

হতে পারেন। মুখ্য কার্যনির্বাহীকে পরিচালকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে হয়। তিনি পরিচালকমণ্ডলী ও মধ্যবর্তী স্তরের ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন। পরিচালকমণ্ডলীর গৃহীত সিদ্ধান্তকে তিনি ব্যবস্থাপক কর্মীগণকে জ্ঞাত করান। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রভৃতি পরিচালকমণ্ডলীর নিকট পেশ করার দায়িত্ব পালন করেন। পরিচালকমণ্ডলীর গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করা হয় এবং প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনায় তিনি অংশগ্রহণ করেন। তবে সাহায্য করার জন্য কোনও কোনও প্রতিষ্ঠানে উপ-সাধারণ ব্যবস্থাপক বা সহ সভাপতি (Vice-President) নিয়োগ করা হয়।

কার্যাবলি ঃ

উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপনার প্রধান প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ ঃ

(১) কারবারি প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণ, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন, মৌলিক নীতি ও ব্যবসায়িক কৌশল(Business Strategy) স্থিরীকরণ এবং কর্মসূচী প্রণয়ন।

(২) কারবারের সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুতকরণ।

(৩) স্বল্পকালীন কর্মসূচী ও প্রতিষ্ঠানের বাজেট অনুমোদন।

(৪) প্রতিষ্ঠানের গৃহীত নীতি অনুসারে কর্মচারী নিয়োগ, তাদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন এবং অনুপ্রাণিত করণ।

(৫) বিভাগীয় পরিকল্পনা গঠনে নেতৃত্ব প্রদান ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে কার্যভার বণ্টন।

(৬) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশ দান এবং যাবতীয় কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় বণ্টন।

(৭) বিভাগীয় ও উপবিভাগীয় ব্যবস্থাপকদের নিয়োগ এবং তাদের ও বিভাগের কার্যের মূল্যায়ন।

(৮) প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা প্রণয়ন।

(৯) প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও বণ্টন বিষয়ে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন।

(১০) বিভিন্ন আইনানুগ কার্যকলাপ, যেমন বিবরণ পত্র (propectus) প্রকাশ, শেয়ার বণ্টন, শেয়ারে তলবী অর্থ আদায়, শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ ও বাজেয়াপ্ত শেয়ার পুনঃবণ্টন, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকার সভা আহ্বান, তৃতীয় পক্ষের সহিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তি করা প্রভৃতি কার্য সম্পাদন।

৪.২.২ মধ্যবর্তী স্তরের ব্যবস্থাপনা ঃ

বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান যেমন বিক্রয়-ব্যবস্থাপক (Sales Manager), ক্রয়-ব্যবস্থাপক (Purchase Manager), উৎপাদন-ব্যবস্থাপক (Production Manager), শ্রমিক-কর্মী-ব্যবস্থাপক (Personnel Manager), মুখ্য হিসাবরক্ষক (Chief Accountant), সচিব (Secretary) এবং তত্ত্বাবধায়কদের (Superintendents) নিয়ে ব্যবস্থাপনার মধ্যবর্ত্তী স্তরটি গঠিত।

কার্যক্ষেত্রে মধ্যবর্তী স্তরের ব্যবস্থাপকদের গুরুত্ব অসীম। এরা প্রধানত উচ্চস্তরের এবং নিম্নতর স্তরের ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে সংযোগ সাধনের সেতু। এদের উপর উচ্চ এবং নিম্ন উভয় স্তর থেকেই চাপ আসে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠানের সাফল্য প্রধানত নির্ভর করে মধ্যবর্তী স্তরের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, কার্যকারিতা ও সংহতি সাধনের উপর।

কার্যাবলি ঃ

মধ্যবর্তী স্তরের ব্যবস্থাপনার প্রধান প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ ঃ

(১) প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, নীতি, পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে নিজ নিজ বিভাগের কর্মীগণকে অবহিতকরণ।

(২) উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকদের নীতি প্রণয়নে এবং সিদ্ধান্তগ্রহণে সাহায্যপ্রদান।

(৩) মুখ্য কার্যনির্বাহীর নিকট থেকে আদেশ গ্রহণ এবং তদানুসারে বিভাগীয় কর্মচারীগণকে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি সম্পাদনে আদেশদান।

(৪) নিজস্ব বিভাগের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যসূচী গ্রহণ।

(৫) বিভাগীয় কার্যের তদারকিকরণ এবং বিভাগীয় কার্যের সহিত ব্যক্তি-কার্যকলাপের সমন্বয় সাধন।

(৬) উচ্চ এবং নিম্ন উভয়স্তরের ব্যবস্থাপকদের কার্যের সমন্বয়সাধন।

(৭) বিভাগীয় কার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকগণের নিকট প্রতিবেদন (Report) পেশ।

(৮) বিভাগীয় কর্মীদের অভাব-অভিযোগ উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকদের অবহিতকরণ এবং তাহা দূরীকরণের ব্যবস্থাগ্রহণ।

(৯) বিভাগীয় পরিকল্পনা ও কর্মসূচী রূপায়ণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ।

(১০) বিভাগীয় কর্মীদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাগ্রহণ, অনুপ্রাণিতকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ।

৪.২.৩ নিম্নতর স্তরের ব্যবস্থাপনা ঃ

নিম্নতর স্তরের ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থাপকগণ হলেন অফিস তত্ত্বাবধায়ক (Office Superintendent), পর্যবেক্ষক (Supervisor), আঞ্চলিক বিক্রয় ব্যবস্থাপক (Area Sales Manager), শাখা অধিকর্তা (Section-in-charge), পরিদর্শক (Inspector), কর্মনায়ক (Foreman) প্রভৃতি।

এরা কার্যকরী ব্যবস্থাপনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকেন। ব্যবস্থাপনার স্তরানুক্রমে সর্বাপেক্ষা নিম্নে অবস্থান করেন বলে এরা সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। নিম্নতর স্তরের ব্যবস্থাপকগণ মধ্যবর্তী স্তরের আদেশ বা নির্দেশ অনুযায়ী সাধারণ কর্মীদের আদেশ প্রদান করেন। এই স্তরের ব্যবস্থাপনার কার্যকে অধিকতর ফলপ্রসূ করা বিশেষ প্রয়োজন কারণ এই স্তর সঠিকভাবে কর্মসম্পাদন না করলে সংগঠনের উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভব নয়। নিম্নতর স্তরের ব্যবস্থাপকগণকে যথেষ্ট কর্তৃত্ব, মর্যাদা, ক্রিয়াগত বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য পরিবেশন এবং উদ্দেশ্য স্থিরীকরণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে দিয়ে এদের কাছ থেকে সর্বোত্তম কার্যকরী ব্যবস্থাপনা (Effective Management) লাভ সম্ভব হয়।

কার্যাবলি ঃ

নিম্নতর স্তরের ব্যবস্থাপনার প্রধান প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ ঃ

(১) সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে মধ্যবর্তী-স্তরের যোগসূত্র স্থাপন।

(২) শ্রমিক-কর্মী, বিক্রয়-কর্মী ও অন্যান্য অধস্তন কর্মচারীগণ দ্বারা কার্য সম্পাদন।

(৩) নিজ নিজ শাখার (section) পরিকল্পনা, কার্যসূচী ও কর্মপন্থা নির্ধারণ।

(৪) নিজ নিজ শাখার কর্মীদের কার্যের তদারকি এবং প্রয়োজনীয় আদেশ, নির্দেশ ও পরামর্শদান।

(৫) শাখা কর্মীদের মতামত, সুপারিশ, কার্যের সুবিধা ও অসুবিধা, অভাব-অভিযোগ প্রভৃতি মধ্যবর্তী স্তরের ব্যবস্থাপকদের নিকট উপস্থাপন।

(৬) কার্যের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শ্রমিক-কর্মীদের নিরাপত্তা ও কল্যাণের দিকে দৃষ্টি প্রদান করে তাদের অনুপ্রাণিতকরণ।

(৭) বিভিন্ন শাখা কর্মীগণের কার্যের সমন্বয়সাধন।

(৮) নিজ নিজ বিভাগের কর্মীদের কার্যের মূল্যায়ন করে তাদের কার্যের ত্রুটি সংশোধনে সাহায্যদান।

(৯) যন্ত্রপাতির উপযুক্ত ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিকা শক্তি (Productivity) বৃদ্ধিতে ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১০) নিজ নিজ শাখার অগ্রগতি সম্পর্কে উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকদের অবহিতকরণ।

৪.৩ সারাংশ ঃ

ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামগ্রিক কার্যাবলির সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য একটি সক্রিয় সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়নের গুরুত্ব অসীম। বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে, কার্যাবলির বিন্যাস ও সমন্বয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর কার্যকারিতা পরিস্ফুট হয়। স্তরভিত্তি ব্যবস্থাপনা হল ধ্রুপদী (classical) পদ্ধতি। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, সব বৃহৎ প্রতিষ্ঠানেই এর প্রচলন দেখা যায়।

৪.৪ প্রশ্নাবলী ঃ

(১) ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরসমূহ উল্লেখ কর। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরের কার্যাবলি আলোচনা করুন।

[উত্তর : ব্যবস্থাপনার স্তরসমূহ]

(২) ব্যবস্থাপনার স্তরগুলির ব্যাখ্যা করুন। যে কোনও একটি স্তরের কার্যাবলি আলোচনা করুন।

[উত্তর : ব্যবস্থাপনার স্তরসমূহ]

(৩) ব্যবস্থাপনার স্তর বলিতে কী বোঝেন?

(৪) ব্যবস্থাপনার স্তরগুলি কী কী?

(৫) ব্যবস্থাপনার উচ্চস্তর মধ্যবর্তী স্তর ও নিম্নতর স্তর বলিতে কী বোঝেন?

৪.৫ গ্রন্থপঞ্জী ঃ

(১) কারবার ব্যবস্থাপনার পরিচয়—নরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী (১৯৯৫)

(২) কারবার ব্যবস্থাপনা—শংকর প্রসাদ গুহ ও বিষ্ণুপদ মুখার্জী (১৯৯৪)

(৩) ব্যবস্থাপনার নীতি ও উদ্যোগ উন্নয়ন—জয়দেব সরখেল, দেবাশিস ব্যানার্জী ও মদনমোহন কর্মকার (২০০০)

(৪) ব্যবসার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা—বিলাসকুমার বিশ্বাস (১৯৯৫)

(৫) ব্যবস্থাপনার রূপরেখা—সুশীল মুখার্জী (১৯৯৭)

(৬) Principles of Management—Tripathi & Reddy, Tata Mograw Hill. 2nd Edn.

একক ৫ ❑ সিদ্ধান্তগ্রহণ, সমন্বয়, জ্ঞাতকরণ

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য

৫.১ প্রস্তাবনা

৫.২ ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ

৫.২.১ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংজ্ঞা

৫.২.২ সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব

৫.২.৩ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকারভেদ বা শ্রেণীবিভাগ

৫.২.৪ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধাপসমূহ বা পদক্ষেপ

৫.৩ ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়

৫.৩.১ ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়ের অর্থ

৫.৩.২ সমন্বয়ের উদাহরণ

৫.৩.৩ সমন্বয়ের কৌশলসমূহ

৫.৪ ব্যবস্থাপনায় জ্ঞাতকরণ

৫.৪.১ জ্ঞাতকরণের সংজ্ঞা

৫.৪.২ জ্ঞাতকরণের গুরুত্ব

৫.৪.৩ জ্ঞাতকরণ ও অনুপ্রাণিতকরণ

৫.৫ সারাংশ

৫.৬ প্রশ্নাবলী

৫.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটির পড়ে আমরা জানতে পারব–

- ব্যবস্থাপনার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি যেমন–সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমন্বয় ও জ্ঞাতকরণ।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমন্বয় ও জ্ঞাতকরণের সংজ্ঞা।
- ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমন্বয় ও জ্ঞাতকরণের গুরুত্ব।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের শ্রেণীবিভাগ।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার পদক্ষেপসমূহ।

● সমন্বয়ের বিভিন্ন কৌশলসমূহ।
● ব্যবস্থাপনার জ্ঞাতকরণের প্রয়োজনীয়তা।
● জ্ঞাতকরণের ও অনুপ্রাণিতকরণের মধ্যে সম্পর্ক।

৫.১ প্রস্তাবনা

ব্যবস্থাপনার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমন্বয় ও জ্ঞাতকরণ ইত্যাদি। কারবার প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে বিলোপসাধন পর্যন্ত প্রায় সব বিষয়ে, সব ক্ষেত্রে এবং প্রায় সব বিষয়ে উপরিউক্ত কার্যগুলি করে চলতে হয়। ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে ও প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমন্বয় ও জ্ঞাতকরণ একটি অন্তর্নিহিত বিষয়। ব্যবস্থাপনার উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকগণকেই পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। কারবারি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নির্ধারণ, উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি কার্য-সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন, কারবারের কর্মসূচী, নিয়মকানুন, বাজেট তৈরি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর ব্যবস্থাপনার সাফল্য নির্ভর করে। তাই সিদ্ধান্তগ্রহণকে ব্যবস্থাপনার প্রাণস্বরূপ বলা হয়।

কারবারি প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে সুপরিকল্পিতভাবে কারবারি প্রতিষ্ঠানকে কয়েকটি বিভাগ ও উপবিভাগে ভাগ করা যায়। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্য এই সমস্ত বিভাগ ও উপবিভাগের কর্মীদের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। প্রতিষ্ঠানের সফলতা ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন হয় বিভিন্ন ব্যক্তির কার্যের সঙ্গে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরের গৃহীত সিদ্ধান্তের সংহতি সাধন। বিভিন্ন বিভাগের কার্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে একতা সৃষ্টির প্রক্রিয়াকেই ব্যবস্থাপনায় সমন্বয় সাধন বলা হয়। কারবারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ ব্যক্তিগতভাবে সকলে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে কার্য করলেও সমষ্টিগতভাবে তাদের কার্যের ফল আশানুরূপ নাও হতে পারে। আশানুরূপ ফলের জন্য সহযোগিতা অবশ্যই কাম্য। কিন্তু শুধুমাত্র সহযোগিতা কর্মে সফলতা আনতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন হয় সমন্বয়। সমন্বয়ের অর্থ বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে এমন সংহতি স্থাপন যাতে সমষ্টিগত প্রচেষ্টা সঠিক পথে ও সঠিক সময়ে সম্পন্ন করে একটি পরিপূর্ণ আকার ধারণ করতে পারে। সব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন কর্মী ও কার্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই সমন্বয়ের মূল উদ্দেশ্য। ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়ের কার্য যত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যাবে ততই কারবারের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হবে।

কারবারি প্রতিষ্ঠানের সমস্ত বিভাগ ও উপবিভাগের কর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন তথ্য, ভাবধারা, ধারণা, সংবাদ, চিন্তা ভাবনা প্রভৃতির বিনিময় হয়। এই ঘটনাই হল জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা। এই জ্ঞাতকরণের মাধ্যমে একপক্ষের থেকে বিভিন্ন তথ্য বিভিন্ন মাধ্যমের (chanels) মধ্য দিয়ে অপর পক্ষের কাছে পৌঁছায়। কারবারি প্রতিষ্ঠানে এটি চিরন্তন ও বিরামহীন প্রক্রিয়া। একটি উত্তম জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নতি ঘটাতে পারে। উত্তম জ্ঞাতকরণের দ্বারা ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়িয়ে ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা অনেক কমিয়ে দেয়। ইহার দ্বারা কর্মীদের অনুপ্রাণিত করে, তাদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

৫.২ ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ব্যবস্থাপনার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কার্য হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কারবার প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে বিলোপসাধন পর্যন্ত সব বিষয়ে, সব ক্ষেত্রে এবং সব সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে এবং প্রতিটি কার্যে

সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি অন্তর্নিহিত বিষয়। ব্যবস্থাপনার উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত সব ব্যবস্থাপকগণই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যতীত কার্য সম্পাদন করতে পারে না। পরিকল্পনা প্রণয়নে কতকগুলি বিকল্প কার্যক্রম থেকে একটিকে বেছে নিতে গেলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দরকার। সংগঠনে উপযুক্ত কার্যের জন্য উপযুক্ত কর্মীকে বেছে নিতেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন। কীভাবে কর্মীদের অনুপ্রাণিত করা হবে সে বিষয়ে স্থির করাও হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ। নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, কখন, কীভাবে, কার ওপর ও কোথায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে তা ঠিক করতে গেলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ কারবারি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নির্ধারণ, উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয় প্রভৃতি কার্যসংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন, কারবারে কর্মসূচী, নিয়মকানুন, বাজেট তৈরি প্রভৃতি সকলক্ষেত্রেই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর ব্যবস্থাপনার সাফল্য নির্ভর করে। তাই ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ব্যবস্থাপনার প্রাণস্বরূপ বলা হয়।

৫.২.১ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংজ্ঞা

সিদ্ধান্ত গ্রহণ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে বিভিন্ন বিকল্প কর্মপন্থা থেকে সর্বোত্তম কর্মপন্থাটি নির্বাচন করা যায়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনাবিদ্‌দের দেওয়া সংজ্ঞা নীচে উল্লেখ করা হল–

পিটার. এফ. ড্রাকার (P.F.Drucker)-মতে "একজন ব্যবস্থাপক তার সকল কার্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সম্পাদনা করেন।"

জর্জ টেরী (George Terry) বলেছেন "দুই বা তার বেশি সম্ভাব্য পন্থা থেকে একটি মাত্র বিকল্প পন্থা, নির্বাচনই হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ডি. ই. ম্যাকফারল্যান্ড (D.E.McFarland) এর ভাষায় "কোনও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাপকগণ যে কার্য করতে মনস্থ করেন তাই হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ।"

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ হল পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত মূল্যায়নের ভিত্তি বিভিন্ন সম্ভাব্য কর্মপন্থা থেকে সর্বোত্তম কর্মপন্থা নির্বাচন করার মানসিক, বুদ্ধিদীপ্ত ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া।

৫.২.১ সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব

কারবারি প্রতিষ্ঠানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যবস্থাপনায়, সব সময়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ-ই হল একমাত্র পন্থা যার সাহায্যে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সমস্ত কার্যাবলি পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার কার্যাবলি যেমন পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মী-নিয়োগ, নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কার্যাবলি সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন বিকল্পের মধ্য থেকে কার্যকরী ও শ্রেষ্ঠ বিকল্প বেছে নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সংগঠন কাঠামো কী ধরনের হবে, কোন ব্যক্তিকে কোন কার্যভার দেওয়া হবে প্রভৃতি বিষয়ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমেই স্থির করা হয়। শুধুমাত্র দায়িত্ব নির্ধারণ বা কর্তৃত্ব প্রদান নয় কর্মীদের নিয়োগ ও অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রভূত গুরুত্ব আছে। কোন উৎসাহমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে অনুপ্রাণিতকরণ সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হবে সেই বিষয়েও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রয়োজন। কী ধরনের মান স্থির করা হবে, কার্যাবলির পরিমাপ কী হবে, কিংবা নির্দিষ্ট মান থেকে বিচ্যুতি ঘটলে তার সংশোধন কীভাবে করা হবে প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি স্থির করা হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে।

কারবারি জগৎ অনিশ্চয়তায় ভরা। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ঐ অনিশ্চয়তা বহুলাংশে দূর করা সম্ভব হয়। ব্যবস্থাপনায় বহুবিধ সমস্যা থাকে। সমস্যা সমাধানের একাধিক পথও আছে। বিকল্পগুলির মধ্য থেকে কোনটি গ্রহণীয় সে সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সঠিক সিদ্ধান্ত

গ্রহণের দ্বারাই প্রতিষ্ঠান তার অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হয়ে সাফল্য অর্জন করতে পারে। তাই ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব অসীম।

৫.২.৩ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকারভেদ বা শ্রেণীবিভাগ

কারবারি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সিদ্ধান্তগ্রহণের শ্রেণীবিভাগ করা হল :

(১) গুরুত্বের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ দুই প্রকারের হয়। যেমন–

(ক) মুখ্য বা প্রধান (Major or Primary) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ

কারবারি প্রতিষ্ঠানে কতকগুলি নীতিগত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এইসব সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপনার উচ্চস্তরে গ্রহণ করা হয়। কারখানা স্থাপন, যন্ত্রপাতি ক্রয়, পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ, লক আউট (Lock Out) ঘোষণা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি এই প্রকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদাহরণ। কারবারের মুনাফা অর্জন, এই ধরনের সিদ্ধান্তের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

(খ) গৌণ বা অপ্রধান (Major or Secondary) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ

কারবারি প্রতিষ্ঠানে কতকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় যার জন্য বিশেষ কোনও চিন্তাশক্তির প্রয়োজন হয় না। যেমন, কোনও শ্রমিকের ছুটির আবেদন মঞ্জুর করা, অফিসের জন্য কাগজপত্র ক্রয় করা, বেয়ারা ও দারোয়ানদের পোশাক পরিচ্ছদ ক্রয় করা প্রভৃতি। এই ধরনের সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপনার যে কোনও স্তরে গ্রহণ করা যায়।

(২) উপলক্ষ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

(ক) আরোপিত (Imposed) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ

উচ্চস্তরের একজন ব্যবস্থাপক যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাকে আরোপিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলে। ঊর্ধ্বস্তন ব্যবস্থাপকের গৃহীত এই ধরনের সিদ্ধান্ত অধস্তন ব্যবস্থাপক বা কর্মচারীদের, সহমত না হলেও মেনে চলতে হয়। যেমন, উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপক কর্তৃক নির্ধারিত দ্রব্যমূল্য, কর্তৃপক্ষ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে কর্মচারীদের সঙ্গে কোনও চুক্তি করা কিংবা প্রতিষ্ঠানের আয়কর রির্টান দাখিল করা প্রভৃতি।

(খ) আবেদনমূলক (Appealed) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ

অধস্তন কর্মীদের আবেদন-নিবেদনে উচ্চস্তরে ব্যবস্থাপকগণ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাকে আবেদনমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলা হয়। যেমন, কর্মচারীদের আবেদনে অতিরিক্ত বোনাস প্রদান বা অতিরিক্ত সময় কার্য করার সময় জলযোগের ব্যবস্থা প্রভৃতি।

(গ) মৌলিক (Original) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ

একজন ব্যবস্থাপক কোনও সিদ্ধান্ত নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করলে তাকে মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলা হয়। যেমন, বিক্রয় ব্যবস্থাপক কর্তৃক বিক্রয় প্রতিনিধিদের জন্য বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা (sales target) স্থির করা বা অধস্তন কর্মীদের মধ্যে কার্যবণ্টন প্রভৃতি।

(৩) প্রভাব/ফল (Consequence / Impact) এর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ দুই প্রকারের হয়। যেমন–

(ক) নিয়মমাফিক (Routine) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ

কারবারি প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয় তাকেই নিয়মমাফিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলা হয়। এই ধরনের সিদ্ধান্ত গতানুগতিক ও পৌনঃপুনিক ধরনের হয়। প্রতিষ্ঠানে এই সিদ্ধান্তগুলির

অতি স্বল্পস্থায়ী প্রভাব পরে। ব্যবস্থাপনার নিম্নস্তর পর্যন্ত এই ধরনের সিদ্ধান্তের বিকেন্দ্রীকরণ করা যায়। এই প্রকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ চিন্তা বা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। একই ধরনের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এই প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রযোজ্য। বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রনিক তথ্য প্রক্রিয়ার (Electronic Data Processing) বা কমপিউটারের সাহায্যে এই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কাঁচামাল ক্রয়, বছরের শেষে দেনাদারদের দেনার কথা স্মরণ করানো, ফরমাস অনুসারে ক্রেতাকে দ্রব্য সরবরাহ, বিক্রয়কর্মীর বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফরমাশ সংগ্রহ ইত্যাদি নিময়মাফিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদাহরণ।

(খ) কৌশলগত (Strategic) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ

প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় ব্যবস্থাপকগণ যে সব গুরুত্বপূর্ণ ও অপৌনঃপুনিক ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাকে কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলে। এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ বিচক্ষণতা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। প্রতিষ্ঠানে এই প্রকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ দীর্ঘকালীন ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, নতুন বাজার অনুসন্ধান, ঋণপত্র বিক্রয়, একটি হিসাব কালে বিজ্ঞাপনের জন্য অত্যধিক ব্যয় প্রভৃতি।

(৪) প্রকৃতি ও স্তরের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন–

(ক) কর্মনীতি (Policy) সম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ

ব্যবস্থাপনার উচ্চস্তরে গৃহীত যে সব সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যাবলি পরিচালিত হয় তাকে কর্মনীতি সম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলে। এই জাতীয় সিদ্ধান্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সব গৃহীত নীতির দীর্ঘকালীন প্রভাব থাকে। কর্মচারীদের স্বেচ্ছায় অবসর প্রকল্প, কর্মচারীদের পদোন্নতির মাধ্যমে পদপূরণ, সকল ক্রেতাকে একই দামে দ্রব্য বিক্রয় প্রভৃতি এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদাহরণ।

(খ) প্রশাসনিক (Administrative) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ

বিভাগীয় প্রধানগণ নিজ নিজ বিভাগ সংক্রান্ত যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাকে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলা হয়। ব্যবস্থাপনার মধ্যবর্তী-স্তরে সাধারণত এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই প্রকারের সিদ্ধান্ত খুবই ব্যাপক। যেমন, কতজন শ্রমিক/কর্মচারী উৎপাদন বিভাগে নিয়োগ করা হবে, কোন কোন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে বা ছুটির দিনে অতিরিক্ত মজুরি দিয়ে কাজ করানো হবে কিনা ইত্যাদি।

(গ) কার্যগত (Operational) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ

কারবারি প্রতিষ্ঠানের কর্মনীতিগুলিকে কার্যে রূপায়িত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণকে কার্যগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলা হয়। প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য এই প্রকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরি। ব্যবস্থাপনার নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপকগণ যারা প্রকৃত অর্থে কার্য সম্পাদনের তদারকি করেন, সেই ব্যবস্থাপকগণই এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। কোনও কর্মচারীর পদোন্নতি, দরপত্র (Tender) আহ্বান, ঠিকাদার, নির্বাচন, যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কার্যগত সিদ্ধান্তের উদাহরণ।

(৫) সুবিধাভোগকারীদের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন–

(ক) ব্যক্তিগত (Personal) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ

যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের ব্যক্তিগত সুবিধালাভ সম্ভব হয় সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলে। যেমন, কর্মচারীদের বাৎসরিক ছুটি, পাওনা ছুটির বদলে বেতন, ক্যান্টিনে কম খরচে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা প্রভৃতি।

(গ) সাংগঠনিক (Organisational) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ

ব্যবস্থাপনার উচ্চস্তর, মধ্যবর্তী স্তর এবং নিম্নস্তরের সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলা হয়। এই রকমের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে সাংগঠনিক উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভব হয়। দ্রব্য বা সেবার মান (Quality) বৃদ্ধি করা, নতুন দ্রব্য তৈরির জন্য গবেষণা, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার (Technology) প্রয়োগ, অফিসে কমপিউটার বসানো প্রভৃতি সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদাহরণ।

(৬) সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সংখ্যা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ দুই ধরনের হয়। যেমন–

(ক) ব্যক্তিগত (Personal) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ

যে সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপক একাই গ্রহণ করেন তখন তাকে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলা হয়। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপকই দায়বদ্ধ থাকেন। দ্রুত কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ও জটিলতা পরিহার করার জন্য ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কোনও কর্মচারীকে অতিরিক্ত অনুদান প্রদান বা প্রতিষ্ঠান থেকে কোনও ব্যবস্থাপকের ইস্তাফা প্রভৃতি এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদাহরণ।

(খ) দলগত বা যৌথ (Group or Collective) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ

একাধিক ব্যবস্থাপকগণ যৌথভাবে কারবারের সুদূরপ্রসারী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাকে দলগত বা যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলে। এই জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়বদ্ধতা থাকে প্রতিষ্ঠানের। যেমন, পরিচালকমণ্ডলীর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত, শেয়ার গ্রহীতাদের সভায় নিরীক্ষক নিয়োগ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত। কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে গঠিত দল বা কমিটিও দলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। যেমন, আর্থিক কমিটি, বিক্রয় কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(৭) পদ্ধতির দিক থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন–

(ক) পরিকল্পিত (Programmed) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ

পরিকল্পিত কার্যক্রম অনুযায়ী, ব্যবস্থাপনার নিম্নস্তরে যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাকে পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলা হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত রীতি অনুসারে এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় থাকে। এই সিদ্ধান্তগুলি রুটিন (Routine) মাফিক বা গতানুগতিক এবং পৌনঃপুনিক ধরনের। সাধারণত এগুলির স্বল্পকালীন প্রভাব দেখা যায়। ফরমাশ অনুসারে পণ্য বা সেবা উৎপাদন, কর্মচারীদের অসুস্থতার জন্য সুবিধাপ্রদান, কর্মচারীদের ছুটি অনুমোদন প্রভৃতি এই ধরনের সিদ্ধান্তের উদাহরণ।

(খ) অপরিকল্পিত (Non Programmed) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ

উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাকে অপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলে। এই সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণ নতুন, অতীতে এইরূপ সিদ্ধান্তের নজির ছিল না। অপৌনঃপুনিক জাতীয় এই সিদ্ধান্তগুলি, সাধারণত ব্যবস্থাপনার উচ্চস্তরে গ্রহণ করা হয়। যেমন, নতুন দ্রব্য উদ্ভাবন, প্রতিযোগিতার মোকাবিলায় নতুন বিভাগ স্থাপন, নতুন কারখানা স্থাপন প্রভৃতি।

৫.২.৪ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধাপসমূহ বা পদক্ষেপ

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার কয়েকটি ধাপ বা পর্যায় আছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপক কার্যাবলি নীচের পদক্ষেপ বা ধাপগুলির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

(১) সমস্যা চিহ্নিতকরণ (Identification of Problem) ঃ

সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রথম ধাপ হল সমস্যা চিহ্নিত করা। কারবারি প্রতিষ্ঠানের অসংখ্য সমস্যা থাকে। এই সমস্যাগুলির প্রকৃত স্বরূপ জানা দরকার। সমস্যার প্রকৃতি জানতে পারলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজসাধ্য হয়। একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনেক ধরনের সমস্যা থাকে। যেমন, যন্ত্রপাতি খারাপ বা অপ্রচলিত হওয়া, ত্রুটিপূর্ণ উৎপাদন, শ্রমিক/কর্মচারীদের কর্মবিরতি প্রভৃতি। সেই রকম একটি ক্রয়-বিক্রয়কারী (Trading) প্রতিষ্ঠানেরও অসংখ্য সমস্যা থাকে। যেমন, বিক্রয় হ্রাস পাওয়া, বিক্রয়কর্মীদের দুর্ব্যবহার, দেনাদরদের দেনা সময়ে না পাওয়া ইত্যাদি। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে প্রকৃত সমস্যা প্রথমেই চিহ্নিত করতে হবে। তার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, কৌতূহলী মনোভাব ও অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

(২) সমস্যার বিশ্লেষণ (Analysing the Problem) ঃ

সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণের পর সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ করা দরকার। এর ফলে সমস্যার এক একটি অংশের সমাধানের পন্থা নির্ণয়ের উপর বেশি প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব হয়। যেমন, ত্রুটিপূর্ণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে দেখতে হবে সারাদিনে কতগুলি দ্রব্য খারাপ উৎপাদিত হয়, উৎপাদিত দ্রব্য কী ধরনের ত্রুটিপূর্ণ—ইহা কি পরিমাণে কম বা সঠিক গঠনের নয় কিংবা সঠিক মাপের নয় প্রভৃতি, বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যাগুলি খুঁজে বার করা প্রয়োজন। যে কোনও সমস্যার, অনেকগুলি সীমা-নির্ধারণকারী শক্তি ও উপাদান থাকে। সেগুলির মধ্যে কিছু আছে প্রাসঙ্গিক আবার কিছু আছে অপ্রাসঙ্গিক। সমস্যার প্রাসঙ্গিক উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করতে হবে। আর অপ্রাসঙ্গিক উপাদানগুলি বর্জন করতে হবে।

(৩) সমাধানের বিকল্প পন্থা অনুসন্ধান (Searching Alternative Solution) ঃ

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল পর্যায় বা ধাপ হল সমাধানের বিকল্প পন্থা অনুসন্ধান। কোনও সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন পন্থা থাকতে পারে। এই সমস্ত বিকল্প পন্থা অনুসন্ধানই সমস্যা সমাধানের সঠিক উপায়। সুতরাং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে যতগুলি সম্ভব বিকল্প সমাধান অনুসন্ধান করতে হবে। বিকল্পগুলি অনুসন্ধান করার সময় সেগুলির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করা দরকার। বিকল্প পন্থা অনুসন্ধানের বিষয়টি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা ও দূরদর্শিতার উপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনও প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়বৃদ্ধির প্রয়াসে বিভিন্ন বিকল্প উপায় আছে। যেমন, পণ্যের গুণমান বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে দ্রব্যমূল্য হ্রাস করা, কার্যকর বিক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিশেষ বিজ্ঞাপন অভিযান ইত্যাদি। বিক্রয় বৃদ্ধি জনিত সমস্যা সমাধানের জন্য উপরোক্ত কোন বিকল্পটি সর্বাধিক ফলপ্রসূ ও কার্যকর তা ঠিক করতে পারলে সিদ্ধান্তগ্রহণ নির্ভুল ও সহজসাধ্য।

(৪) সর্বশ্রেষ্ঠ বিকল্প নির্বাচন (Selecting the Best Alternative) ঃ

সমস্যা সমাধানের বিকল্পগুলির মধ্য থেকে সর্বোত্তম বিকল্পটি নির্বাচন করা দরকার। বিভিন্ন বিকল্প পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধার তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও কার্যকরী বিকল্পটি নির্বাচন করা হয়। অবস্থা অনুযায়ী যে বিকল্পটির খরচ ও সময় কম লাগে এবং প্রতিকূল প্রতিক্রিয়াও অপেক্ষাকৃত কম, সেই বিকল্পটি হল সর্বশ্রেষ্ঠ। সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান বাছাইয়ের জন্য পিটার. এফ. ড্রাকার নিম্নলিখিত চারটি প্রয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন।

(ক) প্রত্যাশিত ফললাভের সঙ্গে ঝুঁকির অনুপাত বিশ্লেষণ;

(খ) ফললাভের সম্ভাবনা ও প্রচেষ্টার মধ্যে সংহতি-বিধান;

(গ) সুবিধাযুক্ত সময় এবং

(ঘ) প্রাপ্ত সহায়-সম্বলের সীমাবদ্ধতা।

(৫) সিদ্ধান্ত রূপায়ণ (Putting the Decisions into Action) ঃ

সর্বশ্রেষ্ঠ বিকল্পটি নির্বাচনের পর বাস্তবে সেটিকে রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য দরকার যে সকল ব্যবস্থাপক বা কর্মী গৃহীত সিদ্ধান্তটি কাজে রূপদান করবেন তাদেরকে সিদ্ধান্তটির প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বোঝানো, সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের স্বীকৃতি পাওয়া এবং তাদের সহযোগিতা ও সমর্থন লাভ। গৃহীত সিদ্ধান্তে যদি কোনও পরিবর্তন করা হয় তা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে জানাতে হবে। সিদ্ধান্ত সঠিক হলে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বাস্তবায়নের কাজ অনেক সহজসাধ্য হয়। সিদ্ধান্তের রূপায়ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর দ্বারা সাংগঠনিক উদ্দেশ্যপূরণ সম্ভবপর হয়।

(৬) সিদ্ধান্তের অনুসরণ (Following up the Decision) ঃ

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত সব ক্ষেত্রেই সঠিক ও অভ্রান্ত হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কিছু পূর্বানুমানের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পূর্বানুমানগুলির সবকটি সঠিক নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও সিদ্ধান্তটি ফলপ্রসূ হয় না। এছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর সীমিত ক্ষমতার দরুন সিদ্ধান্তে ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। সেই কারণে গৃহীত সিদ্ধান্তটির ভুল-ত্রুটি যাচাই করার জন্য সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার পরেও তাহা অনুসরণ করা প্রয়োজন। কোনও দোষ-ত্রুটি পাওয়া গেলে তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করা দরকার।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ নীচে রেখাচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপিত করা হল :

সমস্যা চিহ্নিতকরণ

↓

সমস্যার বিশ্লেষণ

↓

সমাধানের বিকল্প পন্থা অনুসন্ধান

↓

সর্বশ্রেষ্ঠ বিকল্প নির্বাচন

↓

সিদ্ধান্ত রূপায়ণ

↓

সিদ্ধান্তের অনুসরণ

৫.৩ ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়

বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যে সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠে কারবারি প্রতিষ্ঠান। কারবারি উদ্দেশ্য পূরণের প্রয়োজনে শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানকে কয়েকটি বিভাগ ও উপ-বিভাগে ভাগ করা হয়। কারবারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্য এই সমস্ত বিভাগ ও উপ-বিভাগের কর্মীদের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। সামগ্রিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট করে তৈরি করা হয় সাংগঠনিক কাঠামো। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত, ব্যক্তিগণ ও বিভিন্ন বিভাগ আপন আপন কার্য সম্পাদনের জন্য নানারকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠানের সফলতা ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন হয় বিভিন্ন ব্যক্তির কার্যের সঙ্গে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরের গৃহীত সিদ্ধান্তের সংহতি সাধন। বিভিন্ন বিভাগের কার্যের উদ্দেশ্যের মধ্যে একতা সৃষ্টির প্রক্রিয়াকেই ব্যবস্থাপনার সমন্বয় সাধন বলা হয়। সেইজন্য সমন্বয় সাধন ব্যবস্থাপনার সারবস্তু (Essence of Management) হিসাবে বিবেচিত হয়।

৫.৩.১ ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়ের অর্থ

কারবারি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ, উপবিভাগ ও কর্মীদের মধ্যে সেতুবন্ধন করা এবং তাদের কর্মধারার ও সিদ্ধান্তের সংহতি বিধান করাকেই সমন্বয় বলা হয়।

ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন চিন্তাবিদ্গণ সমন্বয়কে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করলেও এর বিষয়বস্তুর মূল সুর কিন্তু এক।

হেনরী ফেয়ল সমন্বয়কে একটি স্বতন্ত্র কর্মধারা হিসাবে বিবেচনা করেছেন। জর্জ টেরীর (George Terry) মতে "সমন্বয় হল সকল কর্মচারীর কর্মপ্রচেষ্টার সুষ্ঠু বিন্যাসের দ্বারা কর্মপ্রচেষ্টার মাত্রা, সময় ও নির্দেশনার সামঞ্জস্য বিধান করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছান।

উপরোক্ত সংজ্ঞা দুটি বিশ্লেষণ করে সমন্বয়ের একটি সংজ্ঞা দেওয়া যায়, কারবারের উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে যে সকল প্রচেষ্টা এর সকল কার্যাবলি ও সিদ্ধান্তের সংহতি সাধন করে তাকে সমন্বয় বলা হয়।

৫.৩.২ ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়ের অর্থ

ব্যবস্থাপকদের দ্বারা কারবারের সকল কার্যের তদারকির মাধ্যমে বিভিন্ন কারবারি ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় সাধিত হয়। উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক তার অধস্তন ব্যবস্থাপককে কার্য সম্পাদনের আদেশ (command) দেন এবং অধস্তন ব্যবস্থাপক তার উপর অর্পিত কার্য সম্পাদন করে উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকের নিকট প্রতিবেদন (Report) পেশ করেন। একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি আলোচনা করা যায়। ধরা যাক জামশেদপুরের টাটা স্টিল কোম্পানি বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে ১০০০ টন ইস্পাত ১ মাসের মধ্যে সরবরাহ করার বরাত (Order) পেয়েছে। টাটা স্টিল কোম্পানির বিক্রয় বিভাগ ঐ বরাত সংগ্রহ করে মুখ্য-নির্বাহীকে (Chief Executive) জানালেন। মুখ্য-নির্বাহীর সঙ্গে সঙ্গেই কারখানা ব্যবস্থাপক (Works Manager)-কে ১০০০ টন ইস্পাত উৎপাদন করার নির্দেশ দিলেন। কারখানা ব্যবস্থাপক ফরমায়েশি দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ক্রয় ব্যবস্থাপক-কে উপযুক্ত ও সঠিক পরিমাণ কাঁচামাল ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় করার নির্দেশ দিলেন। উৎপাদন ব্যবস্থাপককে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদন করার আদেশ দিলেন। একইভাবে শ্রমিক-কর্মচারী পরিচালন বিভাগকে (Personnel Department) শ্রমিক কর্মচারী প্রয়োজন হলে নিয়োগ করার নির্দেশ দান করলেন। এরপর প্রতিটি বিভাগ যেমন, ক্রয় বিভাগ, উৎপাদন বিভাগ এবং শ্রমিককর্মচারী পরিচালন বিভাগ নিজ নিজ কার্য সঠিক সময়ে সম্পাদন করে কারখানা

ব্যবস্থাপকের নিকট প্রতিবেদন (Report) দাখিল করলেন। কারখানা ব্যবস্থাপক আবার অনুরূপ প্রতিবেদ মুখ্য নির্বাহীর কাছে পেশ করলেন। মুখ্য নির্বাহী বিক্রয় বিভাগকে জানালেন দ্রব্য প্রস্তুত হয়েছে এবং সঠিক সময়েই তা সরবরাহ করা যেতে পারে। এরপর বিক্রয় বিভাগ ১০০০ টন ইস্পাত বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানটিকে নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করল। এইভাবে বিভিন্ন বিভাগের কার্যের মধ্যে সমন্বয় করা হয়। অন্যদিকে প্রত্যেক বিভাগকে ঠিক সময়ে কার্য সম্পাদনের নির্দেশদান না করলে কিংবা প্রত্যেক বিভাগের কর্মচারীরা সঠিক সময়ে ও সঠিক পরিমাণে কার্য সম্পাদন না করলে কারবারের বিভিন্ন কার্যের সমন্বয় সাধন সম্ভব হত না। ফলে বিক্রয় কার্যটি সম্পন্ন করা যেত না এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যও সফল হত না।

উপরোক্ত উদাহরণের সাহায্যে ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

৫.৩.৩ সমন্বয়ের কৌশলসমূহ

সমন্বয়কে ফলপ্রসূ করার জন্য কয়েকটি কৌশল বা পদক্ষেপ প্রয়োজন। সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় কৌশলগুলি নিম্নে আলোচিত হল ঃ

(১) সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসমূহ অবহিতকরণ ঃ

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কে প্রতিটি কর্মীর সম্যক ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। কর্মীগণকে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সুস্পষ্টভাবে অবহিত করা হলে তবেই তাদের নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা জন্মায়। এই সুস্পষ্ট ধারণাই সমন্বয়ের ভিত্তি সুদৃঢ় করে থাকে।

(২) সুস্পষ্ট নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়ন ঃ

সুস্পষ্ট নীতি ও যথাযথ কর্মপদ্ধতি প্রণয়নের মাধ্যমে সমন্বয়ের কার্য সহজ ও সফল করা সম্ভব হয়।

(৩) বিভাগীয় সভা ঃ

কারবারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের ব্যবস্থাপকগণ নিয়মিত সভা আহ্বান করে নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন এবং কোনও অসঙ্গতি দেখা গেলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। এই ধরনের সভার মাধ্যমে সংগঠনের নীতি ও সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ব্যবস্থা করা যায়। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল।

(৪) কর্তৃত্ব অর্পণ ঃ

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধীনস্থ কর্মীগণের উপর কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা অর্পণের দ্বারা সমন্বয়ের কার্য সহজ হয়। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে শীর্ষস্তরের ব্যবস্থাপকগণের কার্যের চাপ কমাবার জন্য অধীনস্থ কর্মচারীদের উপর কার্যভার অর্পণ অতি প্রয়োজনীয়। যোগ্যব্যক্তিকে যোগ্য কার্যের দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে সমন্বয়ের সাফল্য সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

(৫) বলিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিভাগ, উপ-বিভাগ ও শাখায় (Section) বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক বিভাগ, উপ-বিভাগ ও শাখার নির্দিষ্ট কর্তব্য ও দায়িত্ব থাকে। এইভাবে গঠিত হয় প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো। বলিষ্ঠ সাংগঠনিক কাঠামো কারবারের কার্যসমূহকে বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যে বণ্টন করে তাদের কার্যের মধ্যে এমনভাবে সমন্বয় ঘটায় যাতে কারবারে নিযুক্ত সকল কর্মীকে সমবেত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল হয়। সেই কারণে বলিষ্ঠ সাংগঠনিক কাঠামো সমন্বয়ের কার্যকে সহজ করে।

(৬) কার্যকরী জ্ঞাতকরণ বা যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ

প্রত্যক্ষ ও দ্রুত জ্ঞাতকরণ (Communication) বা যোগাযোগ ব্যবস্থার কার্যকর প্রয়োগই সুষ্ঠু সমন্বয়ের একটি প্রধান উপায়। ভবিষ্যৎ কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য ও পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ ও শাখার উচ্চস্তরের, মধ্যবর্তী স্তরের ও নিম্নস্তরের কর্মীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন ব্যবস্থা থাকা দরকার। জ্ঞাতকরণের ফলে প্রত্যেক কর্মী তার নিজের কার্যের পরিধি এবং ধরন জানতে পারেন। জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থার দ্রুত ও কার্যকর প্রয়োগ সমন্বয় সাধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

(৭) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ঃ

প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান উত্তম সমন্বয় সাধনে সাহায্য করে। তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে কর্মীদের কাছে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ, ব্যাখ্যা, ভুল-ত্রুটি সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান সম্ভব হয়। ফলে সমন্বয় কার্য সার্থক হয়।

(৮) সুসংহত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঃ

কারবারি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুসংহত হলে সমন্বয়ের প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে অপরিহার্য বিষয়গুলিকে নিয়ে সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত করা প্রয়োজন। বিভিন্ন বাজেট তৈরি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। বিক্রয় বাজেট, ক্রয় বাজেট, উৎপাদন বাজেট প্রভৃতি বাজেট তৈরির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুসংহত করা যায়।

(৯) সমন্বয় বিভাগ ঃ

কোনও কোনও প্রতিষ্ঠানে সমন্বয় কার্য সফল করার জন্য 'সমন্বয় বিভাগ' স্থাপন করা হয়ে থাকে। এই বিভাগের কর্মীগণ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সেতুবন্ধনের কার্য করে। এই বিভাগ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করে, বিভিন্ন বিভাগের কার্যের পারস্পরিক সমঝোতা সৃষ্টি করে, সমন্বয় ব্যবস্থা দুর্বল হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সে বিষয়ে অবহিত করে এবং সমন্বয় সাধনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশদান করে সমন্বয় কার্যকে বাস্তবায়িত করে।

(১০) রৈখিক ও কর্মী সংগঠন ঃ

সমন্বয়ের একটি উল্লেখযোগ্য কৌশল রৈখিক ও কর্মী সংগঠন (Line and Staff Organisation)। এইরূপ সংগঠনের মাধ্যমে দ্রুত ও কার্যকরী সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং তার সফল রূপায়ণ সম্ভব হয়। বিশেষীকরণ (Specialisation), দক্ষতাবৃদ্ধিও বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থাপকগণের পরামর্শমূলক নির্দেশ লাভের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের কার্যের সমন্বয় সাধন অধিক ফলপ্রসূ হয়।

(১১) কার্যকর নেতৃত্ব ঃ

কর্মচারীগণের উপর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে তাদের স্বেচ্ছায় কার্য করার মানসিকতা সৃষ্টি করাই হল নেতৃত্বদান। সার্থক সমন্বয়ের জন্য কার্যকরী নেতৃত্ব প্রয়োজন। একজন দক্ষ নেতা অধীনস্থ কর্মচারীদের আস্থাভাজন হয়ে ব্যক্তিগত দক্ষতায় তাদের মতপার্থক্য দূর করে থাকেন। উপযুক্ত নেতৃত্বদানের দ্বারা ব্যবস্থাপনার বিভিন্নস্তরে পরিকল্পনা রূপায়ণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমন্বয় কার্য নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

(১২) স্বচ্ছ/মূলক সহযোগিতা ঃ

প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করলে সমন্বয় সাধন খুবই সহজসাধ্য হয়। ব্যবস্থাপনার উচিত পারস্পরিক সাহায্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করে এক আদর্শ কর্ম পরিবেশ গড়ে সমন্বয়ের কার্য সার্থক করা।

(১৩) মানবিক সম্পর্ক ঃ

অভীষ্ট ফল অর্জন করতে হলে কারবারি প্রতিষ্ঠানে মানবিক সম্পর্কের (Human Relation) উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান প্রয়োজন। কর্মীদের কার্যে উৎসাহ ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হলে এমন ব্যবস্থাগ্রহণ দরকার যাতে তারা কারবারের কার্যকলাপকে নিজস্ব কার্য বলে মনে করতে পারেন এবং তারা একই গোষ্ঠীভুক্ত বলে গর্ববোধ করে প্রয়োজনীয় দলগত প্রচেষ্টা চালাতে পারেন। মানবিক সম্পর্কের উন্নতি ও গুরুত্ব আরোপ সমন্বয়ের পথ সুগম করে।

সমন্বয়ের নীতি অনুসরণ করে উপরে উল্লেখিত কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে সমন্বয় কার্যকর করা সম্ভব। সমন্বয়ের সফলতা ব্যবস্থাপনাকে সার্থক করে তোলে এবং প্রতিষ্ঠান তার অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে।

৫.৪ ব্যবস্থাপনায় জ্ঞাতকরণ

কারবারি প্রতিষ্ঠানের সমস্ত বিভাগ, উপ-বিভাগ, বিভিন্ন কর্মীগোষ্ঠী কার্যগতভাবে আন্তঃসম্পর্কিত (Interrelated)। এই সম্পর্কের সার্থকতা, স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজন হল, প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক তথ্যের 'কার্যকর প্রবাহ' (Effective flow of information)। বিভিন্ন তথ্য, সংবাদ, ধারণা, ভাবধারা, আদেশ-উপদেশ, চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতির বিনিময় সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপকেই জ্ঞাতকরণ বা যোগাযোগ বলা হয়। ব্যবস্থাপনার কার্য হল কর্মীদের দিয়ে কারবারি কার্যকলাপ সুষ্ঠু সম্পাদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যপূরণ করা। ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কার্যাবলির মূল ভিত্তিই হল বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ ও কর্মীদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক। সেই কারণে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন হয় দক্ষ ও কার্যকরী জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা। ইহা সংগঠন সেতুবন্ধনের কার্য করে এবং ব্যবস্থাপনাকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

জ্ঞাতকরণ হল একজন ব্যক্তির কাছ থেকে অপর একজন ব্যক্তির কাছে মানবিক চিন্তার সঞ্চালন (Transmission of human thought)। জ্ঞাতকরণের জন্য তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে তাই দ্বিমুখী প্রভাব প্রয়োজন। দ্বিমুখী প্রভাবের একদিকে থাকেন প্রেরক (Communicator) এবং অন্যদিকে থাকেন তথ্য প্রাপক (Recipient)। প্রেরক যে তথ্য প্রেরণ করেন প্রাপক সেই তথ্য সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন অথবা নাও করতে পারেন। প্রাপক যদি প্রেরিত তথ্যের অর্থ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন এবং যথোপযুক্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তাহলে তাকে উত্তম জ্ঞাতকরণ বলা হবে। অপরপক্ষে প্রাপক তথ্যের অর্থ উপলব্ধি করতে পারলেও তিনি উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারেন অথবা নাও পারেন। তাই যে ক্ষেত্রে প্রেরিত তথ্যের বিষয়বস্তু প্রাপকের কাছে অবোধ্য থেকে যায় বা যেক্ষেত্রে প্রাপক প্রেরিত তথ্যের ভুল ব্যাখ্যা করেন সেক্ষেত্রে জ্ঞাতকরণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। তাই ব্যবস্থাপনায়, জ্ঞাতকরণের ক্ষেত্রে তথ্যের বর্ণন, শ্রবণ ও উপলব্ধির উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। নীচে চিত্রের সাহায্যে জ্ঞাতকরণ প্রক্রিয়াটি দেখানো হল।

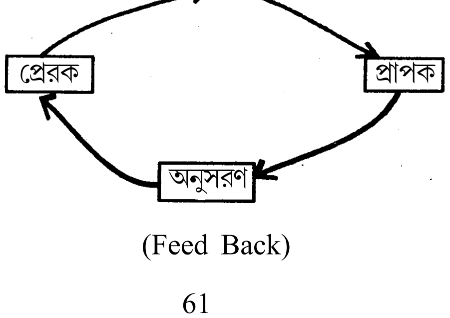

(Feed Back)

সংগঠনে উপযুক্ত জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ করা এবং সরবরাহকৃত তথ্যাদি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে আদর্শ জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমেই উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকগণ তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন। সেই কারণে ব্যবস্থাপনার প্রথম ও প্রধান কার্য হল একটি কার্যকর জ্ঞাতকরণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও সেটি বজায় রাখা।

৫.৪.১ জ্ঞাতকরণের সংজ্ঞা

বিভিন্ন ব্যবস্থাপনাবিদ্ জ্ঞাতকরণের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

অধ্যাপক এল. এ. অ্যালেন(Prof. L.A. Allen)-এর দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী "যখন কোনও ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির মনে কিছু ভাবধারা জাগ্রত করার অভিপ্রায়ে যা কিছু করেন, তার সম্মিলিত রূপ হল জ্ঞাতকরণ। ইহা অভিপ্রায় প্রকাশের সেতু। সুব্যবস্থিত ও ধারাবাহিক বর্ণন, শ্রবণ এবং উপলব্ধিকরণ এর অন্তর্ভুক্ত।"

কুনজ এবং ওডোলেন (Koontz and O'Donnell)-এর মতে "জ্ঞাতকরণ বলতে বোঝায়, সেই উপায় যার মাধ্যমে কার্য সংগঠিত করা হয়, ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা যায় এবং তথ্যকে উৎপাদনশীল করে সাংগঠনিক উদ্দেশ্য সফল করা যায়।"

নিউম্যান এবং সামার (Newman and Summer) এর মতে, "জ্ঞাতকরণ হল দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে ঘটনা, ভাবধারা, মতামত এবং আবেগের বিনিময়।"

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞাতকরণের সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায়, "নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে তথ্য, ঘটনা, ধারণা, চিন্তা-ভাবনা বা মতবাদ বিনিময়ের জন্য বর্ণন, শ্রবণ এবং উপলব্ধিকরণ জনিত কার্যকলাপের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াই হল জ্ঞাতকরণ।"

৫.৪.২ ব্যবস্থাপনায় জ্ঞাতকরণের গুরুত্ব

ব্যবস্থাপনায় জ্ঞাতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা হিসাবে পরিগণিত হয়। বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক ও জটিল ব্যবস্থাপনার যুগে জ্ঞাতকরণের গুরুত্ব ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। জ্ঞাতকরণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কে. ডেভিস (K. Davis) বলেছেন "মানবদেহে রক্তধমনী যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জ্ঞাতকরণ ঠিক ততখানিই গুরুত্বপূর্ণ।" জ্ঞাতকরণ সংগঠনকে গতিশীল করে তোলে এবং কার্য সম্পাদনে অনুপ্রাণিত করে। প্রত্যেক বিভাগ, উপ-বিভাগ এবং প্রত্যেক স্তরের কর্মীদের কাছে কার্যকরী ও সঠিক তথ্য পরিবেশনের উপর ব্যবস্থাপনার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা উন্নত হলে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সহজসাধ্য হয়। সেই কারণে জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থাপনার এক গুরুত্বপূর্ণ কার্যরূপে বিবেচিত হয়। ব্যবস্থাপনায় জ্ঞাতকরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যায়।

(১) পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণের ভিত্তি ঃ

পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপাদান হল তথ্যের প্রবাহ। তাই জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা ছাড়া উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপনার পক্ষে কোনও বিষয়ে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ সম্ভব নয়। যে কোনও সিদ্ধান্তগ্রহণের আগে তথ্য সংগ্রহ অত্যন্ত জরুরি। আবার গৃহীত সিদ্ধান্তের কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রেও উত্তম জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। কোনও বিষয়ে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এবং সম্পাদিত কার্যের পর্যালোচনার জন্যও জ্ঞাতকরণের গুরুত্ব অসীম।

(২) পরিকল্পনা রূপায়ণে সহায়তা ঃ

ভবিষ্যতে সম্পাদনযোগ্য কার্যাবলির রূপরেখাই হল পরিকল্পনা। পরিকল্পনার মাধ্যমে নীতি, পদ্ধতি, নিয়ম-কানুন, কার্যসূচি প্রভৃতি স্থিরীকৃত হয় এবং উদ্দেশ্যপূরণের লক্ষ্যে অনুসৃত হয়। ব্যবস্থাপনার কার্য হল পরিকল্পনা বিষয়বস্তুগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়া। জ্ঞাতকরণ সেই কার্য সম্পাদন করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

(৩) সমন্বয়ের ভিত্তি ঃ

কারবারি প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষায়ণ ও শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের জন্য বিভিন্ন কার্যাবলির সুষ্ঠু সম্পাদন প্রয়োজন। সেই জন্য বিভিন্ন কার্যের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যিক। সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ ও কর্মীদের সম্পাদিত কার্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হয়। এই পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারাই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হয়। যথাযথ জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা ছাড়া সমন্বয় সাধন সম্ভব নয়। সুতরাং সমন্বয় প্রক্রিয়ার ভিত্তিই হল জ্ঞাতকরণ।

(৪) ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি ঃ

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলির সুসংবদ্ধ ও দ্রুত রূপায়ণের জন্য জ্ঞাতকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। জ্ঞাতকরণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা অধস্তন কর্মীদের বিভিন্ন তথ্য পাঠায় ও নির্দেশদান করে, দায়িত্বের বিভাজন ও কর্মীদের কার্যসম্পাদন তদারকি করে। এর ফলে কর্মীগণ তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়। জ্ঞাতকরণ, ব্যবস্থাপনার আদেশ-নির্দেশ অধস্তন কর্মীদের নিকট যথাযথভাবে পরিবেশনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

(৫) সুষ্ঠু সাংগঠনিক কার্যকলাপ নিশ্চিতকরণ ঃ

কারবারি প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু কার্যসম্পাদন ও নিরবচ্ছিন্ন গতিধারা বজায় রাখতে জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা সাহায্য করে। সংগঠনের সমস্ত ধরনের ক্রিয়াকলাপ জ্ঞাতকরণের উপর নির্ভরশীল। নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত কর্মীদের কী করতে হবে সে সম্পর্কে যদি স্পষ্ট ধারণা থাকে তবেই সংগঠনের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। জ্ঞাতকরণের সাহায্যে এই স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়। তাই উপযুক্ত জ্ঞাতকরণের মাধ্যমে তথ্যের সঠিক প্রবাহ, ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ দূর করে সুষ্ঠু সাংগঠনিক কার্যসম্পাদন নিশ্চিত করে।

(৬) কার্যকর নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা ঃ

জ্ঞাতকরণ নেতৃত্বদানের ভিত্তি স্বরূপ। অধীনস্থ কর্মীদের সঙ্গে উপযুক্ত যোগাযোগ থাকলে তবেই নেতৃত্ব সফল হয়। নেতা যে নির্দেশ দান করেন অধীনস্থ কর্মীরা সেই নির্দেশ পালন করেন। উচ্চতর ব্যবস্থাপনার ইচ্ছা, অনিচ্ছা, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট অধস্তন কর্মীদের জ্ঞাতকরণের উপরই নেতৃত্বদানের সাফল্য নির্ভর করে। জ্ঞাতকরণের দ্বারা কর্মীগণ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সবকিছু জানতে পারেন। উত্তম জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা ব্যবস্থাপক ও অধস্তন কর্মীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে কার্যকর নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করে।

(৭) অনুপ্রেণায় সহায়তা ঃ

আদর্শ জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনাকে অধস্তন কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে থাকে। সাংগঠনিক সংঘাতের মূল কারণগুলি হল, ঘটনা সম্পর্কে কর্মীদের অজ্ঞাত, ব্যবস্থাপকদের অভিপ্রায় সম্পর্কে তাদের অস্পষ্ট ধারণা এবং পরস্পর ভুল বোঝাবুঝি। জ্ঞাতকরণের মাধ্যমে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে, কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং কার্যসম্পাদনে অনুপ্রাণিত হয়।

(৮) জন-সম্পর্কের উন্নয়নে সাহায্যদান ঃ

কারবার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর (যেমন, বিনিয়োগকারী, ক্রেতা কর্মচারী, পাওনাদার, সরকার ইত্যাদি) প্রতি কারবারের দায়বদ্ধতা থাকে। এই সমস্ত গোষ্ঠীর সঙ্গে কারবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত। এই সম্পর্ক বজায় রাখতে ব্যবস্থাপনাকে জ্ঞাতকরণের সাহায্য নিতে হয়। জ্ঞাতকরণের দ্বারাই জন-সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। ফলে সমাজে প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।

৫.৪.৩ জ্ঞাতকরণ এবং অনুপ্রাণিতকরণ

অনুপ্রাণিতকরণ বলতে বোঝায় সেই প্রক্রিয়া যা কাঙিক্ষত উদ্দেশ্যপূরণের জন্য, কর্মরত ব্যক্তিদের বিভিন্ন মানবিক প্রয়োজন পূরণ করে এবং তাদের কার্য সম্পাদনে উৎসাহী ও উদ্যোগী করে তোলে।

ব্যবস্থাপনার সার্বিক সফলতা অনুপ্রাণিতকরণের উপর নির্ভরশীল। উন্নত জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা ব্যতীত অনুপ্রাণিতকরণ বর্তমান যুগে সম্ভব নয়। ব্যবস্থাপনায়, অনুপ্রেরণার জন্য ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যিক। কারণ এই সম্পর্কই প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা সুনিশ্চিত করে। জ্ঞাতকরণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কিংবা সংশ্লিষ্ট বিভাগের পারস্পরিক বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ব্যবস্থাপকদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, আদেশ-নির্দেশ কর্মীদের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য ব্যবস্থাপকগণ জ্ঞাতকরণের সাহায্য নিয়ে থাকেন। অপরপক্ষে জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমেই কর্মীগণ তাদের চিন্তা-ভাবনা, অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙক্ষা উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকদের জানিয়ে থাকেন। সাংগঠনিক সংঘাতের প্রধান কারণ হল সাধারণ কর্মীদের ব্যবস্থাপনার অভিপ্রায় সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ভুল বোঝাবুঝি। উপযুক্ত ও সময় উপযোগী জ্ঞাতকরণের মাধ্যমে কর্মীগণ সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য জানার ফলে সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে সমস্ত ধরনের সংঘর্ষ দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা দূর হয় ও কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। তাই উন্নত জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটায় এবং তাদের কার্যসম্পাদনে অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং বলা যায় অনুপ্রাণিতকরণ জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল।

৫.৫ সারাংশ

এই এককটি পড়ে আমরা জানলাম ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ কার্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমন্বয় ও জ্ঞাতকরণ। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নস্তরে সিদ্ধান্তগ্রহণ, সমন্বয় ও জ্ঞাতকরণ প্রক্রিয়া যুগপৎ চলতে থাকে। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এই গৃহীত সিদ্ধান্তের কথা জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে পৌঁছে দিতে হয়। অধিকাংশ সময়ই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে তাঁর সিদ্ধান্তের দায়ভার গ্রহণ করতে হয়। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদক্ষেপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ভুল হলে তার ঋণাত্মক প্রভাব সমস্ত ব্যবস্থাপনাকে প্রভাবিত করে। ব্যবস্থাপনায় স্থির লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে এমন সংহতি স্থাপন করা হয় যাতে সমষ্টিগত প্রচেষ্টা সঠিক পথে ও সঠিক সময়ে সম্পন্ন করে একটি পরিপূর্ণ আকার ধারণ করতে পারে। সম-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন কর্মী ও কর্মের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই সমন্বয়ের মূল উদ্দেশ্য। ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সমন্বয় যতটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনায় জ্ঞাতকরণের গুরুত্ব ঠিক ততটাই। জ্ঞাতকরণ হল কারবারের এক ব্যক্তির কাছ থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে অথবা এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে কারবারি ক্রিয়াকলাপ-সংক্রান্ত আদেশ, নির্দেশ, পরামর্শ, উপদেশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি আদান-প্রদানের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা উন্নত হলে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। কারণ উত্তম জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি করে, বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যে সেতুবন্ধন করে, সমন্বয়ের কার্য সফল করে এবং কর্মীদের অনুপ্রাণিত করে প্রতিষ্ঠানে কার্যের সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করে।

৫.৬ প্রশ্নাবলী

১. সিদ্ধান্ত গ্রহণ কী? ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

[উত্তর সংকেত : সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব]

২. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধাপগুলি বর্ণনা করুন। [উত্তর সংকেত : সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকারভেদ]

৩. বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করুন। [উত্তর সংকেত : সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকারভেদ]

৪. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন :

(ক) সিদ্ধান্ত গ্রহণ, (খ) কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, (গ) কার্যগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, (ঘ) দলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ

৫. পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন।

৬. 'ব্যবস্থাপনা হল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া'—আলোচনা করুন।

৭. সমন্বয় বলতে কী বোঝেন? 'সমন্বয় হল ব্যবস্থাপনার সারবস্তু'—আলোচনা করুন।

[উত্তর সংকেত : ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়ের অর্থ ও ভূমিকা]

৮. সমন্বয়ের কৌশলগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করুন। [উত্তর সংকেত : সমন্বয়ের কৌশলসমূহ]

৯. একটি উদাহরণ সহযোগে ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়ের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

[উত্তর সংকেত : সমন্বয়ের উদাহরণ]

১০. ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়কে কার্যকর করতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়?

[উত্তর সংকেত : সমন্বয়ের কৌশলসমূহ]

১১. সমন্বয়ের সংজ্ঞা দিন।

১২. সহযোগিতা কী?

১৩. সমন্বয়ের অর্থ ব্যাখ্যা করুন। [উত্তর সংকেত : ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়ের অর্থ]

১৪. সমন্বয়ের মূল উদ্দেশ্য কী? [উত্তর সংকেত : ভূমিকা ও সারাংশ]

১৫. জ্ঞাতকরণের সংজ্ঞা দিন।

১৬. ব্যবস্থাপনায় জ্ঞাতকরণের ভূমিকা বিবৃত করুন। [উত্তর সংকেত : জ্ঞাতকরণের গুরুত্ব]

১৭. "জ্ঞাতকরণ হল অনুপ্রাণিতকরণের ভিত্তি"—ব্যাখ্যা করুন। [উত্তর সংকেত : জ্ঞাতকরণ ও অনুপ্রাণিতকরণ]

১৮. জ্ঞাতকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের উল্লেখ করুন। [উত্তর সংকেত : প্রস্তাবনা]

১৯. "ব্যবস্থাপনায়, জ্ঞাতকরণের ক্ষেত্রে উপলব্ধির উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন"— আলোচনা করুন।

[উত্তর সংকেত : প্রস্তাবনা]

৫.৭ গ্রন্থপঞ্জী

(১) ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা —

বিলাস কুমার বিশ্বাস (১৯৯৫)

(২) ব্যবস্থাপনার রীতি পদ্ধতি ও উদ্যোগ উন্নয়ন —

সূরজ কুমার দেবনাথ (১৯৯৮)

(৩) ব্যবস্থাপনার নীতি ও উদ্যোগ উন্নয়ন —

জয়দেব সরখেল, দেবাশিষ ব্যানার্জী ও মদনমোহন কর্মকার (২০০০)

(৪) ব্যবস্থাপনার রীতি-নীতি ও উদ্যোগ উন্নয়ন —

প্রণব কুমার চক্রবর্তী (১৯৯৯)

(৫) ব্যবস্থাপনার নীতি ও উদ্যোগ উন্নয়নের ভূমিকা —

পদ্মলোচন গঙ্গোপাধ্যায় (২০০০)

(৬) ব্যবস্থার নীতি ও উদ্যোগ উন্নয়ন —

ড. এম. জে. আহমেদ্ (২০০১)

(৭) ব্যবস্থাপনার নীতি ও উদ্যোগ উন্নয়নের রূপরেখা —

শ্যামলেশ মাইতি (১৯৯৯)

(৮) Principles of Business Management —

Sharlekar & Sharlekar (1985), Himalaya Pubs.

ই. সি. ও. -৬
বাণিজ্য বিষয়ের
ঐচ্ছিক পাঠক্রম

পর্যায়
৩৬

একক ১ ❑ বস্তুগত বা লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনা (Material or Logistics Management)

গঠন (Structure)

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ প্রস্তাবনা
১.৩ বস্তুগত ব্যবস্থাপনা অর্থ ও সংজ্ঞা
১.৪ বস্তুগত ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য
১.৫ বস্তগত ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য
১.৬ বস্তগত ব্যবস্থাপনার পরিধি ও কার্যাবলি
১.৭ মজুতের সংজ্ঞা
১.৮ মজুতকরণের কারণ
১.৯ মজুত ব্যবস্থাপনা
১.৯.১ সম্ভার অস্তিত্ব যাচাইকরণ
১.৯.২ সম্ভার অস্তিত্ব যাচাইকরণ পদ্ধতি
১.৯.৩ মজুত নিয়ন্ত্রণ সংজ্ঞা
১.৯.৪ মজুত নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য
১.৯.৫ মজুত নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব
১.৯.৬ মজুত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
১.১০ কাঁচামাল প্রয়োজনীয়তার পরিকল্পনা
১.১১ সারাংশ
১.১২ সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ প্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত
১.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পড়ার পর আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- বস্তুগত ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা

- বস্তুগত ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য
- মজুত ব্যবস্থাপনা
- সম্ভার অস্তিত্ব যাচাইকরণ
- মজুত নিয়ন্ত্রণ সংজ্ঞা
- মজুত নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, পদ্ধতি
- কাঁচামাল প্রয়োজনীয়তার পরিকল্পনা

১.২ প্রস্তাবনা

কারবারি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে কতিপয় উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে, আর এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের কাজে নিযুক্ত থাকে। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অনুসারে তাদের কাজের মধ্যে তারতম্য দেখা যায়। তবে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, বিশেষত কারবারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম উদ্দেশ্য হল লাভ বা আয় অর্জন ও এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি ঘটানো। একটি পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তার এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিভিন্ন ধরনের সম্পদ ব্যবহার করে। এই সম্পদগুলিকে '6M' দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং প্রতিটি 'M' উৎপাদনের এক-একটি উপাদানকে চিহ্নিত করে। এগুলি হল — কর্মী (Man), বস্তু (Material), যন্ত্র (Machine), পদ্ধতি (Method), অর্থ (Money) ও বাজার (Market)। পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে থাকে উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তু। কারণ এই বস্তুগুলিকেই উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পণ্যে পরিণত করা হয় এবং পরে বাজারে বিক্রির জন্য পাঠানো হয়। অর্থাৎ উৎপাদন প্রক্রিয়া হল কর্মী ও যন্ত্রের সাহায্যে কাঁচামাল তথা বিভিন্ন বস্তুকে বিশেষ পদ্ধতিতে পণ্যে পরিণত করা এবং সেগুলি বিক্রয়ের জন্য বাজারে পাঠানো। পণ্য বিক্রয় হলে আয় হয় এবং আয় থেকেই লাভের উদ্ভব হয়। বস্তুত, বস্তুই হল উৎপাদনের ভিত্তিস্বরূপ যাকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রেতাদের প্রয়োজন ও চাহিদা মেটানোর উপযোগী বস্তুর মধ্যে যেমন উৎপাদনের বিভিন্ন কাঁচামাল অন্তর্ভুক্ত থাকে। আধুনিক ব্যবস্থাপনায় সেজন্য বস্তুগত ব্যবস্থাপনা আলাদা গুরুত্ব পায়, যদিও ব্যবস্থাপনার এই ক্ষেত্রটি তুলনামূলক ভাবে নতুন — ষাটের দশকে একে ব্যবস্থাপনার আলাদা ক্ষেত্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

১.৩ বস্তুগত ব্যবস্থাপনা—অর্থ ও সংজ্ঞা (Materials Management—Meaning and Definition)

বস্তুগত ব্যবস্থাপনা কারবার ব্যবস্থাপনার একটি ক্ষেত্র। প্রতিষ্ঠানের সুষম উন্নয়ন ও দক্ষতার সাথে কারবার পরিচালনার জন্য বস্তুগত ব্যয়, বস্তুগত দ্রব্যের যোগান ও ব্যবহার এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার যাতে (১) উৎপাদনের সর্বাধিকরণ (Maximisation of production) সম্ভব হয়, (২) উৎপাদন ও বণ্টন সংক্রান্ত ব্যয় কমানো সম্ভব হয় এবং (৩) লাভের সর্বাধিকরণ ঘটে (Maximisation of profit)। বস্তুগত ব্যবস্থাপনা এসব উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কাজ করে। মূলধনের একটি বড় অংশ যাতে দীর্ঘ সময়ের জন্য অযথা আটকে না থাকে বস্তুগত ব্যবস্থাপনা সেদিকে যেমন লক্ষ্য রাখে, সাথে সাথে মূলধন-আবর্তন যাতে উন্নত হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখে। কারণ বস্তুগত

ব্যবস্থাপনা কারবার ব্যবস্থাপনার এমন এক **বিশেষ ক্ষেত্র যা বস্তুগত ব্যয়, বস্তুগত যোগান ও বস্তুগত ব্যবহারকে** নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কাজ করে যাতে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন সহজ হয়। বস্তুগত ব্যবস্থাপনা একদিকে যেমন উৎপাদন প্রক্রিয়াকে গতিশীল রাখার জন্য বস্তুগত উপাদানের যোগান সুনিশ্চিত করে, তেমনি তাদের গুণহগত মান, যাতে বজায় থাকে তার ব্যবস্থা করে, ব্যয় সঙ্কোচনের মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধির পথ পরিষ্কার করে এবং প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি যাতে উজ্জ্বল হয় তার ব্যবস্থা করে। বস্তুগত ব্যবস্থাপনার যেসব সংজ্ঞা বিশেষ ভাবে প্রচলিত, তাদের মধ্যে কয়েকটি সংজ্ঞা তুলে ধরা হল ঃ

A. K. Dutta বলেছেন : "বস্তুগত ব্যবস্থাপনা হল প্রতিষ্ঠানের বস্তুগত উপাদনের সংস্থান ও ব্যবহার সংক্রান্ত একটি প্রয়োজনীয় কাজ যা সংস্থান প্রক্রিয়া ও মানবিক শ্রম ও দক্ষতা থেকে পৃথক এবং যেগুলি একটু পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহৃত হয়।"

P. Gopalakrishnan এবং **M. Sunderesan** বস্তুগত ব্যবস্থাপনার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল ঃ "এমন ধরনের কাজ যা বস্তুগত উপাদানের পরিকল্পনা প্রণয়ন, উৎস নিরূপণ, ক্রয়, সরবরাহ, মজুতকরণ ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্ব কাম্য ভাবে পালন করে ও যার ফলে ক্রেতাদের ন্যূনতম ব্যয়ে পূর্ব-নির্ধারিত সেবা দেওয়া সম্ভব হয়।"

১.৪ বস্তুগত ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য (Importance and Significance of Materials Management)

কারবার ব্যবস্থাপনার আলাদা ক্ষেত্র হিসাবে বস্তুগত ব্যবস্থাপনার উদ্ভব খুব বেশিদিন আগে হয়নি। ১৯৬০-এর দশকে প্রথম এ ধরনের ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি হয়, কারণ বাজারে পণ্য বিক্রয় তীব্র প্রতিযোগিতায় সম্মুখীন হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের লাভ অর্জনের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য ব্যবস্থাপকরা বিক্রয়-বৃদ্ধির জন্য যেমন বিভিন্ন বিক্রয়-প্রসার কৌশলের ব্যবহার বাড়াতে শুরু করেন, তেমনি প্রতিষ্ঠানের বস্তুগত উপাদানগুলির সঠিক নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনার দ্বারা উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করারও প্রচেষ্টা শুরু করেন। এই প্রচেষ্টার কার্যকরী রূপ দেওয়ার জন্য বর্তমানে প্রায় সব কারবারী প্রতিষ্ঠানেই, বিশেষত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে বস্তুগত উপাদানগুলির সঠিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব স্বীকৃতি পায়। বস্তুত শিল্প-জগতের জটিলতা বাড়ার সাথে সাথে এর গুরুত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে। কারণ এটি কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠান বা শিল্পকেই প্রভাবিত করে না, সাথে সাথে জাতীয় অর্থনীতির উপরও প্রভাব বিস্তার করে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে দক্ষ ব্যবস্থাপনার সাহায্যে বস্তুগত উপাদানের উপর ব্যয় 5 শতাংশ হ্রাস করা সম্ভব। এমনকি দক্ষ ও সুচিন্তিত ব্যবস্থাপনা দ্বারা বস্তুগত ব্যয় 5 শতাংশেরও বেশি কমানো সম্ভব হয়েছে এ রকম দৃষ্টান্তও প্রচুর রয়েছে। ১৯৬০-এর দশকের শেষদিকে জাপান মাত্র 18 মাসে এই ব্যয় 3.15 শতাংশ কমাতে পেরেছিল বস্তুগত উপাদানের দক্ষ ব্যবস্থাপনার দ্বারা। জাপানের জাতীয় রেলপথ (The Japan National Railway) 4.9 শতাংশ ব্যয় হ্রাস লক্ষ্য অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল বস্তুগত ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের প্রথম সাত বছরের শেষে। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না যে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উদ্দেশ্যসাধনের ক্ষেত্রে বস্তুগত ব্যবস্থাপনা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বস্তুগত ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব যে সব কারণে স্বীকৃতি পায় সেগুলি হল—

(১) বস্তুগত ব্যবস্থাপনা — একটি সেবাকার্য (Materials Management– A Service Function) ঃ বস্তুগত ব্যবস্থাপনা একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রায় সব কাজের মধ্যেই বিস্তৃত থাকে। Gokarn-এর মতে

বস্তুগত ব্যবস্থাপনা একটি সাহায্যকারী কাজ (Staff function) যা বিশেষভাবে পণ্যের উৎপাদন ও বিপণনে সাহায্য করে। একটি সংস্থার ব্যবস্থাপকদের যে লক্ষ্য থাকে তার মধ্যে অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ও মুনাফা অন্যতম। বস্তুগত ব্যবস্থাপনা এই উভয় লক্ষ্য পূরণের জন্য বিভিন্নভাবে সাহায্য করে।

(২) বস্তুগত ব্যবস্থাপনা — সর্বত্র পরিব্যাপ্ত (Materials Management– All Pervasive) ঃ বস্তুগত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও বণ্টন বিভাগের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তার অর্থ এই নয় যে প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য বিভাগের সাথে এর কোনও যোগসূত্র নেই। উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল **'নক্শা বিভাগ**।' যদিও এই বিভাগ বস্তুগত উপাদানের দাম বা সরবরাহ সম্বন্ধে জানতে চায় না, তবুও উৎপাদনের নক্শা ক্রয় কর্মসূচী এবং দাম দ্বারা প্রভাবিত হয়। কারণ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও অন্যান্য বস্তু, উৎপাদন কর্মসূচী ও নক্শামাফিক না হলে উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়, আবার উৎপাদন কর্মসূচী বিপণন পরিকল্পনাকে অনুসরণ করে। সেজন্য বলা হয় বস্তুগত ব্যবস্থাপনা পণ্যের **নক্শা থেকে গুণগত মান, সংগ্রহ থেকে সরবরাহ, উৎপাদন থেকে বণ্টন সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত।**

(৩) বস্তুগত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হল উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা (MM's Target of Cost Reduction) ঃ বস্তুগত ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায় যখন এর দ্বারা পণ্যের উৎপাদনব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হয়। কারণ বস্তুগত ব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য হল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যেসব কাঁচামাল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, সেগুলি অধিক নিয়ন্ত্রণ ও দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা যাতে অহেতুক ব্যয়বৃদ্ধি না ঘটে। একটি উৎপাদনকারী সংস্থার মোট ব্যয়ের প্রায় 60 শতাংশ বস্তুগত উপাদানের জন্য ব্যয় করতে হয়। সুতরাং বস্তুগত উপাদানের উপর ব্যয় হ্রাস করতে পারলে সমপরিমাণ মুনাফা বৃদ্ধি ঘটে। তাই বস্তুগত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হল উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা।

(৪) বস্তুগত ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন কাজের মধ্যে সংহতি, সমন্বয় ও বুননের কাজ করে (MM Intergrates, Co-ordinates And Entwines) ঃ প্রতিষ্ঠানের সাফল্যকে সুনিশ্চিত করতে বস্তুগত ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কাজের মধ্যে সংহতি, সমন্বয় ও বুননের কাজ করে। প্রতিটি উৎপাদনকারী সংস্থাকে যেসব কাজ করতে হয় তাদের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বাজেট প্রণয়ন, সংগ্রহ ও ক্রয়, গ্রহণ, উৎপাদন কর্মসূচী প্রণয়ন, উৎপাদন, বস্তুগত সম্পদের ও পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, মান নির্ধারণ, মজুতকরণ, পরিবহন, বণ্টন প্রভৃতি। প্রতিষ্ঠান তার কাজ শুরু করে পরিকাঠামোর জন্য অর্থসংস্থানের দ্বারা ও কাজ শেষ করে পণ্যের চূড়ান্ত বণ্টন দ্বারা। বস্তুগত ব্যবস্থাপনার কাজ শুরু হয় উৎপাদন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে। এভাবেই বস্তুগত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১.৩ বস্তুগত ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Material Management)

বাস্তব জগতে উদ্দেশ্য ছাড়া কোনও প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় না। কারবার একটি বাস্তব প্রতিষ্ঠান। সুতরাং কারবার যেসব প্রচেষ্টা গ্রহণ করে তাদের লক্ষ্য হল কারবারের উদ্দেশ্য সাধন। বস্তুগত ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য আলাদা করে আলোচনা করার অবকাশ বিশেষ থাকে না। কারণ এই উদ্দেশ্যগুলি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কাজ করে এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যপূরণ যাতে সহজ হয় তার ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ বস্তুগত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি ভারসাম্য আনার চেষ্টা করে। বস্তুত এধরনের

ব্যবস্থাপনা একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যপূরণে সহায়তা করে তেমনি সাথে সাথে সামাজিক আকাঙ্ক্ষা মেটানোর দিকেও লক্ষ্য রাখে। অর্থাৎ একদিকে যেমন বস্তুগত ব্যবস্থাপনা ব্যয় হ্রাস ও মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে তেমনি ক্রেতাদের সন্তুষ্টির প্রতিও যত্নবান হয়, কারণ ক্রেতারাই প্রতিষ্ঠানের মেরুদণ্ড।

উদ্দেশ্যের প্রকৃতি ও আপেক্ষিক গুরুত্বের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উদ্দেশ্যের উপর গুরুত্ব দেয়। কোনও প্রতিষ্ঠান কোনও একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, আবার অন্য একটি প্রতিষ্ঠান অন্য একটি উদ্দেশ্যর উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পাটশিল্পে বা বাস্তবয়ন শিল্পে উৎপাদনের কাঁচামাল অর্থাৎ পাট বা তুলার দামের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ ধরনের শিল্পে ন্যূনতম দামে কাঁচামাল ক্রয়ের চেষ্টা করা হয়, তবে অবশ্যই কাঁচামালের গুণগত মান ও সেবা প্রদানের ক্ষমতার সাথে কোনওরূপ আপোস না করে। অপরদিকে যেসব প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল বাজারে দুষ্প্রাপ্য, তারা দামের উপর বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে সংগ্রহের দিকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। অর্থাৎ প্রথম প্রকারের প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল ন্যূনতম দামে কাঁচামাল ও অন্যান্য বস্তুর সংগ্রহ। অপরদিকে যেসব প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল সহজলভ্য নয় তাদের উদ্দেশ্য হল 'যে কোনও মূল্যেই কাঁচামালের সংগ্রহ।' A. K. Dutta এর সপক্ষে যে যুক্তি তুলে ধরেছেন তা হল ঃ "The material managers' basic job is balancing of objectives. The objectives varies in importance and in order to achieve one, he may have to sacrifice or relax the other."

বস্তুগত ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যকে প্রাথমিকভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—(১) নিজস্ব উদ্দেশ্য ও (২) প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য। নিজস্ব উদ্দেশ্য আবার দু'ভাগে বিভক্ত — ব্যয়-সঙ্কোচন ও সরবরাহে দক্ষতা অর্জন। একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে এই উদ্দেশ্যগুলি নিচে তুলে ধরা হল।

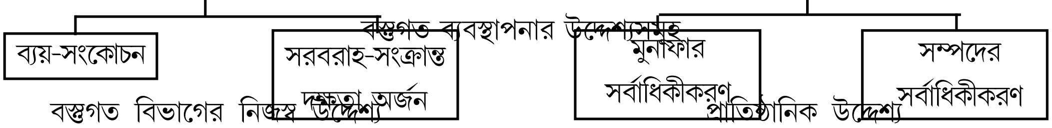

বস্তুগত ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণাত্মকভাবে তুলে ধরলে আর এক ধরনের রেখাচিত্র গড়ে ওঠে। এই রেখাচিত্রে বিভিন্ন প্রাথমিক ও গৌণ উদ্দেশ্যগুলি নির্দিষ্ট ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

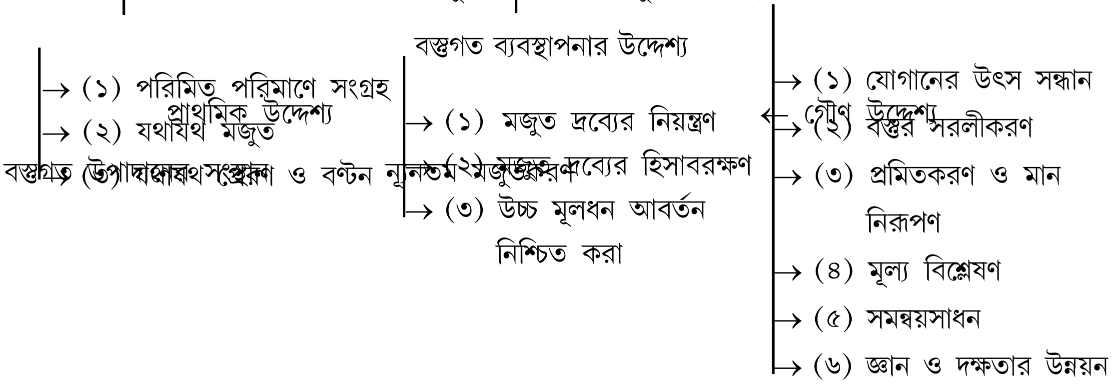

উপরের তালিকা থেকে বস্তুগত ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে ওঠে। এই উদ্দেশ্যগুলি থেকে দেখা যায় বস্তুগত ব্যবস্থাপনা একদিকে যেমন বস্তুগত বিভাগের উদ্দেশ্যসাধনে ব্রতী হয়, তেমনি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যেও কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে বস্তুগত ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যগুলি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যের মধ্যেই কাজ করে, এর বাইরে যেতে পারে না। বস্তুগত ব্যবস্থাপনার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিচে তুলে ধরা হল।

(১) ব্যয়-হ্রাস (Cost Reduction) ঃ ব্যয় হ্রাস বলতে এখানে পণ্যের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস বোঝায়। বস্তুগত ব্যবস্থাপনার এটি একটি প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য অর্থাৎ লাভ-অর্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, প্রতিষ্ঠান তার লাভের লক্ষ্যে সহজেই পৌঁছাতে পারে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে একটি পণ্য উৎপাদনে বস্তুগত উপাদানের জন্য মোট উৎপাদন-ব্যয়ের গড়ে ষাট থেকে সত্তর শতাংশ ব্যয় করতে হয়। সুতরাং এই বিপুল পরিমাণ ব্যয়কে দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব। আর এই ব্যয়-হ্রাস মুনাফা বৃদ্ধির সাথে সরাসরি যুক্ত।

(২) মুনাফার সর্বাধিকরণ (Maximisation of Profit) ঃ যদিও মুনাফার সর্বাধিকরণ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে তবুও এই উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে বস্তুগত ব্যবস্থাপনার ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। বিশ্ব-বাজার ধারণা (World Market Concept) প্রবর্তনের সাথে সাথে বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, বাজারের পরিবর্তনশীল চরিত্র অনেক বেশি প্রকট হয়েছে। এর ফলে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের কাছে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। অথচ পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমেই লাভ অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু এই লাভ বা মুনাফার সর্বাধিকরণ ঘটাতে হলে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় ন্যূনতম করার জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালানো দরকার। সেজন্য বর্তমানে পণ্যের উৎপাদন-ব্যয় কম করার দিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং আধুনিক কালের ব্যবস্থাপকরা মুনাফার সর্বাধিকরণের জন্য বর্তমানে বস্তুগত উপাদানের জন্য ব্যয় যতটা সম্ভব কম করার চেষ্টা করেন।

(৩) উৎপাদনের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা (To ensure continuity of production) ঃ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বস্তুগত ব্যবস্থাপনার যতখানি গুরুত্ব দেখা যায়, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ততখানি গুরুত্ব দেখা যায় না। তার কারণ উৎপাদন একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ার সাফল্যের উপরই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ অনেকাংশেই নির্ভর করে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাফল্য আবার নির্ভর করে বস্তুগত বিভাগের দক্ষতা তথা বস্তুগত ব্যবস্থাপনার উপর। সঠিক সময়ে সঠিক মানের উপাদান সঠিক পরিমাণে পাওয়া না গেলে উৎপাদন বন্ধ করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকে না। আর উৎপাদন বন্ধ হলে প্রতিষ্ঠানের প্রচুর পরিমাণে লোকসান হয়, ফলে প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যায়। সেজন্য বস্তুগত ব্যবস্থাপনার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হল সঠিক মানের বস্তুগত উপাদান সঠিক পরিমাণে ও সঠিক সময়ে উৎপাদন বিভাগকে সরবরাহ করা যাতে উৎপাদন প্রক্রিয়া কোনও ভাবেই ব্যাহত না হয়। সুতরাং উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের প্রবাহে ধারাবাহিকতা সুনিশ্চিত করাও বস্তুগত ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

(৪) প্রতিষ্ঠনের বিভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয়সাধন (To bring co-ordination among different

efforts) ঃ প্রতিষ্ঠান তার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা ও কার্যকলাপ গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠানের সাফল্য এই বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজগুলি বিচ্ছিন্নভাবে করা হলে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণ বিলম্বিত হয় ও প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায় না। অথচ প্রত্যাশিত ফল পেতে হলে বিভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় ঘটানো অর্থাৎ দলগত সংহতি আনা দরকার। কারণ প্রত্যেক প্রচেষ্টার মধ্যেই এক-ধরনের আন্তঃসম্পর্ক থাকে এবং বিভিন্ন প্রচেষ্টার সামগ্রিক সাফল্য থেকেই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য আসে। প্রতিষ্ঠানের আকার ও কাজের পরিধির উপর এই প্রচেষ্টাগুলি নির্ভর করে। তবে সব প্রতিষ্ঠানই আবশ্যিকভাবে কতকগুলি কাজ করে। এগুলি হল—অর্থ সংক্রান্ত, উৎপাদন সংক্রান্ত ও বিপণন সংক্রান্ত। এই কাজগুলির সফল রূপায়ণের উপরই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে, এবং এদের মধ্যে সার্বিক সমন্বয় ঘটাতে না পারলে এই সাফল্য পাওয়া সম্ভব হয় না।

বস্তুগত ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর লক্ষ্যে কাজ করে যাতে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় বস্তুগত উপাদানের প্রবাহ ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে, বিপণন বিভাগ পণ্যের যোগান যথাসময়ে পায় এবং বিভিন্ন বিভাগ তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ যথাসময়ে পায়, যাতে ব্যয় সংঙ্কোচ সম্ভব হয়। সুতরাং বস্তুগত ব্যবস্থাপনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্মের মধ্যে সমনযয় ঘটানো এবং প্রতিষ্ঠানে একটি সুসংহত বস্তুগত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

(৫) অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহ (Other objectives) ঃ বস্তুগত ব্যবস্থাপনার সার্বিক উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যকে সফল করা। আর এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যই বস্তুগত ব্যবস্থাপনা বিবিন্ন উদ্দেশ্যে তার কাজকর্ম পরিচালিত করে। এর বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে যেগুলি বিশেষ দাবির উল্লেখ রাখে সেগুলি হল—**প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বজায় রাখা, বৃদ্ধি ও উন্নয়ন ঘটানো, ক্রেতাদেরকে সর্বাধিক সেবা প্রদান, দুষ্প্রাপ্য বস্তুগত উপাদানের সংরক্ষণ ও বিকল্প দ্রব্যের ব্যবহার বাড়ানো, সমাজে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা, প্রতিষ্ঠানের নৈতিক মানদণ্ড ঠিক রাখা, মূলধন-আবর্তনকে যতটা সম্ভব বৃদ্ধি করা** ইত্যাদি। সংক্ষেপে বস্তুগত ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা।

১.৬ বস্তুগত ব্যবস্থাপনার পরিধি ও কার্যাবলি (Scope and Functions of material Management)

বস্তুগত ব্যবস্থাপনার পরিধি ও কার্যাবলি ব্যাপক এবং বস্তুগত বিভাগ ছাড়িয়ে প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য বিভাগেও এর উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। সরকারি সংস্থায় বস্তুগত ব্যবস্থাপনার পরিধি ও কার্যাবলি চিহ্নিত করতে গিয়ে একটি সরকারি সমীক্ষক হল (Study team on public sector undertakings) যেসব ক্ষেত্রের উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল—

(১) বস্তুগত উপাদানের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন;

(২) ক্রয় ও মজুত নিয়ন্ত্রণ ;

(৩) গ্রহণ, মজুতকরণ ও গুদামজাতকরণ ;

(৪) পরিবহন ও পরিচালন ;

(৫) উদ্বৃত্ত, বর্জিতাংশ ও উপজাত দ্রব্যের বন্দোবস্ত করা।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রথম সারির কারবারী সংস্থা—The General Electric Company বস্তুগত ব্যবস্থাপনার কার্যাবলির যে তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে উপরের তালিকাকেই খণ্ডিত করে আরও বিস্তৃত করা হয়েছে। এই তালিকা অনুযায়ী বস্তুগত ব্যবস্থাপনার কাজকে দশভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই কাজগুলি হল—

(১) বস্তুগত উপাদানের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন ;
(২) ক্রয় সংক্রান্ত কাজ;
(৩) মজুত নিয়ন্ত্রণ ;
(৪) গ্রহণ ও গুদামজাতকরণ;
(৫) মজুতকরণ;
(৬) মূল্য-বিশ্লেষণ ও প্রমিতকরণ;
(৭) উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ;
(৮) পরিবহন;
(৯) বস্তুগত সম্পদের পরিচালনা; ও
(১০) উদ্বৃত্ত ও বর্জিতাংশের বন্দোবস্ত করা।

বস্তুগত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে বিশেষ পরিচিত A. K. Dutta একটি ছোটো তালিকার মধ্যে বস্তুগত ব্যবস্থাপনার পরিধিকে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর কার্যকলাপকে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে এর পরিধি কতকগুলি নির্দিষ্ট কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ও এই কাজগুলি হল—

(১) বস্তুগত উপাদানের বাজেট তৈরি করা, পরিকল্পনা গ্রহণ করা ও সংগ্রহের ব্যবস্থা করা;
(২) কর্ম পরিকল্পনা (Scheduling), ক্রয় ও কর্মসূচী তৈরি করা;
(৩) বিভিন্ন দ্রব্য গ্রহণ ও পরিদর্শনের কাজ;
(৪) মজুত-নিয়ন্ত্রণ, মজুতকরণ ও গুদামজাতকরণ;

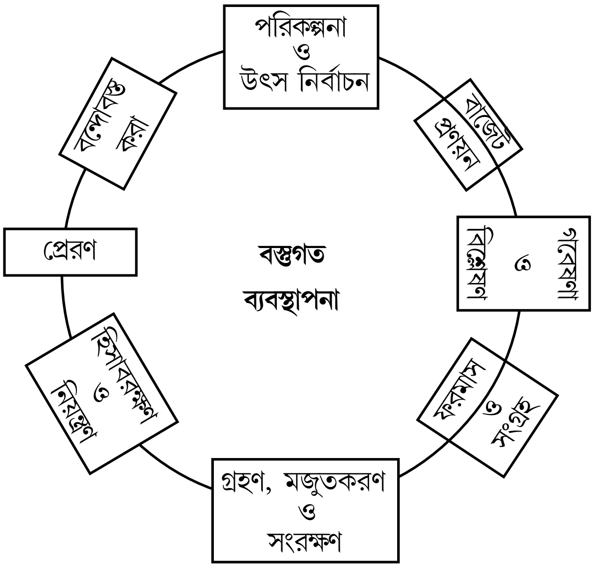

(৫) বস্তুগত সম্পদের পরিচালনা এবং চলাচল সংক্রান্ত, এবং

(৬) পাঠানো, জাহাজে তোলা এবং বন্দোবস্ত করা।

উপরের তালিকগুলিতে সন্নিবেশিত করলে বস্তুগত ব্যবস্থাপনার মৌলিক কাজগুলি সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যায় এবং একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে এই কাজগুলিকে তুলে ধরা যায় ঃ

নিচে বিভিন্ন কাজগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

(১) পরিকল্পনা ও উৎস নির্বাচন (Planning and Source Selection) ঃ যথাযথ পরিকল্পনা ছাড়া কোনও কাজ করলে প্রত্যাশা অনুযায়ী ফল পাওয়া যায় না। সেজন্য বস্তুগত ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক কাজ হল বস্তুগত উপাদানের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এই পরিকল্পনা বিক্রয়-পূর্বাভাস ও উৎপাদন পরিকল্পনার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। অর্থাৎ কোন্ ধরনের উপদান কী পরিমাণে, কিরূপ মানে ও কোন্ সময়ে সংগ্রহ করতে হবে বা পাঠাতে হবে তা ঠিক করা হয়। সাথে সাথে বস্তুগত উপাদান কোন্ কোন্ উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে তাও নির্বাচন করা হয়।

(২) বাজেট প্রণয়ন (Budgeting) ঃ প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী মূলধনের অধিকাংশই বস্তুগত উপাদানের জন্য ব্যয় করতে হয়। অর্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করতে ও অর্থের অপচয় রোধ করতে বাজেট তৈরি করা একটি সাধারণ নিয়ম। বাজেট হল একটি বিবরণী যা ভবিষ্যতের একটি সময়কালের জন্য বর্তমানে তৈরি করা হয় এবং এটি পরিমাণমূলক বা আর্থিক বা উভয়ই হতে পারে। বাজেট প্রকৃতপক্ষে একটি ভবিষ্যৎ কর্মসূচী। বস্তুগত ব্যবস্থাপনাও বস্তুগত সম্পদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করতে, অপচয় রোধ করতে ও প্রবাহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে একটি বাজেট তৈরি করে এবং ঐ বাজেট অনুসারে ভবিষ্যতে বিভিন্ন ধরনের কাজ হাতে নেয়।

(৩) গবেষণা ও বিশ্লেষণ (Research and Analysis) ঃ গবেষণা হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান। এরূপ অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বস্তুগত ব্যবস্থাপনা বস্তুগত উপাদান সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় সমীক্ষা করে বিভিন্ন নীতি বা কর্মসূচী প্রণয়ন করে যাতে বস্তু বিভাগের উদ্দেশ্যসাধন সহজ হয়।

(৪) ফরমাশ ও সংগ্রহ (Indenting & Procuring) ঃ এটি বস্তুত ক্রয়-সংক্রান্ত কাজ। এর অন্তর্ভুক্ত কাজগুলি হল ক্রয়ের শর্ত চূড়ান্ত করা, ক্রয়ের আদেশ ও ফরমাশ দেওয়া, যোগানদারদের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা, তাদের পাওনা মেটানোর ব্যবস্থা করা এবং সর্বোপরি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের যথাসময়ে ও যথাযথ পরিমাণে সংগ্রহের ব্যবস্থা করা।

(৫) গ্রহণ, মজুতকরণ ও সংরক্ষণ (Receiving, Storing and Preserving) ঃ সরবরাহকারী যেসব বস্তুগত উপাদান সরবরাহ করে সেগুলি গ্রহণ করা এবং যথাযথভাবে ও একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সেগুলি মজুত করার ব্যবস্থা করেত হয়। সাথে সাথে মজুত দ্রব্য যাতে কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং ভবিষ্যতে কোনওভাবে অপচয় না হয় তার জন্য যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করাও বস্তুগত ব্যবস্থাপনার কাজের অন্তর্ভুক্ত।

(৬) হিসাবরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ (Accounting and Control) ঃ বস্তুগত ব্যবস্থাপনা বস্তুগত সম্পদের উপর ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে কাজ করে। বিভিন্ন মজুত সম্পদের হিসাবরক্ষণ ও মূল্য নির্ধারণ করাও এর কাজের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও বিভিন্ন মজুত বস্তুর স্তর (Stock level) নির্ধারণ, মজুত সম্পদের পরীক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণমূলক

ব্যবস্থা গ্রহণ করাও এর কাজের মধ্যে পড়ে।

(৭) প্রেরণ (Issue) ঃ উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সচল রাখতে যেমন প্রয়োজনীয় বস্তুগত সম্পদের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা দরকার, তেমনি বিপণন কাজকে গতিশীল রাখতে সময়মতো যথাযথ পরিমাণে পণ্য পাঠানোর ব্যবস্থা করাও এর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

(৮) বন্দোবস্ত করা (Disposal) ঃ মজুদাগারে যে বিভিন্ন ধরনের মজুতদ্রব্য থাকে তাদের মধ্যে অনেকগুলিই অপ্রচলনজনিত বা অন্যান্য কারণে বাতিল বলে গণ্য হয়। আবার উৎপাদন প্রক্রিয়ার কোনও ত্রুটির জন্য যে-সব ছাঁট দ্রব্য বা উপজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয় সেগুলির বন্দোবস্ত করাও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এছাড়াও উৎপাদনকালে যেসব বর্জিত দ্রব্যের উদ্ভব হয় সেগুলির বন্দোবস্ত করাও এর কাজ। অন্যথায় মজুদাগারে এগুলি অযথা জমে থাকে এবং স্থান ও অর্থের অপচয় ঘটায়।

(৯) বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো (To Co-ordinate among the activities) ঃ বস্তুগত ব্যবস্থাপনার অপর একটি মৌলিক কাজ হল বস্তুগত বিভাগের বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো। কারণ বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় আনতে না পারলে কাম্য ফল পাওয়া যায় না ও উদ্দেশ্যসাধনও সম্ভব হয় না। একদিকে এর দ্বারা বস্তুগত বিভাগের বিভিন্ন কাজের মধ্যে যেমন সমন্বয় আনার ব্যবস্থা করা হয়, তেমনি প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য বিভাগের কাজকর্মের মধ্যে ও সমন্বয় ও সংহতি সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালানো হয়। এর দ্বারা বস্তুগত ব্যবস্থাপনার দুটি প্রধান লক্ষ্য উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস (Cost reduction) ও মুনাফার সর্বাধিকরণ (Maximisation of profit) সফল করা সহজ হয়।

১.৭ মজুত ব্যবস্থাপনা (Inventory management)

মজুত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার আগে মজুত সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক।

মজুতের সংজ্ঞা (Definition) ঃ আভিধানিক অর্থে মজুত বলতে বোঝায় পণ্যের সম্ভার (Stock of Goods)। এখানে পণ্য (Goods) বলতে শুধু সমাপ্ত দ্রব্য বোঝায় না, মজুত হল কাঁচামাল, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যসামগ্রী (Consumable Stores), যন্ত্রাংশ, প্রক্রিয়ারত দ্রব্য, সমাপ্ত এবং ছাঁটের সমাহার যা উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য মজুদাগারে মজুত রাখা হয়। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের অর্থ অলসভাবে আটকে থাকে এবং যার ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠান তাৎক্ষণিকভাবে সেসব মজুত থেকে কোনও আয় করতে পারে না। সুতরাং এদিক দিয়ে বিচার করলে মজুত হল সময় সাপেক্ষে আয় অনুপার্জনকারী পণ্যসম্ভার। **ফ্রেড হ্যানস্‌ম্যানের** (Fred Hansman) ভাষায় ঃ "An inventory is an idle resource of any kind, provided that such resource has economic value." অর্থাৎ "মজুত হল যে কোনও ধরনের অলস সম্পদ, যার অবশ্যই অর্থনৈতিক মূল্য থাকে।" অপরদিক **স্টার ও মিলার** (Starr & Miller) বলছেন ঃ "Inventory is the stocking of anything, whether tangible or not, to meet future demand." অর্থাৎ, "মজুত হল দৃশ্য বা অদৃশ্য যে কোনও সম্ভার যা ভবিষ্যতের চাহিদা মেটাতে সক্ষম।"

১.৮ মজুত কেন করা হয়? (Why is Invetory maintained?)

একথা সত্য যে মজুতের ফলে প্রতিষ্ঠানের অর্থ অলসভাবে আটকে থাকে। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, মজুত কেন করা হয়? মূলত চারটি প্রধান কারণে মজুত করা হয় ঃ

১। লেনদেনের উদ্দেশ্যে (Transaction Purpose) ঃ আমরা জানি আজকের মজুত আগামীদিনের প্রয়োজনে কাজে লাগে। যেদিন পণ্য মজুত করা হল, পণ্য সেদিনই কাজে লাগে না। পণ্য মজুতের দিন ও পণ্য কাজে লাগার দিনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান (Time Lag) থাকে। এই সময়কে লিড টাইম (Lead Time) বলে। আবার কাঁচামাল সংগ্রহ করার জন্য অর্ডার প্রদান এবং কাঁচামাল প্রাপ্তির মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকে। এই সময়ের ব্যবধানকেও **লিড টাইম** বলে। এই সময়ের পার্থক্য যত বেশি হবে মজুতের পরিমাণও তত বৃদ্ধি করতে হবে। সুতরাং লিড টাইমের মধ্যে পণ্যের লেনদেন বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দ্রব্যের মজুত গড়ে তোলা হয়।

২। দাম বৃদ্ধি বা হ্রাস (Increase or decrease in Price) ঃ মজুতের মধ্যে যে আকারে সম্ভার থাকে তাতে অর্থ বিনিয়োজিত অবস্থায় থাকে। যেমন কাঁচামাল ক্রয় করে সেটিকে মজুদাগারে রাখা হলে, অর্থ কাঁচামালে বিনিয়োজিত থাকে। এখন যে দামে কাঁচামাল সংগৃহীত হয়েছে, পরবর্তীকালে সেই কাঁচামালের দাম মুদ্রাস্ফীতির জন্য প্রায়শই বৃদ্ধি পায়। তাই কাঁচামাল যদি স্বল্প দামে ক্রয় করা হয়, সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে দাম বৃদ্ধিজনিত অসুবিধা এড়ানো সম্ভব হয়। তাই মজুত করা হলে দাম বৃদ্ধি বা হ্রাসজনিত সমস্যা দূর করা সম্ভব হয়।

৩। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অসমতা (Unevenness in production system) ঃ অনেক সংস্থা থাকে যেখানে উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট সময়ে বা প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত হয় না। অনেক প্রতিষ্ঠানের কার্যধারা ঋতু বৈচিত্র্যের (Season) উপর নির্ভর করে। এরূপ অবস্থায় কাঁচামাল ও অন্যান্য দ্রব্য মজুত রাখা আবশ্যই প্রয়োজন, অর্থ অলসভাবে পড়ে থাকুক বা নাই থাকুক তার উপর নির্ভর করে না।

৪। বাজারে পণ্যের চাহিদা (Demand in market) ঃ মজুতের একটি ধরন হল সমাপ্ত দ্রব্য। সমাপ্ত দ্রব্যের চাহিদার উপর মজুতের পরিমাণ নির্ভর করে। দ্রব্যটির চাহিদা যদি অবিরত থাকে, সেক্ষেত্রে মজুতের পরিমাণ সবসময়ই একটি নির্দিষ্ট স্তরে রাখতে হয়। আবার অসম চাহিদার ক্ষেত্রে মজুতের পরিমাণ সব সময় এক নাও থাকতে পারে। তবে উন্নত মানের মজুত নিয়ন্ত্রণ দাবি করে যে বাজারে পণ্যের যে ধরনের চাহিদাই দেখা যাক না কেন, দ্রব্যের মজুত সর্বদাই থাকা আবশ্যক। অন্যথায় প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

১.৯ মজুত ব্যবস্থাপনা (Inventory Management)

মজুত ব্যবস্থাপনা বলতে প্রতিষ্ঠানে যে সব ধরনের মজুত দ্রব্যসামগ্রী থাকে সেগুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করাকে বোঝায়। যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে যে সব বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি নিচে আলোচিত হল ঃ

১.১.১ সম্ভার অস্তিত্ব যাচাইকরণ (Stock Verification)

সংজ্ঞা ঃ অস্তিত্ব যাচাইকরণ শব্দের অর্থ হল প্রামাণ্য দলিলপত্রের সাহায্যে হিসাব বইয়ে লিখিত দ্রব্যগুলির প্রকৃত অস্তিত্ব আছে কিনা তা পরীক্ষা করা। কাঁচামাল প্রথমে মজুদাগারে পাঠানো হয় এবং পরে বিভিন্ন উৎপাদন বিভাগের প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলি উৎপাদন বিভাগে পাঠানো হয়। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে এই ঘটনা অনবরত ঘটে, ফলে অনেক বেশি সতর্কতার সাথে হিসাব রাখতে হয়। হিসাব রাখার ব্যাপারে যে সব দলিল ব্যবহৃত হয় সেগুলি নিচে সংক্ষেপে আলোচিত হল—

বিন কার্ড (Bin Card) ঃ উৎপাদন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাঁচামাল মজুদাগারে যথাস্থানে সুরক্ষিত

অবস্থায় রাখা হয়। বিন শব্দের অর্থ তাক (Shelf)। এইসব বিনে মালপত্র গচ্ছিত রাখা হয়। যেখানে কাঁচামাল থাকে সেখানে একটি করে কার্ড ঝোলানো থাকে যা বিন কার্ড হিসাবে পরিচিত। এই বিন কার্ডের মধ্যে যে সব তথ্য থাকে সেগুলি হল — কত পরিমাণ সম্ভার গ্রহণ করা হল, কত পরিমাণ বিলি করা হল এবং কত পরিমাণ সম্ভার অবশিষ্ট থাকল। এইসব তথ্যের মধ্যে কোনও দামের হিসাব থাকে না। শুধুমাত্র পরিমাণগত হিসাব লিপিবদ্ধ হয়।

সম্ভার খতিয়ান (Stores Ledger) ঃ সম্ভার খতিয়ান সম্ভার অস্তিত্ব যাচাইকরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দলিল। এই দলিলে বিভিন্ন প্রকার সম্ভারের প্রাপ্তি, বিলি এবং সেগুলির মূল্য সমেত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়। এই খতিয়ান বা দলিলে একদিকে যেমন প্রাপ্তি ও বিলিকরণের মূল্য জানা সম্ভব হয়, তেমনি অন্তিম সম্ভারের (Closing Stock) পরিমাণ ও মূল্য উভয়ই জানতে পারা যায়।

১.৯.২. সম্ভার অস্তিত্ব যাচাইকরণ পদ্ধতি (Methods of Stock Verifications)

সম্ভার অস্তিত্ব যাচাইকরণের ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, সেগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে দেওয়া হল ঃ

(১) নিরন্তর মজুতদ্রব্য গণনা পদ্ধতি ও

(২) সময়ান্তর মজুতদ্রব্য গণনা পদ্ধতি।

(১) নিরন্তর মজুতদ্রব্য গণনা পদ্ধতি (Perpetual Inventory System) ঃ

সংজ্ঞা ঃ এই গণনা পদ্ধতি হল মজুত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সাহায্যে মজুদাগারে মজুতদ্রব্যের পরিমাণ কতখানি আছে তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়। Chartered Institute of Management Accounts (London) প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে "অবিরাম মজুতদ্রব্য গণনা পদ্ধতি বলতে বোঝায় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত এমন এক লিপিবদ্ধকরণ পদ্ধতি যার সাহায্যে মজুতদ্রব্যের ভৌত চলাচল ও তাদের বর্তমান জের প্রকাশ পায়।" এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত নিরন্তর মজুতদ্রব্য গণনা পদ্ধতি সম্বন্ধে যে ধারণা পাওয়া যায় তা হল ঃ

(i) এই পদ্ধতির সাহায্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাঁচামাল ও অন্যান্য সামগ্রীর মজুতের পরিমাণ নথিপত্র অনুসারে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়;

(ii) মজুদাগারে সংরক্ষিত মজুতের বিভিন্ন দফাগুলির অনবরত অস্তিত্ব যাচাই-এর মাধ্যমে প্রকৃত মজুতের পরিমাণ স্থির করা যায় ; এবং

(iii) নথিপত্র অনুসারে মজুতের পরিমাণের সাথে বাস্তব অস্তিত্ব যাচাই অনুযায়ী মজুতের পরিমাণ মিলিয়ে দেখা যায়।

এই পদ্ধতি মূলত বিন কার্ড ও সম্ভার খতিয়ানকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে।

নিরন্তর মজুতদ্রব্য গণনা পদ্ধতির সুবিধা (Advantages of prepetual Inventory System) ঃ এই পদ্ধতির সুবিধাগুলি নিচে আলোচিত হল—

(ক) কাঁচামাল ও অন্যান্য দ্রব্যের প্রাপ্তি ও বিলি সংক্রান্ত যথাযথ নথিপত্র অত্যন্ত দ্রুততার সাথে লিপিবদ্ধ করা হয়।

(খ) মালপত্র বাস্তব অবস্থার সাথে দলিলে উল্লিখিত পরিমাণের নিরন্তর তুলনা করা সম্ভব হয়।

(গ) এই পদ্ধতির সাহায্যে বৎসরান্তে সঠিকভাবে সম্ভারের পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

(ঘ) এই পদ্ধতির সাহায্যে অন্তর্বর্তীকালীন হিসাব তৈরি করা সহজ হয়।

(ঙ) এই পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে অপ্রয়োজনীয়ভাবে কার্যকরী মূলধন আটকে থাকে না।

(চ) কাঁচামাল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি, অবহেলা ও ক্ষয়ক্ষতি দেখা দিলে এই পদ্ধতির সাহায্যে তা দূর করা সম্ভব হয়।

অসুবিধা (Disadvantages) ঃ নিরন্তর মজুতদ্রব্য গণনা পদ্ধতির অসুবিধাগুলি হল—

(ক) এই পদ্ধতিতে বিন কার্ড ও সম্ভার খতিয়ানের সাহায্য নেওয়া হয়। এই দলিলগুলিতে ভুল থাকলে এই পদ্ধতিতে ব্যাঘাত ঘটে।

(খ) সব ধরনের সম্ভারের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না — যেমন বালি, কয়লা ইত্যাদি।

(গ) এই পদ্ধতি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ।

(ঘ) এই পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুলও বটে।

(২) সময়ান্তর মজুতদ্রব্য গণনা পদ্ধতি (Periodic Inventory System) ঃ

এই পদ্ধতি অনুযায়ী মজুত দ্রব্যের অস্তিত্ব যাচাইকরণ নির্দিষ্ট সময়ান্তরে অর্থাৎ বছরের মাঝামাঝি বা বছরের শেষে প্রস্তুত করা হয়। অস্তিত্ব যাচাইকরণের ক্ষেত্রে মজুতের বাস্তব অবস্থা বিচার করার জন্য গণনা, ওজন, পরিমাপ ইত্যাদি করতে হয়।

সুবিধা (Advantages) ঃ

(ক) এই পদ্ধতি খুবই সরল।

(খ) যেহেতু অস্তিত্ব যাচাইকরণের কাজ উদ্বর্তপত্র প্রস্তুতের সময় করা হয়, সেজন্য অন্তিম সম্ভারের মূল্য নিরূপণ অত্যন্ত যত্নের সাথে করা হয়। এর ফলে ভুল হবার সম্ভাবনা কম থাকে।

(গ) এই কাজ করার জন্য বেশি সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন হয় না, ফলে ব্যয়বহুল নয়।

অসুবিধা (Disadvantages) ঃ

(ক) এই কাজ সম্পাদনের জন্য বেশি সময় লাগে।

(খ) বৎসরান্তে সাধারণত একবার মাত্র মজুতদ্রব্য গণনা ও মূল্যায়ন করা হয় বলে মজুতের পার্থক্য নির্ণয়ে দেরি হয় এবং সংশোধনের সময় কম পাওয়া যায়।

(গ) বছরের শেষে বার্ষিক নির্ণয়ে এই পদ্ধতি খুব সাহায্য করে না।

১.৯.৩ মজুত নিয়ন্ত্রণ (Inventory Control)

সংজ্ঞা (Definition) ঃ পরিকল্পনার সাথে সমপদের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ বলে। মজুদাগারে যে সব দ্রব্য থাকে তাদের নিয়ন্ত্রণকে মজুত নিয়ন্ত্রণ বলে। মজুদাগারে যে সব পণ্য মজুত থাকে তার জন্য প্রতিষ্ঠানকে বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়। প্রতিষ্ঠান একদিকে যেমন এই উপাদানগুলির জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে, সাথে সাথে প্রতিষ্ঠান আবার এই ব্যয় থেকে আয় অর্জনে অসমর্থ হয়। কারণ এই অর্থ মজুত ভাণ্ডারে অলসভাবে পড়ে থাকে। অন্য দিকে এই অর্থ মজুত উপাদানে ব্যয় না করে প্রতিষ্ঠান যদি ব্যাঙ্কে রাখত তাহলে ব্যাঙ্ক থেকে প্রতিষ্ঠান সুদ পেত। যেহেতু প্রতিষ্ঠান এই সুযোগ-সম্পর্কিত ব্যয় (Opportunity Cost) বহন করছে তার জন্য মজুত নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে মাৎস্, কুরি এবং ফ্রাঙ্কের .(Matz, Curry and Frank) মত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মতে ঃ "Inventory constitutes such a significant part of production cost and scince this cost is controllable, proper planning, purchasing, handling and accounting are of great importance." অর্থাৎ "মজুত দ্রব্য উৎপাদন ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং যেহেতু এই ব্যয় নিয়ন্ত্রণযোগ্য তাই সঠিক পরিকল্পনা, ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ এবং হিসাবরক্ষণ সবচেয়ে জরুরি।" মজুত নিয়ন্ত্রণের তিনটি লক্ষ্য আছে ঃ

(ক) মজুত নিয়ন্ত্রণ এমন হবে যাতে কোনও সময়ই মজুদাগারে মজুতের পরিমাণ কম না হয়;

(খ) মজুদাগারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপাদান মজুত করা না হয়; ও

(গ) কম পরিমাণ উপাদান ক্রয়ের জন্য অধিক পরিমাণ অর্থ বা পরিবহন ব্যয় প্রদান করা না হয়।

১.৯.৪. মজুত নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য (Objectives of inventory control) ঃ

মজুত নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য বহুমুখী। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলি নিচে আলোচনা করা হল—

(ক) অলস সময়ের হ্রাস (Reduction of idle time) ঃ মজুদাগারে সঠিক পরিমাণ মজুত না থাকলে উৎপাদন বন্ধ হবার আশঙ্কা থাকে। মালপত্রের অভাব দেখা দিলে উৎপাদন বন্ধ থাকে; ফলে প্রতিষ্ঠানকে অলসভাবে সময় কাটাতে হয়; অথচ প্রতিষ্ঠানকে কিছু স্থির ব্যয় বহন করতেই হয়। এইভাবে সময়ের অপচয় প্রতিষ্ঠানকে সামগ্রিক অসুবিধায় ফেলে, কারণ উৎপাদন-ব্যয় অহেতুক বৃদ্ধি পায়। এজন্য মজুত নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হল উৎপাদন ব্যবস্থা যাতে কোনওভাবেই বন্ধ না হয়ে যায় তার ব্যবস্থা করা।

(খ) উপযুক্ত পরিমাণ পণ্য সরবরাহ (Supplying proper quantity of goods) ঃ ক্রেতাসাধারণকে উপযুক্ত সময়ে সঠিক পরিমাণে পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা মজুত নিয়ন্ত্রণের সাফল্যের একটি চাবিকাঠি। মজুত নিয়ন্ত্রণ তখনই সফল হয় যখন উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত না হয় এবং ক্রেতার সময়মতো সঠিক পরিমাণে পণ্য সংগ্রহ করতে পারে।

(গ) উপযুক্ত মানের পণ্য সরবরাহ (Supplying good quality goods) ঃ ক্রেতাসাধারণ পণ্য ক্রয় করার সময় পণ্যের পরিমাণের প্রতি শুধু দৃষ্টি দেয় না, তারা পণ্যের গুণগত দিকগুলিও বিচার করে। উপযুক্ত মজুত নিয়ন্ত্রণের আরও একটি উদ্দেশ্য হল ক্রেতাসাধারণকে উপযুক্ত গুণ সমৃদ্ধ পণ্য সরবরাহ করা। অর্থাৎ মজুতকালে পণ্যের গুণমান যেন কোনওভাবেই বিঘ্নিত না হয় তা নিশ্চিত করা।

(ঘ) অপচয় হ্রাস করা (Reduction of waste) ঃ মজুদাগারে সংরক্ষিত মালপত্রের অপচয় রোধ করা বা অপচয়ের বিষয়গুলিকে ন্যূনতম সীমার মধ্যে আটকে রাখা উন্নত মজুত নিয়ন্ত্রণের অন্যতম লক্ষ্য।

(ঙ) মূলধন বিনিয়োগ হ্রাস করা (Reduction of capital investment) ঃ মজুত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস করা যায়। কারণ মজুত-নিয়ন্ত্রক উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান যাতে সঠিক সময়ে ও সঠিক দামে সরবরাহ করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেয়। এর ফলে প্রয়োজনমতো চলতি মূলধন বিনিয়োগ করা হয় ও মূলধনের ব্যবহার সর্বোত্তম করার চেষ্টা চালানো হয়।

(চ) মজুদাগারের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ হ্রাস করা (Reduction of storage cost) ঃ মজুদাগারের প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার উপাদান মজুত থাকে। এই উপাদানগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন ধরনের ব্যয় বহন করতে হয়। উপযুক্ত মজুত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই ব্যয় কমানো সম্ভব। সুতরাং প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত মাত্রায় মজুত নিযন্ত্রণ ঘটালে মজুতকালীন-ব্যয় কমানো সম্ভব হয়। এর ফলে উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় কম হয়, কারণ সমস্তরকম পরোক্ষ ব্যয়ও পণ্যের উৎপাদন-ব্যয়ে যুক্ত হয়।

১.৯.৫ মজুত নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব (Importance of Inventory Control)

মজুত নিয়ন্ত্রণের উপর উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার সাফল্য অনেকাংশ নির্ভর করে। সেজন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে মজুত নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব অসীম। মজুত নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব নিচের আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা যায় ঃ

(ক) উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রাখে (Maintaining running of production) ঃ মজুত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উৎপাদন বিভাগের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের সরবরাহ সুনিশ্চিত করে। এর ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হয় না এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল রাখা সম্ভব হয়।

(খ) কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যয় হ্রাস (Reduction in purchasing price) ঃ মজুত নিয়ন্ত্রণের আর একটি গুরুত্বপর্ণ কাজ হল সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণে বিভিন্ন উপাদান ক্রয়ের ব্যবস্থা করা। প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন ধরনের পণ্য ক্রয় করতে হয় এবং এই পণ্য ক্রয় বস্তুগত ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যে সব প্রতিষ্ঠান কম দামে সঠিক গুণসমৃদ্ধ কাঁচামাল ও অন্যান্য উপাদান ক্রয় করে সে সব প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনব্যয় স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পায়। এর ফলে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রতিষ্ঠান কম দামে তার পণ্য বিক্রয় করতে ও লাভ অর্জনে সমর্থ হয়। তাই উপযুক্ত মজুত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যয় হ্রাস পায়।

(গ) বস্তুগত উপাদানের ক্ষয়ক্ষতির হ্রাস পায় (Reduces loss of material) ঃ মজুত নিয়ন্ত্রণের ফলে বিভিন্ন উপাদান সঠিক পদ্ধতিতে মজুদাগারে রাখা হয় ও সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। ফলে মজুত উপাদানের ক্ষয়ক্ষতির অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব হয়।

(ঘ) বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত দ্রুত হয় (Expedities preparation of final accounts) ঃ মজুত নিয়ন্ত্রণের ফলে বৎসরান্তে অন্তিম সম্ভারের মূল্যায়ন খুব তাড়াতাড়ি করা সম্ভব হয়। অন্তিম সম্ভার বার্ষিক হিসাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মজুত নিয়ন্ত্রণের ফলে এই বিষয়গুলির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়তে হয় না। ফলে বার্ষিক হিসাব তাড়াতাড়ি প্রস্তুত করা সম্ভব হয়।

(ঙ) কাজের সময় সংক্ষিপ্ত করে (Reduces time of operation) ঃ মজুত নিয়ন্ত্রণের ফলে সময়মতো

কাঁচামাল ও অন্যান্য উপাদান যোগান দেওয়া সম্ভব হয়। ফলে উৎপাদন ব্যবস্থাপককে কাঁচামাল বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানের জন্য অযথা বসে থাকতে হয় না। সুতরাং কাঁচামালের অভাবজনিত কারণে যে সময় নষ্ট হয় তা থেকে প্রতিষ্ঠান অব্যাহতি পায় এবং এধরনের কাম্য অবস্থা সৃষ্টির পিছনে মজুত নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা অনেকখানি।

(চ) শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় (Increases efficiency of worker) ঃ মজুত নিয়ন্ত্রণের ফলে কাঁচামালের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি পায় ও উৎপাদন ব্যবস্থা সচল থাকে। ফলে শ্রমিকরা অলস ভাবে সময় অতিবাহিত করার সুযোগ পায় না। কাজের চাপ থাকার জন্য শ্রমিকরা কর্মব্যস্ত থাকে এবং স্বাভাবিক কারণেই তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(ছ) কর্মীদের দায়িত্ব বৃদ্ধি পায় (Increases Responsibility of employees) ঃ মজুত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থা সচল থাকে। সুতরাং মজুদাগার থেকে উৎপাদন প্রক্রিয়া পর্যন্ত যে সব কর্মী কাজে নিযুক্ত থাকে তাদের যেমন একদিকে দায়িত্বের সাথে কাজ করতে হয়, তেমনি তাদের কাজ অন্যান্য বিভাগের কাছে দৃষ্টান্তরূপে দেখা দেয়। এর ফলে সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের দায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।

(জ) বাজেট নির্মাণে সাহায্য করে (Helps in preparing budget) ঃ উৎপাদন সঠিকভাবে চালানোর ক্ষেত্রে উৎপাদন বাজেট একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। মজুত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একদিকে যেমন কাঁচামাল ও অন্যান্য উপাদান সম্পর্কিত বাজেট তৈরি করা সম্ভব হয়, তেমনি আবার উৎপাদন বাজেট তৈরিতেও এই নিয়ন্ত্রণ সাহায্য করে।

(ঝ) সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে (Helps in decision-making) ঃ মজুত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কাঁচামাল ও অন্যান্য উপাদান সম্পর্কিত বিষয়ে, যেমন— কত সময় ধরে উৎপাদন চলবে, উৎপাদনের উপাদানগুলি সংগ্রহের জন্য কত সময় লাগবে, কত পরিমাণ মাল ক্রয় করা হবেও তার ব্যয় কত ইত্যাদি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়। এর ফলে প্রতিষ্ঠান তার কাজকর্ম ধারাবাহিকভাবে চালাতে সক্ষম হয়।

১.৯.৬ কয়েকটি মজুত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Selective Inventory Control System)

মজুত নিয়ন্ত্রণের নির্বাচিত কয়েকটি পদ্ধতি নিচে আলোচত হল ঃ

(১) এ.বি.সি. বিশ্লেষণ (ABC Analysis) ঃ এ.বি.সি. বিশ্লেষণ নির্ধারিত মজুত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। মজুদাগারে রক্ষিত মালপত্রের মূল্যের ভিত্তিতে এগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এ. বি. এবং সি.-এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে যখন মালপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় তখন তাকে ABC বিশ্লেষণ বলে। এখানে এ(A) অর্থাৎ সব সময় (Always), বি(B) অর্থাৎ উন্নত (Better) এবং সি (C) অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ (Control)। এক কথায় সব সময় উন্নততর নিয়ন্ত্রণ (Always Better Control) পদ্ধতি হল ABC বিশ্লেষণ। এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে মূল্য ও গুরুত্ব অনুসারে বস্তুকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয। নিচে এগুলি দেখানো হল।

'এ' শ্রেণী → এই শ্রেণীর অন্তর্গত সেসব বস্তু পড়ে যেগুলির জন্য বাৎসরিক ব্যয় অত্যন্ত বেশি হয এবং যেগুলির ব্যবহারের পরিমাণ সমগ্র পরিমাণের অনুপাতে অনেক কম। 'এ' শ্রেণীভুক্ত বস্তুর ক্ষেত্রে সেজন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব ও নিয়ন্ত্রণ রাখা দরকার।

'বি' শ্রেণী → যে বস্তুগুলির বাৎসরিক ব্যয় 'এ' শ্রেণী অপেক্ষা কম এবং ব্যবহারের পরিমাণ সমগ্র পরিমাণের তুলনায় মধ্যম স্তরের সেই বস্তুগুলি 'বি' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীভুক্ত বস্তুর ক্ষেত্রে মধ্যম মানের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

'সি' শ্রেণী → সর্বাপেক্ষা কম মূল্যবান ও পরিমাণগত দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ বস্তুকে সি শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এইজাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে স্বল্প পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

এ.বি.সি. বিশ্লেষণ পদ্ধতি নিম্নলিখিত উপায়ে প্রকাশ করা যায়।

শ্রেণী (Categories)	বাৎসরিক মূল্যের শতকরা হার (Percentage of Annual value)	বাৎসরিক পরিমাণের শতকরা হার (Percentage of Annual usage)	নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি (Nature of Control
এ (A)	৭০%	১০%	সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ।
বি (B)	২০%	২০%	মধ্যম গুরুত্ব আরোপ।
সি (C)	১০%	৭০%	ন্যূনতম গুরুত্ব আরোপ।

উপরের তালিকাটি নিচের রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হল ঃ

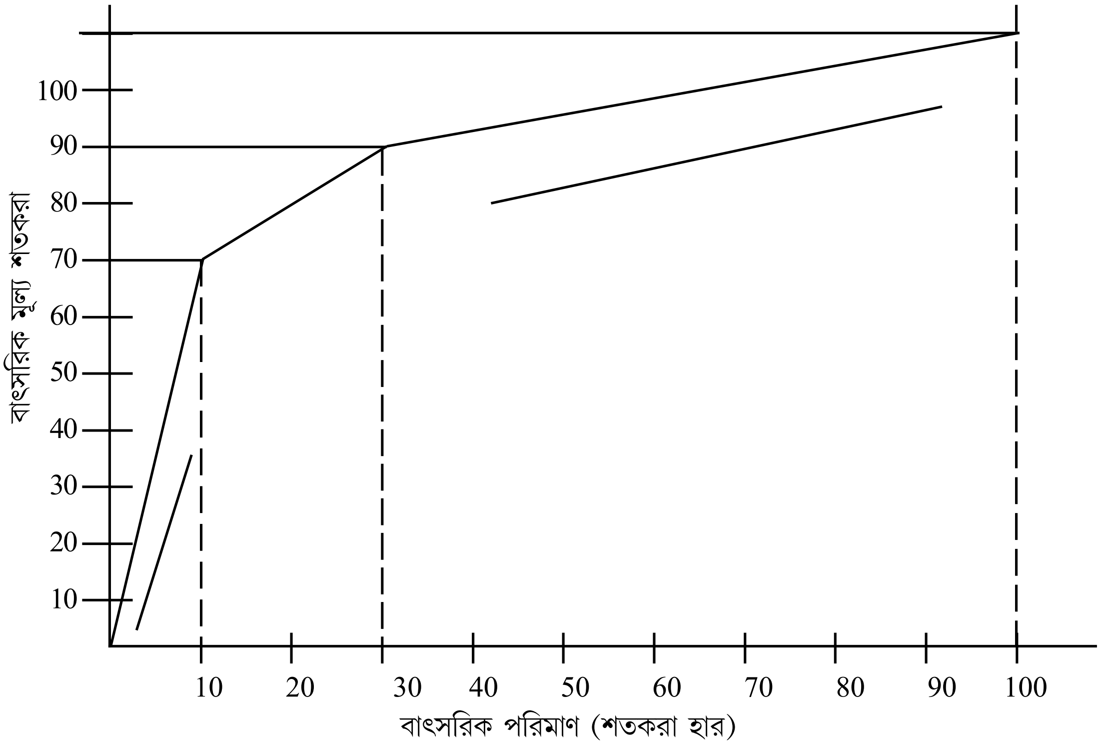

উপরের রেখাচিত্রে দেখা যায় যে A শ্রেণীর বস্তুর বাৎসরিক ব্যবহারের পরিমাণ 10 শতাংশ কিন্তু দামের বিচারে তা 70 শতাংশ। B শ্রেণীর বস্তুর ব্যবহার 20 শতাংশ এবং দামের বিচারেও 20 শতাংশ (90%–70%) এবং C শ্রেণীর বস্তুর বাৎসরিক ব্যবহারের পরিমাণ 70 শতাংশ অথচ তার মূল্য প্রকৃতপক্ষে 10 শতাংশ।

এ.বি.সি. বিশ্লেষণের সুবিধা (Advantages of ABC Analysis) ঃ এ. বি. সি. বিশ্লেণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি লক্ষ্য করা যায়—

১। নির্বাচিত নিয়ন্ত্রণ (Selective Control) ঃ এই পদ্ধতিতে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর উপর সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ, অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর জন মধ্যম মানের নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বাপেক্ষা কম মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর জন্য সর্বাপেক্ষা কম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়।

২। **বস্তুর সম্ভারের হিসাব রাখা সম্ভব হয় (Proper Stock of Material)** ঃ এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বস্তুর (Material) সম্ভারের (Stock) হিসাবে সঠিক ভাবে রাখা যায় এবং এর ফলে অধিক সম্ভার বা স্বল্প সম্ভারের (Over stocking and under stocking) সমস্যা দূর করা সম্ভব হয়।

৩। **বস্তুর জন্য স্বল্প বিনিয়োগ (Law Investment for Material)** ঃ এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে বস্তুর জন্য প্রয়োজন ভিত্তিক মূলধন বিনিয়োগ করা যায়। এর ফলে প্রতিষ্ঠানে মূলধন বিনিয়োগজনিত সমস্যা দূর করা সম্ভব হয়।

৪। **ন্যূনতম মজুত ব্যয় (Minimum Inventory Cost)** ঃ এই বিশ্লেষণ বস্তুর ক্রয়ের ক্ষেত্রে যে সব ব্যয় [যেমন অর্ডার দেওয়ার জন্য ব্যয় (ordering cost) এবং পরিবহন ব্যয় (carrying cost)] বহন করতে হয় সেগুলি যাতে ন্যূনতম হয় তার দিকে লক্ষ রাখে।

৫। **ক্ষতি হ্রাস (Minimisation of Loss)** ঃ এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে খুব দামি বস্তুর ক্ষেত্রে যেহেতু অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ রাখা হয় সেজন্য সেসব বস্তুর অপচয় কম হয়। ফলে সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পায়।

(২) ভি. ই. ডি. [ভেড্] বিশ্লেষণ (VED Analysis) ঃ ভেড্ বিশ্লেষণ নির্ধারিত মজুত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির এমন এক ব্যবস্থা যার সাহায্যে কোনও প্রতিষ্ঠানের বস্তুগুলিকে তাদের প্রকৃতি ও জটিলতার (nature or criticality) ভিত্তিতে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় এবং উপর থেকে নিচের ভিত্তিতে (Descending order) নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কোনও উৎপাদন সংস্থায় যন্ত্রাংশ (spare parts) নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই বিশ্লেষণ খুব কার্যকরী। এখানে ভি (V) অর্থাৎ খুবই গুরুত্বপূর্ণ (Vital), ই (E) অর্থাৎ প্রয়োজনীয় (Essential) এবং ডি (D) অর্থাৎ বাঞ্ছনীয় (Desirable), এই তিনটি শ্রেণীতে মজুত বস্তুগুলিকে বিভক্ত করা হয়। নিচে এগুলি আলোচনা করা হল ঃ

ভি (V) শ্রেণীভুক্ত — এর অর্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেসব বস্তুকে এই শ্রেণীভুক্ত করা হয় যাদের মূল্য অত্যন্ত বেশি এবং যার অভাবে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই শ্রেণীভুক্ত বস্তুর ক্ষেত্রে সম্ভার বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরি এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা উচিত।

ই (E) শ্রেণীভুক্ত — এর অর্থ প্রয়োজনীয়। এই শ্রেণীর মধ্যে সেসব বস্তু পড়ে যাদের মূল্য মোটামুটি বেশি কিন্তু V শ্রেণীর মতো নয় এবং এই শ্রেণীর বস্তু সঠিকভাবে উৎপাদনকে চালাতে সাহায্য করে। এই শ্রেণীভুক্ত বস্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রে অল্প সময়ের জন্য না থাকলেও চলে, তবে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে সচল রাখার ক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর অভাব দূর করা উচিত। এইজাতীয় বস্তু যাতে মজুদাগারে থাকে তার জন্য সবসময় সচেষ্ট থাকা দরকার।

ডি (D) শ্রেণীভুক্ত — এর অর্থ বাঞ্ছনীয়। এই শ্রেণীভুক্ত উপাদানগুলি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন তবে এগুলির অভাব হলেও কিছুদিন উৎপাদন বন্ধ হবে না। এইজাতীয় উপাদানের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখলেই চলে।

(৩) এস. ডি. ই. বিশ্লেষণ (SDE Analysis) ঃ SDE বিশ্লেষণও নির্ধারিত মজুত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অন্তর্গত। এই বিশ্লেষণ মূলত কাঁচামালের যোগানের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়। অর্থাৎ কোন্ কাঁচামাল সহজলক্ষ্য, কোন্ কাঁচামাল দুর্লভ ইত্যাদি বিষয়ের জন্য SDE বিশ্লেষণ করা হয়। কাঁচামালের লভ্যতার দিকে লক্ষ্য রেখে সেগুলিকে

তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় এবং এগুলি হল যথাক্রমে 'এস' (S) অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য বা দুর্লভ (Scarce), ডি (D) অর্থাৎ শক্ত (Difficult) ও ই (E) অর্থাৎ সহজ (Easy)।

এস **(S) শ্রেণীভুক্ত** — এই শ্রেণীতে সেসব কাঁচামালকে রাখা হয় যেগুলি সহজে পাওয়া যায় না অর্থাৎ দুর্লভ। সুতরাং এইজাতীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করার জন্য প্রতিষ্ঠানকে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় এবং গুদামজাত করতে হয়। এসব দ্রব্যের মজুতের ক্ষেত্রে কাঁচামালের দাম, পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখলে চলে না, কারণ উৎপাদনের সময় এইজাতীয় কাঁচামালের অভাবে দেখা দিলে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

ডি (D) শ্রেণীভুক্ত — এই শ্রেণীভুক্ত কাঁচামাল বলতে সেসব কাঁচামাল বোঝায় যেগুলি পাওয়া যায় তবে পাওয়া কঠিন। সুতরাং এই শ্রেণীর কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানকে যথেষ্ট তৎপর হতে হয়।

ই **(E) শ্রেণীভুক্ত** — এই শ্রেণীভুক্ত কাঁচামাল সহজেই পাওয়া যায়। সুতরাং এই শ্রেণীর কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়ের সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করলেই চলে, বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের আবশ্যকতা নেই।

(৪) এফ. এস. এন. বিশ্লেষণ (FSN Analysis) ঃ এই বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় মূলত অপ্রচলিত (Obsolete) কাঁচামাল বা যন্ত্রাংশ চিহ্নিত করার জন্য। প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন ধরনের উপাদান ক্রয় করতে হয় এবং সেসব উপদান কতখানি ব্যবহার হচ্ছে তা নির্ণয় করতে না পরলে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা দরকার যার সাহায্যে প্রতিষ্ঠান কাঁচামালের চলনভঙ্গি (Movement) অর্থাৎ কোনও কাঁচামাল কতখানি কাজে লাগছে, কোন্‌টি বেশি কাজে লাগছে, কোন্‌টি কম কাজে লাগছে ইত্যাদি নির্ণয় করা সম্ভব হয়। এজন্য নিম্নলিখিত তিন ভাবে এগুলির শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে।

এফ (F) শ্রেণীভুক্ত — এই শ্রেণীর উপাদানকে দ্রুতগতিসম্পন্ন (Fast moving) উপাদানরূপে গণ্য করা হয়।

এস (S) শ্রেণীভুক্ত — এই শ্রেণীর উপাদানকে ধীরগতিসম্পন্ন (Slow moving) উপাদানরূপে গণ্য করা হয়।

এন (N) শ্রেণীভুক্ত — এই শ্রেণীর উপাদানকে অচল (Non moving) উপাদানরূপে গণ্য করা হয়।

১.১০ কাঁচামাল প্রয়োজনীয়তার পরিকল্পনা [Material Requirement Planning (MRP)]

পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান কাজ। ভবিষ্যতে যে কাজ করতে হবে তার জন্য কতগুলি বিকল্প (Alternative) তৈরি করতে হয়। এই বিকল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বিকল্পকে নির্বাচন করা হল পরিকল্পনা। কাঁচামাল প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা বস্তুগত ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ। যেখানে অনবরত উৎপাদন প্রক্রিয়া চলে না সেখানে উৎপাদনের জন্য যে সম্ভার (Inventory) প্রয়োজন তা আগে থাকতে নির্ধারণ করতে হয়। এই নির্ধারণ প্রক্রিয়াই হল কাঁচামাল প্রয়োজনীয়তা পরিকল্পনা (MRP)। প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ উৎপাদন তালিকা (Master Production Schedule) প্রস্তুত করার সাথে সাথে কাঁচামাল কতখানি প্রয়োজন তারও পূর্ণাঙ্গ পরিমাণ এই MRP-র মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়। MRP প্রক্রিয়া শুরু হয় উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হবার আগে থাকতে। উৎপাদনের

জন্য কাঁচামাল কত পরিমাণ লাগবে তা নির্ধারণ করা হয় বিল অফ মেটেরিয়ালের (Bill of Material) মাধ্যমে। যেহেতু অনেক সময় অনবরত উৎপাদন প্রক্রিয়া চলে না, কিছু সময় ছাড় থাকে (Lead Time), সেজন্য বিভিন্ন সময়ে কত পরিমাণ কাঁচামাল লাগবে তা নির্ধারণ করতে হয়। MRP-র মাধ্যমে ন্যূনতম কতখানি সম্ভার লাগবে, কতখানি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় করতে হবে যার ফলে চূড়ান্ত উৎপাদন সম্ভব হবে, তা নির্ণয় করা যায়। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে অযথা সম্ভারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না এবং সম্ভার রক্ষণাবেক্ষণের (Carrying Cost) ব্যয় হ্রাস পায়। তাই বলা যেতে পারে, কাঁচামাল প্রয়োজনীয়তার পরিকল্পনার মুখ্য লক্ষ্য হল সম্ভারের পরিমাণকে একেবারে কমিয়ে রাখা, আবার উৎপাদনের প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করা যার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ ও সময় রক্ষা করা সম্ভব হয়।

কাঁচামাল প্রয়োজনীয়তা পরিকল্পনা প্রয়োগের শর্ত (Conditions of applying Material Requirement Planning) ঃ

নিম্নলিখিত শর্তাদিতে এই পরিকল্পনা সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে ঃ

(ক) যেখানে কাঁচামালের চাহিদা অনবরত থাকে না, অথবা সাধারণভাবে উৎপাদন চলাকালীন কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা সবসময় অনুভূত হয় না।

(খ) যেখানে কাঁচামালের চাহিদা মূল পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাজে লাগে না, সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

(গ) সময়ের উপর ভিত্তি করে এই পরিকল্পনা করা হয়। ঠিক যখন যত পরিমাণ কাঁচামাল দরকার, ঠিক সেই পরিমাণ আগে থাকতে নির্ধারণ করা এই পরিকল্পনার অন্যতম শর্ত। যার ফলে সম্ভারের পরিমাণ যেমন হ্রাস পাবে, তেমনি উৎপাদনও ব্যাহত হবে না।

১.১১ সারাংশ (Summary)

প্রতিষ্ঠানে যে সব সম্পদ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় যেমন কর্মী, বস্তু, যন্ত্র, অর্থ, পদ্ধতি ও বাজার সেগুলির মধ্যে বস্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুগলিকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পণ্যে পরিণত করা হয় এবং পরে বাজারে বিক্রির জন্য পাঠানো হয়। বস্তু হল উৎপাদনের ভিত্তিস্বরূপ। আধুনিক ব্যবস্থাপনায় বস্তুগত ব্যবস্থাপনা বর্তমানে একটি বিশেষ স্থান নিয়ে রয়েছে।

বস্তুগত ব্যবস্থাপনা হল প্রতিষ্ঠানের বস্তুগত উপাদানের সংস্থান ও ব্যবহার সংক্রান্ত একটি প্রয়োজনীয় কাজ। এটি এমন ধরনের কাজ যা বস্তুগত উপাদানের পরিকল্পনা প্রণয়ন, উৎস নিরূপণ, ক্রয় সরবরাহ, মজুতকরণ ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্ব কাম্যভাবে পালন করে ও যার ফলে ক্রেতাদের ন্যূনতম ব্যয়ে পূর্ব নির্ধারিত সেবা দেওয়া সম্ভব হয়।

এই ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অসীম। এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার কমানো সম্ভব হয়। যার ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। সুতরাং বস্তুগত ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অনুধাবন করে যে সব বিষয় সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় সেগুলি হল-এটি একটি সেবাকার্য, এর ব্যাপ্তি সর্বত্র, এর লক্ষ্য উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করা এবং উৎপাদন সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের মধ্যে সংহিত ও সমন্বয় সাধন করা।

বস্তুগত ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন উদ্দেশ্য আছে। প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল — ব্যয় হ্রাস, মুনাফার সর্বাধিকরণ, উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা, ক্রেতাদের সর্বাধিক সেবা প্রদান, দুষ্প্রাপ্য বস্তুগত উপাদানের সংরক্ষণ ও বিকল্প দ্রব্যের ব্যবহার বাড়ানো।

এই ব্যবস্থাপনার পরিধি ও কার্যাবলি ব্যাপক। বস্তুগত ব্যবস্থাপনার যে সব কাজগুলি লক্ষ করা যায় সেগুলি হল— পরিকল্পনা ও উৎস নির্বাচন, বাজেট প্রণয়ন, গবেষণা ও বিশ্লেষণ, ফরমাশ ও সংগ্রহ, বস্তুগ্রহণ মজুতকরণ, সংরক্ষণ, হিসাবরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ, বস্তু প্রেরণ ইত্যাদি।

মজুত ব্যবস্থাপনা আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মজুতের সংজ্ঞা জ্ঞান প্রয়োজন। মজুত বলতে পণ্যের সম্ভার বোঝায়। এখানে পণ্য বলতে শুধু সমাপ্ত দ্রব্য বোঝায় না, মজুত হল কাঁচামাল, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যসামগ্রী, যন্ত্রাংশ, পক্রিয়ারত দ্রব্য, সমাপ্ত এবং ছাঁচের সমাহার যা উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য মজুদাগারে মজুত রাখা হয়। এই সব মজুতের ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ এখানে বিভিন্ন ধরনের মজুতের জন্য প্রচুর অর্থ আটকে থাকে।

মজুত ব্যবস্থাপনার জন্য যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল — সম্ভার অস্তিত্ব যাচাইকরণ। সম্ভারের অস্তিত্ব যাচাইকরণ শব্দের অর্থ হল প্রামাণ্য দলিলপত্রের সাহায্যে হিসাব বইয়ে লিখিত দ্রব্যগুলির প্রকৃত অস্তিত্ব আছে কিনা তা পরীক্ষা করা। এই কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে যে সব গুরুত্বপূর্ণ দলিলের সাহায্যে নেওয়া হয় তার মধ্যে অন্যতম হল বিন কার্ড ও সম্ভার খতিয়ান।

বিন কার্ড এমন একটি দলিল যা সম্ভার গ্রহণ, বিলিকরণ এবং অন্তঃমজুতের পরিমাণ নির্দেশ করতে সাহায্য করে।

সম্ভার খতিয়ানে সম্ভারের প্রাপ্তি, নিরন্তর মজুতদ্রব্য গণনা পদ্ধতি এবং সময়ান্তর মজুতদ্রব্য গণনা পদ্ধতি। বিলি এবং সেগুলির মূল্য সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়।

সম্ভারের অস্তিত্ব যাচাইকরণের দুটি পদ্ধতি আছে — নিরন্তর মজুতদ্রব্য গণনা পদ্ধতির সাহায্যে মজুত দ্রব্যের ভৌত (Physical) চলাচল ও তাদের বর্তমান জের নির্ণয় করা সম্ভব হয়। সময়ান্তর মজুতদ্রব্য গণনা পদ্ধতি অনুযায়ী মজুত দ্রব্যের অস্তিত্ব যাচাইকরণ নির্দিষ্ট সময়ান্তরে করা হয়।

মজুত ব্যবস্থাপনার আরও একটি ধাপ হল মজুত নিয়ন্ত্রণ। মজুত নিয়ন্ত্রণ বলতে এমন একটি প্রক্রিয়া বোঝায় যার সাহায্যে মজুদাগারে অতিরিক্ত মজুত থাকবে না, প্রয়োজনীয় মজুত সবসময় থাকবে এবং মজুত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় কম হবে।

মজুত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হয়—যেমন অলস সময় হ্রাস, উপযুক্ত পরিমাণ ও মালের পণ্য সরবরাহ, অপচয় হ্রাস করা, মূলধনের অযথা বিনিয়োগ কমানো, মজুদাগারে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ হ্রাস করা।

বর্তমান মজুত নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিভিন্ন ধরনের মজুত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে যেগুলি উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল এ.বি.সি বিশ্লেষণ, ভি.ই.ডি. বিশ্লেষণ, এস.ডি.ই বিশ্লেষণ এফ.এস.এন বিশ্লেষণ পদ্ধতি।

মজুত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে কাঁচামাল প্রয়োজনীয়তার পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এই পরিকল্পনা সে সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় যেখানে অনবরত উৎপাদন প্রক্রিয়া চলে না এবং যে পরিমাণ কাঁচামাল প্রয়োজন ঠিক সেই পরিমাণ কাঁচামালই ক্রয় করা আবশ্যক। উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হবার আগে থাকতে এই পরিকল্পনার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

১.১২ সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘপ্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত

১। বস্তুগত ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দিন। উত্তর — ১.৩
(Define Materials management)

২। বস্তুগত ব্যবস্থাপনার দুটি গুরুত্ব উল্লেখ করুন। উত্তর — ১.৪
(Mention two importances of materials management)

৩। বস্তুগত ব্যবস্থাপনার দুটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করুন। উত্তর — ১.৫
(Mention two objectives of materials management)

৪। মজুতের সংজ্ঞা দিন। উত্তর — ১.৭
(Define Inventory)

৫। সম্ভার অস্তিত্ব যাচাইকরণ বলতে কী বোঝেন? উত্তর — ১.৯.১
(What do you mean by stock verification)

৬। বিন কার্ড কী? উত্তর — ১.৯.১
(What is Bin Card?)

৭। সম্ভার খতিয়ান কী? উত্তর — ১.৯.১
(What is Stores ledger?)

৮। নিরন্তর মজুতদ্রব্য গণনা পদ্ধতি বলতে কী বোঝেন? উত্তর — ১.৯.২
(What do you mean by Perpetual Inventory System?)

৯। সময়ান্তর মজুতদ্রব্য গণনা পদ্ধতি কী? উত্তর — ১.৯.২
(What is Periodic Inventory System?)

১০। মজুত নিয়ন্ত্রণ কাকে বলে? উত্তর — ১.৯.৩
(What is Inventory Control?)

১১। এ. বি. সি. বিশ্লেষণ কাকে বলে? উত্তর — ১.৯.৬
(What is ABC Analysis?)

১২। ভি. ই. ডি. বিশ্লেষণ কী? উত্তর — ১.৯.৬
(What is VED?)

১৩। এস. ডি. ই. বিশ্লেষণ কাকে বলে? উত্তর — ১.৯.৬
(What is SDE?)

১৪। এফ. এস. এন. বিশ্লেষণ কী? উত্তর — ১.৯.৬
(What is FSN analysis?)

১৫। কাঁচামাল প্রয়োজনীয়তার পরিকল্পনার সংজ্ঞা দিন। উত্তর — ১.১০
(Define Material Requirement Planning.)

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত

১। বস্তুগত ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দিন। এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন। উত্তর — ১.৩, ১.৪
(Define Materials management, discuss importance and significance.)

২। বস্তুগত ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য আলোচনা করুন। উত্তর — ১.৫
(Discuss the objectives of Materials management.)

৩। বস্তুগত ব্যবস্থাপনার পরিধি ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করুন। উত্তর — ১.৬
(Explain the scope and functions of Materials management.)

৪। মজুত কাকে বলে? মজুত কেন করা হয়? উত্তর — ১.৮, ১.৯
(What is inventory? Why inventory is maintained?)

৫। সম্ভার অস্তিত্ব যাচাইকরণ কী? এর পদ্ধতিগুলি আলোচনা করুন। উত্তর — ১.৯.১, ১.৯.২
(What is stock verification? Discuss its different methods)

৬। মজুত নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝেন? এর উদ্দেশ্য আলোচনা করুন। উত্তর — ১.৯.৩, ১.৯.৪
(What is Inventory control? Discuss its objectives.)

৭। মজুত নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ও পদ্ধতি আলোচনা করুন। উত্তর — ১.৯.৫, ১.৯.৬
(Discuss the importance and methods of Inventory control.)

৮। মজুত নিয়ন্ত্রণ কাকে বলে? প্রতিষ্ঠানে কাঁচামাল প্রয়োজনীয়তার পরিকল্পনা কেন করা হয়?
উত্তর — ১.৯.৩, ১.১০
(What is Inventory control? Why is it required by the concern to adopt Material Requirement Planning?)

১.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

১। কারবার ব্যবস্থাপনা — ভদ্র ও সৎপতি
২। ব্যবস্থাপনা পরিচয় — পদ্মলোচন গঙ্গোপাধ্যায়।

একক ২ ❑ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা (Production Management)

গঠন (Structure)

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ প্রস্তাবনা
২.৩ উৎপাদনের সংজ্ঞা
২.৪ উৎপাদন ব্যবস্থাপনার নীতি
২.৫ উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য
২.৬ উৎপাদন ব্যবস্থাপনার নীতি
২.৭ উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ
    ২.৭.১ উৎপাদন পরিকল্পনার সংজ্ঞা
    ২.৭.২ উৎপাদন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য
২.৮ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সংজ্ঞা
    ২.৮.১ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য
২.৯ উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব
২.১০ উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের ধাপ
২.১১ উৎপাদিকা শক্তি
২.১২ শ্রমিকদের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির হাতিয়ার
২.১৩ উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির বিচার্য বিষয়
২.১৪ সারাংশ
২.১৫ সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ প্রশ্নাবলী এবং উত্তর সংকেত
২.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পড়ার পর আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- উৎপাদনের সংজ্ঞা
- উৎপাদন ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা
- উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ
- উৎপাদিকা শক্তি

২.২ প্রস্তাবনা

শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের মূলে আছে উৎপাদন। পণ্য উৎপাদন হয় বলেই কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, মূলধন, শ্রমিক ও সংগঠনের প্রয়োজন হয়। আবার কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতিও উৎপাদন করতে হয়। উৎপাদন ব্যবস্থা সরল হতে পারে, আবার জটিলও হতে পারে। তবে উৎপাদন ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যার ফলে একদিকে যেমন কম সময়ে উৎপাদন সম্ভব হবে, তেমনি উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস পাবে। তবে এ প্রসঙ্গে মনে রাখা আবশ্যিক যে, উৎপাদন-ব্যয় হ্রাসের ক্ষেত্রে দ্রব্যের গুণগত মান যেন বজায় থাকে। অর্থাৎ উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানকে বিসর্জন দিয়ে পণ্যের উৎপাদন-ব্যয় কমানো কোনও মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। বর্তমানে বাজার অর্থনীতিতে যে সব প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যবস্থা যত সমৃদ্ধ হবে, সে সব প্রতিষ্ঠান তত সমৃদ্ধ হবে। সেজন্য আধুনিক কারবারি জগতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল চিরনতুন দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন।

২.৩ উৎপাদনের সংজ্ঞা (Definition of Production)

উৎপাদনের অন্যতম অর্থ হল উপযোগিতা সৃষ্টি। এই উপযোগিতা বিভিন্ন ভাবে সৃষ্টি হয় ঃ

(i) আকৃতি বা রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে, যেমন— কাঁচা লোহা থেকে ইস্পাত, কাঠের গুঁড়ি থেকে আসবাবপত্র প্রস্তুত ইত্যাদি।

(ii) স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে — যেমন, জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে গৃহস্থকে সরবরাহ করা।

(iii) সময়ের পরিবর্তনের মাধ্যমে — যেমন বর্ষার সময় জলাধারে জল সঞ্চয় করে গ্রীষ্মকালে কৃষিকার্যের জন্য তা ব্যবহার করা। উপরিলিখিত উপযোগিতা সৃষ্টিতে উৎপাদন সরাসরি সাহায্য করে। তাই উৎপাদন হল প্রকৃতি থেকে কাঁচামাল আহরণ করে যন্ত্রপাতি ও শ্রমিকের সাহায্যে তা মানুষের ব্যবহার উপযোগী করার প্রক্রিয়া। তবে পণ্য প্রস্তুত করাই উৎপাদন নয়। বিভিন্ন সেবাকার্য সরবরাহও উৎপাদনের পর্যায়ভুক্ত।

২.৪ উৎপাদন ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা (Definiftion of Production Management)

কোনও প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কার্য বলতে পণ্য উৎপাদন ও সেবা সরবরাহ কার্যকে বোঝায়, যার ফলে ক্রেতাদের সন্তুষ্টিবিধান সম্ভব হয়। উৎপাদন ব্যবস্থাপনা উৎপাদন কার্যকে পরিচালিত করে। উৎপাদন ব্যবস্থাপনা হল একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে উৎপাদনের পরিকল্পনা, কর্মসূচী, সমন্বয়সাধন এবং নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংগঠনের মানুষ ও যন্ত্রপাতিকে (Man & Machine) এমনভাবে পরিচলনা করা যায় যার ফলে একদিকে যেমন উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে, তেমনি অপরদিকে ক্রেতাসাধারণের সন্তুষ্টিবিধান সম্ভব হয়।

২.৫ উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য (Objectives of Production Management)

উৎপাদন ব্যবস্থাপনা উৎপাদন ব্যবস্থাকে সুপ্রযুক্তভাবে পরিচালনা করে। নিচে উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করা হল ঃ

(১) পণ্যের পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন (Product Planning and development) ঃ প্রতিষ্ঠান যদি কোনও নতুন পণ্য উৎপাদন করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়, সেক্ষেত্রে পণ্যের চাহিদা নিরূপণ এবং পণ্য কি ভাবে প্রস্তুত হবে তার নক্সা (Design) প্রস্তুত করা হল উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য।

(২) কৌশলগত সিদ্ধান্ত (Strategic Decision) ঃ উৎপাদন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল উৎপাদন ব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য। কত পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে, কারখানা কোথায় স্থাপন করা যাবে, কী জাতীয় শ্রমিক আবশ্যক, কাঁচামালের যোগান কোথা থেকে হবে ইত্যাদি বিষয় কৌশলগত সিদ্ধান্তের অন্তর্গত বিষয়। উৎপাদন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উপরিউক্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়।

(৩) উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ (Production Control) ঃ উৎপাদন ব্যবস্থাকে যেমন খুশি চলতে দেওয়া যায় না এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়। ‘যেমন খুশি চলো’ নীতি অনুসৃত হলে উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানও খারাপ হয়। উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হল উৎপাদন ব্যবস্থার অবাঞ্ছিত অংশ দূর করা এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকে একটি সুনির্দিষ্ট পথে চালনা করা।

(৪) ব্যয় হ্রাস (Cost Reduction) ঃ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এমনভাবে প্রয়োগ করা উচিত যার ফলে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রতিষ্ঠান তার উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় হ্রাস করতে সমর্থ হয়।

(৫) উৎপাদন সংস্থার আয়তন নির্ধারণ করা (To determine the size of production unit) ঃ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা উৎপাদন সংস্থার আয়তন নির্ধারণে সাহায্য করে। এই আয়তন নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হয় — যেমন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ কত, কত শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে, পণ্যের চাহিদার পরিমাণ, ইত্যাদি। এই সব বিষয়ে পর্যালোচনা করে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা উৎপাদন সংস্থার আয়তন নির্ণয়ে সমর্থ হয়।

(৬) কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থায় সাহায্য করা (Helps in providing training facilities to the workers) ঃ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কী জাতীয় শ্রমিক লাগবে এবং উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নত মানের শ্রমিক লাগবে তাদের যে মানের প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন, তা উৎপাদন ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ করে। তাই উৎপাদন ব্যবস্থাপনা কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

(৭) উৎপাদিকা শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে (Helps in increasing the productivity) ঃ উৎপাদিকা শক্তি হল উৎপাদন কত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে তার একটি মাপকাঠি। কত পরিমাণ সম্পদ বিনিয়োগ করে কত পরিমাণ উৎপাদন হচ্ছে তাই হল উৎপাদিকা শক্তি। উৎপাদন ব্যবস্থাপনার সাহায্যে এই উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানো সম্ভব হয়।

২.৬ উৎপাদন ব্যবস্থাপনার নীতি (Principles of Production Management)

উৎপাদন ব্যবস্থাপনা কতগুলি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। নীতিগুলি নিচে আলোচিত হল ঃ

(১) উন্নত মানের পণ্য সরবরাহ করা শিল্প প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কাজ। ভোগকারীর কাছে সঠিক সময়ে পণ্য পৌঁছিয়ে দেওয়া হল উৎপাদন ব্যবস্থাপনার অন্যতম নীতি।

(২) উৎপাদন ব্যবস্থাকে চরম উৎকর্ষে পৌঁছানো এবং তা নিরবচ্ছিন্নভাবে চালানো উৎপাদন ব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

(৩) উৎপাদন ব্যবস্থাপনার নীতি হল সংস্থার সমস্ত সদস্যের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে তাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রবাহিত করা এবং কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি করা।

(৪) উত্তম কারবারি নীতি যাতে অনুসৃত হয় তা দেখাও উৎপাদন ব্যবস্থাপনার নীতি।

(৫) দক্ষ কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উৎপাদন ব্যবস্থাপনার অন্যতম নীতি।

(৬) উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থের অপব্যবহার রোধ করা হল উৎপাদন ব্যবস্থাপনার অন্যতম নীতি।

২.৭ উৎপাদন পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রণ (Production Planning and Control)

উৎপাদন পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রণ হল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি কাজ। পণ্য বিক্রয়ের জন্য যে পরিমাণ পণ্য নির্ধারণ করা হয় তা উৎপাদনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ, নির্দেশ দান এবং নিয়ন্ত্রণ করা উৎপাদন ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নিচে উৎপাদন পরিকল্পনা ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হল ঃ

২.৭.১ উৎপাদন পরিকল্পনার সংজ্ঞা (Definition of Production Planning)

উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন পরিকল্পনা বলতে দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের পরিকল্পনাকে বোঝায়। **ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড বুকলেটে** (British Standard Booklet) উৎপাদন পরিকল্পনা সম্পর্কে নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ঃ

“ উৎপাদন পরিকল্পনা একটি মাধ্যম যার সাহায্যে উৎপাদন সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়, পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তথা সরবরাহ করা যায় এবং উপাত্ত সংগ্রহ ও নথিভুক্ত করা যায়, যার সাহায্যে শিল্পোৎপাদনের যন্ত্রপাতিকে সমস্ত স্তরে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়” (Production planning is the means by which a manufacturing plan is determined, information is issued for its execution, and data collected and recorded, which will enable the plant to be controlled through all its stages).

উৎপাদন পরিকল্পনা দুটি প্রশ্নের উত্তর দেয়—

(i) কোন্ কাজ করতে হবে?

(ii) পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন্ সময়ের মধ্যে কাজ সম্পাদন করতে হবে?

উপরিউক্ত প্রশ্নগুলিকে সামনে রেখে উৎপাদন ব্যবস্থাপক কর্ম সম্পাদনের জন্য একটি সর্বাত্মক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যার সাহায্যে কত দক্ষতা ও অল্প মূল্যে পণ্য প্রস্তুত করা যাবে তা নির্ণয় করা যাবে, এবং ক্রেতাদের কাছে কোন্ সময়ের মধ্যে তা পৌঁছানো সম্ভব হবে।

২.৭.২ উৎপাদন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (Objectives of Production Planning)

শিল্প ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। উৎপাদন পরিকল্পনার নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) উৎপাদনের জন্য কত পরিমাণ কাঁচামাল ক্রয় করা উচিত এবং ক্রেতাদের চাহিদা মেটানোর জন্য কত পরিমাণ উৎপাদিত পণ্য মজুত রাখা উচিত, তা উৎপাদন পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

(২) এই পরিকল্পনার মাধ্যমে উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়।

(৩) এই পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় রাখা সম্ভব হয়।

(৪) উৎপাদন পরিকল্পনার সাহায্যে উৎপাদন উপকরণের সঠিক ব্যবহার সম্ভব হয়, যার ফলে একদিকে যেমন উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়, অপরদিকে সঠিক সময়ে ক্রেতাদের কাছে উৎপাদিত পণ্য পৌঁছানো সম্ভব হয়।

(৫) উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে বিকল্প পরিকল্পনাও রচনা করা যায়, যার ফলে অপ্রত্যাশিত কোনও ঘটনা ঘটলে বিকল্প পরিকল্পনাকে গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

(৬) এই পরিকল্পনার সাহায্যে পণ্য বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রায় যেমন পৌঁছানো সম্ভব, তেমনি প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জনও সম্ভব হয়।

(৭) এই পরিকল্পনার মাধ্যমে শ্রমিকদের কাজে যেমন দক্ষতা বাড়ে, তেমনি তাঁদের পারিশ্রমিকে পরিমাণও বাড়ে। ফলে সামগ্রিক ভাবে প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্যপূরণে সমর্থ হয়।

২.৮ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ (Production Control)

সংজ্ঞা (Definition) ঃ উৎপাদন পরিকল্পনা রচনা করাই উৎপাদন ব্যবস্থাপনার শুধুমাত্র কাজ নয়। উৎপাদন পরিকল্পনার সার্থক প্রয়োগ তখনই ঘটে যখন তার সঠিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ উৎপাদন ব্যবস্থাপনার এমন একটি প্রক্রিয়া যা অনুসরণ করলে উৎপাদন ব্যবস্থা কোনও মতে বাধাপ্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনবরত উৎপাদন বাধাহীনভাবে চলতে পারে। প্রতিষ্ঠান পণ্য বিক্রি করার জন্য যে ফরমাশ (order) পায় সেই পরিমাণ পণ্য কত দক্ষতার সাথে দ্রুত উৎপাদন করা যাবে, তা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের আওতায় পড়ে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের যে সংজ্ঞা দেওয়া যায় তা হল ঃ

কাঁচামাল ব্যবহার থেকে আরম্ভ করে উৎপাদিত পণ্য ক্রেতাদের কাছে পরিবেশন করা পর্যন্ত যে উৎপাদন চক্র আছে সেগুলির পরিকল্পনা গ্রহণ, সংগঠিতকরণ, নির্দেশ দান এবং নিয়ন্ত্রণ করা হল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, যার ফলে (i) উৎপাদনে ন্যূনতম বিনিয়োগ, (ii) দক্ষতা বৃদ্ধি ও (iii) ক্রেতাসাধারণের সন্তুষ্টিবিধান সম্ভব হয়।

২.৮.১ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে (Objectives of Production Control)

উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি লক্ষ্য করা যায়—

(১) প্রতিষ্ঠান যে ধরনের পণ্য উৎপাদন করবে সেগুলির প্রকার, অর্থের পরিমাণ, ব্যবহার ইত্যাদিকে সমন্বয় করা হল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য।

(২) সঠিক সময়ে সঠিক গুণমানের ও সঠিক পরিমাণ পণ্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য।

(৩) এই নিয়ন্ত্রণের অন্যতম লক্ষ্য হল সম্পদ ও তার প্রয়োগের সর্বোত্তম মিশ্রণ যার সাহায্যে উৎপাদনের গড় ব্যয় সর্বনিম্ন হয়।

(৪) উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় কাঁচামালের মজুতের পরিমাণ যেমন হ্রাস পায়, তেমনি উৎপাদিত পণ্যের মজুতের পরিমাণও হ্রাস পায়। মজুত পণ্যের আবর্তন যত বৃদ্ধি পাবে, মূলধন তত স্বল্প পরিমাণে আটকে থাকবে, যার ফলে প্রতিষ্ঠান তার বিনিয়োগের উপর আয়ের পরিমাণ বাড়াতে সক্ষম হবে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ একটি উৎপাদনকারী সংস্থার মস্তিষ্ক এবং নার্ভতন্ত্র (Nervous system) হিসাবে কাজ করে। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সমন্বয় সাধনকারী প্রতিনিধি (co-ordinating agent) কাঁচামাল ক্রয়, পণ্য বিক্রয়, সম্ভার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সাহায্য করে।

২.৯ উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব (Importance of Production Planning and Control)

উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রাখে। ফলে এদের গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে এদের গুরুত্ব আলোচিত হল ঃ

(১) উৎপাদনকারী সংস্থার নার্ভতন্ত্র (Plant's Nervous System) ঃ মানুষের শরীরে শ্বাস-প্রশ্বাস এবং পেশি সঞ্চালনের জন্য শরীরের নার্ভগুলি যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনি কোনও উৎপাদনকারী সংস্থার উৎপাদন সংক্রান্ত কাজগুলির সমন্বয় সাধনের জন্য উৎপাদন পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনও বৃহৎ উৎপাদনকারী সংস্থায়, যেমন গাড়ি উৎপাদনকারী সংস্থায় বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য আবশ্যক। যেমন গাড়ির ইঞ্জিন, টায়ার, চেসিস্, রেডিয়েটর, গ্রিল ইত্যাদি। এসব দ্রব্য কখন ক্রয় বা উৎপাদন করা হবে এবং কোন্ কোন্ পর্যায়ে এসব দ্রব্যের সংযুক্তির ফলে গাড়ি তৈরির কাজ শেষ হবে এসব বিষয়ের পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ না থাকলে সার্থক উৎপাদন সম্ভব নয়।

(২) **ব্যয় নিয়ন্ত্রণ (Cost Control)** ঃ উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সঠিকভাবে চালু থাকলে মনুষ্যশক্তি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল এবং অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব হয়, যার ফলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। সুতরাং বলা যেতে পারে, এই বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়।

(৩) **উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায় (Increase Productivity)** ঃ উৎপাদনকারী সংস্থায় উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুপ্রযুক্তভাবে প্রয়োগ করা হলে উৎপাদনের উপাদান, যেমন— কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, অর্থ, শ্রমিক ইত্যাদির সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব হয়। এসবের সর্বোত্তম ব্যবহার হলে উৎপাদনের গুণগত মানও যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। ফলে সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

(৪) **যুক্তিসঙ্গত যন্ত্রপাতির ব্যবহার (Rational use of plants)** ঃ কী ধরনের উৎপাদন, উৎপাদনের গুণগত মান এবং উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণের পর কীভাবে ও কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন কার্য সম্পন্ন হবে তা উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব হবে। এসব ক্ষেত্রে যে বিষয় সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে তা হল যুক্তিসঙ্গত যন্ত্রপাতির ব্যবহার। যুক্তিসঙ্গতভাবে যন্ত্রপাতির ব্যবহার উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সম্ভব হয়।

২.১০ উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের ধাপ (Steps in Production Planning and Control)

যখন ক্রেতাদের কাছ থেকে পণ্য ক্রয়ের আবেদন আসে তখন দুটি জিনিস লক্ষ্য রাখতে হয় ঃ

(i) উৎপাদিত পণ্য মজুত থেকে ক্রেতাদের পণ্য সরবরাহ করা যাবে কি না; অথবা

(ii) পণ্য উৎপাদন করে তা সরবরাহ করা হবে কি না;

ক্রেতাদের চাহিদা মেটানোর জন্য যদি পণ্য উৎপাদন করতে হয়, সেক্ষেত্রে উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ বিভাগের **(Production planning and Control Department)** কাজ শুরু হয়। এই কাজগুলি বিভিন্ন ধাপে বিভক্ত। নিচে এইধাপগুলি আলোচনা করা হল—

(১) **রুটিং (Routing)** ঃ এটি একটি পরিকল্পনার ধাপ। রুটিং-এর সাহায্যে কোথায় কাজ করতে হবে তা ধারণা করা যায়। এর সাহায্যে উৎপাদনের পথ, অর্থাৎ কী এবং কোথায় উৎপাদন করতে হবে এবং কোন্ নির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি এই কাজের জন্য ব্যবহৃত হবে। রুটিং-এর মাধ্যমে উৎপাদন করার জন্য সবচেয়ে সার্থক পথ নির্বাচন করা সম্ভব হয়।

(২) **সময়সূচী নির্ধারণ** (Scheduling) ঃ এটিও একটি পরিকল্পনার ধাপ। সময়ের অনুক্রম (Time sequence) তালিকাভুক্তকরণের অন্তর্গত। উৎপাদনের সময় নির্ধারণ এবং কাজের অনুক্রম কী হবে তা তালিকাভুক্তকরণের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ কখন করা হবে তাও এই কাজের অন্তর্গত। সময় অনুযায়ী কাজ সম্পাদিত হলে সঠিক সময়ে পণ্য সরবরাহ সম্ভব হয়।

(৩) **কার্যারম্ভের নির্দেশ (Dispatching)** ঃ এটি কার্য **সম্পাদনের ধাপ** (Stage of action)। সঠিক সময়ে উৎপাদনের জন্য ফরমাশ প্রদান এবং উৎপাদন সংক্রান্ত কাজ ভাগ করে দেওয়া এই ধাপের অন্তর্গত। কোন্ ব্যক্তি কী কাজের সাথে যুক্ত থাকবেন তা এই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত।

(৪) ত্বরান্বিত করা (Expediting) ঃ এই ধাপটিকে অনুসরণের ধাপ (Follow up Step) হিসাবেও আখ্যা দেওয়া হয়। কোনও কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী হচ্ছে কিনা, এবং কী কারণে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে সে সম্পর্কে খবর রাখা ও কী করলে সংশ্লিষ্ট কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে তা পর্যালোচনা করা এই ধাপের অন্তর্গত। এই ধাপ অনুসরণ করে কাজ সংক্রান্ত সব ধরনের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।

(৫) পরিদর্শন (Inspection) ঃ উৎপাদিত পণ্যের মান বজায় রাখার জন্য উৎপাদন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কাজের পরিদর্শন আবশ্যক। উন্নত মানের পণ্যসামগ্রী উৎপাদিত হচ্ছে কি না বা নিম্ন মানের পণ্যসামগ্রী বাতিল করা হবে কি না তা সঠিক পরিদর্শনের মাধ্যমে জানা সম্ভব হয়।

(৬) পরিসংখ্যানগত পণ্যমান নিয়ন্ত্রণ (Statistical Quality Control) ঃ এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পণ্যের গুণমান সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। যে মানের পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে সেই মানের পণ্য উৎপাদন হচ্ছে কিনা তা বোঝা যায়।

২.১১ উৎপাদিকাশক্তি (Productivity)

উৎপাদিকা শক্তি বলতে উৎপাদন করার ক্ষমতাকে বোঝায়। ১৭৭৬ সালে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ কোয়েস্নি (Quesney) সমৃদ্ধির প্রতীক হিসাবে 'উৎপাদিকাশক্তি' শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন। প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিকাশক্তি কেমন তা একটি সূত্রের সাহায্যে সূত্রটি হল ঃ

$$\frac{\text{উৎপাদিত পণ্য}}{\text{উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদান}}$$

উৎপাদনের জন্য যে সব উপকরণ লাগে যেমন, জমি, শ্রমিক, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, মূলধন, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি, সেগুলি ব্যবহার করে যে পরিমাণ পণ্য উৎপাদিত হয়, তার অনুপাতকে উৎপাদিকাশক্তি হিসাবে প্রকাশ করা হয়।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organisation)-এর মতে, উৎপাদিকাশক্তির অর্থ হল কোনও কর্মীগোষ্ঠী, সমাজ বা দেশের মোট উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও পরিবেশিত সেবাকার্যে সব ধরনের সঙ্গতি বা উপাদানসমূহ প্রয়োগের অনুপাত।

পিটার ড্রাকারের (Peter Drucker) মতে, সর্বনিম্ন ব্যয়ে সর্বাধিক পরিমাণ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত উপকরণগুলির ঠিকমতো ভারসাম্য রাখা হল উৎপাদিকাশক্তি।

উপরের আলোচনার প্ররিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, উৎপাদিকাশক্তির অর্থ হল দক্ষতা বৃদ্ধি করার এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য বিশেষ দক্ষতা সৃষ্টির একটি প্রচেষ্টা। উৎপাদিকাশক্তির ধারণার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের হার কেমন তা পরিমাপ করা হয়।

২.১২ শ্রমিকদের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির হাতিয়ার (Tools of Increasing Labour Productivity)

শ্রমিকরা উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উৎপাদনের অন্যান্য যে সব উপাদান আছে সেগুলি প্রতিষ্ঠান তার প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতে সমর্থ হয়, কারণ সেগুলির প্রাণ নেই। শ্রমিকরা হল উৎপাদনের সেই উপাদান যাঁদের

সার্থক পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান উৎপাদিকাশক্তি বাড়াতে সমর্থ হয়। শ্রমিকদের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানোর জন্য প্রতিষ্ঠান যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেগুলি নিচে আলোচিত হল ঃ

(১) সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ও কলকৌশলের প্রয়োগ;

(২) কার্য সমীক্ষা, অঙ্গ সঞ্চালন সমীক্ষা, সময় সমীক্ষা, ক্লান্তি সমীক্ষা ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রমিকদের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

(৩) শ্রমিকদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য প্রেরণামূলক মজুরি, শ্রমিক কল্যাণ, ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ পদ্ধতি গ্রহণ;

(৪) কর্মী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(৫) কাজের পরিবেশ ও কারখানার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন;

(৬) শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি বিধান।

২.১৩ উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির বিচার্য বিষয় (Factors on which the increase of productivity depends)

উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কি ভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা উৎপাদিকাশক্তির মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব হয়। বিভিন্ন বিষয়ের উপর উৎপাদিকাশক্তি নির্ভর করে। নিচে সেগুলি সম্বন্ধে একটি ধারণা দেওয়া হল ঃ

(১) দক্ষ ব্যবস্থাপনা (Efficient Management) ঃ দক্ষ ব্যবস্থাপনা যে কোনও কারবারের সাফল্যের অন্যতম হাতিয়ার। ব্যবস্থাপনা দক্ষ হলে উৎপাদনে মানবিক এবং অমানবিক সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার সম্ভব হয় এবং অপচয় বন্ধ হয়। ফলে উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

(২) **উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা (Better Technology) ঃ** উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। শ্রমের বিশেষীকরণ, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার, উন্নত কারিগরি বিদ্যা, সময় ও গতি সমীক্ষা ইত্যাদির সাহায্যে উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

(৩) **প্রাকৃতিক বিষয় (Natural Factor) ঃ** অনুকূল জলবায়ু শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভৌগোলিক অবস্থান উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কাঁচামাল, শক্তি, আবহাওয়া, খনিজসম্পদ সব দেশে সমানভাবে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তায় মানুষ প্রাকৃতিক বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

(৪) **শ্রমিকের দক্ষতা (Efficiency of Labour) ঃ** শ্রমশক্তি উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। শ্রমিকদের দক্ষতা যত বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদনের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পাবে। কাজের সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ, উদ্দীপনামূলক মজুরি ব্যবস্থা ইত্যদি প্রচলনের মাধ্যমে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। যার ফলশ্রুতি হিসাবে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

(৫) **উন্নত যন্ত্রপাতি (Improved Machinery) ঃ** উন্নত মানের যন্ত্রপাতির সাহায্যে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। উন্নত যন্ত্রপাতি উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধিতে তাই প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করে।

(৬) **সরকারি নীতি (Government Policy) ঃ** সরকারের আর্থিক নীতি, শিল্পনীতি, বাণিজ্যনীতি, শুল্কনীতি ইত্যাদি উৎপাদনকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। যার ফলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিকা শক্তি যেমন বাড়তে পারে, তেমনি হ্রাসও পেতে পারে।

২.১৪ সরাংশ (Summary)

শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের মূলে আছে উৎপাদন। কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি উৎপাদন করতে হয়। উৎপাদন ব্যবস্থা এমন হওয়া আবশ্যক যার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস পাবে। তবে এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন কোনও অবস্থাতেই যেন উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান হ্রাস না পায়।

প্রকৃতি থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে যন্ত্রপাতি ও শ্রমিকের সাহায্যে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করার প্রক্রিয়া হল উৎপাদন।

উৎপাদন কার্য পরিচালনার মাধ্যমে ক্রেতাদের সন্তুষ্টিবিধান করা হল উৎপাদন ব্যবস্থাপনা।

উৎপাদন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পণ্য সম্পর্কে পরিকল্পনা, কৌশলগত সিদ্ধান্ত, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি ইত্যাদি সম্ভব হয়।

উন্নত মানের পণ্য সরবরাহ, নিরবচ্ছিন্নভাবে উৎপাদন কার্য চালানো, দক্ষ কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি হল উৎপাদন ব্যবস্থার নীতি।

উৎপাদন পরিকল্পনা বলতে পণ্য ও সেবা উৎপাদনের পরিকল্পনাকে বোঝায়।

কত পরিমাণ কাঁচামাল ক্রয় করা উচিত, উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা, উৎপাদন উপকরণের সঠিক ব্যবহার, পণ্য বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ইত্যাদি হল উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য।

কাঁচামাল ব্যবহার থেকে আরম্ভ করে উৎপাদিত পণ্য চূড়ান্ত ক্রেতাদের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত যে সব কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা হয় সেগুলির পরিকল্পনা গ্রহণ, সংগঠিতকরণ, নির্দেশ দান ও নিয়ন্ত্রণ করা হল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ।

উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সঠিক সময়ে সঠিক গুণমানসমৃদ্ধ পণ্য উৎপাদন, অপ্রয়োজনীয় কাঁচামাল মজুতের পরিমাণ হ্রাস, মজুত পণ্যের আবর্তন ইত্যাদি বৃদ্ধি সম্ভব হয়।

উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি ও যুক্তিসঙ্গত যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্ভব হয়।

রুটিং, সময়সূচী নির্ধারণ, কার্যারম্ভের নির্দেশ, ত্বরান্বিতকরণ, পরিদর্শন ইত্যাদি হল উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের ধাপ।

উৎপাদিকাশক্তি হল সর্বনিম্ন ব্যয়ে সর্বাধিক পরিমাণ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত উপকরণগুলির ঠিকমতো ভারসাম্য রাখার মাপকাঠি।

শ্রমিকদের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির জন্য সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন, কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধিকারক মজুরি প্রদান, কর্মী প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রয়োজন।

সাধারণভাবে উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির জন্য দক্ষ ব্যবস্থাপনা, উন্নত প্রযুক্তি, শ্রমিক দক্ষতা, সরকারি নীতি ইত্যাদি আবশ্যক

২.১৫ সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ প্রশ্নাবলী এবং উত্তর সংকেত

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর সংকেত

১. উৎপাদন কী ? উত্তর— ২.৩

২. উৎপাদন ব্যবস্থাপনা কি ? উত্তর— ২.৪

৩. উৎপাদন পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায়? উত্তর— ২.৭.১

৪. উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ কী ? উত্তর— ২.৮

৫. উৎপাদিকাশক্তি বলতে কী বোঝায় ? উত্তর— ২.১১

দীর্ঘ প্রশ্ন ও উত্তর সংকেত

১. উৎপাদন ব্যবস্থাপনা কাকে বলে? উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য আলোচনা করুন।

উত্তর—২.৪ এবং ২.৫

২. উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ আলোচনা করুন। উত্তর— ২.৫ এবং ২.৬

৩. উৎপাদন পরিকল্পনার সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য আলোচনা করুন। উত্তর— ২.৭.১ এবং ২.৭.২

৪. উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ও উদ্দেশ্য আলোচনা করুন। উত্তর—২.৮ এবং ২.৮.১

৫. উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ও ধাপ আলোচনা করুন। উত্তর ২.৯ এবং ২.১০

৬. উৎপাদিকাশক্তির সংজ্ঞা এবং শ্রমিকদের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির হাতিয়ার আলোচনা করুন।

উত্তর— ২.১১ এবং ২.১২

৭. উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির বিচার্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা দিন। উত্তর— ২.১৩

২.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। কারবার ব্যবস্থাপনা— ভদ্র ও সৎপতি

২। ব্যবস্থাপনা পরিচয় — পদ্মলোচন গঙ্গোপাধ্যায়

একক ৩ ❑ বিপণন ব্যবস্থাপনা (Marketing Management)

গঠন (Structure)

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ বিপণনের সংজ্ঞা

৩.৪ বিপণন ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা

৩.৫ বিপণন ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য

৩.৬ বিপণনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

৩.৭ বিপণনের মৌলিক কার্যাবলি

৩.৮ বিপণন ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য

৩.৯ বিপণন ব্যবস্থাপনার পরিধি

৩.১০ বিপণন ধারণা বা মতবাদ

৩.১১ বিপণন সংক্রান্ত আধুনিক মতবাদ

৩.১২ বিক্রয় ও বিপণনের পার্থক্য

৩.১৩ বিপণন ব্যবস্থাপকের কার্যাবলি

৩.১৪ বিক্রয় প্রসার-সংজ্ঞা

- ৩.১৪.১ বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞা
- ৩.১৪.২ বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য
- ৩.১৩.৩ বিজ্ঞাপনের মাধ্যম
- ৩.১৪.৪ বিজ্ঞাপন মাধ্যম নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ
- ৩.১৪.৫ বাজার গবেষণা— সংজ্ঞা
- ৩.১৪.৬ বাজার গবেষণার গুরুত্ব
- ৩.১৪.৭ বাজার গবেষণার উদ্দেশ্য
- ৩.১৪.৮ ক্রেতাদের আচরণ
- ৩.১৪.৯ ক্রেতাদের আচরণ নির্ধারণকারী বিষয়
- ৩.১৪.১০ নতুন পণ্য পরিকল্পনা

৩.১৫ সারাংশ

৩.১৬ সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ প্রশ্নাবলী এবং উত্তর সংকেত

৩.১৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পড়ার পর আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- বিপণনের সংজ্ঞা
- বিপণন ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা
- বিপণন ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি, পরিধি এবং গুরুত্ব
- বিপণনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
- বিপণনের আধুনিক ধারণা
- বিপণন ও বিক্রয়ের পার্থক্য
- বিপণন ব্যবস্থাপকের কাজ
- বিক্রয় প্রসার
- বিজ্ঞাপন
- বাজার গবেষণা
- ক্রেতাদের আচরণ

৩.২ প্রস্তাবনা

আধুনিক যুগ বিপণনের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এমন একটি সময় ছিল যখন মানুষের চাহিদা ছিল সীমাবদ্ধ এবং দ্রব্যের বিনিময়ের (Barter System) মাধ্যমে মানুষ তার অভাব মেটাত। মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন, শিল্প বিপ্লব, গণ উৎপাদন ব্যবস্থা, বাজার অর্থনীতি, বিশ্বায়ন ইত্যাদির ফলশ্রুতি হিসাবে মানুষের জীবনে দ্রব্যের চাহিদার ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এখন বহুজাতিক সংস্থা (Multinational Company) যে কোনো দেশে গিয়ে ব্যবসা করতে সমর্থ হচ্ছে। ফলে বিভিন্ন দেশীয় উৎপাদনকারী সংস্থা এবং এর পাশাপাশি বহুজাতিক সংস্থাও মানুষের কাছে নিত্যনতুন দ্রব্যের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। এক জায়গায় যে পণ্য উৎপাদন হচ্ছে, তা ব্যবহৃত হচ্ছে অন্যত্র। দেশীয় সংস্থা BPL-এর টিভি যেমন আমরা পাচ্ছি, তেমনি জাপানি SONY কোম্পানির টিভিও আমাদের কাছে এসে পৌঁছচ্ছে। এ সব সম্ভব হচ্ছে বিপণনের জন্য। ফলে আধুনিক সমাজে মানুষের জীবনযাত্রার মানেরও দ্রুত উন্নয়ন ঘটছে। কেবল ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলের মধ্যেই এর কাজকর্ম আজ আর সীমাবদ্ধ নেই, সামাজিক পরিমণ্ডলেও আজ বিপণন পরিব্যাপ্ত। বিপণনের সফলতা বিপণন ব্যবস্থাপনার সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমে সংগঠিত হয়। নিচে তাই আমরা বিপণন ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব, প্রকৃতি বিপণন ব্যবস্থাপকের কাজ, বিক্রয় প্রসারণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

৩.৩ বিপণনের সংজ্ঞা (Definition of Marketing)

ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে বিপণন কথাটি বিপণি থেকে এসেছে। বিপণি বলতে বোঝায় দোকান। সেক্ষেত্রে বিপণনকে বিপণিজাতকরণও বলা যায়। আবার, বিপণির অপর অর্থ হল দোকান বা বাজার, অর্থাৎ যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা মিলিত হয়ে পণ্য বা সেবার বিনিময় করে। অতীতে বিপণন বলতে বিক্রয় করা বোঝাত। বর্তমানে বিপণন বলতে ক্রেতার তৃপ্তিসাধনও বোঝায়। সুতরাং এককথায় বলা যেতে পারে, বিপণন হল এমন এক ব্যবসায়িক কার্যকলাপ যা পণ্য বা সেবাকে উৎপাদকের কাছ থেকে ভোক্তার কাছে নিয়ে যায় এবং এই কাজ সম্পাদনের জন্য পণ্য বা সেবার পরিকল্পনা, দাম নির্ধারণ, বিক্রয় সম্প্রসারণ ও বণ্টন আবশ্যক।

ফিলিপ কোটলারের (Philip Kotler) মতে যে সব মানবিক কার্যকলাপ বিনিময় প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে কাজ করে, তাই হল বিপণন (Marketing is a human activity directed at satisfying needs and wants through exchange process)।

ক্লার্ক ও ক্লার্কের (Clark and Clark) মতে, যে সব কর্মপ্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হল পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর ও যে সব উদ্যোগ পণ্যের ভৌতিক বণ্টনের প্রতি যত্নবান, তাদেরকে একত্রে বিপণন বলে (Marketing consists of those efforts which effect transfer in owerership of goods and their physical distribution)।

৩.৪ বিপণন ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা (Definition of Marketing Managoment)

বিপণন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনাই হল বিপণন ব্যবস্থাপনা। বিপণনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিপণনের বিভিন্ন কার্যকলাপ সঠিক সময়ে, সঠিক ব্যয়ে এবং সঠিক দক্ষতার সাথে সম্পাদন করাই হল বিপণন ব্যবস্থাপনা।

ফেরু এবং প্রাইডের (Ferreu and Pride) ঃ মতে বিপণনের বিভিন্ন কাজ যেমন সহজ, দ্রুত, বাধাহীন, দক্ষ এবং সফল বিনিময়ের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ, সংগঠিতকরণ, কার্যে পরিণতকরণ ও নিয়ন্ত্রণকরণের যে সর্বাত্মক প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয় তাই হল বিপণন ব্যবস্থাপনা (Marketing management is the combined effort of different functions of planning, organising, activating and controlling essential for marketing the functions of exchange easy, quick, smooth, efficient and successful) ।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিপণন ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে যে ধারণা করতে পারি তা হল, সম্ভাব্য ক্রেতাদের স্বার্থে লাভজনক বিনিময় গড়ে তুলতে বিপণন কার্যসূচীর বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিকল্পনা রূপায়ণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং এসবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পূরণ করা। অর্থাৎ, বিপণন ব্যবস্থাপনা হল বিপণন সংক্রান্ত এক সুসংহত কার্যক্রম যার সাহায্যে কারবারের উদ্দেশ্যসাধন সম্ভব হয়। অনেকে আবার বিপণন ব্যবস্থাপনাকে চাহিদা ব্যবস্থাপনা (Demand Management) হিসাবেও অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে, বিপণন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হল চাহিদার স্তর, সময় ও গঠনকে এমনভাবে প্রভাবিত করা যায় যার ফলে প্রতিষ্ঠান তার অভিপ্রেত লক্ষ্য পূরণে সমর্থ হয়। এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চাহিদার অবস্থাকে প্রতিষ্ঠানের সপক্ষে আনার চেষ্টা করা হয়।

৩.৫ বিপণন ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য (Goals of Marketing Management)

বিপণন ব্যবস্থাপনা লক্ষ্য হল বিপণনের লক্ষ্য পূরণ করা। সাধারণভাবে বিপণনের যে সব লক্ষ্য আমরা দেখতে পাই সেগুলি হল ক্রেতাদের চাহিদা, প্রয়োজন, আকাঙক্ষা ও পছন্দ অনুযায়ী পণ্য ও সেবার পরিকল্পনা করা, উৎপাদিত পণ্য বাজারে যোগান দেওয়া, ক্রেতাদের সুপ্ত চাহিদার উন্মেষ ঘটানো, বিনিময় সংগঠিত করা, ভোক্তার তৃপ্তিসাধন এবং সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল করা। বিপণনের এইসব লক্ষ্যকে সুপরিকল্পিত ভাবে কার্যে পরিণত করা হল বিপণন ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। বিপণন ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যগুলিকে প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক এই দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়। নিচে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

প্রাতিষ্ঠানিক দিক (Organisational Aspect) ঃ

(১) বাজার চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণ ও প্রসারণ (Market Identification, Retention and Expansion)— বিপণনের কাজ বাজারকেন্দ্রিক। বাজারে সম্ভাব্য ক্রেতাদের রুচি, পছন্দ, প্রয়োজন ইত্যাদি বিচার করার জন্য বাজার গবেষণার যেমন প্রয়োজন তেমনি বিক্রেতারা কী পদ্ধতি অবলম্বন করে সেসব পণ্য বিক্রি করবে তা দেখাও আবশ্যক। প্রতিষ্ঠান এই বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখে। তাই বিপণন ব্যবস্থাপনার কাজ হল (i) বাজার চিহ্নিত করণ অর্থাৎ ক্রেতাদের চাহিদার প্রকৃতি স্থির করা; (ii) বাজার সংরক্ষণ, অর্থাৎ বাজার ধরে রাখা; এবং (iii) বাজার প্রসারণ, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের পন্য আরও নতুন ক্রেতার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা।

(২) কারবারের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করা (To Control the internal and external of business) ঃ বিপণন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কারবারের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। অভ্যন্তরীণ পরিবেশ অনুকূল হলে ব্যবস্থাপনার কাজকর্ম সঠিকভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়। বাহ্যিক পরিবেশ সাধারণত ক্রেতা, প্রতিযোগী উৎপাদক, বন্টন-প্রণালীতে যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি ও সরকারি নির্দেশের উপর নির্ভরশীল। অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও বাহ্যিক পরিবেশকে কাম্য নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে না পারলে বিপণন সাফল্য লাভ করতে পারে না।

(৩) বিনিময়ের সর্বাধিকীকরণ (Maximisation of Exchange)— পণ্য বা সেবা বিনিময়ের উদ্দেশ্যেই বিপণন বিভিন্ন ধরনের কাজ করে। বিনিময় বা বিক্রয়ের মাধ্যমেই কারবারের জীবনীশক্তি অটুট থাকে। বিনিময়ের সর্বাধিকীকরণ হলে মুনাফার ও সর্বাধিকীরণ সম্ভব হয় এবং এভাবেই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল হয়।

(৪) কার্যকরী বিপণন মিশ্রণ গড়ে তোলা (To create an effective marketing mix)—'বিপণন মিশ্রণ' হল বিপণন ব্যবস্থাপকের হাতে একটি হাতিয়ার যার সাহায্যে বিপণনের লক্ষ্য পূরণ করা সহজ হয়। বিপণন মিশ্রণের চারটি উপাদান — পণ্য (Produc), দাম (pricet), বিক্রয় প্রসার (Promotion) ও বণ্টন (Place)। এই চারটি উপাদান 4Ps নামে পরিচিত। বিপণন ব্যবস্থাপক এই চারটি উপাদানকে এমনভাবে মিশ্রিত করেন যাতে বিপণনের উদ্দেশ্য সহজেই সফল করা যায়। প্রতিষ্ঠানের সমগ্র বিপণন ব্যবস্থা এই চারটি উপাদানকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। বিপণন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবার জন্য একটি কার্যকরী বিপণন মিশ্রণ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে।

(৫) সুসম্পর্ক স্থাপন (To establish good relationship)— কারবারি জগতের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিপণনের দর্শনের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিপণন একটি জটিল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার নানা স্তরে বিভিন্ন ধরনের মানুষ যুক্ত, যেমন—বিপণন কর্মী, বিক্রয় প্রতিনিধি, বণ্টনকারী, পাইকারি, খুচরা করবারী ও শেষ প্রান্তে ক্রেতা। এদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হলে বিপণন অনেক কার্যকরী হয়। সেজন্য বিপণন ব্যবস্থাপনা বর্তমানে বিপণনের সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষের সাথে দীর্ঘমেয়াদী ভাবে সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

সামাজিক দিক (Social Aspect)

(১) **ভোগের সর্বাধিকীকরণ (To maximise consumption)**— অনেক কারবারি মনে করেন যে বিপণন এমন হওয়া উচিত যাতে মানুষের ভোগস্পৃহা বাড়ে। কারণ ভোগস্পৃহা বাড়লে উৎপাদন বাড়বে, নিয়োগ বাড়বে এবং সম্পদও বাড়বে। এই অনুমানের পেছনে যুক্তি হল মানুষ যত বেশি খরচ করবে, তত বেশি ভোগ করবে ও তারা তত বেশি সুখী হবে। বিপণন ব্যবস্থাপনা মানুষের মনের সুপ্ত ইচ্ছাকে জাগ্রত করে আরও ভোগের পথে নিয়ে যায়।

(২) পছন্দের সর্বাধিকীকরণ (Choice maximisation)— বিপণন ব্যবস্থাপনার অন্যতম লক্ষ্য পণ্যের বিভিন্নতা (variety) ও ভোক্তার পছন্দের সর্বাধিকীকরণ। বিভিন্ন ধরনের পণ্যের যোগান না থাকলে ভোক্তার পছন্দের সুযোগ থাকে না। পণ্যের বিভিন্নতা ক্রেতাদের পণ্য পছন্দের সুযোগ দেয় এবং যে পণ্যটি তাদের সর্বাধিক সন্তুষ্টি দেয় তা খুঁজে নিতে সাহায্য করে। এভাবে তারা তাদের তৃপ্তির সর্বাধিকীকরণ ঘটাতে সমর্থ হয়।

(৩) জীবনযাত্রার মানের সর্বাধিক উন্নয়ন (To maximise quality of life)—বিপণন ব্যবস্থাপনার অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে জীবনযাত্রার মানের সর্বাধিক উন্নয়নকে গ্রহণ করা হয়। সঠিক সময়ে সঠিক দামে সঠিক জায়গায় পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা ও তার সাথে সাথে ভৌতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের দিকেও বিপণন ব্যবস্থাপনা লক্ষ্য রাখে। ফলে সামগ্রিকভাবে মানুষের জীবনযাত্রার মানেরও উন্নয়ন ঘটে।

৩.৬ বিপণনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (Importance and Necessity of Marketing)

কারবারের উদ্দেশ্য সাধনে বিপণন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিপণন ছাড়া কারবার অচল। সেজন্য বিপণনকে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে তুলনা করা হয়। কারবারের ক্ষেত্রে বিপণনের গুরুত্ব অনেকটা শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। বিপণনের গুরুত্ব প্রকৃতপক্ষে স্বীকৃত হয় বিশ শতকের গোড়ার দিকে। বিপণন একটি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, যার মাধ্যমে ক্রেতার প্রয়োজন, ইচ্ছা, পছন্দ ইত্যাদি জানা সম্ভব হয়। **পিটার ড্রাকার**-এর মতে বিপণনকে ক্রেতাভিমুখী হতে হয়। কারণ ক্রেতাগণই কারবারের ভাগ্য নির্ধারণ করে। এই কারণে প্রত্যেক কারবারের প্রথম কাজ হল ক্রেতা ধরে রাখা। ক্রেতা সংগ্রহ ও ধরে রাখতে হলে তাদের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, পছন্দ, ফ্যাশন, গতিপ্রকৃতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি বোঝা প্রয়োজন। বিপণন ক্রেতাগণকে বুঝতে চেষ্টা করে এবং সেই অনুযায়ী তাদের অভাব পূরণ করবার প্রচেষ্টা চালায়। সুতরাং বিপণন শুধুমাত্র একটি কারবারি কাজ নয়, এটি একটি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী।

বিপণনের গুরুত্ব অলোচনাকালে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক **'টয়েনবির'** একটি উক্তি খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন,'‘মানুষের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দী স্মরণীয় হয়ে থাকবে পারমাণবিক বোমা ফাটানোর জন্য নয়; সভ্যতার

সুফল মানবজাতির দরজায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য। উৎপাদিত পণ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে বিপণন। তাই দার্জিলিংয়ের চা পান করছে রাশিয়া, ব্রিটেন ও আমেরিকার লোকেরা, জাপানের ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি আজ বিশ্বের সব দেশের মানুষই অল্পবিস্তর ব্যবহার করছে। মিশরের তুলায় প্রস্তুত কাপড় পরছে বিভিন্ন দেশের মানুষ। এ সব কিছুই বিপণনের দান।" মানুষের মধ্যে সভ্যতার উত্তরণ যত বেশি ঘটছে বিপণনের গুরুত্বও মানুষ তত বেশি করে উপলব্ধি করছে। বর্তমানে বিপণন প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম প্রণয়নে প্রধান নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। কারণ কোনও প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও অসাফল্যের পিছনে বিপণনের গুরুত্ব অপরিসীম।

যেসব কারণে বিপণনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়, সেগুলি হল—

(১) **উন্নতমানের জীবনযাত্রা (High lifestyle) ঃ** আক্রমণাত্মক বিপণনের ফলে মানুষ উন্নত জীবনযাত্রার স্বাদ পায়। বিপণন উন্নত জীবনযাত্রার জন্য মানুষের মনে আকাঙক্ষার সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তির প্রচেষ্টা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, তাই এককালের বিলাসদ্রব্য আজ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পরিণত হয়েছে। নতুন নতুন পণ্য ক্রয় করে মানুষ তার প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয় যার ফলশ্রুতি উন্নতমানের জীবনযাত্রা।

(২) **গণ-উৎপাদন ও উদ্বৃত্ত (Mass production and surplus) ঃ** বর্তমান যুগ গণ-উৎপাদনের যুগ। এর ফলে পণ্যের উৎপাদন-মূল্য হ্রাস পায়। কাঁচামালের সহজলভ্যতা গণ-উৎপাদন ও বিপণনের গুরুত্ব অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। অতীতে উৎপাদকের মূল সমস্যা ছিল **'দুষ্প্রাপ্যতা'** (scarcity)। কিন্তু বর্তমানে তাদের মূল সমস্যা হল **'উদ্বৃত্ত'** (surplus)। গণ-উৎপাদনের ফলে যে বিপুল পরিমাণ পণ্য উৎপন্ন হয় তা কীভাবে মানুষের ভোগে লাগবে তাই হল কারবারের বড়ো সমস্যা। বিপণন এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নেয়। ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল থাকে।

(৩) **শিল্পের বিকাশ (Industrial growth) ঃ** জনগণ শিল্পজাত দ্রব্য ভোগ করলে তবেই শিল্পের বিকাশ ঘটে এবং সাথে সাথে দেশেরও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। অর্থাৎ শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার গড়ে না উঠলে শিল্পের বিকাশ সম্ভব হয় না। বিপণন বাজার গড়ে তুলতে সাহায্য করে। বিপণন তাই পরোক্ষভাবে শিল্প প্রসারকে উৎসাহিত করে এবং এভাবে সম্ভাব্য সম্পদকে প্রকৃত সম্পদে রূপান্তিরত করতে সাহায্য করে।

(৪) **চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য (Equilibrium between demand and supply) ঃ** বিপণন মানুষের চাহিদা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। পণ্যর চাহিদা সৃষ্টি না হলে উৎপাদনের কোনও প্রয়োজন হয় না। পণ্যের চাহিদা বাড়লে উৎপাদনও বাড়ে, যোগানও বাড়ে। এভাবেই গণ-উৎপাদন ও গণ-সম্ভোগ যুগপৎ চলতে থাকে। বিপণন অগণিত মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যের যোগানের ব্যবস্থা করে ও সাথে সাথে কারবারের উদ্দেশ্য সাধন করে।

(৫) **ঝুঁকি (Risk) ঃ** প্রত্যেক কারবারেই কিছু না কিছু ঝুঁকি থাকে। উৎপাদক পণ্য উৎপাদন করে এই আশায় যে তার পণ্য বিক্রয় হবে এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হবে। এই আশায় সে উৎপাদনের ঝুঁকি নেয়। বিপণন উৎপাদকের এই আশাকে বাস্তবায়িত করে। সুতরাং বলা যায় বিপণনই উৎপাদকের ঝুঁকি বহন করার ক্ষমতা দেয়।

(৬) **কারবারের জীবনীশক্তি (Vitality in business) ঃ** বিপণন কারবারের মধ্যে জীবনী সঞ্চার করে কারবারকে সজীব ও সচল রাখে। সেজন্য বিপণনকে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে তুলনা করা হয়। বিপণন হল

ক্রেতা ও বিক্রেতার মানসিক প্রস্তুতি। ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী বিক্রেতা পণ্যের যোগান দেয়। বিক্রেতা ক্রেতার চাহিদা জানার চেষ্টা করে আর ক্রেতা জানার চেষ্টা করে কোথায় তার প্রয়োজনীয় পণ্য পাওয়া যাবে। এই ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে কারবারে সজীবতা আসে ও ধারাবাহিকভাবে কারবার চলতে থাকে।

(৭) কর্মসংস্থান (Employment) ঃ বিপণন একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন ধরনের মানুষ জড়িত। এসব মানুষ বিপণন সংক্রান্ত কাজকর্মের মাধ্যমেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। এভাবে বিপণন কর্মসংস্থানের পথ সুগম করে। এছাড়াও কারবারকে বাঁচিয়ে রাখতে ও কারবারের সম্প্রসারণ ঘটাতে বিপণন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কারণ বিপণন ছাড়া কারবারের সাফল্য অসম্ভব। কারবার যেহেতু বহু মানুষের গ্রাসাচ্ছাদন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে সেহেতু বিপণন পরোক্ষভাবে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সাথে যুক্ত।

(৮) সামাজিক দায়িত্ব (Social responsibility) ঃ বিপণনের প্রধান লক্ষ্য হল ক্রেতার সন্তুষ্টিবিধান। এজন্য বিপণন সঠিক মানের পণ্য, সঠিক দামে, সঠিক স্থানে ও সঠিক সময়ে উপস্থিত করার ব্যবস্থা করে।

(৯) বিক্রয় বৃদ্ধি ঃ উত্তম বিপণন ব্যবস্থা বিক্রয়ের পরিমাণকে বিশেষভাবে বৃদ্ধি করে।

বিপণনের কার্যকলাপ সংক্রান্ত সমীকরণটি হল ঃ

$$S = F\ (E, O)$$

যেখানে S = বিক্রয়, F = কার্য, E = প্রচেষ্টা, O = সুযোগ

সুযোগ ও বিপণন প্রচেষ্টার কার্যকরী সম্পর্ক বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

(১০) ব্যাপকতা ঃ পিটার ড্রাকার মনে করেন যে, বিপণন কারবারি সংস্থার শুধুমাত্র একটি কাজ নয়। এটিই কারবার এবং সমগ্র কারবারের সঙ্গে সমার্থক। বিপণন একটি অর্থনৈতিক সংগঠন, যার মাধ্যমে দ্রব্য ও সেবা পরিবেশিত হয়। বিপণনের পরিধি শুধুমাত্র বণ্টনকার্যে সীমাবদ্ধ নয়, চাহিদা সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তর করা পর্যন্ত সব কাজই এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

৩.৭ বিপণনের মৌলিক কার্যাবলি (Basic Marketing Functions)

পণ্যকে ভোগকারীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে পণ্য ও সেবার সাথে চূড়ান্ত ভোগকারীর একটি সম্পর্ক গড়ে তোলাই হল বিপণনের মূল কাজ। বিপণনের কাজগুলিকে মূলত তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। নিচের রেখাচিত্রে বিষয়টি দেখানো হল ঃ

বিপণনের কাজ

বিনিময় সংক্রান্ত কাজ | সরবরাহ সংক্রান্ত কাজ | সহায়ক কাজ

উপরিউক্ত কার্যাবলিকে আরও বিশ্লেষণ করলে সামগ্রিক চিত্রটি পাওয়া যায় নিচে আলোচিত হল।

ক. বিনিময় কার্যাবলি (Exchange Function) ঃ বিপণন কার্যকলাপের মূল ভিত্তি বিনিময়ের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কারণ পণ্য বা সেবার প্রবাহ শেষ পর্যন্ত ভোক্তার হাতে পৌঁছায়। উৎপাদকের কাছ থেকে

ভোক্তার কাছে পণ্য পৌঁছানোর প্রক্রিয়াকেই বিনিময় কাজ বলা হয়। বিনিময়ের দুটি প্রধান উপাদান হল ক্রয় ও বিক্রয়। বিনিময় কার্যাবলির অর্ন্তভুক্ত বিষয়গুলি হল—

(১) পণ্য পরিকল্পনা ও উন্নয়ন (Product Planning and development) ঃ বিনিময় প্রচেষ্টায় পণ্যই হল মূল উপাদান। পণ্যকে কেন্দ্র করেই বিনিময় সম্পন্ন হয়। পণ্যই ক্রেতার সন্তুষ্টিবিধান করে। তাই বিপণনের প্রাথমিক কাজ হল পণ্য পরিকল্পনা, যাতে ক্রেতারা সহজেই সন্তুষ্ট হয়। কারণ ক্রেতারা সন্তুষ্ট হলেই পণ্যের বাজার প্রসারিত হয়। পণ্য পরিকল্পনার মধ্যে নতুন পণ্যের উদ্ভাবন, পণ্য মিশ্রণ, মূল্যায়ন, আকারগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

(২) মান নিরূপণ ও স্তর বিভাজন (Standardising and Grading) ঃ কারবারের উৎপাদিত সকল পণ্যের মান সমান হয় না। অবশ্য যেক্ষেত্রে পুরোপুরি যান্ত্রিক পণ্য উৎপাদিত হয় সেক্ষেত্রে এই মান প্রায় সমান হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে পণ্যের গুণগতমান নিরূপণ করে তাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বা স্তরে বিভক্ত করা হয়। যেগুলি নিম্নমানের পণ্য সেগুলিকে বাতিল করা হয়। যেহেতু পণ্যের গুণমান ক্রেতার তৃপ্তিসাধনের সাথে সরাসরি যুক্ত সেহেতু বিপণনের একটি প্রধান কাজ হল পণ্যের মান নিরূপণ করা ও ঐ মান অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা।

(৩) ক্রয় ও একত্রীকরণ (Buying and Assembling) ঃ ক্রয় ও একত্রীকরণ হল বিপণনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পণ্যের পুনর্বিক্রয় করতে হলে পণ্যের কাঁচামাল বা পণ্য কিনতে হবে। কারণ এগুলি ঠিকমতো কিনতে না পারলে উৎপাদন ও বিপণন উভয়ই ব্যাহত হবে। আবার কাঁচামাল কেবল কিনলেই হবে না, সেগুলিকে একত্রিত করারও প্রয়োজন রয়েছে। কারণ একত্রীকরণের মাধ্যমেই কাঁচামাল পণ্যে পরিণত হয় এবং ক্রেতার প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হয়। সেজন্য ক্রয় ও একত্রীকরণকে বিপণনের একটি প্রধান কাজ বলে চিহ্নিত করা হয়।

(৪) বিক্রয় (Selling) ঃ বিপণনের অপর একটি প্রধান কাজ হল বিক্রয়। অধিকাংশ কারবারের বিপণন কাজকর্ম এখনও বিক্রয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই পরিচালিত হয়। বিক্রয় বলতে এখানে কেবল পণ্যের মালিকানার হস্তান্তর (Transfer of ownership) বোঝায় না। বিক্রয় এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিপণনে বিক্রয় কাজের মধ্যে মোড়াই, বিজ্ঞাপন, বিক্রয় সম্প্রসারণ, বিক্রয়-পরবর্তী সেবা প্রভৃতিও অন্তর্ভুক্ত থাকে। বিক্রয় বলতে ভবিষ্যৎ ক্রেতার চিহ্নিতকরণ, তাদের চাহিদা সৃষ্টি এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য যোগান দেওয়াও বোঝায়। বিক্রয়ের মধ্যে যেসব কাজকর্ম অন্তর্ভুক্ত সেগুলির যথাযথ সম্পাদনের উপরই কারবারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

খ সরবরাহ কার্য (Supply functions) ঃ বিপণনের সরবরাহ কার্য বলতে সেসব কার্যকলাপকেই বোঝায় যা পণ্যকে সঠিক সময়ে, সঠিক জায়গায়, সঠিক মূল্যে ও সঠিক পরিমাণে ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেয়। এই কাজ দু'ধরনের—

(১) গুদামজাতকরণ (Storing) ঃ সম্ভাব্য চাহিদার উপর ভিত্তি করে পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হয়। পণ্যের যোগান অব্যাহত রাখতে ও সুষম বণ্টনের স্বার্থে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের আগে গুদামে মজুত করার প্রয়োজন হয়। একেই গুদামজাতকরণ বলে। সাধারণত কারবার তিনটি কারণে পণ্যকে গুদামজাত করে। এগুলি হল— (i) উৎপাদন বা বিক্রয়ের ঋতুকালীন বৈষম্য (Seasonal variation) দূর করার জন্য; (ii) কিছু কিছু কারবারি কার্যকলাপ থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়ার জন্য ও (iii) পণ্যের মান ও মূল্য বৃদ্ধির জন্য। প্রকৃতপক্ষে গুদামজাতকরণের মূল লক্ষ্য হল কারবারি জগতে স্থান ও কালের বাধাকে অতিক্রম করা।

(২) পরিবহন (Transportation) ঃ বিপণনের কাজ হল পণ্যকে ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়া। যেহেতু উৎপাদক ও ভোক্তা একই স্থানে অবস্থান করে না সেহেতু পরিবহন ছাড়া বিপণন অসম্ভব। পরিবহন হল বিপণনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা পণ্যকে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেয়। এই নির্দিষ্ট জায়গাটি হল পণ্যের বাজার।

গ. সহায়ক কার্যাবলি (Supporting functions) ঃ যদিও সহায়ক কাজগুলি পণ্য বিক্রয়ে তথা মালিকানার হস্তান্তরের সাথে সরাসরি যুক্ত নয়, তবুও বিপণন কার্যকলাপের ক্ষেত্রে এদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। সহায়ক কাজের মধ্যে যেসব কাজ অন্তর্ভুক্ত সেগুলি হল—

(১) বিপণনের অর্থসংস্থান (Marketing financing) ঃ বিপণন হল একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে যেসব কাজ করতে হয় তার জন্য অর্থের আবশ্যক হয়। বিপণনের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য অর্থসংস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিপণনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন, পণ্যের গুদামজাতকরণ, পরিবহন, ক্রয় পরবর্তী সেবা প্রভৃতি কাজে ভালো রকম অর্থের প্রয়োজন হয়। এসব কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড়া সম্ভব হয় না। সেজন্য বিপণনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বিপণনের জন্য অর্থ সংস্থান।

(২) ঝুঁকি গ্রহণ (Risk taking) ঃ কারবারি কার্যকলাপ সরল নয়। সুতরাং বিপণনের কাজকর্মও সরল নয়। বিপণনে ঝুঁকি সাধারণত সৃষ্টি হয় চাহিদা-যোগানের পরিবর্তন (Changes in demand-supply) ও বাজার সংক্রান্ত বিভিন্ন কারণে। পণ্য উৎপাদন হল ঝুঁকির ব্যাপার। বিপণন এই ঝুঁকি বহন করে কারণ পণ্য বিক্রয়ের যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করে বিপণন। অন্যান্য ক্ষতির থেকে পণ্যকে রক্ষা করার জন্য বীমা (Insurance) করাও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এছাড়াও বিক্রয়জনিত ঝুঁকি এড়াবার জন্য বিজ্ঞাপন, জনসংযোগ ও বিক্রয় প্রসারের অন্যান্য কলা-কৌশলও বিপণনের কাজের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ (Collection and analysis of marketing information) ঃ বিপণন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বাজার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও তাদের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। অন্যথায় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। বিপণনের সাফল্য যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলি হল—(i) বাজারের আয়তন, অবস্থান ও চরিত্র; (ii) বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ক্রেতাদের প্রয়োজন, ক্রয় অভ্যাস, পছন্দ; (iii) প্রতিযোগীদের কৌশল, দুর্বলতা, শক্তি ও কার্যকলাপ এবং সর্বোপরি (iv) চাহিদা ও যোগানের গতি-প্রকৃতি। এসব তথ্য সংগ্রহ করা এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বিপণনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সহায়ক কাজ হিসাবে বিপণনের এ কাজ অন্যান্য সকল কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে।

৩.৮ বিপণন ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য (Features and Significance of Marketing Management)

বিপণন ব্যবস্থাপনা হল কারবারের লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি সামগ্রিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। বর্তমানে কারবারি জগতে উৎপাদন কোনও সমস্যা নয়। কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছ। গণ উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। গণ উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উৎপাদিত পণ্যের বিপণন বর্তমানে সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে একচেটিয়া (Monopoly) কারবার বা প্রতিযোগিতাহীন বাজার (zero competitive market) দেখতে পাওয়া যায় না। প্রতিযোগিতামূলক

বাজারে পণ্যের বিপণন এখন ব্যবস্থাপকদের কাছে এক ধরনের চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। যেসব কারবারি তাদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণনে সাফল্য অর্জন করে তারাই কারবারি জগতে টিকে থাকে ও উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। সেজন্য **পিটার ড্রাকারের (Peter Drucker)** মতো প্রখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিও মন্তব্য করেছেন—"বিপণন ও কারবার সমার্থক। বিপণনকে বাদ দিয়ে কারবারের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।" বিপণন ব্যবস্থাপনার যে সব বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি হল—

(১) **বিপণন পরিকল্পনা (Marketing Plan)** ঃ বিপণন ব্যবস্থাপনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল একটি সম্পূর্ণ বিপণন পরিকল্পনা প্রণয়ন। কেননা সুসংহত পরিকল্পনা ছাড়া কারবারি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। সে কারণে বিপণন ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক শর্ত হল বিপণন পরিকল্পনা তৈরি করা ও পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যবস্থা করা যাতে কারবার তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। এজন্য বিপণন, লক্ষ্য স্থির করা হয়, বিপণন কৌশল নির্ধারণ করা হয় ও বিক্রয় লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়।

(২) **বাজার ও বিপণন গবেষণা (Market and Marketing Research)** ঃ আমরা আগেই বলেছি যে বিপণন ব্যবস্থাপনা হল কারবারের লক্ষ্য পূরণের এক বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা। পণ্যের বিপণন বাজারের উপর নির্ভরশীল এবং বাজারের গতি-প্রকৃতি সর্বদাই পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল বাজারে কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে হলে বাজারের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা থাকা আবশ্যক। আর এই ধারণা পাওয়ার জন্যই গবেষণার সাহায্য নেওয়া হয়। গবেষণা হল এক বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান যা সত্য উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করে। অর্থাৎ কোনও সমস্যাকে চিহ্নিত করা ও বিশ্লেষণ করার এটি হল একটি সুসংহত সমীক্ষা। বাজারের চাহিদা, প্রয়োজনীয়তা, পছন্দ, ক্রয়-অভ্যাস, ক্রেতাদের আচরণ, তাদের জীবনধারণের মান, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বাজারের আয়তন, সমস্যা, প্রতিযোগীদের অবস্থা, বিক্রয় কৌশল ইত্যাদি নানা তথ্য বাজার গবেষণা থেকে পাওয়া যায়। সুতরাং বাজার গবেষণা বিপণন ব্যবস্থাপনার একটি বড় হাতিয়ার।

(৩) **বিপণন মিশ্রণ (Marketing Mix)** ঃ বিপণন ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল বিপণন মিশ্রণ। বিপণনের উদ্দেশ্য সাধনে মিশ্রণ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। এক 4'Ps' দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর অন্তর্ভুক্ত চারটি 'P' হল— পণ্য (Product), দাম (Price), স্থান (Place) ও প্রসার (Promotion)। যে কোনও বিপণন কৌশল পণ্যের পরিকল্পনা দিয়ে শুরু হয় অর্থাৎ তার আকার, আয়তন, মান, সৌন্দর্য ইত্যাদি ক্রেতাদের কতখানি আকর্ষণ ও মুগ্ধ করতে পারবে। অনুরূপভাবে পণ্যের দাম নির্ধারণ করা হয় পণ্যের প্রকৃতি, গুণাগুণ, উৎপাদন ব্যয়, সম্ভাব্য ক্রেতাদের আর্থিক অবস্থা ইত্যাদির উপর লক্ষ্য রেখে। স্থান বলতে এক্ষেত্রে পণ্যের বণ্টন ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যেসব বাজারে পণ্য বণ্টন করা হবে, পণ্যবণ্টনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বণ্টন প্রণালীর ব্যবহার, পণ্য পরিবহণ, গুদামজাতকরণ ইত্যাদি। পণ্যের প্রসার বলতে বোঝায় বিক্রয় প্রসার। অর্থাৎ পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য যেসব কৌশল অবলম্বন করা যায়, যেমন— বিজ্ঞাপন, প্রচার, বিক্রয়বিদ্যা, বিক্রয়োত্তর পরিষেবা ইত্যাদি। সেজন্য বিপণন মিশ্রণকে বিপণন ব্যবস্থাপনার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

(৪) **বিপণন কার্যকলাপ (Marketing Activities)** ঃ বিপণনের আধুনিক ধারণায় বলা হয়েছে যে বিপণনের মুখ্য কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল—বাজার গবেষণা, পণ্য পরিকল্পনা, পণ্যের দাম নির্ধারণ, বিক্রয় প্রসার, পণ্য বণ্টন ও আনুষঙ্গিক কাজকর্ম। প্রকৃতপক্ষে বিপণন ব্যবস্থাপনা বিপণন কার্যকলাপকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়, যদিও এর পরিধি আরও ব্যাপক। তবে বিপণন ব্যবস্থাপনার মুখ্য অংশ জুড়ে থাকে বিপণন

কার্যকলাপ। অর্থাৎ বাজারের গতি, প্রকৃতি, অবস্থা, ক্রেতাদের রুচি, পছন্দ, চাহিদা, পণ্যের আকার, ওজন মোড়ক, মোড়াই, প্রমিতকরণ, বণ্টন, পণ্যের দাম, বিজ্ঞাপন, বিক্রয়কুশলতা, বিক্রয়োত্তর পরিষেবা, মজুতকরণ, পরিবহন ইত্যাদি বিপণন কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত, যা আবার পর্যায়ক্রমে বিপণন ব্যবস্থাপনা কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত।

(৫) **বিপণন সংগঠন (Marketing Organisation) ঃ** সংগঠন হল যে কোনও প্রতিষ্ঠানের সেই পরিকাঠামো যা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধন করতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে। বিপণন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিপণন সংগঠন মজবুত না হলে ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য তথা কারবারের উদ্দেশ্য কখনওই সফল হতে পারে না। সংগঠন হল প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যকলাপের মধ্যে সমণ্বয় সাধনের এক অদৃশ্য বন্ধন। সেজন্য বিপণন ব্যবস্থাপনার অঙ্গ হিসাবে প্রত্যেক কারবারী প্রতিষ্ঠানেই একটি বিপনন বিভাগ থাকে এবং কাজের আয়তন অনুযায়ী সেখানে নানা ধরনের বিভাগ যেমন— পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ, বিজ্ঞাপন ও প্রচার বিভাগ, বিক্রয় বিভাগ, পণ্য বণ্টন বিভাগ, জনসংযোগ বিভাগ ইত্যাদি থাকে। প্রতিটি বিভাগ তাদের নিজ নিজ বিভাগের কাজ যাতে দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হয় তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

(৬) **বিপণন কার্যকলাপের উপর সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় (Overall Control and Co-ordination of Marketing Activities) ঃ** বিপণন ব্যবস্থাপনার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল বিপণন কার্যকলাপের উপর সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়সাধন। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ চালায়। এই কার্যকলাপের প্রকৃতি যেক্ষেত্রে জটিল, সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়সাধন করার দরকার হয়। কাজকর্মের উপর ব্যবস্থাপকদের নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় করতে না পারলে প্রতিষ্ঠান উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়। যেহেতু বিপণন ব্যবস্থাপনা কারবারের বিপণন লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন কাজকর্ম করে, সেহেতু এসব কাজকর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা অবশ্যই দরকার।

(৭) **কারবার ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য অংশ (An Integral Part of Business Management) ঃ** বর্তমানে বিপণনই হল কারবারের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। কারণ পণ্য বিক্রয় বিপণন ব্যবস্থাপনার সাফল্যের উপরই নির্ভর করে। আবার সামগ্রিক কারবার ব্যবস্থাপনার সাফল্য নির্ভর করে বিপণন ব্যবস্থাপনার উপর। বস্তুত ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ক্ষেত্রেই কোনও না কোন ভাবে বিপণনের সাথে জড়িত। কারণ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই মুনাফার সর্বাধিকীকরণ (Maximisation of profit) করতে চায়। এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা একমাত্র তখনই সম্ভব যখন পণ্যের বিপণন সাফল্য লাভ করে। সেজন্য বিপণনকে মুখ্য বিষয় (Key factor) বা সীমাবদ্ধ বিষয় (limiting factor) হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়নে বিপণনের আলাদা ভূমিকা থাকে। একারণেই বিপণন ব্যবস্থাপনাকে কারবারের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার একটি অংশ বলা হয়।

৩.৯ বিপণন ব্যবস্থাপনার পরিধি (Scope of Marketing Management)

বিপণন ব্যবস্থাপনার পরিধি পর্যালোচনা করতে হলে বিপণনের উল্লেখ করতেই হয়, কারণ বিপণন ব্যবস্থাপনার উদ্ভব বিপণনকে কেন্দ্র করেই। বিপণন ব্যবস্থা বলতে বোঝায় বিপণন সংক্রান্ত কার্যাবলির যথাযথ সম্পাদন যাতে বিপণনের উদ্দেশ্য তথা কারবারের উদ্দেশ্য সফল হয়। বিপণন একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং বিপণনের সাফল্য ছাড়া কারবারের সাফল্য অর্জন সম্ভব হয় না। এর পরিধিও ব্যাপক, কারণ বিপণনের সাফল্য

অনেকগুলি ভিন্নমুখী কাজের উপর নির্ভর করে। এই কাজ শুরু হয় ক্রেতাদের প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা, পছন্দ ইত্যাদি চিহ্নিতকরণের মধ্য দিয়ে এবং শেষ হয় দ্রব্য বা সেবার বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের তৃপ্তিসাধন দিয়ে। এই বিশাল কর্মপ্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায় যাতে দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হয় তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়াই বিপণন ব্যবস্থাপনার কাজ। সুতরাং বিপণনের মতোই ব্যবস্থাপনার পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। এমনকি অনেক সময় বিপণনের সীমারেখাকে অতিক্রম করে বিপণন ব্যবস্থাপনা বিস্তৃতি লাভ করে।

নিচে বিপণন ব্যবস্থাপনার পরিধি আলোচিত হল।

(১) মানুষের চাহিদা নিরূপণ থেকে চাহিদাপূরণ ও তৃপ্তিসাধন (Determination of human wants, supply and satisfaction) ঃ বিপণন ব্যবস্থাপনা মানুষের সুপ্ত চাহিদাকে খুঁজে বার করে তাকে জাগ্রত করে, চাহিদাপূরণে উৎসাহিত করে এবং পণ্য বা সেবার বিনিময় তথা বিক্রয়ের মাধ্যমে চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা করে। অবশ্য এখানেই তার কাজ শেষ হয়ে যায় না, ক্রেতা যাতে সন্তুষ্ট হয় তারও ব্যবস্থা করে। কারণ বিপণন ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য বিক্রয় নয়, 'ক্রেতা সৃষ্টি ও ক্রেতার তৃপ্তিসাধন'। আর এসব করা খুব সহজ বা সরল কাজ নয়। এজন্য বিপণন ব্যবস্থানা নিরন্তর বিপণন গবেষণার সাহায্য নেয়। এই বিশাল পরিধির মধ্যে যেসব কাজ খুবই উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল—পণ্য পরিকল্পনা, মোড়াই, মোড়কবন্ধন, পণ্যের নামকরণ, অভিজ্ঞাতকরণ বা ব্র্যান্ডিং, মজুতকরণ, দাম নিরূপণ, বণ্টন, বিক্রয় প্রসার, বিক্রয় ও বিক্রয়-পরবর্তী পরিষেবার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। অর্থাৎ ক্রেতার মানসিক জগতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এর কার্যকলাপের পরিধি বিস্তৃত।

(২) **কারবারের উন্নয়ন থেকে জাতীয় উন্নয়ন (Business development to National development) ঃ** বিপণন ব্যবস্থাপনার পরিধি কারবারের উন্নয়ন থেকে জাতীয় উন্নয়ন পর্যন্ত বিস্তৃত। সংকীর্ণ ক্ষেত্রে (Micro level) বিপণন ব্যবস্থাপনা কারবারের উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে। কারণ বিপণন ব্যবস্থা উন্নত না হলে কারবারের উন্নতি সম্ভব নয়। বিপণনকে কেন্দ্র করেই কারবারের অন্যান্য কার্যকলাপ আবর্তিত হয়। পণ্য বা সেবার বিপণন ব্যাহত হলে উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং আনুষঙ্গিক কাজগুলিও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে, কারবারের সমৃদ্ধি অসম্ভব হয়ে উঠে এবং কারবার রুগ্ণ হয়ে পড়ে। সুতরাং বিপণনের উন্নতির উপর কারবারের উন্নতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল, আর বিপণন ব্যবস্থাপনা বিপণনের পথের বাধাগুলি দূর করে বিপণনকে সফল হতে সাহায্য করে। সেজন্য বিপণন ব্যবস্থাপনাকে কারবারের উন্নয়নের নিয়ামক হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়।

আবার জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রেও বিপণনের বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়নের পথে যে সব বাধা রয়েছে তাদের মধ্যে বিপণনও একটি বাধা। কারণ এসব দেশে বিপণন ব্যবস্থা উন্নতি লাভ করতে পারেনি। দক্ষ বিপণন ব্যবস্থাপনা গণ উৎপাদনের (mass production) ব্যবস্থা করে। গণ উৎপাদনের ফলে পণ্যের উৎপাদন-ব্যয় কমানো সম্ভব হয়। ক্রেতাদের প্রকৃত আয় (Real income) বৃদ্ধি পায়, পণ্যের যোগান বৃদ্ধি পায়, ফলে মানুষের পক্ষে বেশি করে ভোগ (consumption) করা সম্ভব হয়। W. J. Emlen বলেছেন— "Production may be the door to economic growth of the underdeveloped countries, but marketing is the key that turns the lock ।" অর্থাৎ 'উৎপাদনকে যদি উন্নত দেশের উন্নয়নের দরজা বলা যায়, তাহলে বিপণন হল ঐ দরজার তালা খোলার চাবিকাঠি।' সুতরাং বিপণন ব্যবস্থাপনার পরিধি কেবল কারবারের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না, তার ভূমিকা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য, কারণ বিপণন ব্যবস্থাপনা ছাড়া বিপণনের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

(৩) **কারবারি ক্ষেত্র থেকে সামাজিক ক্ষেত্র (From Business to Soceity) ঃ** বিপণন ব্যবস্থাপনা কারবারি জগতে শুরু হলেও কিন্তু এর প্রধান লক্ষ্য হল সমাজ। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যকলাপই সমাজকে সামনে রেখে সংঘটিত হয়। বিপণন সমাজের মানুষের চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন, পছন্দ ইত্যাদি মেটানোর জন্যই বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ গ্রহণ করে। এর ফলশ্রুতিই হল দ্রব্য বা সেবার উৎপাদন এবং এর লক্ষ্য হল ক্রেতা বা ভোক্তার সন্তুষ্টি বা তৃপ্তিসাধন। Philip Kotler তাঁর Principles of Management বইতে মন্তব্য করেছেন। 'Marketing is the creation and delivery of a standard of living'। বিপণন সঠিক মানের পণ্য সঠিক দামে, সঠিক সময়ে ও সঠিক জায়গায় সরবরাহ করার দায়িত্ব নেয়। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা ও ভোগস্পৃহা পূরণের মাধ্যমে বিপণন সমাজে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটায়। আর এসব কাজ যাতে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা করে বিপণন ব্যবস্থাপনা। সমাজকল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কারবারি কার্যকলাপ যাতে পরিচালিত হয় তার ব্যবস্থা করে বিপণন ব্যবস্থাপনা। সেজন্য কারবারি ক্ষেত্র থেকে সামাজিক ক্ষেত্রে এর স্বচ্ছন্দ বিচরণ দেখা যায়। অর্থাৎ কারবার ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার যোগসূত্র হিসাবে বিপণন ব্যবস্থাপনা তার ভূমিকা পালন করে।

(৪) **অভ্যন্তরীণ পরিবেশ থেকে বাহ্যিক পরিবেশ (From Internal Environment to External Environment) ঃ** বিপণন ব্যবস্থাপনার পরিধি কারবারের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ থেকে বাহ্যিক পরিবেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। বিপণন একটি দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া, এটি কারবারের একটি সংকটপূর্ণ ক্ষেত্র। বিপণন বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে এবং এই বিষয়গুলি সতত পরিবর্তনশীল। সেজন্য এই বিষয়গুলিকে একযোগে কারবারের পরিবেশ বলা হয় এবং বিপণনের সাফল্য এই পরিবেশের নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভর করে। বিপণনের পরিবেশকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলি হল অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও বাহ্যিক পরিবেশ। অভ্যন্তরীণ পরিবেশগুলি নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং এর উপাদানগুলি হল—(i) বাজার নির্বাচন—বাজারের আয়তন, চরিত্র ইত্যাদি, (ii) বিপণন লক্ষ্য—বিক্রয়, লাভ ও ভাবমূর্তি (iii) বিপণন পরিকল্পনা ও সংগঠন, (iv) বিপণন নিয়ন্ত্রণ— কালান্তিক মূল্যায়ন, (v) বিপণন মিশ্রণ — পণ্য, দাম, প্রসার ও বণ্টন। এই সমস্ত বিষয়গুলির উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে বিপণন ব্যবস্থাপনা বিপণন কৌশল তৈরি করে।

বিপণনের সাফল্যের উপর বাহ্যিক পরিবেশেরও প্রভাব পড়ে। এগুলি নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয় এবং বিপণন কৌশলের কার্যকারিতা বিনষ্ট করার পিছনে এদের যথেষ্ট ভূমিকা থাকে। এই পরিবেশের উপাদানগুলি হল—(১) প্রযুক্তিগত পরিবেশ, (২) অর্থনৈতিক পরিবেশ, (৩) প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ, (৪) জনসংখ্যাগত পরিবেশ, (৫) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং (৬) রাজনৈতিক ও আইনগত পরিবেশ। সাধারণত বাহ্যিক পরিবেশের মধ্যে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে বিপণন কৌশলের মধ্যে পরিবর্তন আনার দরকার পড়ে। বিপণন ব্যবস্থাপনা বাহ্যিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যেসব পরিবর্তন ঘটে এবং তার যে প্রভাব বিপণন কৌশলের মধ্যে পড়ে সেগুলি ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করে ও বিপণন কৌশলের মধ্যেও কাম্য পরিবর্তন ঘটায়। অন্যথায় বিপণনের উদ্দেশ্য তথা কারবারের উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। একারণে বলা হয় বিপণন ব্যবস্থাপনার পরিধি অভ্যান্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় পরিবেশের মধ্যেই বিস্তৃত।

৩.১০ বিপণন ধারণা বা মতবাদ (Marketing Concept)

বিপণন বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট বাজারে পণ্য বা সেবার ইপ্সিত বিনিময়ের উদ্দেশ্যে এক সুসংহত প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার পেছনে বিভিন্ন দর্শন কাজ করে। বিপণনের বিবর্তনের ইতিহাস সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। বিপণন ধারণা বা মতবাদ বিপণনের ক্ষেত্রে কারবারি দর্শনকে বোঝায়। একে পাঁচভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। সেগুলি হলঃ

বিপণন ধারণা

উৎপাদন মুখী বিপণন (১৮৬৯-১৯৩০)	পণ্যমুখী বিপণন (১৯০০-১৯৩০)	বিক্রয়মুখী বিপণন (১৯৩০-১৯৫০)	ক্রেতামুখী বিপণন (১৯৫০-১৯৬০)	সমাজমুখী বিপণন (১৯৬০-)

(১) উৎপাদনকারী বিপণন (Production-oriented Marketing) ঃ উৎপাদনমুখী বিপণন ধারণাই বিপণনের সবচেয়ে পুরানো ধারণা। এই ধারণার পেছনে যে ভাবনা বা দর্শন কাজ করেছিল তা হল, ক্রেতা সেই পণ্যই পছন্দ বা ক্রয় করবে যার দাম কম এবং সর্বত্র পাওয়া যাবে। উচ্চ উৎপাদন-ক্ষমতা ও বিস্তৃত জায়গা জুড়ে পণ্যের বন্টনের উপর প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকরা জোর দিতেন। এই ধারণাই পরবর্তী পর্যায়ে গণ-উৎপাদন ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটিয়েছিল।

(২) পণ্যমুখী বিপণন (Product-oriented Marketing) ঃ পণ্য-মুখী বিপণন যে ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত তা হল ক্রেতা সেই পণ্যই গ্রহণ করবে যেটি সর্বোত্তম মানের, কার্যকারিতার দিক থেকে অগ্রণী ও যার মধ্যে উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এই ধারণা যে সব প্রতিষ্ঠানে অনুসৃত হয় সেখানে ব্যবস্থাপকরা উন্নতমানের পণ্য উৎপাদনের জন্য ও সময়ের সাথে সাথে তাদের উন্নয়নের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

(৩) বিক্রয়মুখী বিপণন (Sales-oriented Marketing) ঃ ১৯২৯-৩০ সালে সারা বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দার ফলে বিশ্বের বাজার সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ফলে উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয়। প্রয়োজন হয় পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করা। এরই সূত্র ধরে বিক্রয়মুখী বিপণন ধারণার উদ্ভব। এই ধারণার মূল বিষয়গুলি হল পণ্যের গুণগত মান যতই উন্নতমানের হোক না কেন, বিক্রয় প্রবর্তন ছাড়া পণ্যের যথেষ্ট বাজার পাওয়া সম্ভব নয়। এই ধারণায় তাই বলা হয়। পণ্য নিজে থেকে বিক্রি হয় না, বিক্রির সর্বতো চেষ্টা করতে হয়।

(৪) ক্রেতামুখী বিপণন (Customer-oriented Marketing) ঃ এই ধারণার মূল বিষয় হল ক্রেতাদের চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা, পছন্দ খুঁজে বের করা এবং তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত পণ্যের উৎপাদন ও যোগানের মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্ট করার মধ্যেই প্রতিষ্ঠানের চাবিকাঠি নিহিত। এই ধারণায় উৎপাদন বা পণ্য বিক্রয়কে বিপণনের কেন্দ্রবিন্দু না করে ক্রেতাকে ঐ জায়গায় বসানো হয় এবং বিপণন সংক্রান্ত সমস্ত কার্যকলাপ ক্রেতাকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়।

(৫) সামাজিক বিপণন ধারণা (Social Marketing Concept) ঃ বিপণনের এই ধারণায় সমাজের কল্যাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠান প্রাথমিকভাবে ভোগকারীদের প্রয়োজন, চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা নিরূপণ করবে এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রতিযোগীদের থেকে আরও কার্যকরীভাবে পণ্য বা সেবার যোগান দেবে, যাতে ভোক্তার মঙ্গলের সাথে সাথে সমাজের মঙ্গল হয়।

৩.১১ বিপণন সংক্রান্ত আধুনিক মতবাদ (Modern Concept of Marketing)

বিপণনের প্রচলিত মতবাদগুলি আলোচনাকালে আমরা দেখেছি এক-একটি মতবাদ এক-একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যেমন—উৎপাদনমুখী বিপণন মতবাদে উৎপাদনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, বিক্রয়মুখী বিপণন মতবাদ বিক্রয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। অনুরূপভাবে ক্রেতা ও সমন্বাজকে কেন্দ্র করে ক্রেতামুখী বিপণন ও সমাজমুখী বিপণন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এদের মধ্যে উৎপাদনমুখী বিপণন মতবাদই প্রাচীন। বিপণনের আধুনিক মতবাদ হিসাবে সমাজমুখী বিপণনকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অবশ্য সমাজমুখী বিপণন হল ক্রেতামুখী বিপণন ধারণার সম্প্রসারিত রূপ। সেজন্য বিপণনের আধুনিক মতবাদ সমাজ ও ক্রেতা উভয়কেই বিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং এদেরকে কেন্দ্র করেই বিপণন সংক্রান্ত কাজকর্ম পরিচালিত হয়।

অতীতে কারবারের কাজকর্ম ছিল, কারণ উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল সরল। উৎপাদনের চেয়ে চাহিদা ছিল বেশি। বস্তুত উৎপাদন ছিল সমস্যাবহুল, বিপণন ছিল সহজ সরল। ফলে উৎপাদনমুখী বিপণন ধারণা অনুসৃত হত। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের ফলে গণ-উৎপাদন যখন সম্ভব হল তখন থেকে উৎপাদনমুখী বিপণন তার কার্যকারিতা হারায়। এর জায়গায় বিক্রয়মুখী মতবাদ নতুন মতবাদরূপে দেখা দিল। এই সময়ে কারবারের কাছে বিক্রয় নতুন সমস্যা রূপে দেখা দেয়। বাজারে চাহিদার থেকে যোগান বেশি হওয়ায় গণ উৎপাদনের ফলে পণ্য উদ্বৃত্ত হতে থাকে। এই বিক্রয়মুখী বিপণনের প্রায় সাথে সাথেই ক্রেতামুখী বিপণন ধারণা গড়ে ওঠে। কারণ বিপণনের সাফল্য যে ক্রেতার সন্তুষ্টিবিধান তথা পরিতৃপ্তির উপর নির্ভর করে তা স্বীকৃত হয়। এই মতবাদের মূল প্রবক্তা হলেন P. F. Drucker। তিনি বলেছেন—'কারবারের আসল লক্ষ্য একটিই—খরিদ্দার সৃষ্টি।' Drucker -এর কথারই প্রতিধ্বনি আমরা পাই Philip Kotler-এর বক্তব্যে। তিনি বলেছেন ঃ 'বিপণন ধারণাটি হল ক্রেতা-কেন্দ্রিক, এর ভিত্তি হল সুসংহত বিপণন, লক্ষ্য হল ক্রেতার পরিতৃপ্তি এবং ক্রেতার তৃপ্তিসাধনই হল কারবারের সংগঠন-সংক্রান্ত লক্ষ্য পূরণের চাবিকাঠি।' কিন্তু এই শতাব্দীর বিগত তিন দশকে ক্রেতামুখী বিপণন-ব্যবস্থা সম্পর্কেও যেসব প্রশ্ন দেখা দেয় তার মধ্যে মূল প্রশ্নটি হল— ক্রেতার পরিতৃপ্তি না সমাজের কল্যাণ কোন্ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে? ফলস্বরূপ সামাজিক বা সমাজমুখী বিপণন ব্যবস্থার উদ্ভব হয় এবং এটি বিপণনের আধুনিক ধারণা নামে সমধিক পরিচিত। এই ধারণায় কারবারের মুনাফা, ক্রেতা-সন্তুষ্টি ও সমাজের কল্যাণ— এই তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যেহেতু আধুনিক মতবাদ ক্রেতার প্রয়োজন, চাহিদা, পছন্দ, অপছন্দ, রুচি, সন্তুষ্টি প্রভৃতির উপর বেশি গুরুত্ব দেয় এবং ক্রেতা যেহেতু সমাজেরই অংশ, সেহেতু একে সমাজমুখী বিপণন বলে।

এই মতবাদ অনুযায়ী কারবার হল সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। কারবার ও সমাজের উন্নতি অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত। কারবারের উন্নতি ঘটলে কারবারের সাথে জড়িত ব্যক্তিদেরও উন্নতি ঘটে। আর যেহেতু এই ব্যক্তিরা সমাজে বাস করে, ফলে সমাজেরও উন্নতি হয়। কারবারের সামাজিক দায়িত্ব থেকেই এই ধারণার উদ্ভব হয়েছে। এই মতবাদের মূল কথা হল—জনকল্যাণ, ক্রেতার পরিতৃপ্তি, কারবারের উন্নতি ও সমাজের মানোন্নয়ন। এই মতবাদের ফলে কারবারের সামাজিক দায়িত্ব পালনের পথ আরও প্রশস্ত হয়েছে। পরিবর্তনশীল এই জগতে কারবারের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তনশীল। বিপণনের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে ক্রেতার কল্যাণ বা তৃপ্তিসাধনের দিকে যেমন দৃষ্টি দেওয়া হয়, তেমনি সাথে সাথে সামাজিক কল্যাণও সুনিশ্চিত করা হয়। যেন-তেন-প্রকারেণ লাভ করাই কারবারের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। নতুন নতুন উপযোগ সৃষ্টি করে

মানুষের চাহিদা মেটানো এবং এইভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করাও কারবারের অন্যতম উদ্দেশ্য। বর্তমানে কারবার কেবল ব্যবসায়িক কার্যকলাপেই লিপ্ত থাকে না, সাথে সাথে সামাজিক কার্যকলাপেও অংশগ্রহণ করে এবং সামাজিক পরিবেশ যাতে উন্নত হয় সেদিকেও দৃষ্টি দেয়। এই মতবাদেরই ফলস্বরূপ বর্তমানে বৃহদায়তন কারবারগুলিকে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। এসব প্রতিষ্ঠান স্কুল, কলেজ, ক্লাব প্রভৃতি সংস্থাকে আর্থিক সাহায্য দেয়, এলাকার পরিবেশ উন্নয়নে সচেষ্ট হয়। বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় বৃহদায়তন কোম্পানিগুলি খেলাধূলার উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করছে। যেমন ঃ টাটা কোম্পানি ফুটবলের উন্নতির জন্য টাটা একাডেমি গড়েছে, গুড্‌রিখ কোম্পানি দাবা খেলার মান উন্নয়নের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এম. আর. এফ (M.R.F), চারমিনার প্রভৃতি কোম্পানি কার র্যালি, ক্রিকেট খেলা স্পনসর্ড করছে, ডানলপ বিভিন্ন ধরনের দুঃসাহসিক অভিযানে (expedition) অর্থ সাহায্য দিচ্ছে। যদিও এই বৃহদায়তন কোম্পানিগুলি এর মাধ্যমে তাদের পণ্যকে জনগণের কাছে পেশ করার সুযোগ পায় এবং বিজ্ঞাপনের সুফল লাভ করে তথাপি এসবের পিছনে কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য হল সামাজিক স্বীকৃতি লাভ। সমাজের চোখে কোম্পানি বন্ধু হিসাবে বিবেচিত হলে তার পণ্য ক্রেতারা নির্দ্বিধায় ক্রয় করবে, কোম্পানিরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। অপরদিকে সমাজের চোখে কারবারের কাজকর্ম ক্ষতিকর বা অপরাধমূলক মনে হলে সেই কারবারে সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য এই মতবাদে প্রতিটি কারবার-ই ক্রেতার আস্থা ও সমাজের আস্থা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হয়। পণ্য বিপণন তখনই সফল হয় যখন কারবার এই দুটি আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়। কারবার এমন কোনও পণ্য উৎপাদন করবে না যাতে ক্রেতার সন্তুষ্টি হতে পারে কিন্তু সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। যদিও সমাজে এই মতবাদের সার্বিক প্রয়োগ এখনো সম্ভব হয়নি, তথাপি প্রয়োগের চেষ্টা হচ্ছে এবং ক্ষতিকর। পণ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতাদেরকে বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ করা হচ্ছে। যেমন, সিগারেট প্যাকেটের ক্ষেত্রে 'সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর' বা শিশুখাদ্যের ক্ষেত্রে 'মাতৃ-দুগ্ধই শিশুর শ্রেষ্ঠ আহার' প্রভৃতি উল্লেখ থাকে। যদিও এগুলি আইন দ্বারা সৃষ্ট, তবুও আমরা বলতে পারি এই আইন সৃষ্টি হয়েছে সমাজের মঙ্গলের জন্য, কারবারের সমাজিক দিকটিকে তুলে ধরার জন্য।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, আধুনিক বিপণন মতবাদের মূল ভিত্তি হল চারটি — (১) ক্রেতা-সন্তুষ্টি, (২) সুসংহত বিপণন, (৩) সমাজকল্যাণ ও (৪) করাবারের মুনাফা। এই মতবাদে ক্রেতার স্বার্থ, প্রয়োজন ও চাহিদা যেমন প্রাধান্য পায় তেমনি সমাজকল্যাণও সমান গুরুত্ব পায়। উৎপাদন ও বিপণন এগুলিকে কেন্দ্রকরেই আবর্তিত হয়। অর্থাৎ এর লক্ষ্য হল ক্রেতার সন্তুষ্টির সাথে সাথে সামাজিক সন্তুষ্টি বিধান ও সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সার্থক করা। বিপণনের আধুনিক মতবাদ অনুসারে বিপণনের চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়। এগুলি হল—(১) আধুনিক বিপণন ক্রেতা-কেন্দ্রিক, (২) বিপণন শুরু হয় ক্রেতাকে নিয়ে ও শেষও হয় ক্রেতাকে নিয়ে, (৩) উৎপাদনের আগে ও পরে বিপণনের কাজকর্ম চলতে থাকে, এবং (৪) আধুনিক বিপণন কারবারের পথ-প্রদর্শকরূপে কাজ করে।

৩.১২ বিপণন ও বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Marketing and Selling)

বিপণনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল পণ্য বা সেবার বিনিময়ের মাধ্যমে লাভ অর্জন। অপরদিকে বিক্রয় হল প্রতিদিনের বিনিময়ে পণ্য বা সেবার মালিকানার হস্তান্তর। যদিও সংকীর্ণ অর্থে বিক্রয় ও বিপণন সমার্থক মনে করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা এক নয়। বিপণনের পরিধি যতখানি ব্যাপক, বিক্রয়ের পরিধি ততখানি ব্যাপক

নয়। বিপণন কতকগুলি সুসংহত কাজ যার মধ্যে একটি কাজ হল বিক্রয়। বিপণনের কাজকে নানাভাবে বিভক্ত করা হয়, যেমন—পণ্যের উৎকর্ষ সাধন, পণ্যের বণ্টন, ক্রেতার চাহিদা সৃষ্টি, পণ্য বিক্রয় ও বিক্রয়-পরবর্তী পরিষেবা। সুতরাং বিক্রয় হল বিপণনের একটি অংশ মাত্র। যাহোক এদের মধ্যে যেসব পার্থক্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি নিচে তুলে ধরা হল—

বিপণন	বিক্রয়
১। বিপণন হল সেইসব আনুষঙ্গিক কাজ যা পণ্য বা সেবাকে ভোগকারীর কাছে পৌঁছে দেয় ও তাদের চাহিদা মেটায়। সুতরাং এটি একটি দর্শন বা নীতি।	১। বিক্রয় হল পণ্য বা সেবার মালিকানার হস্তান্তর। এটি বিপণনেরই অংশ মাত্র।
২। বিপণন সবসময় ক্রেতামুখী অর্থাৎ ক্রেতার প্রয়োজনকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।	২। বিক্রয় পণ্যাভিমুখী। বিক্রেতা তার প্রয়োজনে পণ্য বিক্রয় করে। লাভ না হলে সে তার পণ্য বিক্রয় করতে চায় না।
৩। বিপণন ক্রেতার চাহিদা, রুচি ও তৃপ্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করে।	৩। বিক্রয় বিক্রেতার ইচ্ছার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।
৪। ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টনের মাধ্যমে ক্রেতার তৃপ্তিসাধন করাই হল বিপণনের কাজ।	৪। বিক্রয়ের কাজ হল পণ্যের বিক্রয় নিশ্চিত করা।
৫। বিপণন ক্রেতার চাহিদা পূরণের মাধ্যমে লাভ অর্জন করার চেষ্টা করে।	৫। অপরদিকে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে কারবার লাভ অর্জন করার চেষ্টা করে।
৬। বিপণনে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বন করা হয়, যেমন— বাজার গবেষণা, ক্রেতার চাহিদা নিরূপণ, পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, বণ্টন, বিক্রয় সম্প্রসারণ ইত্যাদি।	৬। বিক্রয়ে কেবল বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য কিছু পদ্ধতি বা কৌশলের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, যেমন— বিজ্ঞাপন, বিক্রয় অভিযান ইত্যাদি।
৭। বিপণন হল দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টা।	৭। বিক্রয় হল স্বল্পকালীন প্রচেষ্টা।
৮। বিপণনের মাধ্যমে ক্রেতার প্রয়োজন মেটানোই এর মুখ্য উদ্দেশ্য।	৮। বিক্রয়ের মাধ্যমে নগদ অর্থ আহরণ করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য।
৯। বিপণনের পরিধি অনেক ব্যাপক।	৯। বিক্রয়ের পরিধি সংকীর্ণ।
১০। বিপণন একটি জটিল প্রক্রিয়া।	১০। তুলনায় বিক্রয় একটি সরল প্রক্রিয়া।

৩.১৩ বিপণন ব্যবস্থাপকের কার্যাবলি (Functions of Marketing Manager)

বিপণন ব্যবস্থাপকের কাজ হল প্রশাসনিক ও প্রক্রিয়াগত কার্য সম্পাদন। পণ্যের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য ও সেবা ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং ক্রেতাদের সন্তুষ্টি বিধানের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে তাঁর কাজ সম্পন্ন হয়। বিপণন ব্যবস্থাপকের কাজগুলিকে বিশ্লেষণ করলে যে মূল চারটি কাজ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায় সেগুলি হল

যথাক্রমে পণ্য সম্পর্কে কাজ, পণ্যের মূল্য সম্পর্কে কাজ, পণ্য বিক্রয় সম্পর্কে কাজ এবং পণ্য বণ্টন সম্পর্কে কাজ। এই চারটি কাজ যত দক্ষতার সাথে তিনি সম্পন্ন করতে পারবেন প্রতিষ্ঠানে তত সাফল্য আসবে। উপরের এই চারটি কাজকে সার্বিকভাবে সমাধান করতে হলে নিম্নলিখিত কার্যাবলির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অন্যভাবে বলতে হলে নিম্নলিখিত কাজগুলির মাধ্যমে বিপণন ব্যবস্থাপক তাঁর কাজ সুসম্পন্ন করতে পারেন।

(১) পরিকল্পনা (Planning) ঃ পণ্য উৎপাদন, পণ্যের মূল্য, বিক্রয় ও পণ্য বণ্টন সম্পর্কে বিপণন ব্যবস্থাপক যথাযথ পরিকল্পনা করবেন। কারণ পরিকল্পনা, নীতি নির্ধারণ ও কৌশলগত পথ অবলম্বনের মাধ্যমে বিপণন ব্যবস্থাপক উপরিলিখিত চারটি কাজ সুসম্পন্ন করতে সমর্থ হবেন।

(২) বাজার গবেষণা (Market Research) ঃ বিপণন ব্যবস্থাপক বাজার গবেষণার মাধ্যমে বাজার, চাহিদার প্রকৃতি এবং সেই অনুযায়ী বিজ্ঞাপনের ধরন কী হবে তা স্থির করতে পারেন। বাজার গবেষণার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে মধ্যস্থ কারবারিদের বাজারের ওপর প্রভাব জানাও সম্ভব হয়।

(৩) বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ (Determining Sales Target) ঃ কোনও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিক্রয় বিভাগ কি পরিমাণ পণ্য বিক্রি করতে পারবে, সেই পরিমাণ করাকে নির্ধারণ বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা বলে। বিপণন ব্যবস্থাপক বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করে বিক্রির মডেল তৈরি করে বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেন।

(৪) বিক্রির নীতি ও কৌশল নির্ণয় করা (Determining the Sales Policy and Sales Strategy) ঃ তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সঠিক বিক্রয়নীতি ও পণ্য বিক্রয়ের কৌশল প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। বিপণন ব্যবস্থাপক অতীত অভিজ্ঞতা, বাস্তব অবস্থা এবং পূর্বাভাসের ভিত্তিতে বিক্রয়নীতি ও কৌশল স্থির করতে সমর্থ হন।

(৫) বিক্রয় পদ্ধতি নির্ধারণ (Formulation of Sales Methods) ঃ বিক্রয় পদ্ধতি নির্ধারণ বিপণন ব্যবস্থাপকের অন্যতম কাজ। এই কাজের মধ্যে যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে সেগুলি হল বিজ্ঞাপনের ধরন ও মাধ্যম স্থির করা, বিক্রয়কর্মী নিয়োগ করা, বিক্রয়কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, বিক্রয়কর্মীদের পারিশ্রমিক স্থির করা ইত্যাদি।

(৬) উন্নয়ন (Development) ঃ বিপণন ব্যবস্থাপককে সর্বদা পরিবর্তনের প্রতি সর্তক দৃষ্টি রাখতে হয়। বিক্রয়ের সাফল্য সুনিশ্চিত করার জন্য বিপণন ব্যবস্থাপককে বিক্রয়-সংক্রান্ত পরিকল্পনা, নীতি, কার্যক্রম, কর্মপদ্ধতি ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। সামগ্রিকভাবে বিক্রির কর্মপন্থার উন্নয়নসাধন বা উৎকর্ষ সাধন করা বিপণন ব্যবস্থাপকের অন্যতম কাজ।

(৭) পর্যবেক্ষণ (Supervision) ঃ বিক্রির কাজের পর্যালোচনা করে বিক্রির কাজগুলি সঠিকভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কি না বিপণন ব্যবস্থাপককে তা পর্যবেক্ষণ করতে হয়। এই কাজ করার জন্য তিনি বিক্রয়নীতির প্রয়োগ ও বিক্রয়কর্মীদের কাজের অসুবিধাগুলির দিকে লক্ষ্য রাখেন এবং আবশ্যকীয় নির্দেশ ও উপদেশ দেন।

(৮) পণ্যের নামকরণ (Branding of Product) ঃ পণ্যের নামকরণ পণ্য চিহ্নিতকরণের একটি সর্বাধিক ব্যবহৃত পদ্ধতি। পণ্যের নামকরণ পণ্যের পরিচিতি ঘটাতে তথা বাজারে পণ্যের ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিক্রয় ব্যবস্থাপক পণ্যের নামকরণে সাহায্য করে।

(৯) মূল্য নির্ধারণ করা (Determining the Pricing of the Product) ঃ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ বিপণন ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মূল্য নির্ধারণ এমন ভাবে করতে হয় যার ফলে বিক্রেতার কাম্য

লাভ ও ক্রেতার চাহিদা, ক্রয়-ক্ষমতা ও সন্তুষ্টি বিধানের মধ্যে ভারসাম্য আনা সম্ভব হয়। বিক্রয় ব্যবস্থাপক মূল্য নির্ধারণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। তিনি মূল্য নির্ধারণের নীতি ও কৌশল ঠিক করেন, যার ফলে প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন দাম ধার্য করতে পারে ও মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়। পণ্য মূল্য নির্ধারণের যেসব বিভিন্ন রকমের নীতি অনুসৃত হয়, যেমন—অন্তর্ভেদী মূল্য, মাখন তোলা মূল্য (skimming price), ন্যায়সঙ্গত মূল্য, ব্যয়-নিম্ন মূল্য ইত্যাদি, সেসব বিষয় ঠিক করার জন্য বিক্রয় ব্যবস্থাপক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

(১০) **পণ্য বন্টন (Distribution of Product) ঃ** উৎপাদকের কাছ থেকে চূড়ান্ত ক্রেতার কাছে পণ্য পৌঁছতে বিক্রয় ব্যবস্থাপক সাহায্য করে। বিভিন্ন ধরনের বণ্টন প্রণালী আছে, যেমন—দুই স্তর, তিন স্তর, চার স্তর ও পাঁচ স্তর। পণ্যের প্রকৃতি, উৎপাদন স্থান, ক্রেতার চাহিদা ইত্যাদির উপর পণ্য বণ্টন প্রণালী নির্ভরশীল, কোন বণ্টন প্রণালী সবচেয়ে কার্যকরী হবে তা বিক্রয় ব্যবস্থাপক ঠিক করবেন বা ঠিক করতে সাহায্য করবেন।

৩.১৪ বিক্রয় প্রসার (Sales Promotion)

উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে একটি কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলাকেই প্রসার বলে। বিক্রয় প্রসার বিপণন মিশ্রণের এমন একটি অবস্থা যা প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবা সম্পর্কে বাজারকে অবহিত ও প্ররোচিত করে, যার ফলে বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও যোগাযোগ সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। বিক্রয় প্রসার ঘটাতে যে সব উপাদানের প্রয়োজনা তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি হল (i) বিজ্ঞাপন, (ii) বাজার গবেষণা, (iii) ক্রেতাদের আচরণ, (iv) নতুন পণ্য সম্পর্কে পরিকল্পনা। নিচে এই উপাদাগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

৩.১৪.১ বিজ্ঞাপন—অর্থ ও সংজ্ঞা (Advertisement-meaning and definition)

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞাপনের। বিজ্ঞান নতুন নতুন উদ্ভাবন ও নতুন নতুন পণ্য সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করে, আর বিজ্ঞাপন এই বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। বর্তমান যন্ত্রসভ্যতার যুগে জটিল জীবনযাত্রার মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কারবারের সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করে বিজ্ঞাপনের উপর। কারণ পণ্য বিপণনে সাফল্য না পেলে প্রতিষ্ঠান তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। বিজ্ঞাপন ক্রেতাদের কাছে পণ্য বার্তা নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। বর্তমানে কোনও নতুন পণ্য বাজারে উপস্থাপন করতে, বা চালু পণ্যের বাজার ধরে রাখতে বা বাজার সম্প্রসারিত করতে বিজ্ঞাপনের সহায়তা ছাড়া সম্ভব নয়। যদিও বিজ্ঞাপনের ব্যবহার কারবারি ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় তবুও বর্তমানে বিজ্ঞাপন কারবারি ক্ষেত্র ছাড়াও অন্যত্র ভালো রকমই ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই বিপণন প্রসারের ক্ষেত্রে এর আলাদা গুরুত্ব রয়েছে।

সাধারণভাবে 'বিজ্ঞাপন হল তথ্য জ্ঞাপনের মাধ্যম।' বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যসম্ভার ক্রেতাদের কাছে পাঠানো হয়। এর উদ্দেশ্য হল এই তথ্য জ্ঞাপনের মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্রেতাকে প্রকৃত ক্রেতায় পরিণত করা। এটি প্রসার মিশ্রণের সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান। Advertisement কথাটি উৎপন্ন হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'advertise' থেকে যার অর্থ হল 'ফেরাতে' বা 'ঘোরাতে' (To turn to)। বিজ্ঞাপনের আভিধানিক অর্থ হল 'জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া বা জনসমক্ষে ঘোষণা করা।'

The American Marketing Association বিজ্ঞাপনের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল ঃ 'প্রবর্তকের দ্বারা পণ্য, সেবা বা ধারণার ব্যয়যুক্ত নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনা ও প্রসার।' বিজ্ঞাপনের অপর একটি সংজ্ঞা হল—'প্রবর্তক কর্তৃক পণ্য, সেবা বা ধারণার ব্যয়যুক্ত নৈর্ব্যক্তিক গণসংযোগ।' সিনক্লেয়ার লুইস বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞায় বলেছেন ঃ

'বিজ্ঞাপন হল একটি মূল্যবান অর্থনৈতিক উপাদান, কারণ পণ্য বিক্রয়ের এটিই সবচেয়ে সস্তা উপায়, বিশেষত পণ্যগুলি যদি মূল্যহীন হয়' (Advertisement is a valuable economic factor because it is the cheapest way of selling goods, particularly if the goods are worthless.')! John Hobson সংক্ষিপ্তভাবে বলেছেন 'Adverstisement is the window display of satisfaction.' অর্থাৎ 'বিজ্ঞাপন হল সন্তুষ্টির বাতায়ন সজ্জা।'

৩.১৪.২ বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য (Objectives of Advertisement)

বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য বিবিধ। সাধারণভাবে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য হল পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করা ও বিক্রয় বৃদ্ধি করা। এছাড়াও পণ্যের বাজার ধরে রাখা এবং প্রতিযোগীর বাজার কেড়ে নেওয়া এর উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য পণ্যসংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও বিশেষ অভাব পূরণের জন্যও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, যেমন–কর্মখালির বিজ্ঞাপন, বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন, টেন্ডারের বিজ্ঞাপন ইত্যাদি।

Russel Colley বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য বোঝাতে DAGMAR শব্দটি সৃষ্টি করেছেন। এর প্রতিটি অক্ষর নিয়ে এক একটি শব্দ গঠিত হয় ও একটি বাক্যের সৃষ্টি করে। বাক্যটি হল ঃ 'Define advertising goals, measure advertising results' অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য স্থির কর ও তার ফলাফল পরিমাপ কর। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন বিজ্ঞাপনের সাফল্য ও অসাফল্য নির্ভর করে কীভাবে বাঞ্ছিত বার্তা ঠিক লোকের কাছে ঠিক সময়ে এবং সঠিক ব্যয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তার উপর। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য প্রধানত চারটি, যেমন–বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করা, চাহিদা বৃদ্ধি করা, সৃষ্ট চাহিদা বজায় রাখা, সুপ্ত চাহিদা জাগানো। কারবারিক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যগুলিকে নিম্নোক্তভাবে সারিবদ্ধ করা যায়। এগুলি হল ঃ

(১) বিজ্ঞাপন নতুন চাহিদা, নতুন ক্রেতা ও নতুন বাজার সৃষ্টি করে। এগুলির সামগ্রিক ফল হল কারবার ও শিল্পের বিকাশ।

(২) বিজ্ঞাপন বিক্রয় সম্প্রসারণে সাহায্য করে, ফলে কারবারের মুনাফা বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে।

(৩) পণ্যের উৎপাদনজনিত ব্যয় সঙ্কোচন করাও বিজ্ঞাপনের লক্ষ্য। কারণ চাহিদা বৃদ্ধি পেলে গণ উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠে এবং পণ্যের উৎপাদন ব্যয় কমতে থাকে।

(৪) বিজ্ঞাপন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হয়। এর ফলে পণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় ও কারবারের স্থায়িত্বও বৃদ্ধি পায়।

(৫) বিজ্ঞাপনের পরোক্ষ উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি হল মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। বিজ্ঞাপন নিত্যনতুন উপযোগ তাদের কাছে পৌঁছে দেয় ও ভোগস্পৃহাকে বাড়িয়ে তোলে, তাদের রুচির পরিবর্তন করে এবং অধিক আয় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

(৬) বিজ্ঞাপনের অপর একটি লক্ষ্য হল জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি। বিভিন্ন বিজ্ঞাপনী প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত থেকে বহু লোক তাদের জীবিকা নির্বাহ করে এবং বর্তমানে এটি একটি পেশা হিসাবেও স্বীকৃত হয়েছে।

(৭) কারবারের সুনাম বৃদ্ধি করাও এর আর এক উদ্দেশ্য, কারণ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কারবারের নামটি জনগণের কাছে পরিচিত হয়ে উঠে। এর ফলে অনেক সম্ভাব্য ক্রেতা প্রকৃত ক্রেতায় পরিণত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য হল জনসাধারণের মনস্তত্ত্বকে অলক্ষে প্রভাবিত করে কারবারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। 'Look, Like, Learn and Buy'—'দেখুন, পছন্দ করুন, জানুন এবং কিনুন' –এভাবেই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করা যায়।

৩.১৪.৩ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে (Media of Advertisement)

বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হল বিজ্ঞাপনদাতার বক্তব্য বহনকারী যোগসূত্র। যার সাহায্যে পণ্যের উৎপাদক বা বিক্রেতা জনসাধারণের কাছে পণ্যবার্তা। পৌঁছে দেয় তাকেই বিজ্ঞাপনের মাধ্যম বলে। বিজ্ঞাপনের বহুল ব্যবহৃত মাধ্যমগুলি হল ঃ

(১) **সংবাদ ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা ঃ** সংবাদপত্র বিজ্ঞাপনের একটি সুবিধাজনক, বহুল ব্যবহৃত ও শক্তিশালী মাধ্যম। এর মাধ্যমে অসংখ্য ক্রেতার কাছে পণ্যবার্তা দ্রুত পৌঁছে দেওয়া যায়। এর অন্যান্য সুবিধাগুলি হল - -বারে বারে বিজ্ঞাপন দিয়ে পণ্যবার্তার ধারাবাহিকতা রাখা যায় ও প্রয়োজনে বিজ্ঞাপন প্রতিলিপি পরিবর্তনও করা যায়। তবে বিজ্ঞাপন মাধ্যম হিসাবে সংবাদপত্র খুব ব্যয়বহুল এবং যেখানে শিক্ষার হার কম সেখানে এটি অনুপযোগী।

(২) **বেতার, দূরদর্শন ও সিনেমা ঃ** আধুনিক যুগে বেতার, দূরদর্শন ও সিনেমা বিজ্ঞাপনের গণমাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। একই সাথে এত বেশি লোকের কাছে আবেদন পৌঁছে দেওয়ার আর কোনও বিজ্ঞাপন মাধ্যমের পক্ষে সম্ভব নয়। বেতারের বিজ্ঞাপন শ্রুতিমধুর, অন্যদিকে দূরদর্শন ও সিনেমার বিজ্ঞাপন শ্রুতিমধুর ও দৃষ্টি-নন্দন। মূল প্রোগ্রামের আগে, মাঝে ও পরে সাধারণত এই বিজ্ঞাপনগুলি দেওয়া হয়। এই মাধ্যমগুলির সুবিধা হল যে বিনোদনের মাধ্যমে পণ্যবার্তা পৌঁছে দেয়, এবং শ্রোতা ও দর্শকের মনে স্থায়ী প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয়। তাছাড়া এই মাধ্যমগুলির দ্বারা বিজ্ঞাপনের প্রচার জাতীয় ক্ষেত্র অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে। এই মাধ্যমের একটিই ত্রুটি যে এগুলি খুবই ব্যয়বহুল। সেজন্য ছোটো ছোটো কারবারিরা এই মাধ্যমগুলি ব্যবহার করতে পারে না।

(৩) **বিজ্ঞাপন-ফলক ও প্রাচীর-পত্র ঃ** বিজ্ঞাপন-ফলক ও প্রাচীর-পত্রও বর্তমানে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং অধুনা এর বহু ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণত জনবহুল জায়গায় এসব বিজ্ঞাপনফলক ও প্রাচীর-পত্র পণ্যবার্তা নিয়ে আকর্ষণীয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। বহুদিন ধরে একই জায়গায় এগুলি থাকে বলে অসংখ্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ক্রমাগত তাদের মনে ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়। এই পদ্ধতিও অত্যন্ত ব্যয়বহুল বলে ছোটো ছোটো কারবারিরা এই মাধ্যম ব্যবহার করতে সমর্থ হয় না।

(৪) **ডাক মারফত প্রচার ঃ** এটি হল একটি ব্যক্তিগত আবেদন যা ডাক মারফত সম্ভাব্য ক্রেতাদের নিকট পাঠানো হয়। বিজ্ঞাপনের এই মাধ্যমটিও বর্তমানে জনপ্রিয়। সাধারণত টেলিফোন ডাইরেক্টরি, ব্যবসা-বাণিজ্যের ডাইরেক্টরি প্রভৃতি থেকে সম্ভাব্য ক্রেতাদের ঠিকানা জোগাড় করে তাদের কাছে ডাকযোগে ব্যক্তিগত আবেদন পাঠানো হয়। এই আবেদন পাঠ করে অনেক সম্ভাব্য ক্রেতা প্রকৃত ক্রেতায় পরিণত হয়। এই পদ্ধতিও ব্যয়বহুল এবং এর দ্বারা খুবই সীমিত সংখ্যক লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।

(৫) **পণ্যসজ্জা ঃ** বর্তমানে পণ্যসজ্জাও বিজ্ঞাপনের একটি মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত। সম্ভাব্য ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পণ্যগুলিকে দৃষ্টিনন্দনভাবে সাজানো হয়। কাপড়, সাইকেল, রেডিও, খেলনা প্রভৃতি দোকানে, বিভাগীয় বিপণীতে সাধারণত এরূপ পণ্যসজ্জা দেখা যায়। তবে এর অসুবিধা হল যে এর প্রভাব কেবল স্থানীয় ক্রেতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

(৬) **অন্যান্য মাধ্যম ঃ** বিজ্ঞাপনের এই মাধ্যমগুলি ছাড়াও দেশভেদে ও কালভেদে অন্যান্য নানা ধরনের মাধ্যম ব্যবহৃত হয়। এই মাধ্যমগুলিও বহু মানুষের কাছে পণ্যবার্তা পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে। এদের মধ্যে ইস্তাহার, 'রেখার নিচে' বিক্রয়, প্রদর্শনী ও মেলা, ডায়েরি ও ক্যালেন্ডার, নমুনা প্রেরণ ও বিভিন্ন পণ্যের মোড়ক পণ্যবার্তা ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেয়।

৩.১৪.৪ বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ (Factors in determining the media of advertising)

বিপণনে বিজ্ঞাপন যেমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে তেমনি বিজ্ঞাপনের সাফল্যের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন মাধ্যম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক মাধ্যম নির্বাচন করতে না পারলে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। বিজ্ঞাপন মাধ্যমের সংখ্যা প্রচুর তাই যথেষ্ট সতর্কতার সাথে বিজ্ঞাপন মাধ্যম নির্বাচন করতে হয়। কারণ সব মাধ্যম সব ধরনের বিজ্ঞাপনের জন্য উপযুক্ত নয়। যেমন–কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত পণ্যের বিজ্ঞাপন যদি 'মেডিক্যাল জার্নালে' ও ওষুধপত্রের বিজ্ঞাপন যদি কারিগরি ও শিল্পমূলক পত্রিকায় দেওয়া হয় তাহলে কাম্য ফল পাওয়া যায় না। সেজন্য কৃষি-সংক্রান্ত পণ্যের বিজ্ঞাপন কৃষি-পত্রিকায় ও ওষুধের বিজ্ঞাপন 'মেডিক্যাল, জার্নালে' দিলে বিজ্ঞাপন ফলপ্রসূ হয়। বিজ্ঞাপনের সাফল্য অনেকাংশেই মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল। একজন কারবারি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্বাচনকালে নিচের বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন।

(ক) **পণ্যের প্রকৃতি ঃ** পণ্যের প্রকৃতি বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচনকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। পণ্যটি মূলধনী পণ্য না ভোগ্যপণ্য, পণ্যের স্থায়িত্ব, উপযোগ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম স্থির করা হয়।

(খ) **ক্রেতাদের প্রকৃতি ঃ** ক্রেতা অর্থাৎ যারা পণ্যটি কিনবে তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধেও ধারণা থাকা আবশ্যক। এখানে ক্রেতাদের প্রকৃতি বলতে মূলত তারা কোনও বিশেষ আয়গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না সমস্ত আয়গোষ্ঠীর মানুষই অন্তর্ভুক্ত, তা দেখতে হবে।

(গ) **ক্রেতাদের সাংস্কৃতিক মান ঃ** সম্ভাব্য ক্রেতাদের রুচি, পছন্দ, অপছন্দ, অভ্যাস, শিক্ষা, জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিয়ে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত।

(ঘ) **বাজারের পরিধি ঃ** পণ্যটি কোন্ ধরনের বাজারে–স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রয় করা হবে তার উপরও বিজ্ঞাপন মাধ্যমের নির্বাচন নির্ভর করে। স্থানীয় বাজারের জন্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যম ও আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য বিজ্ঞাপন মাধ্যম কখনও এক হতে পারে না।

(ঙ) **আবেদনের স্থায়িত্ব ঃ** বিজ্ঞাপন তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পাঠক বা ক্রেতাদের কাছে কোনও বিষয়ে আবেদন রাখে। এই আবেদনের স্থায়িত্ব স্বল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন হতে পারে। সুতরাং আবেদনের স্থায়িত্বের উপরও মাধ্যম নির্বাচন নির্ভরশীল।

(চ) **বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ঃ** বিজ্ঞাপনের প্রধান উদ্দেশ্য হল চাহিদা সৃষ্টি করা। বিজ্ঞাপন প্রত্যক্ষভাবে তাড়াতাড়ি চাহিদা সৃষ্টি করতে পারে অথবা পরোক্ষভাবে ধীরে ধীরে ভবিষ্যৎ চাহিদা সৃষ্টি করতে পারে। উদ্দেশ্যের তারতম্যের জন্য বিজ্ঞাপন মাধ্যমেরও তারতম্য ঘটে।

(ছ) **বিজ্ঞাপন-ব্যয় ঃ** বিজ্ঞাপন মাধ্যম নির্বাচনে বিজ্ঞাপন, ব্যয়কে বাদ দিলে চলে না, কারণ এই উদ্দেশ্যে অধিক ব্যয় হলে তা কারবারের কাছে বোঝা হিসাবে দেখা দেয়। বিজ্ঞাপন ব্যয়ের ক্ষেত্রে যে নীতি মেনে চলা হয় তা হল–'ন্যূনতম খরচে সর্বাধিক লাভ' (minimum cost, maximum benefit)। বিজ্ঞাপন ব্যয় বেশি হলে মুনাফা হ্রাস পায়। ফলে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য 'চাহিদা সৃষ্টির দ্বারা মুনাফা অর্জন' তা ব্যাহত হয়। সেজন্য বিজ্ঞাপন ব্যয়ের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে বিজ্ঞাপন মাধ্যম নির্বাচন করতে হয়।

৩.১৪.৫ বাজার গবেষণা (Market Research)

সংজ্ঞা ঃ বিক্রয় প্রসারে বাজার গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গবেষণা হল একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে মানবজীবনের যে কোনও শাখার জটিল ও প্রাসঙ্গিক ঘটনার নথিভুক্তকরণ ও বিশ্লেষণ করাকে বোঝায়। এর মাধ্যমে সমস্যা সম্পর্কে ধারণা ও অনুসন্ধান করা হয় এবং কীভাবে এই সমস্যা মেটানো সম্ভব সে সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত দেওয়া যায়। বাজার গবেষণা হল কোনও ঘটনার একটি নিয়মতান্ত্রিক, উদ্দেশ্যমুখী এবং গভীর অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যার সাহায্যে বিপণনের সমস্যার চিহ্নিতকরণ এবং সমাধান নির্ণয় সম্ভব।

৩.১৪.৬ বাজার গবেষণার গুরুত্ব (Importance of Market Research)

বাজার গবেষণার গুরুত্ব নিচে আলোচিত হল ঃ

(১) আগে বাজার ছোটো জায়গায় সীমাবদ্ধ ছিল। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে মানুষের চাহিদার পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তিত চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের যোগান দেবার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলি নিত্যনতুন পণ্যের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। পণ্যের উন্নত সংস্করণ বাজার গবেষণার মাধ্যমে সম্ভব। বাজার গবেষণার মাধ্যমে ক্রেতারা নতুন ধরনের পণ্যের যোগান পাচ্ছে এবং তাদের তৃপ্তিসাধন সম্ভব হচ্ছে।

(২) বাজার গবেষণার মাধ্যমে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার সম্ভব হয়। যেহেতু ক্রেতাদের চাহিদার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সেজন্য উন্নতমানের বাজার গবেষণার প্রয়োজন। উন্নত গবেষণা একমাত্র সম্ভব হয় যদি উন্নত প্রযুক্তির সার্থক ব্যবহার সম্ভব হয়। তাই বাজার গবেষণা তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়নে সরাসরি সাহায্য করে।

(৩) **পরিবর্তন জীবনের নিয়ম।** এই পরিবর্তনকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য প্রতিষ্ঠানই ক্রেতাদের মধ্যে পণ্য সম্পর্কে নিত্য চাহিদার সৃষ্টি করে। এই বিশেষ কাজকে সার্থক রূপ দেবার জন্য বাজার গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাজার গবেষণার মাধ্যমে একদিকে যেমন এই পরিবর্তনের চরিত্র নির্ণয় করা সম্ভব হয়, অপর দিকে এই পরিবর্তনকে কীভাবে সন্তুষ্টিবিধানের লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়া যায় সে সম্পর্কে ব্যবস্থাপনার সাথে যারা যুক্ত তাদেরকে সাহায্য করে।

৩.১৪.৭ বাজার গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of Market Research)

বাজার গবেষণার উদ্দেশ্য নিচে আলোচিত হল ঃ

(১) বাজার সম্পর্কে পরিকল্পনা, নীতি, কর্মসূচী এবং পদ্ধতি প্রণয়ন বাজার গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

(২) বাজার গবেষণা পণ্য বিক্রয়, বিজ্ঞাপন, প্রসার এবং বণ্টনের ব্যয় যাতে কম হয় সে দিকে দৃষ্টি দেয়।

(৩) বাজার সম্পর্কে তিনধরনের সমস্যা সমাধানে বাজার গবেষণা সাহায্য করে, যেমন—(i) পণ্য সম্পর্কে সমস্যা—ব্রান্ডিং, মোড়কজাত করণ এবং লেবেলিং সংক্রান্ত সমস্যা; (ii) ক্রেতার চাহিদা সম্পর্কে সমস্যা; (iii) বাজারজাতকরণ সম্পর্কে সমস্যা।

(৪) চলমান এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করার ক্ষেত্রে বাজার গবেষণা প্রত্যেক্ষ ভূমিকা পালন করে।

(৫) বাজার গবেষণার সাহায্যে বিপণন ব্যবস্থাপনা সঠিক পণ্য, সঠিক বণ্টন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, সঠিক ক্রেতার কাছে, সঠিক সময়ে এবং সঠিক দামে বিক্রয় করতে সমর্থ হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বাজার গবেষণা ব্যবসাকে কতখানি সাহায্য করতে পারে তা নিচে সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হল ঃ

(i) কী ধরনের পণ্য?	→	পণ্য সম্পর্কে গবেষণা
(ii) কারা ক্রেতা?	→	ক্রেতা সম্পর্কে গবেষণা
(iii) কেন ক্রেতারা কিনবেন?	→	প্রেরণার গবেষণা
(iv) কেমন ভাবে কিনবেন?	→ }	ক্রেতাদের ক্রয় সম্পর্কে ধারণা করা
(v) কখন তাঁরা কিনবেন?	→ }	এবং বণ্টন সম্পর্কে গবেষণা।
(vi) কোথায় তাঁরা কিনবে?	→ }	

উপরিলিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় বাজার গবেষণা সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠানকে পণ্য উৎপাদন থেকে আরম্ভ করে পণ্য বণ্টন পর্যন্ত সর্বস্তরে সাহায্য করতে সক্ষম হয়।

৩.১৪.৮ ক্রেতাদের আচরণ (Consumer Behaviour)

বিক্রয় প্রসার ক্রেতাদের আচরণের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে, বিশেষ করে বাজার যদি ক্রেতাদের পছন্দের (Buyers Preference) উপর নির্ভর করে। ক্রেতাদের আচরণ তাই সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সহজ নয়। কোটলারের (Kotlar) মতে, "Knowing customers is never simple." বিক্রয় প্রসারের অন্যতম লক্ষ্য হল ক্রেতাদের আচরণকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে বিক্রয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করা। যেসব বিষয় ক্রেতাদের আচরণকে প্রভাবিত করে নিচে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

৩.১৪.৯ ক্রেতাদের আচরণ নির্ধারণকারী বিষয় (Factors on which buyers' behaviour depends)

নিম্নলিখিত যে বিষয়গুলি ক্রেতাদের আচরণকে প্রভাবিত করে সেগুলি হল ঃ

(১) **আর্থিক অবস্থা (Financial Condition)** ঃ ক্রেতাদের আর্থিক অবস্থা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। দেশের অর্থনীতি যদি উন্নত হয়, সেক্ষেত্রে ক্রেতাদের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়ে। বর্ধিত ক্রয়-ক্ষমতা ক্রেতাদেরকে নিত্যনতুন পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করে, যা বিক্রয় প্রসারে সাহায্য করে।

(২) **সাংস্কৃতিক বিষয় (Cultural Factor)** ঃ ক্রেতাদের সাংস্কৃতিক পরিবেশ অর্থাৎ যে সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে ক্রেতারা বড়ো হয়ে উঠেছেন, জীবনদর্শন তৈরি হয়েছে সেই বিষয়গুলি ক্রেতাদের আচরণকে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত করে। যে শিশু আমেরিকায় যে জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে বড়ো হয়, তারা যে জাতীয় পণ্য কিনতে আগ্রহী হয়, অপরদিকে ভারতবর্ষের অধিকাংশ শিশুরা সেই ধরনের পণ্যের সাথে পরিচিত হয় না এবং তাঁদের সাংস্কৃতিক পরিবেশও তাদেরকে সেই জাতীয় পণ্য কিনতে প্রলুব্ধ করে না। সাংস্কৃতিক পরিবেশের এই বৈচিত্র্য ক্রেতাদের আচরণকে প্রভাবিত করে যা বিক্রয় প্রসারে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে।

(৩) **সামাজিক শ্রেণী (Social Class)** ঃ মানবজীবনে সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে এই শ্রেণী তৈরি হয় অর্থনৈতিক অবস্থার বিচারে। সেইদিক থেকে উচ্চ-উচ্চ (Upper Upper), নিম্ন-উচ্চ (Lower Upper), উচ্চ-মধ্য (Upper Middle), মধ্যবিত্ত (Midle Class), উচ্চ-নিম্ন (Upper Lower), নিম্ন-মধ্য (Lower Middle), নিম্ন-নিম্ন (Lower Lower) এই কটি ভাগে সামাজিক শ্রেণীর সৃষ্টি। যে দেশে সামাজিক শ্রেণী যে রকম সেই দেশের ক্রেতাদের আচরণও সেই খাতে প্রবাহিত হয় এবং বিক্রয় প্রসার সেই দেশে কেমনভাবে পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে সেই রকমভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

(৪) **পারিবারিক গঠন (Family Structure)** ঃ পরিবারের সদস্যরা সকলেই সম্ভাব্য ক্রেতা। কিন্তু তাদের পণ্যদ্রব্যের চাহিদার মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তবে পরিবারের গঠন যদি শিক্ষা ও সংস্কৃতির মেল বন্ধনে এক দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের পণ্য ক্রয়ের উপর একটি ছাপ পড়ে। সেখানে যে কোনও ধরনের পণ্য প্রবেশ করতে পারে না। ফলে পরিবারের গঠন ক্রেতার আচরণকে প্রভাবিত করে। এই জাতীয় পারিবারিক গঠন সমৃদ্ধ ক্রেতাদের কাছে বিক্রয় প্রসার কেমন হবে সে সম্পর্কে বিক্রয় ব্যবস্থাপককে গভীর ভাবে ভাবতে হয়।

(৫) **ক্রেতাদের বয়স (Age of the buyer)** ঃ ক্রেতাদের বয়স ক্রেতার আচরণকে সরাসরি প্রভাবিত করে। অল্পবয়স্ক ক্রেতাদের যেমন ধরনের পণ্যের চাহিদা থাকে, যুবক, মাঝবয়সি এবং বেশিবয়স্ক ক্রেতাদের চাহিদারও বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ক্রেতাদের বয়স অনুযায়ী আচরণগত পার্থক্য থাকার জন্য বিক্রয় প্রসারেও পরিবর্তন আনতে হয়।

(৬) **কোন্ দেশের উৎপাদন (Country of Origin)** ঃ কোন্ দেশের পণ্য ভোগ করলে আত্মতৃপ্তি লাভ করা যাবে ক্রেতার আচরণে তাও প্রকাশ পায়। যেমন অনেকের ধারণা জাপানের তৈরি পণ্য গুণগত মানে অন্যদের থেকে সেরা। বহু ক্রেতা জাপানের তৈরি পণ্যই শুধু ক্রয় করে। সুতরাং ক্রেতার আচারণ কোন্ দেশের পণ্য বিক্রি হচ্ছে তার উপরও বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

৩.১৪.১০ নতুন পণ্য পরিকল্পনা (New Product Planning)

নতুন পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয় প্রসার সরাসরি সাহায্য করে। এই বিশ্বায়নের (Globalisation) যুগে যেহেতু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার সম্মুখীন, সেজন্য তাঁদেরকে ভাবতে হয় ক্রেতাদের তৃপ্তিসাধনের জন্য কী ধরনের পণ্য উৎপাদন করা প্রয়োজন। সেজন্য নতুন পণ্য উৎপাদনের জন্য সবসময় পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। নতুন পণ্য উৎপাদনের পরিকল্পনা করলেই চলবে না, তাঁর সাথে দরকার এই পণ্য সম্বন্ধে ক্রেতাদের অবহিত করা ও সুষম বণ্টনের বন্দোবস্ত করা। বণ্টন ব্যবস্থা যদি যথাযথ না হয়, সেক্ষেত্রে ক্রেতা ব্র্যান্ডের পণ্য ছেড়ে একই জাতীয় ভিন্ন ব্র্যান্ডের পণ্য ক্রয় করবে। ফলে প্রতিষ্ঠান তার ক্রেতা হারাবে। সেজন্য নতুন পণ্য উৎপাদনের পরিকল্পনার সাথে সাথে বিক্রয় প্রসার কীভাবে হওয়া উচিত সেদিকে দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত জরুরি।

৩.১৫ সারাংশ (Summary)

আধুনিক যুগ বিপণনের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তথ্য ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নতি সমগ্র পৃথিবীকে একটি গ্রামে রূপান্তর (Global Village) করেছে। সেখানে পৃথিবীর সমগ্র বড়ো বড়ো বড়ো বহুজাতিক সংস্থা তাদের পণ্য বিক্রির জন্য অনবরত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রয়াসে তারাই সফল যারা পণ্যের বিপণন সার্থকভাবে চালাচ্ছে। তাই বিপণন ব্যবস্থাপনা এখন এত গুরুত্বপূর্ণ।

বিপণন বলতে বোঝায় মানবিক কার্যকলাপ। যে সব মানবিক কার্যকলাপ বিনিময় প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানের লক্ষ্যে কাজ করে তাই হল বিপণন।

বিপণনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিপণনের বিভিন্ন কার্যকলাপ সঠিক সময়ে, সঠিক ব্যয়ে এবং সঠিক দক্ষতার সাথে সম্পাদন করাই হল বিপণন ব্যবস্থাপনা। তাই, বিপণন ব্যবস্থাপনা হল বিপণন সংক্রান্ত এক সুসংহত কার্যকলাপ যার সাহায্যে কারবারের উদ্দেশ্যসাধন সম্ভব হয়।

বিপণন ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হল বাজার চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণ ও প্রসারণ, বিনিময়ের সর্বাধিকীকরণ, কার্যকরী বিপণন মিশ্রণ গড়ে তোলা, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সুসসম্পর্ক স্থাপন, ভোগের সর্বাধিকীকরণে সাহায্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সাহায্য করা।

বিপণনের গুরুত্ব হল উন্নত মানের জীবনযাত্রা সৃষ্টিতে সাহায্য করা, গণ উৎপাদন ও উদ্বৃত্ত সৃষ্টি, শিল্পের বিকাশ, চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য আনা, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা।

বিপণনের মৌলিক কার্যাবলির মধ্যে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি হল পণ্য পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, পণ্যের মান নিরূপণ ও স্তর বিভাজন, ক্রয় ও একত্রীকরণ, বিক্রয়, গুদামজাতকরণ, পরিবহন, ঝুঁকি গ্রহণ, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।

বিপণন ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক। যে সব বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি হল বিপণন পরিকল্পনা, বাজার ও বিপণন গবেষণা, বিপণন মিশ্রণ, পণ্যের মোড়ক দাম বিজ্ঞাপন ইত্যাদি ঠিক করা, বিপণন সংগঠন গড়ে তোলা, বিপণনকে কারবারের অংশ হিসাবে চিহ্নিত করা।

বিপণন ব্যবস্থাপনার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। মানুষের চাহিদা নিরূপণ থেকে চাহিদাপূরণ ও তৃপ্তিসাধন, কারবারের উন্নয়ন থেকে জাতীয় উন্ময়ন, কারবারি ক্ষেত্রে থেকে সামাজিক ক্ষেত্র, অভ্যন্তরীণ পরিবেশ থেকে বাহ্যিক পরিবেশ সর্বত্র বিপণন ব্যবস্থাপনার ছোঁয়া দেখতে পাওয়া যায়।

বিপণন সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা বর্তমান–যেমন উৎপাদনমুখী, পণ্যমুখী, বিক্রয়মুখী, ক্রেতামুখী ও সমাজমুখী। তবে বিপণন সংক্রান্ত আধুনিক যে মতবাদ আমরা দেখতে পাই তা মূলত চারটি বিষয়ের মধ্যে আবর্তিত। সেগুলি হল ক্রেতা সন্তুষ্টি, সুসংহত বিপণন, সমাজকল্যাণ ও কারবারের মুনাফা।

বিপণন ব্যবস্থাপকের কার্যাবলি এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতামূলক বাজারে। যে সব কাজ তিনি পালন করে থাকেন সেগুলি হল পণ্য সম্পর্কে পরিকল্পনা, বাজার গবেষণা, বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, বিক্রির নীতি ও কৌশল নির্ণয় করা, উন্নয়ন, পর্যবেক্ষণ, পণ্যের নামকরণ, পণ্যমূল্য নির্ধারণ, পণ্য বণ্টন ইত্যাদি।

বিক্রয় প্রসার বিপণন মিশ্রণের এমন একটি অবস্থা যা পণ্য ও সেবা সম্পর্কে বাজারকে অবহিত ও প্ররোচিত করে।

প্রবর্তক কর্তৃক পণ্য, সেবা বা ধারণার ব্যয়যুক্ত নৈর্ব্যক্তিক গণসংযোগ হল বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন নতুন চাহিদা, ক্রেতা ও বাজার সৃষ্টিতে সহায়তা করে। বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দেখতে পাওয়া যায়–যেমন সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন, সিনেমা, বিজ্ঞাপন-ফলক, প্রাচীর-পত্র, পণ্যসজ্জা ইত্যাদি।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচনে বিভিন্ন বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয়, যেমন--ক্রেতাদের প্রকৃতি, ক্রেতাদের সাংস্কৃতিক মান, বাজারের পরিধি, বিজ্ঞাপন ব্যয় ইত্যাদি।

বাজার গবেষণা হল কোনও ঘটনার একটি নিয়মতান্ত্রিক, উদ্দেশ্যমুখী এবং গভীর অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যার সাহায্যে বিপণনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান নির্ণয় সম্ভব হয়।

বাজার গবেষণার সাহায্যে বিপণন ব্যবস্থাপনা সঠিক পণ্য, সঠিক সময়ে, সঠিক বণ্টন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, সঠিক ক্রেতার কাছে, সঠিক দামে বিক্রয় করতে সমর্থ হয়।

ক্রেতার আচরণ বিপণন ব্যবস্থাপনার অন্যতম আলোচ্য বিষয়। ক্রেতাদের আচরণের উপর প্রতিষ্ঠানের পণ্য বিক্রয়ের অবস্থা নির্ভরশীল। যেসব বিষয় ক্রেতাদের আচরণকে প্রভাবিত করে সেগুলি হল--আর্থিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক বিষয়, ক্রেতাদের সামাজিক শ্রেণী, পারিবারিক গঠন, ক্রেতাদের বয়স, উৎপাদনকারী দেশের পরিচয় ইত্যাদি।

৩.১৬ সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ প্রশ্নাবলী এবং উত্তর সংকেত

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলীর ও উত্তর সংকেত

১। বিপণন সংজ্ঞা দিন। উত্তর--৩.৩

(Define Marketing)

২। বিপণন ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়? উত্তর--৩.৪

(What is meant by Marketing Management?)

৩। বিক্রয়মুখী বিপণন বলতে কী বোঝেন? উত্তর--৩.১০

(What do you mean by Sales-oriented marketing?

৪। ক্রেতামুখী বিপণন কী? উত্তর--৩.১০

(What is Customer-oriented Marketing)

৫। বিপণন ও বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন। উত্তর--৩.১২

(Distinguish between Marketing and Selling.)

৬। বিক্রয় প্রসার কী? উত্তর--৩.১৪

(What is Sales Promotion?)

৭। বিজ্ঞাপনের সংজ্যা দিন। উত্তর--৩.১৪.১

(Define advertisement)

৮। বিজ্ঞাপনের দুটি মাধ্যমের উল্লেখ করুন। উত্তর--৩.১৪.৩

(Mention two methods of Advertisement.)

৯। বাজার গবেষণা কাকে বলে? উত্তর--৩.১৪.৫

(What is Market Research?)

১০। ক্রেতার আচরণ বলতে কী বোঝেন? উত্তর ৩.১৪.৮

(What do you mean by Consumer Behaviour?)

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত

১। বিপণন ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দিন। এর লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করুন। উত্তর--৩.৪, ৩.৫

(Define Marketing Management. Discuss its aims.)

২। বিপণন কাকে বলে? বিপণনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন। উত্তর--৩.৩, ৩.৬

(What is Marketing? Discuss the necessity and importance of Marketing.)

৩। বিপণনের কার্যাবলি আলোচনা করুন। উত্তর--৩.৭

(Discuss the functions of marketing.)

৪। বিপণন ব্যবস্থাপনার পরিধি আলোচনা করুন। উত্তর--৩.৯

(Discuss the scope of Marketing Management.)

৫। বিপণন সংক্রান্ত আধুনিক মতবাদ ব্যাখ্যা করুন। উত্তর--৩.১১

(Explain the modern concept of marketing.)

৬। বিপণন ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন, বিক্রয় ও বিপণনের পার্থক্য নির্দেশ করুন।

উত্তর--৩.৮, ৩.১২

(Discuss the features of Marketing Management. Distinguish between selling and marketing.)

৭। বিপণন ব্যবস্থাপকের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করুন। উত্তর--৩.১৩

(Explain the functions of Marketing Manager.)

৮। বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞা দিন। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য নির্দেশ করুন। উত্তর--৩.১৪.১, ৩.১৪.২

(What is Advertisement? Mention the objectives of Advertisement.)

৯। বিজ্ঞাপনের মাধ্যম কাকে বলে? বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়গুলি আলোচনা করুন।

উত্তর--৩.১৪.৩, ৩.১৪.৪

(What is advertisement media? Discuss the factors in determining the media of advertising.)

১০। বাজার গবেষণার সংজ্ঞা দিন। বাজার গবেষণার গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য আলোচনা করুন।

উত্তর--৩.১৪.৫, ৩.১৪.৬, ৩.১৪.৭

(Define Marketing Research. Discuss its importance and objectives.)

১১। ক্রেতাদের আচরণ বলতে কী বোঝেন? ক্রেতাদের আচরণ নির্ধারণকারী বিষয়গুলি কী কী?

উত্তর--৩.১৪.৮, ৩.১৪.৯

(What do you mean by Consumer Behaviour. What are the factors on which the behaviour of consumer depends?)

৩.১৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। কারবার ব্যবস্থাপনা--ভদ্র ও সৎপতি।

২। ব্যবস্থাপনা পরিচয়--পদ্মলোচন গঙ্গোপাধ্যায়।

একক ৪ ❑ আর্থিক ব্যবস্থাপনা (Financial Management)

গঠন (Structure)

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা

৪.৪ আর্থিক ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি

৪.৫ আর্থিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য

৪.৬ মূলধন কাঠামো

৪.৭ মূলধন কাঠামোর বিভিন্ন বিচার্য্য বিষয়

৪.৮ চলতি মূলধন-সংজ্ঞা

৪.৯ স্থির মূলধন ও পরিবর্তনশীল মূলধন

৪.১০ চলতি মূলধন সংগ্রহের উৎস সমূহ

৪.১১ চলতি মূলধনের ব্যবহার

৪.১২ চলতি মূলধন নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

৪.১৩ অর্থ সংস্থানের পদ্ধতি

৪.১৪ সারাংশ

৪.১৫ সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ প্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত

৪.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পড়ার পর আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন--

- আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য
- মূলধন কাঠামো
- চলতি মূলধন
- অর্থ সংস্থানের উৎস

৪.২ প্রস্তাবনা

কারবারি প্রতিষ্ঠান সম্পদ রূপান্তরের মাধ্যম হিসাবে (Resource converter) কাজ করে। কারবার প্রকৃতি থেকে প্রয়োজনীয় কাঁচমাল ও সমাজ থেকে মানবিক সম্পদ সংগ্রহ করে এবং উভয়ের সাহায্যে নতুন সম্পদ সৃষ্টি করে। সেই সম্পদ জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করে জনসাধারণের অভাব পূরণে যেমন সাহায্য করে, তেমনি কারবার নিজের উদ্দেশ্য সাধনে অর্থাৎ মুনাফা অর্জনে সমর্থ হয়। সম্পদের এই রূপান্তর ঘটানোর ক্ষেত্রে অর্থ (Finance) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অর্থ কারবারের প্রাণশক্তি। কারবারের কর্মধারা নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালু রাখতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। আমরা জানি আইনের দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠান একটি কাল্পনিক ব্যক্তি (an artificial being in the eye of law)। যেহেতু প্রতিষ্ঠানকে কাল্পনিক ব্যক্তি হিসাবে ধরে নিতে হয়, সেহেতু এ কথাও মেনে নিতে হয় যে কাল্পনিক ব্যক্তির অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক পর্যায়ে নিজস্ব কোনও অর্থ থাকতে পারে না। বিভিন্ন উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রতিষ্ঠানকে সেই অর্থ সংগ্রহ করতে হয় এবং সংগৃহীত অর্থ এমন ভাবে ব্যয় করতে হয় যার ফলে মুনাফা সৃষ্টি সম্ভব হয় ও কারবারের সার্বিক উন্নতি ঘটে। এককথায় প্রাথমিক ভাবে কারবার বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সম্পদে রূপান্তর ও সেই সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে তার কর্মধারার নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখে। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে অর্থ উপার্জনের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও অর্থ ব্যয় আবশ্যক। নিচের চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি দেখান হল।

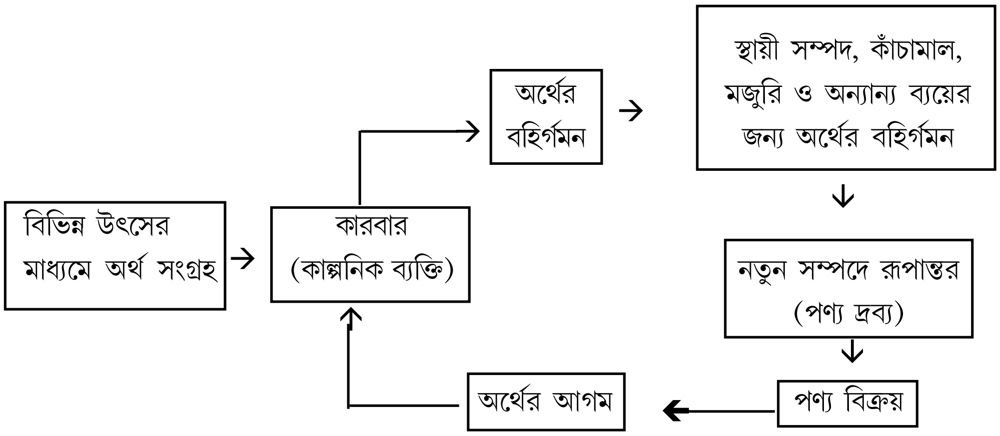

উপরের চিত্রে দেখান হল যে কারবার একদিকে যেমন অর্থের উৎসের দিকে লক্ষ্য রাখে, অপরদিকে সেই সংগৃহীত অর্থ কত ভালো ভাবে ব্যবহার করা যায় সেদিকেও সমান দৃষ্টি রাখে। অর্থের আগম (Inflow of Finance) ও অর্থের বহির্গমন (Outflow of Finance)-এর মধ্যে যদি সঠিক নিয়ন্ত্রণ না থাকে, সেক্ষেত্রে কারবারের কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই বলা যেতে পারে যে সুষ্ঠু কারবার পরিচালনায় অর্থের সঠিক ব্যবস্থাপনা আবশ্যক।

৪.৩ আর্থিক ব্যবস্থাপনা (Financial Management)

সংজ্ঞা (Definition) ঃ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কার্যকরী ক্ষেত্রের (Functional area of management) মধ্যে আর্থিক ব্যবস্থাপনা অন্যতম। কারবার বা অন্যান্য শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের অর্থ সংস্থান ও অর্থলগ্নী সংক্রান্ত কার্যাবলি যে ব্যবস্থাপনার দ্বারা পর্যালোচিত হয় তাই আর্থিক ব্যবস্থাপনা। কারবারকে একটি কাল্পনিক ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। সেজন্য কারবার যেমন অর্থ সংগ্রহ করে তেমনি সেই সংগৃহীত অর্থের সঠিক ব্যবহার কারবারকেই করতে হয়। এই বিশেষ কাজের দায়িত্বে থাকেন আর্থিক ব্যবস্থাপক (Financial Manager)। সুতরাং **আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলতে ব্যবস্থাপনার সেই বিশেষ কর্মপদ্ধতিকে বোঝায় যা প্রয়োগের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাপক অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ের পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন।**

আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যে সব চিন্তাবিদ্ বিভিন্ন ধারণা প্রদান করেছেন তার মধ্যে কয়েকটি ধারণা নিচে দেওয়া হল ঃ

প্রসন্ন চন্দ্রের (Prasanna Chandra) মতে, "Financial Management is broadly concerned with the acquisition and use of funds by a business firm."

অর্থাৎ একটি কারবারি প্রতিষ্ঠানের অর্থের সংগ্রহ ও তার ব্যবহার যে ব্যবস্থাপনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলে।

রমেশ কে. এস. রাও (Ramesh K. S. Rao)-এর মতে, "...The investment decision and the financial decision, are the responsibility of the financial manager, and the art and science of making the right decision for the firm is called financial management."

অর্থাৎ আর্থিক ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব হল অর্থলগ্নীকরণ এবং অর্থসংস্থান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা হল কলা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের মাধ্যমে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে এই ধারণা পেতে পারি যে, এই ব্যবস্থাপনা শুধু অর্থ সংগ্রহ ও তার ব্যবহারের বিষয় নিয়েই আলোচনা করে না, প্রতিষ্ঠানে কত পরিমাণ আর্থিক সম্পদ থাকবে, সম্পদ থেকে ন্যূনতম কত আয় হওয়া উচিত, কত লভ্যাংশ বণ্টন করা উচিত ইত্যাদি বিষয়ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত বিষয় হিসাবে স্বীকৃত। এই অর্থে আর্থিক ব্যবস্থাপনার পরিধি ব্যাপক।

৪.৪ আর্থিক ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি (Functions of Financial Management)

অর্থ সংগ্রহ ও তার কার্যকরী ব্যবহার আর্থিক ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত বিষয়। এই বিশেষ কাজ সঠিক ভাবে সম্পাদন করার জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনার কার্যাবলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কার্যাবলি এবং দ্বিতীয়টি নিয়মমাফিক আর্থিক কার্যাবলি। নিচে এই দুই প্রকার কার্যাবলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

(১) গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কার্যাবলি (Important Financial Functions) ঃ গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কার্যাবলি আর্থিক ব্যবস্থাপক দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই এই বিশেষ কাজকে **ব্যবস্থাপনাগত আর্থিক কার্যাবলি** (Managerial Finance Function) হিসাবেও অভিহিত করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কার্যাবলি বলতে প্রতিষ্ঠানের মূলত তিনটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত কাজকে বোঝায় এবং এগুলো হল যথাক্রমে অর্থলগ্নীকরণ সিদ্ধান্ত (Investment Decision), অর্থসংস্থান সিদ্ধান্ত (Financing Decision) এবং লভ্যাংশ-নীতি

সিদ্ধান্ত (Dividend Decision)। **জেমস সি. ভ্যান হরন্** (James C. Van Horne) তাঁর *Financial Management and Policy* গ্রন্থে বলেছেন যে, প্রতিষ্ঠান অর্থ সংক্রান্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ঃ অর্থলগ্নীকরণ সিদ্ধান্ত, অর্থসংস্থান সিদ্ধান্ত এবং লভ্যাংশনীতি সিদ্ধান্ত (The functions of finance involve three major decisions the firm must take : the investment decision the financing decision and the diveidend decision)।

উপরের আলোচনা থেকে আর্থিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কার্যাবলি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ধারণা পাওয়া যায়--

(ক) **অর্থলগ্নীকরণ (Investment Decision)** ঃ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তি ক্রয় করে। এর মধ্যে কিছু সম্পত্তি হল দীর্ঘমেয়াদী (Long-term assets) এবং কিছু সম্পত্তি হল স্বল্পমেয়াদী (Short-term assets)। কী জাতীয় সম্পত্তিতে কত অর্থ ব্যয় করা হবে সেই সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণই হল অর্থলগ্নীকরণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। দীর্ঘমেয়াদী সম্পত্তিতে অর্থলগ্নীকরণকে Capital budgeting decision এবং স্বল্পমেয়াদী সম্পত্তিতে অর্থলগ্নীকরণকে (Working capital management decision বলা হয়।

(খ) **অর্থ সংস্থান (Fanancing Decision)** ঃ কী জাতীয় সম্পত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করা হবে সেই সম্পর্কিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত অর্থলগ্নীকরণ সিদ্ধান্তের মধ্যে পড়ে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের মূলধন কাঠামো (Capital Structure) বা মূলধনের কী জাতীয় মিশ্রণ (Capital Mix) হবে সেই জাতীয় সিদ্ধান্ত অর্থসংস্থান সিদ্ধান্তের অন্তর্গত বিষয়। অর্থাৎ মূলধন কাঠামোতে কত পরিমাণ ঋণ মূলধন থাকবে (Borrowed Capital) এবং কত পরিমাণ নিজস্ব মূলধন (Owned Capital) থাকবে, সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণই হল অর্থসংস্থানগত সিদ্ধান্তগ্রহণ।

(গ) লভ্যাংশ নীতি (Dividend Policy) ঃ প্রতিষ্ঠান যে মুনাফা অর্জন করে তার কত অংশ শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন করবে এবং কত অংশ ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করবে (Retention) সেই সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ লভ্যাংশ নীতির অন্তর্গত বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়। সাধারণত কোনও কারবারই তার অর্জিত লাভের পুরোটাই বণ্টন (Cent percent pay out) করে না, কিছু অংশ 'সঞ্চয় তহবিলে' (Reserve Fund) জমা রাখে। লাভের কতটা অংশ মালিকদের মধ্যে বণ্টিত হবে আর কতটা সঞ্চয় তহবিলে জমা হবে এই নীতি তারই দিক নির্দেশ করে।

উপরের তিনটি কার্যাবলি ব্যতিরেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কার্যাবলি হল আর্থিক বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ।

(ঘ) **আর্থিক বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ (Financial Analysis & Control)** ঃ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার সেই হাতিয়ার যার সাহায্য ছাড়া কারবারি প্রতিষ্ঠান তার কাজ চালাতে পারে না। আর্থিক নিয়ন্ত্রণ হল অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলি যেমন প্রতিষ্ঠানের মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণ, অর্থ সংগ্রহের উপায়, তার বিনিয়োগ, লভ্যাংশ বণ্টন সংক্রান্ত বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। এই নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় ও আর্থিক বিশ্লেষণের সাহায্য নিতে হয়, যেমন--আর্থিক অনুপাত (Financial Ratios), আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ (Financial Statement Analysis) ইত্যাদি।

(২) **নিয়মমাফিক কার্যাবলি (Routine Functions)** ঃ

আর্থিক ব্যবস্থাপনার নিয়মমাফিক কার্যাবলির মধ্যে যেগুলি অন্তর্ভুক্ত সেগুলি হল ঃ

(ক) নগদ আগম (Cash inflow) এবং নির্গমের (Cash outflow) উপর লক্ষ্য রাখা এবং নগদ অর্থের প্রকৃত পরিমাণ উল্লেখ করা;

(খ) লগ্নিপত্র (Securities), বীমাপত্র এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাগজ সঠিক ভাবে গচ্ছিত রাখা;

(গ) নতুন কোনও অপ্রচলিত (non-conventional) অর্থ সংগ্রহের উৎসের প্রতি নজর রাখা; ও

(ঘ) হিসাব ও তথ্যাদি সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আর্থিক ব্যবস্থাপনার কার্যাবলিকে নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে তুলে ধরা হল ঃ

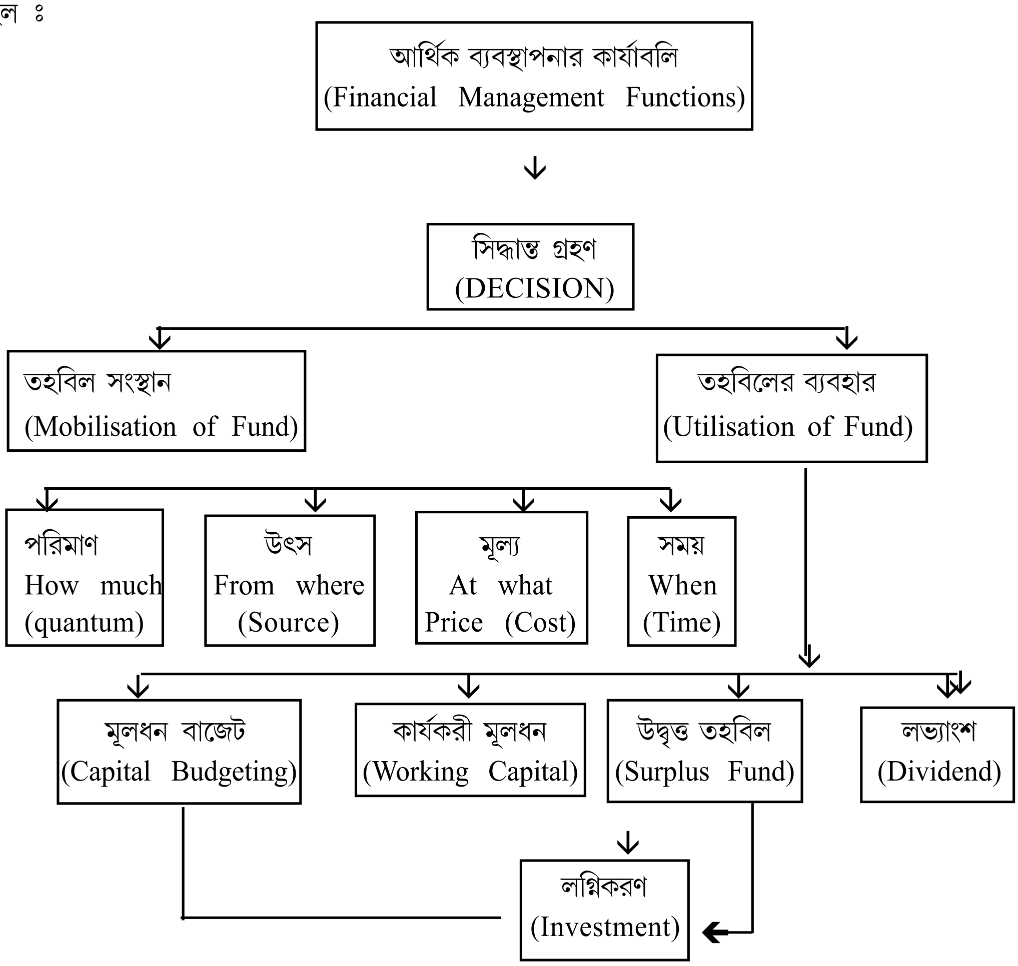

৪.৫ আর্থিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য (Objectives of Financial Management

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় কিছু উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। আমরা জানি যে আর্থিক ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যেমন--(ক) কত পরিমাণ অর্থ প্রতিষ্ঠান সংগ্রহ করবে ও কোন্ কোন্ উৎস থেকে তা সংগৃহীত হবে, (খ) কোন্ কোন্ খাতে তা লগ্নি করা হবে ও (গ) কত পরিমাণ লভ্যাংশ বণ্টন করা হবে। আর্থিক উদ্দেশ্য স্থির না করে এই সকল সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করতে পারে না। এ কথা সঠিক যে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক উন্নতি মালিকের আর্থিক উন্নতিতে সাহায্য করে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের

আর্থিক উন্নতি কী ভাবে প্রকাশ করা হবে? যথেষ্ট পরিমাণ মুনাফা অর্জনই (Profit maximisation) সঠিক আর্থিক উন্নতির মাপকাঠি, না কি সম্পদের সর্বাধিকরণই (Wealth maximisation) প্রতিষ্ঠানের আর্থিক উন্নতির সূচক। এই দুটি বিষয় আলোচনার মাধ্যমেই আর্থিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা যায়।

(১) মুনাফার সর্বাধিকরণ (Profit Maximisation)

প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে মুনাফা অর্জনের আশায় এবং প্রবর্তন চেষ্টা করেন কী ভাবে এই মুনাফার হার বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন রকম অর্থব্যবস্থার মধ্যে কাজ করে। যদি প্রতিষ্ঠান বাজার অর্থনীতির (Market Economy) মধ্যে কাজ করে তাহলে যে দ্রব্য থেকে অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব, প্রতিষ্ঠান সেই জাতীয় দ্রব্যই উৎপাদন করবে। অপরদিকে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থার মধ্যে কাজ করলে দ্রব্য উৎপাদনের ব্যাপারে সরকারি নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে হয়, ফলে অধিক মুনাফা অর্জন করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় ওঠে না। কিন্তু যে অর্থব্যবস্থার মধ্যেই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক না কেন, প্রবর্তক বা কারবারি মুনাফা সর্বাধিকীরণের দিকে লক্ষ্য রেখেই কারবার পরিচালনা করেন। এর ফলে একদিকে যেমন তার স্বার্থসিদ্ধি হয় অপর দিকে তেমনি সামাজিক দায়িত্ব পালিত হয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, মুনাফার সর্বাধিকীকরণ বলতে আমরা কি শুধু মনে করব যে এটা কারবারির স্বার্থ রক্ষার সূচক? বিষয়টিকে শুধু কারবারির ব্যক্তিগত দিক দিয়ে বিচার করলে চলবে না, কারণ মুনাফা একটি কার্যকরী ধারণা এবং অর্থনৈতিক দক্ষতা পরিমাপ করার মানদণ্ড। কারবারি যখন কোনও বিশেষ কাজের মূল্যায়ন করে তখন সেই কাজের উৎপাদিকা শক্তিও পরিমাপ করে। অর্থাৎ সেই কাজে কত অর্থ বিনিয়োগ হয়েছে এবং সেই বিনিয়োজিত অর্থের পরিবর্তে কত মুনাফা অর্জিত হয়েছে তার তুলনামূলক আলোচনা করে থাকে। যদি দেখা যায় মুনাফা অর্জনে প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হয়েছে, বা মুনাফার সর্বাধিকীকরণ সম্ভব হয় নি, তাহলে কারবারি সেই কাজে আগ্রহ হারায়। সুতরাং 'মুনাফার সর্বাধিকীকরণ' নামে এই বিশেষ সূচক আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে।

(২) সম্পদ সর্বাধিকীরণ (Wealth Maximisation) ঃ সম্পদ সর্বাধিকীকরণ ধারণাকে বর্তমানে সারা পৃথিবীতে আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সঠিক কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণের হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করা হয়। সম্পদ সর্বাধিকরণ শব্দের অর্থ হল 'কোন কর্মপন্থার বর্তমান নিট মূল্যের সর্বাধিকরণ' (maximising the net present value of a course of action) । বর্তমান নিট মূল্য বলতে বোঝায় সুবিধার (benefits) বর্তমান মোট মূল্য (Gross Present Value) ও সেই সুবিধা অর্জন করার জন্য যে বিনিয়োগ করা হয়েছে এই দুটি বিষয়ের অন্তর। বর্তমান মোট মূল্য নির্ধারণ করা হয় যে সুবিধাগুলি বৎসরান্তে পাওয়া যাবে সেগুলিকে একটি নির্দিষ্ট বাট্টার হার দিয়ে ভাগ করার মাধ্যমে। যদিও কোন বিশেষ কর্মপন্থার বর্তমান নিট মূল্য ধনাত্মক হয় অর্থাৎ বর্তমান মোট মূল্য প্রারম্ভিক বিনিয়োগ থেকে বেশি হয়, তাহলে সেই কর্মপন্থাকে গ্রহণ করা হয় আর ঋণাত্মক হলে তা বর্জন করা হয়। যে সূত্রের সাহায্যে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয় তা হল—

$$W=\frac{R_1}{(1+K)}+\frac{R_2}{(1+K)^2}+\frac{R_3}{(1+K)^3}+\cdots\cdots+\frac{R_n}{(1+K)^n}-1$$

W= বর্তমান নিট মূল্য, R_1, R_2, R_3..........R_a = বিভিন্ন বছর হতে প্রাপ্ত সুবিধা, K= বাট্টার হার এবং I = বিনিয়োগ।

পরের আলোচনা থেকে আমরা যে বিষয়গুলি জানতে পারি সেগুলি হল—

(ক) কর্মপন্থা থেকে যে সুবিধাগুলি পাওয়া যাবে সেগুলি মুনাফার পরিমাণ দিয়ে প্রকাশ করা হবে না। সুবিধাগুলিকে নগদ অর্থের আগম (Cash Inflow) দ্বারা প্রকাশ করা হবে। কারণ, এই বিষয় দিয়ে যদি সুবিধাকে প্রকাশ করা যায় তাহলে মুনাফা দিয়ে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যে সমালোচনা রয়েছে তা দূর করা যায় এবং অনেক যুক্তিগ্রাহ্য হয়।

(খ) সম্পদ সর্বাধিকীকরণ সুবিধার পরিমাণগত ও গুণগত উভয় প্রকার বিষয় দ্বারাই নির্ধারিত হয়। সুবিধার পরিমাণগত বিষয় হল নগদ অর্থের আগম ও গুণগত বিষয় হল সেই অর্থের আগমকে বাট্টার হার দিয়ে ভাগের মাধ্যমে তার বর্তমান মূল্যে নির্ধারণ। সুবিধা প্রাপ্তি যদি নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট হয় তাহেল সেই কর্মপন্থার মূল্যও বেশি হয়। কিন্তু সুবিধা প্রাপ্তি যদি নির্দিষ্ট না হয়, কর্মপ্রন্থার মূল্যও হ্রাস পায়।

(গ) মোট বর্তমান মূল্য (Gross Present Value) নির্ধারণ করার ব্যাপারে বাট্টার হার স্থির করে নিতে হয় এবং তা অনুমান-নির্ভর। সুবিধাগুলিকে বাট্টার হার দিয়ে ভাগ করার ব্যাপারে যুক্তি হল অর্থের সময় মূল্য রয়েছে, তাই যে সুবিধাগুলি ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে সেগুলিকে বাট্টার হার দিয়ে ভাগ করে তার বর্তমান মূল্য প্রকাশ করা হয়।

(ঘ) সম্পদ সর্বাধিকীকরণের সাথে মালিকের অর্থনৈতিক কল্যাণেরও (Owner's economic welfare) যোগসূত্র রয়েছে। সম্পদের সর্বাধিকীকরণের সাথে সাথে মালিকেরও অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে এবং পরবর্তী পর্যায়ে মালিক তাঁর অর্থ এমনভাবে ব্যবহার বা বিনিয়োগ করেন যার ফলে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ বৃদ্ধি পায়। যে কোনও কোম্পানির ক্ষেত্রে বিষয়টি একইভাবে প্রযোজ্য। সম্পদের সঠিক বিনিয়োগ কোম্পানির আর্থিক উন্নতিতে সাহায্য করে, যার ফলে প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের বাজার মূল্য (Market value of the share) বৃদ্ধি পায়।

৪.৬ মূলধন কাঠামো (Capital Structure)

সংজ্ঞা (Definition) ঃ কাঠামো বলতে আমরা সাধারণত একটি আকার, অবয়ব বা গঠন বুঝি। যে কোনও গঠনের একটি আকৃতি এবং প্রকৃতি থাকে। মূলধন কাঠামোরও সেইরকম আকৃতি ও প্রকৃতি বর্তমান। কোম্পানি যে সব উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে সেই সংগৃহীত অর্থের সমষ্টি হল মূলধনের আকৃতি এবং যে জাতীয় অর্থ সংগ্রহ করে তাকে মূলধনের প্রকৃতি বলে। সাধারণত কোম্পানির মূলধনের মধ্যে ঋণ মূলধন ও ইক্যুইটি মূলধন মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। মূলধন মিশ্রণের মধ্যে ঋণ মূলধন ও ইক্যুইটি মূলধনের অনুপাতিক হারকে মূলধন কাঠামো বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যদি কোনও কোম্পানির ঋণ মূলধনের পরিমাণ ২ কোটি টাকা এবং ইক্যুইটি মূলধনের পরিমাণ ১ কোটি টাকা হয়, সেক্ষেত্রে ঋণ ও ইক্যুইটির অনুপাত হবে ২ ঃ ১, যাকে মূলধন কাঠামো বলা হয়। কোনও প্রতিষ্ঠানের মূলধন কাঠামোতে যদি ঋণ মূলধন না থাকে, সেইজাতীয় মূলধন-কাঠামোবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে Unlevered প্রতিষ্ঠান বলে এবং যে প্রতিষ্ঠানে ইক্যুইটি মূলধনের সাথে সাথে ঋণ মূলধনও থাকে, সেই মূলধন-কাঠামোবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে levered প্রতিষ্ঠান বলে। মূলধন কাঠামো সম্পর্কে পণ্ডিতগণ যে সব সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাদের মধ্যে কয়েকটি সংজ্ঞা নিচে দেওয়া হল। ব্রেলে ও মেয়ার্সের মতে (Brealay & Mayers) "The firm's mix of different securities is known as Capital Structure." অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের লগ্নির মিশ্রণকে মূলধন কাঠামো (Capital Structure) বলে।

জে. জে. হ্যাম্পটনের (J.J. Hampton) মতে, 'Capital structure is the composition of debt and equity securities that comprise a firm's financing of its assets." অর্থাৎ মূলধন কাঠামো হল ঋণ ও ইক্যুইটি মূলধনের মিশ্রণ যা কোনও প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য কাজে লাগে।

গার্সটেনবার্গের (Gerstenberg) মতে, "By Capital structure we mean the kinds of securities and their proportionate amounts that make up the capitalisation." অর্থাৎ মূলধন কাঠামো বলতে মূলধনায়নের জন্য বিভিন্ন লগ্নিপত্র এবং তাদের আনুপাতিক পরিমাণকে বোঝায়।

৪.৬.১ সর্বোত্তম মূলধন কাঠামো (Optimum Capital Structure)

সংজ্ঞা (Definition) ঃ সর্বোত্তম মূলধন কাঠামো হল ঋণ ও ইক্যুইটি মূলধনের সেই অনুপাত যার ফলে কোম্পানির মূল্য (Firm value) সর্বোচ্চ হয়। কোম্পানির মূল্য তখনই সর্বোচ্চ হয় যখন শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ সর্বোচ্চ হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে কোম্পানির মূল্য বলতে আমরা কী বুঝি? পণ্ডিতরা বলেন যে ঋণের ও ইক্যুইটির বাজার মূল্য যৌথভাবে কোম্পানির মূল্য গড়ে তোলে। অর্থাৎ —

কোম্পানির মূল্য	=	ঋণের বাজার মূল্য	+	ইক্যুইটির বাজার মূল্য
(Firm value)		(Market value of Debt)		(Market value fo Equity)

ঋণের ও ইক্যুইটির বাজার মূল্য বলতে প্রতিষ্ঠানের এই ধরনের লগ্নির অন্তর্নিহিত মূল্যকে (Intrinsic value) বোঝায়। প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির পরিচালন ব্যবস্থা যদি সুনির্দিষ্ট ও দৃঢ়ভাবে চলতে থাকে, সেক্ষেত্রে উভয় প্রকার লগ্নির বাজার মূল্য (Market value) লিখিত মূল্য (Face value) থেকে বেশি হয় যা' যে কোনও প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের সূচক। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে যখন এই প্রকার লগ্নির বাজার মূল্য বৃদ্ধি পায় তখন প্রতিষ্ঠানের মূল্য ও সেই সাথে শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদও বৃদ্ধি পায়।

সর্বোত্তম মূলধন কাঠামো সম্পর্কে এজরা সলোমন (Ezra Solomon) তাঁর *Theory of Financial Management* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন সেটি হল ঃ কাঠামো হল ঋণ ও ইক্যুইটির মিশ্রণ যা কোনও কোম্পানির বাজার-মূল্যকে সর্বোচ্চ করে অর্থাৎ যা কিনা উদ্বর্তপত্রের ক্রেডিট দিকের মালিকানা স্বত্ব ও অন্যান্য দাবির সমষ্টির মূল্যকে বোঝায়।

"Optimum leverage can be defined as that mix of debt and equity which will maximise the market value of a company, i.e., the aggregate value of claims and ownership interests represented on the criedit side of the balance sheet."

সর্বোত্তম মূলধন কাঠামো হল ঋণ ও ইক্যুইটির মিশ্রণ যা কোনও কোম্পানির বাজার মূল্যকে সর্বোচ্চ করবে অর্থাৎ যা কিনা উদ্বর্তপত্রের ক্রেডিট দিকের মালিকানা স্বত্ব ও অন্যান্য দাবির সমষ্টির মূল্য।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে কোম্পানির মূলধন কাঠামোর সর্বোত্তম রূপ নির্ধারণ করা গঠিন কাজ। এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করা সহজ কিন্তু বাস্তবে এর রূপায়ণ সাধারণত সম্ভব হয় না।

৪.৭ মূলধন কাঠামোর বিভিন্ন বিচার্য বিষয় (Factors on which Capital Structure depends)

কোম্পানির মূলধন কাঠামো কেমন হবে তা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এ সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত পাওয়া যায় Pearson Hunt, Charles Williams এবং Gordon Donaldson-এর লিখিত *Basic Business Finance* গ্রন্থে। এঁরা মূলধন কাঠামো গঠনের জন্য যে সব বিষয় বিবেচনা করার সুপারিশ করেছেন তাদেরকে এককথায় FRICT বলা হয়। FRICT শব্দটিকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা হয় ঃ

F — Flexibility (নমনীয়তা)

R — Risk (ঝুঁকি)

I — Income (আয়)

C — Control (নিয়ন্ত্রণ)

T — Time (সময়)

তবে শুধু উপরের বিষয়গুলি মূলধন কাঠামো নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যেমন—

কোম্পানির আকৃতি (Size of the Company)

কোম্পানির প্রকৃতি (Nature of the Company)

ইক্যুইটির ওপর কারবার (Trading on Equity)

মূলধন বাজারের অবস্থা (Condition of the Capital Market)

মূলধন সংগ্রহের ব্যয় (Cost of Capital) ইত্যাদি।

(১) **কোম্পানির আকৃতি (Size of the Company)** ঃ কোম্পানির আকৃতি যদি বৃহদায়তন হয় তাহলে মূলধনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। যেহেতু শুধুমাত্র ইক্যুইটি শেয়ার দিয়ে বৃহদায়তন কোম্পানির মূলধনের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয় না এবং এ ব্যাপারে সরকারের বিধি-নিষেধ রয়েছে, তাই ঋণ মূলধনের পরিমাণও এই জাতীয় কোম্পানিতে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। মাঝারি ও ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রেও আজকাল ঋণ মূলধন যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে।

(২) **কোম্পানির প্রকৃতি (Nature of the Company)** ঃ বিভিন্ন কোম্পানির প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের। যদি বৃহৎ কিংবা মাঝারি উৎপাদনকারী সংস্থা হয়, অথবা শুধু কারবারি সংস্থা হয় তাহলে কোম্পানির চরিত্র অনুযায়ী মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় ও মূলধন কাঠামো নির্ধারিত হয়।

(৩) **ইক্যুইটির উপর কারবার (Trading on equity)** ঃ কোম্পানির মূলধন কাঠামোতে যদি ইক্যুইটি শেয়ারের অংশ প্রেফারেন্স শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের অংশ থেকে কম হয় তাহলে তাকে উচ্চ-বিন্যস্ত মূলধন (High-geared Capital) এবং যদি বেশি হয় তাহলে তাকে নিম্ন-বিন্যস্ত মূলধন (Low-geared Capital) বলে। উচ্চবিন্যস্ত মূলধনের ক্ষেত্রে কোম্পানি যদি লাভের মাত্রা বাড়াতে পারে তাহলে কোম্পানি, বাইরের দেনা অর্থাৎ সুদ প্রদান করার পরে ইক্যুইটি শেয়ার মালিকদের অধিক মাত্রায় লভ্যাংশ দিতে সক্ষম হয়। সুতরাং, কোম্পানির মূলধন কাঠামোর ঋণ মূলধনকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে যদি ইক্যুইটি শেয়ারের পাওয়া বৃদ্ধি করা যায় তবে এই অবস্থাকে ইক্যুইটির উপর কারবার বলে। ইক্যুইটির উপর কারবারের সাথে সাথে কোম্পানির শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পায় কারণ, শেয়ার-

প্রতি আয় (EPS) বৃদ্ধি পায়। নিম্ন-বিন্যস্ত মূলধনের ক্ষেত্রে এর বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে Gearing ও Financial Leverage শব্দ দুটিকে সাধারণত আলাদা করা হয় না। Leverage শব্দটি আমেরিকাতে ব্যবহৃত হয় এবং Gearing শব্দটি ইংল্যান্ডে ব্যবহৃত হয়। উচ্চ-বিন্যস্ত মূলধন কাঠামোতে কোম্পানির আয় সমান্তর প্রগতিতে বৃদ্ধি পেলে ইক্যুইটি শেয়ার মালিকগণের আয় কীভাবে প্রায় গুণোত্তর প্রগতিতে (Geometric Progression) বৃদ্ধি পায়, তা একটি উদাহরণের সাহায্যে তুলে ধরা হল ঃ

বিকল্প (Alternatives)

	I	II	III
ইক্যুইটি মূলধন (শেয়ার-প্রতি ১০ টাকা)	১০, ০০০	৫,০০০	৩,০০০
১০% ডিবেঞ্চার	১০,০০০	১৫,০০০	১৭,০০০
	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
সুদ ও কর বাদ দেবার পূর্বে আয় [Earnings Before Interest & Tax. (EBIT)]	৪০,০০০	৪০,০০০	৪০,০০০
বাদ ঃ ডিবেঞ্চারে উপর সুদ ১০%	১,০০০	১,৫০০	১,৭০০
কর বাদ দেবার পূর্বে আয় (Earnings After Tax)	৩৯,০০০	৩৮,৫০০	৩৮,৩০০
বাদ ঃ কর (ধরা যাক ৫০%)	১৯,৫০০	১৯,২৫০	১৯,১৫০
কর বাদ দেবার পর আয় (Earnings after Tax)	১৯,৫০০	১৯,২৫০	১৯,১৫০
ইক্যুইটি শেয়ারের সংখ্যা	১,০০০	৫০০	৩০০
ইক্যুইটি শেয়ার-প্রতি আয়	১৯,৫০০+১,০০০	১৯,২৫০+৫০০	১৯,১৫০+৩০০
[Earning Per Share (EPS)]	১৯,৫০ টাকা	৩৮.৫০ টাকা	৬৩.৮৩ টাকা

উপরের উদাহরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বিকল্প III -এর ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় অন্যান্য বিকল্প থেকে বেশি, কারণ এই বিকল্পে উচ্চ-বিন্যস্ত মূলধন থাকার দরুন ইক্যুইটি শেয়ারের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে এবং যার ফলে শেয়ার-প্রতি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ কর বাদ দেবার পরে যদিও আয়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে কিন্তু ইক্যুইটি শেয়ারের সংখ্যা কম থাকার জন্য শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৪) **মূলধন বাজারের অবস্থা (Position of capital market)** ঃ মূলধন বাজারের তেজি ভাব ও মন্দা ভাবের উপরও কোম্পানির মূলধনের পরিমাণ নির্ভর করে। মূলধনের বাজারে তেজি ভাব থাকলে কোম্পানিতে শেয়ার মূলধনের পরিমাণ বাড়ে কারণ জনসাধারণ শেয়ার কিনতে আগ্রহী হয়। মন্দার বাজারে এর বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, যদিও একথা সব সময় সত্য নয়।

(৫) **মূলধন সংগ্রহের ব্যয় (Cost of Capital)** ঃ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে মূলধন সংগ্রহের ব্যয় স্বীকৃত। এ কথা ঠিক যে ইক্যুইটি শেয়ারের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের ব্যয় ঋণ মূলধন সংগ্রহের ব্যয় অপেক্ষা বেশি। আবার বেশি পরিমাণ ঋণ মূলধন কোম্পানির ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। সুতরাং কোম্পানি যদি অধিক পরিমাণ ঝুঁকি বহন করতে চায় তাহলে বেশি পরিমাণ ঋণ মূলধন জোগাড় করবে এবং ঝুঁকি বহন করতে চাইলে ইক্যুইটি মূলধন বিনিয়োগ করবে যার ফলে মূলধন সংগ্রহের ব্যয় বাড়বে।

(৬) **নমনীয়তা (Flexibility)** ঃ কোম্পানির মূলধন কাঠামো এমন হবে যাতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই কাঠামোর পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। ভবিষ্যতে কোনও প্রকল্প শুরু করার সময় কত অর্থ ব্যয় করতে হবে এবং সেই সময় কোনও উৎস থেকে কত অর্থ সংগ্রহ করা যাবে তার ব্যবস্থা রাখা দরকার। যদি কোম্পানি প্রথমেই ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন সম্পূর্ণ কাজে লাগিয়ে দেয় তাহলে ভবিষ্যতে মূলধনের প্রয়োজন হলে ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন আর ব্যবহার করা যাবে না। সেক্ষেত্রে কোম্পানির অসুবিধা দেখা দেবে। সুতরাং মূলধন কাঠামো এমন ভাবে স্থির করতে হবে যাতে নমনীয়তা কোনও ভাবেই হ্রাস না পায়।

(৭) **ঝুঁকি (Risk)** ঃ কোম্পানি যদি বেশি পরিমাণ ঝুঁকি নিতে আগ্রহী হয় তাহলে ঋণ মূলধন বেশি জোগাড় করবে। ঋণ মূলধনে ঝুঁকি বেশি কারণ কোম্পানি যদি সময়মতো সুদ দিতে না পারে তাহলে ঋণ মূলধন সরবরাহকারীরা কোম্পানির অবসায়ন দাবি করতে পারে কারণ সুদ প্রদান আইনানুযায়ী বাধ্যতামূলক। কোম্পানি যদি ঝুঁকি নিতে রাজি না হয় তাহলে ইক্যুইটি মূলধন ব্যবহার করে কোম্পানি কারবার চালাবে।

(৮) **আয় (Income)** ঃ কোম্পানির আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে ইক্যুইটির উপর কারবার বৃদ্ধি পায়। সুতরাং কোম্পানির আয় বৃদ্ধি পেলে ইক্যুইটি মূলধনে বিনিয়োগের পরিমাণ ঋণ মূলধন থেকে কম হবে।

(৯) **নিয়ন্ত্রণ (Control)** ঃ কোম্পানি পরিচালনায় বাইরের ব্যক্তিদের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ কোম্পানি পরিচালনার ক্ষেত্রে কাম্য নয়। তাদের দ্বারা যাতে কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত না হয় তার জন্য মূলধন কাঠামোতে ইক্যুইটি শেয়ার মালিকদের পরিমাণ সঠিক অনুপাতে বৃদ্ধি করা বাঞ্ছনীয়।

(১০) **সময় (Time)** ঃ মূলধন যদি দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহার করতে হয় তাহলে ইক্যুইটি শেয়ার বা দীর্ঘকালীন ঋণ মূলধনের সাহায্যে মূলধন কাঠামো গঠন করতে হবে। স্বল্পকালীন অর্থের প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক বা জন আমানত (Public deposit) ব্যবহার করা হয়।

(১১) **আইনগত বিষয় (Legal aspect)** ঃ কোম্পানির প্রকৃতি অনুযায়ী মূলধন কাঠামো নির্ধারণ করতে হয়। সীমিত দায়যুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে মূলধন কাঠামো হল ইক্যুইটি শেয়ার, অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার ও ঋণ মূলধনের মিশ্রণ। এইজাতীয় কোম্পানি বিলম্বিত শেয়ার বিলি করতে পারে না। অপরপক্ষে সীমিত দায়যুক্ত ঘরোয়া কোম্পানি বিলম্বিত শেয়ার বিলি করতে পারে। আবার ব্যাঙ্কিং কোম্পানির ক্ষেত্রে মূলধন কাঠামো হল শেয়ার মূলধন এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ সংগ্রহ ইত্যাদির মিশ্রণ। সুতরাং বিভিন্ন কোম্পানির আইনগত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে মূলধন কাঠামো নির্বাচন করা হয়।

৪.৮ চলতি মূলধন (Working Capital)

সংজ্ঞা (Definition) : কারবারকে সচল রাখার ক্ষেত্রে চলতি মূলধন খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেবলমাত্র স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠান তার উৎপাদন প্রক্রিয়া বা দৈনন্দিন কাজকর্ম চালাতে পারে না। সুতরাং স্থায়ী মূলধনের পাশাপশি চলতি মূলধনেরও আবশ্যক।

চলতি মূলধন বলতে আমরা সেই মূলধনকে বুঝি যা কারবারের দৈনন্দিন কাজ সম্পাদনের জন্য আবশ্যক হয়। কারবারের দৈনন্দিন কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে যে সব ব্যয়গুলি করতে হয় সেগুলি হল কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিকদের মজুরি প্রদান, অফিস সংক্রান্ত ব্যয়, বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যয় ইত্যাদি। এই ব্যয় ছাড়া কারবার তার কাজকর্ম সচল রাখতে পারে না। তাই উৎপাদন শুরু করার আগে উপরিউক্ত ব্যয়গুলি বহন করার জন্য কারবারকে যে পরিমাণ মূলধনের সংস্থান করতে হয় তাকে চলতি মূলধন বলে।

ব্যবসার ক্ষেত্রে চলতি মূলধনের আবশ্যিকতা সম্বন্ধে W.H. Lough ১৯১৭ সালে প্রকাশিত তাঁর *Business Finance* গ্রন্থে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন : "Sufficient Working Capital must be provided in order to take care of the normal process of purchasing raw materials and supplies, turning out finished products, selling the products and waiting for payments to be made. If the original estimates of working capital are insufficient, some emergency measures must be resorted to or the business will come to a dead stop."

অর্থাৎ কাঁচামাল এবং সামগ্রী ক্রয়, এগুলির উৎপাদিত পণ্যে পরিবর্তন, পণ্যের বিক্রয় এবং বিক্রিত পণ্যের অর্থপ্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা ইত্যাদি কাজের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ চলতি মূলধনের সংস্থান থাকা আবশ্যিক। যদি প্রাথমিক ভাবে চলতি মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণ সঠিক না হয়, সেক্ষেত্রে কিছু জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়, নতুবা ব্যবসা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।

চলতি মূলধনের পরিমাণকে বিভিন্ন উপায়ে নির্ধারণ করা যায়। এই উপায়গুলি হল—

(ক) মোট চলতি মূলধন (Gross Working Capital) : প্রতিষ্ঠানের সমস্ত চলতি সম্পত্তি মূল্যের সমষ্টিকে মোট চলতি মূলধন বলে।

(খ) নীট চলতি মূলধন (Net Working Capital) : প্রতিষ্ঠানের সমস্ত চলতি সম্পত্তির যোগফল থেকে সমস্ত চলতি দায় বাদ দেবার পর যে মূলধন অবশিষ্ট থাকে, তাকে নীট চলতি মূলধন বলে।

৪.৯ স্থির চলতি মূলধন এবং সাময়িক বা পরিবর্তনশীল চলতি মূলধন (Fixed and Temporary or Fluctuating or Variable Working Capital)

স্থির চলতি মূলধন (Fixed Working Capital) : প্রতিষ্ঠান একটি চলমান ধারণা। প্রতিষ্ঠানকে সচল রাখতে গেলে চলতি মূলধনের যোগান পর্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কত পরিমাণ চলতি মূলধন লাগবে তা যদি সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানকে সচল রাখা মুশকিল। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কর্মধারাকে অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হলে যে পরিমাণ মূলধন অবশ্যই প্রয়োজন তাকে স্থির চলতি মূলধন বলে।

পরিবর্তনশীল চলতি মূলধন (Variable/Fluctuating/Temporary Working Capital) ঃ স্থির চলতি মূলধনের পরিমাণ ছাড়াও আরও কিছু পরিমাণ অর্থ প্রতিষ্ঠানকে রাখতে হয়। কারণ, স্বাভাবিক উৎপাদনের পরিমাণ হঠাৎ যদি কোনও বাড়তি উৎপাদনের অর্ডার প্রতিষ্ঠান পায় সেক্ষেত্রে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাড়তি চলতি মূলধনের প্রয়োজন হয়। সুতরাং প্রতিষ্ঠান এই রকম পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য পরিবর্তনশীল চলতি মূলধন হিসাবে কিছু অর্থ সংরক্ষণ করে। নিচের চিত্রের সাহায্যে স্থির ও পরিবর্তনশীল চলতি মূলধন দেখানো হল।

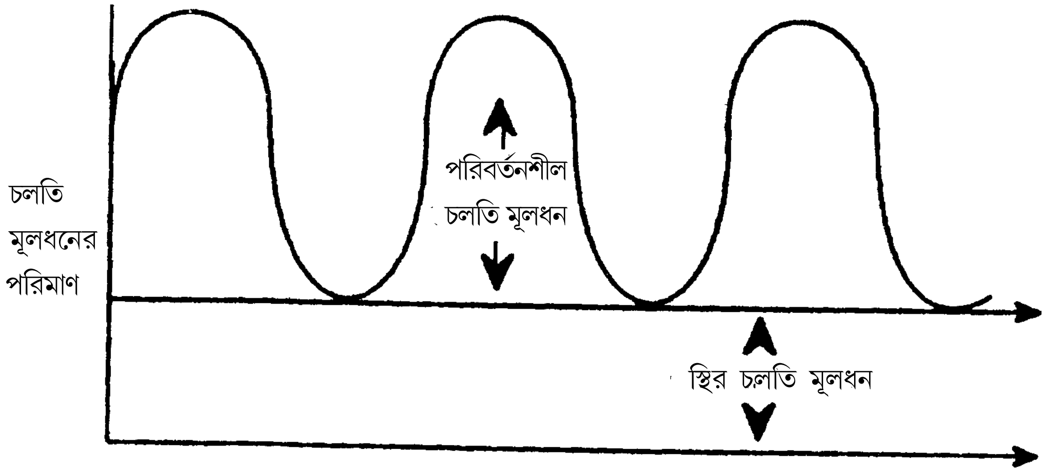

৪.১০ চলতি মূলধন সংগ্রহের উৎসসমূহ (Sources of Working Capital)

চলতি মূলধন নিম্নলিখিত উৎস থেকে সংগৃহীত হয়—

(১) **ব্যবসার মাধ্যমে (From business) ঃ** দ্রব্য উৎপাদন এবং সেই দ্রব্য বিক্রি করে চলতি মূলধন সংগ্রহ করা হয়।

(২) **শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে (Issue of Share) ঃ** শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে কোম্পানিতে চলতি মূলধনের সরবরাহ অব্যাহত রাখা হয়।

(৩) **স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন সময়ের জন্য ঋণ (Short term & Long term borrowings) ঃ** স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ঋণ উভয়ই কোম্পানির চলতি মূলধনের বৃদ্ধি ঘটায়, কারণ এই ঋণের ফলে অর্থের আগম হয়।

(৪) **স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রির মাধ্যমে (Sale of Fixed Assests) ঃ** কোম্পানির কিছু স্থায়ী সম্পত্তি বা লগ্নী বিক্রির মাধ্যমেও চলতি মূলধনের পরিমাণ বাড়ে।

৪.১১ চলতি মূলধনের ব্যবহার (Uses of Working Capital)

(১) কারবার পরিচালনা (Running of business) ঃ ব্যবসার দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ ব্যয়ের ফলে চলতি মূলধনের ব্যবহার হয়।

(২) লভ্যাংশ প্রদান (Payment of dividend) ঃ শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ প্রদানের ফলে অর্থের নির্গম (Cash outflow) হয়। ফলে চলতি মূলধনের ব্যবহার হয়।

(৩) দীর্ঘকালীন ঋণ পরিশোধ (Repayment of long term loans) ঃ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পরিশোধের সময় প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ বেরিয়ে যায়, ফলে চলতি মূলধন হ্রাস পায়।

(৪) স্বল্পকালীন ঋণ শোধ (Repayment of short term loan) ঃ স্বল্পকালীন ঋণ পরিশোধের সময় অর্থের নির্গম হয় এবং চলতি মূলধনের ব্যবহার ঘটে।

(৫) স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় (Purchase of Fixed Assets) ঃ স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ের সময় প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ বেরিয়ে যায়, ফলে চলতি মূলধন হ্রাস পায়। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে চলতি মূলধনের উৎস ও ব্যবহার দেখানো হল।

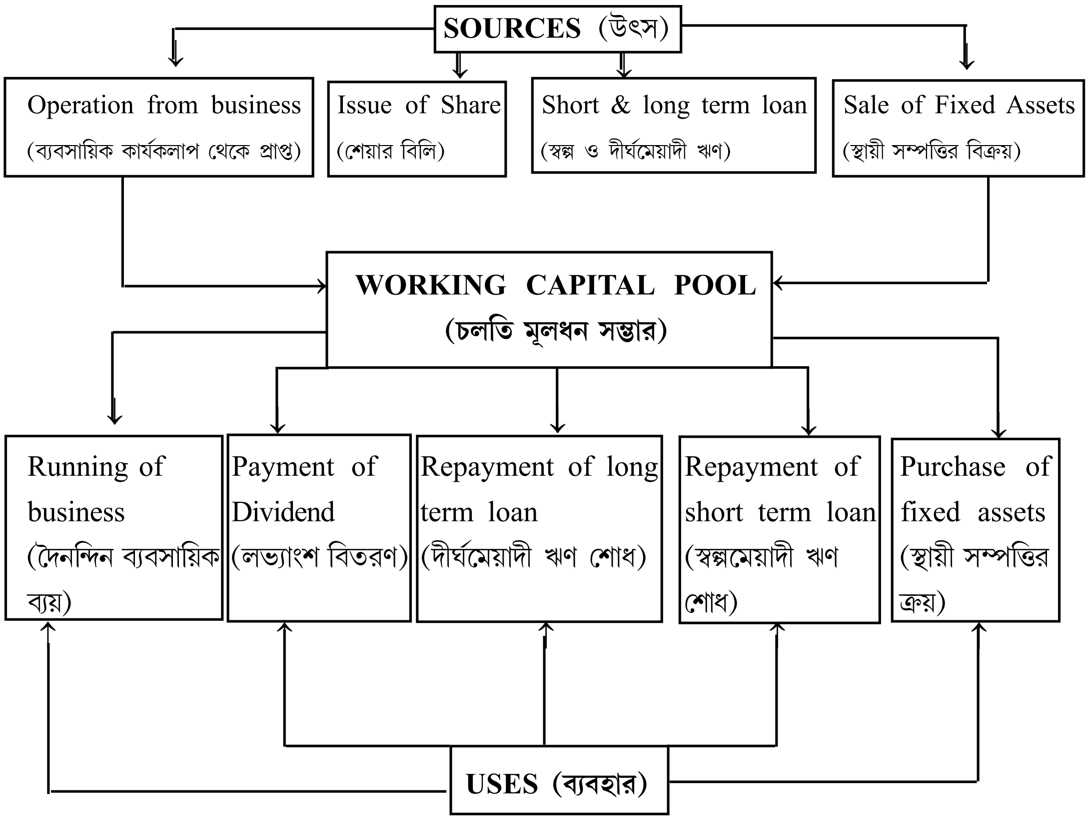

৪.১২ চলতি মূলধন নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয়গুলি (Determinants of Working Capital)

কারবারের গতিশীলতা বজায় রাখার জন্য চলতি মূলধন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যবসায়ে কত পরিমাণ চলতি মূলধন লাগবে তার সঠিক পরিমাণ নির্ণয় কারবারের ধারবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। এই মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হয়—

(১) কারবারের প্রকৃতি (Nature of Business) ঃ কারবারের প্রকৃতির উপর চলতি মূলধনের প্রকৃতি নির্ভর করে। যেমন—সাধারণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান (Trading Concern) এবং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের (Manufacturing Concern) ক্ষেত্রে চলতি মূলধনের পরিমাণ বেশি লাগে। অন্যদিকে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে (Public untility services) এই মূলধনের পরিমাণ কম। সুতরাং কারবারের প্রকৃতি চলতি মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণে সাহায্য করে।

বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান চলতি সম্পত্তি ও স্থায়ী সম্পত্তিতে শতকরা কত অর্থ বিনিয়োগ করে, নিচে সেই সম্বন্ধে একটি ধারণা দেওয়া হল ঃ

চলতি সম্পত্তি	**স্থায়ী সম্পত্তি**	**শিল্প**
%	%	
১০—২০	৮০—৯০	হোটেল ও রেস্টুরেন্ট
২০—৩০	৭০—৮০	ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন এবং বণ্টন
৩০—৪০	৬০—৭০	অ্যালুমিনিয়াম, জাহাজ
৪০—৫০	৫০—৬০	লৌহ ও ইস্পাত, প্রধান রাসায়নিক শিল্প
৫০—৬০	৪০—৫০	চা শিল্প
৬০—৭০	৩০—৪০	চিনি ও সুতো শিল্প
৭০—৮০	২০—৩০	তামাক, ভোজ্য তেল শিল্প
৮০—৯০	১০—২০	সাধারণ ব্যবসা ও গঠন-শিল্প

* প্রসন্ন চন্দ্রের *Financial Management Theory & Practice* গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

(২) উৎপাদনের সময় (Length of production) ঃ কোনও দ্রব্য উৎপাদন করতে যে সময় ব্যয়িত হয় তাকে উৎপাদন সময় বলে। অর্থাৎ কাঁচামাল সংগ্রহ করার সময় থেকে পণ্য উৎপাদন পর্যন্ত যে সময় প্রয়োজন হয় সেই সময় সমষ্টি হল উৎপাদনের সময়। এই সময় যত দীর্ঘ হবে, চলতি মূলধনের প্রয়োজনও তত বৃদ্ধি পাবে।

(৩) উৎপাদনের মাত্রা ও ক্ষমতা (Scale and capacity of operation) ঃ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের মাত্রা ও ক্ষমতা চলতি মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণে সাহায্য করে। একই জাতীয় দুটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের মাত্রা ও ক্ষমতা আলাদা হলে, দুটি প্রতিষ্ঠানে চলতি মূলধনের পরিমাণও আলাদা হয়। প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ক্ষমতা যদি

বেশি হয়, তাহলে বেশি উৎপাদনের জন্য চলতি মূলধন বেশি লাগবে। কাজেই উৎপাদনের মাত্রা ও ক্ষমতা চলতি মূলধনের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে।

(৪) বাণিজ্য চক্র (Business cycle) ঃ বাণিজ্য চক্রের আবর্তনের ওপরও চলতি মূলধনের পরিমাণ নির্ভর করে। বাণিজ্য চক্রের আবর্তনের দুটি বিশেষ অবস্থা হল—

(ক) অর্থনৈতিক প্রগতিও চূড়ান্ত ভালো অবস্থা (Boom condition) ; এবং

(খ) অর্থনৈতিক অধোগতি এবং খারাপ বা মন্দা অবস্থা (Depression)।

যে কোনও দেশের অর্থনীতির এই দুই বিশেষ বিপরীত অবস্থায় চলতি মূলধনের প্রয়োজনও বিপরীত হয়। অর্থনীতির উন্নততর অবস্থায় আরও বেশি উৎপাদন ও সম্পদ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, যার ফলে চলতি মূলধনের প্রয়োজনও বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে অর্থনীতির খারাপ অবস্থায় বহু শিল্প বন্ধ হয়ে যায়, ফলে চলতি মূলধনের প্রয়োজনও হ্রাস পায়।

(৫) ঋতু-নির্ভরতা ও উৎপাদন নীতি (Seasonality and production policy) ঃ কোনও প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যের চাহিদা যদি বিশেষ কোনও ঋতুর উপর নির্ভর করে (যেমন—বর্ষাকালে রবারের জুতো) এবং সেই প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন নীতি যদি বিভিন্ন সময়, সেক্ষেত্রে চলতি মূলধনের প্রয়োজনও বিভিন্ন হবে।

এইজাতীয় প্রতিষ্ঠান যদি সারা বছর ধরে উৎপাদন চালায়, সেক্ষেত্রে অন্তিম সম্ভারের (Closing Stock) পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং যেহেতু সারা বছর ধরে দ্রব্য বিক্রয় হয় না তাই বহু পরিমাণ অর্থ মজুত সম্ভারের সাথে আটকে থাকে। ফলে চলতি মূলধনের প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়।

(৬) সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ (Growth and expansion) ঃ প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের ফলে মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি পায়। মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সাথে চলতি মূলধনের প্রয়োজনও বৃদ্ধি পায়। কারণ সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের ফলে উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং বর্ধিত উৎপাদন-ক্ষমতা চলতি মূলধনের প্রয়োজন ও পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

(৭) ধারের শর্ত (Credit terms) ঃ প্রতিষ্ঠান দ্রব্য বিক্রি করার ক্ষেত্রে যেমন ধার দেয় তেমনি কাঁচামাল বা অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে ধার গ্রহণের সুবিধা পায়। দ্রব্য বিক্রির ক্ষেত্রে এই ধার যদি অধিক দিনের জন্য হয়, সেক্ষেত্রে চলতি মূলধন বেশি লাগে। তেমনি কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি ধার শোধ করার জন্য বেশি সময় পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে চলতি মূলধন কম লাগে।

(৮) কাঁচামালের দামের ঊর্ধ্বগতি (Rise in price level of Raw Materials) ঃ কাঁচামালের দাম যদি বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে কম পরিমাণ কাঁচামালের জন্য বেশি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, ফলে চলতি মূলধনের প্রয়োজন ও পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(৯) ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি (Increase in efficiency of management) ঃ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি চলতি মূলধন ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় যাঁরা রয়েছেন তাঁরা যদি তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারেন, তাহলে অপচয় কম হয় এবং সম্পদের সঠিক ব্যবহার সম্ভব হয়। এইভাবে দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে নগদ অর্থের আগম ভালো হয় ফলে চলতি মূলধনের অভাব কমে।

(১০) কাঁচামালের যোগান (Supply of Raw Meterials) ঃ উৎপাদনের জন্য যত পরিমাণ কাঁচামালের প্রয়োজন, সেই পরিমাণ কাঁচামাল যদি সহজলভ্য না হয় অর্থাৎ কাঁচামালের যোগান যদি পর্যাপ্ত না থাকে সেক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে সচল রাখতে গেলে যখন কাঁচামাল সহজ লভ্য হবে, তখন অধিক পরিমাণে কাঁচামাল ক্রয় করে রাখতে হবে। এমত অবস্থায় চলতি মূলধনের প্রয়োজন বেশি হয়।

(১১) অবচয়ের নীতি (Depreciation Policy) ঃ অবচয় চলতি মূলধনের পরিমাণকে প্রভাবিত করে। অবচয় এমন একটি ব্যয় যার জন্য প্রতিষ্ঠানকে কোনও অর্থ ব্যয় করতে হয় না, কিন্তু লাভ-ক্ষতি নির্ধারণের হিসাবে (Profit & Loss A/c) খরচ হিসাবে দেখানো হয়। ফলে লাভের পরিমাণ কমে, করের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং লভ্যাংশ প্রদান কম করা হয়। এসবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান থেকে কম অর্থ নির্গম (Outflow of cash) হয়, ফলে প্রতিষ্ঠান বেশি পরিমাণ অর্থ ধরে রাখতে সক্ষম হয়। সুতরাং অবচয়ের ফলে চলতি মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(১২) লভ্যাংশ নীতি (Dividend Policy) ঃ লভ্যাংশ প্রদান চলতি মূলধনের পরিমাণকে হ্রাস করে। প্রতিষ্ঠান যদি বেশি পরিমাণ লভ্যাংশ প্রদান করে তাহলে বেশি অর্থ নির্গম হয়, ফলে চলতি মূলধনে টান পড়ে। অন্যদিকে কম লভ্যাংশ প্রদান করলে এই মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(১৩) মুনাফার সংরক্ষণ (Retention of Profit) ঃ প্রতিষ্ঠান মুনাফার পুরো অংশ লভ্যাংশ হিসাবে শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করে না। কিছু অংশ ভবিষ্যতের জন্য সরিয়ে রাখে। এই অবণ্টিত অংশ যদি অধিক মাত্রায় স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ব্যয় করা হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানের সাধারণ প্রয়োজনে বাকি অংশ পর্যাপ্ত না-ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে চলতি মূলধনের পরিমাণ হ্রাস পায়। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের মুনাফা সংরক্ষণ ও তার ব্যবহার চলতি মূলধনের পরিমাণকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে।

(১৪) কর নীতি (Taxation Policy) ঃ ভারতীয় আয়কর আইনের ২১১ ধারায় অগ্রিম কর প্রদানের (Advance Payment of Tax) কথা বলা আছে। সুতরাং যে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন করার সম্ভাবনা আছে, সেই প্রতিষ্ঠানকে কর প্রদানের দায় বহন করতে হয়। কর যেহেতু নগদ অর্থের মাধ্যমে প্রদান করতে হয়, এ কথা বলাই বাহুল্য যে তার জন্য প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থের নির্গম হয় এবং চলতি মূলধনের ভাণ্ডারে টান পড়ে। সুতরাং কর নীতি চলতি মূলধনের পরিমাণকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে।

৪.১৩ অর্থ সংস্থানের পদ্ধতি (Methods of Raising Finance)

মূলধন কারবারের প্রাণশক্তি। কোম্পানিকে যেহেতু আইনের দৃষ্টিতে কাল্পনিক ব্যক্তি হিসাবে ধরে নেওয়া হয়, সেই যুক্তিতে বলা যায় যে কাল্পনিক ব্যক্তির কোনও অর্থ থাকে না। সুতরাং কোম্পানিকে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। এই অর্থ দুটি কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রথমটি হল স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করতে এবং দ্বিতীয়টি হল চলতি মূলধনের প্রয়োজন মেটাতে। এক কথায়, কোম্পানির কাজকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ—যাকে মূলধন বলা হয়, মূলত সংগ্রহ করা হয় দুটি উৎস থেকে—অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক (Internal and External)। নিচে একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে উৎসগুলি দেখানো হল ঃ

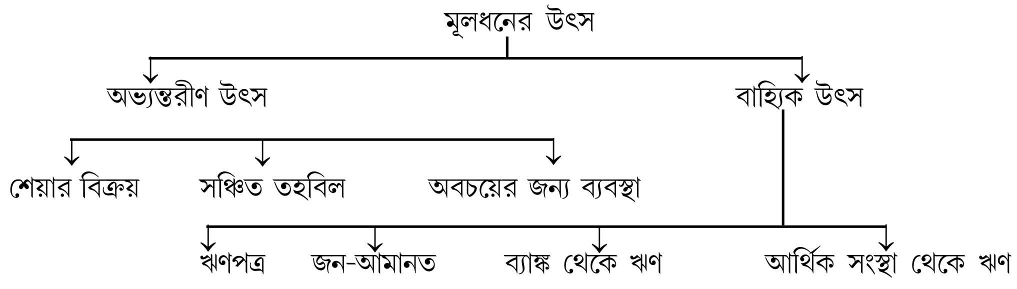

(১) অভ্যন্তরীণ উৎস (Internal Sources) ঃ মূলধন সংগ্রহ করার জন্য কোম্পানি যখন বাহ্যিক উৎসের সাহায্য না নিয়ে শেয়ার বা অভ্যন্তরীণ সম্পদকে কাজে লাগায় তখন তাকে অভ্যন্তরীণ উৎস বলে। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে যে তিনটি প্রধান সেগুলি হল—

(ক) শেয়ার বিক্রয় (Sale of Share) ঃ শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করা খুবই প্রচলিত ও কার্যকরী উপায়। শেয়ার বাজারের মাধ্যমে কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করা হয়। এই শেয়ার যারা ক্রয় করে তাদেরকে শেয়ারহোল্ডার বলা হয় এবং এরা কোম্পানির মালিক। শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে যে মূলধন সংগৃহীত হয়, সেই মূলধন দীর্ঘমেয়াদী মূলধন হিসাবে বিবেচিত হয়।

(খ) অবচয় বাবদ বরাদ্দ (Provision for Depreciation) ঃ কোম্পানি তার কাজকর্ম চালানোর জন্য স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করে। এই সম্পত্তি ব্যবহার করার ফলে সম্পত্তির ক্ষয় হয় এবং এই ক্ষয়ের ক্ষতিপূরণের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ মুনাফা থেকে সরিয়ে রাখা হয়। কিন্তু এই সরিয়ে-রাখা অংশ সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় করা হয় না। সুতরাং এই অর্থ ব্যবসায়ে পুনরায় কাজে লাগানো হয় এবং অভ্যন্তরীণ উৎস হিসাবে কাজে লাগে।

(গ) সঞ্চিত তহবিল (Reserve Fund) ঃ কোম্পানি যে মুনাফা অর্জন করে সেই মুনাফার পুরো অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করে না। মুনাফার কিছু অংশ সরিয়ে সঞ্চিত তহবিল গঠন করা হয়। কারণ ভবিষ্যতে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কোম্পানিতে আরও অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। তখন এই সঞ্চিত তহবিল কোম্পানি কাজে লাগায়। সঞ্চিত তহবিলের অর্থ পুনরায় কোম্পানিতে কাজে লাগানো খুব প্রচলিত পদ্ধতি এবং তহবিলের এই পুনর্বিনিয়োগকে Ploughing back of profit বলে।

(২) বাহ্যিক উৎস (External Sources) ঃ শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ মূলধন কোম্পানির কাজকর্ম পরিচালনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কোম্পানি যখন তার কাজকর্ম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে তখন অভ্যন্তরীণ উৎসের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের সাথে সাথে বাহ্যিক উৎসের সাহায্যেও কোম্পানি প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে। কোম্পানির প্রধান প্রধান বাহ্যিক উৎসগুলি হল—

(ক) ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার বিক্রয় (Issue of Debenture) ঃ ডিবেঞ্চার এক ধরনের ঋণপত্র। কোম্পানি জনসাধারণের কাছ থেকে লিখিত ও সিলমোহরযুক্ত একটি দলিলের মাধ্যমে এবং ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতিতে যে অর্থ সংগ্রহ করে তাকে ডিবেঞ্চার বলে। ডিবেঞ্চার মূলধনের উৎস হিসাবে খুবই কার্যকরী মাধ্যম। ডিবেঞ্চার হোল্ডাররা কোম্পানির মালিক নয়, এরা উত্তমর্ণ। এরা কোম্পানির পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে না, কিন্তু কোম্পানি এদের অর্থ পরিশোধ করতে অসমর্থ হলে, এরা কোম্পানির অবসায়ন দাবি করতে পারে। ভারতবর্ষে কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের উৎসগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ডিবেঞ্চারের ব্যবহার অন্যান্য উৎসগুলি থেকে বেশি।

(খ) জন-আমানত (Public Deposit) ঃ আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করা কোম্পানির দিক থেকে একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। এর মাধ্যমে কোম্পানি জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ সংগ্রহ করে এবং পরিবর্তে নির্দিষ্ট সময়ে অন্তর সুদ প্রদান করে। তবে জন-আমানত দীর্ঘ সময়ের জন্য সংগৃহীত হয় না।

(গ) ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ (Loan from Bank) ঃ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে কোম্পানি সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সংগ্রহ করে না। স্বল্পমেয়াদী ঋণ যা কোম্পানির চলতি মূলধনের প্রয়োজন মেটায়, তা কোম্পানি ব্যাঙ্ক থেকে সংগ্রহ করে। চলতি মূলধন হিসাবে কত পরিমাণ ঋণ কোম্পানিকে দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করা হয় দুটি কমিটির

সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে। কমিটিগুলি হল ট্যান্ডন কমিটি ও চোরে কমিটি (Tandon Committee and Chore Committee)। তবে ট্যান্ডন কমিটির সুপারিশই ঋণদানের ক্ষেত্রে বেশি কার্যকরী।

(ঘ) আর্থিক সংস্থা থেকে ঋণ (Loan from Financial Institutions) ঃ কোম্পানি সাধারণত আর্থিক সংস্থা থেকে তার প্রয়োজনীয় দীর্ঘমেয়াদী মূলধন সংগ্রহ করে। এই সংস্থাগুলি সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকারই হতে পারে। দেশের শিল্প বিকাশে এইজাতীয় সংস্থা যথেষ্ট পরিমাণ মূলধন কোম্পানিগুলিকে সরবরাহ করে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন (Industrial Finance Corporation), ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (Industrial Development Bank), স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন (State Finance Corporation) প্রভৃতি সংস্থা কোম্পানিদের প্রয়োজনীয় মূলধনের চাহিদা মেটাতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে।

(ঙ) আন্তর্জাতিক উৎস (International Sources) ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে দেশের বিভিন্ন বিখ্যাত শিল্প-প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থ সরবরাহকারী সংস্থা—যেমন বিশ্বব্যাঙ্ক (World Bank), এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (Asian Development Bank) ইত্যাদি থেকে ঋণ গ্রহণ করে। তবে এই জাতীয় সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করলে বহু শর্ত পূরণ করতে হয়, যা অনেক সময় কোম্পানির কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে।

(চ) বিদেশি শেয়ার বাজার (Foreign Share Market) ঃ বর্তমান বিশ্বায়নের (Globalisation) যুগে দেশের বহু অগ্রণী শিল্প-প্রতিষ্ঠান ইউরোপের শেয়ার বাজার—যাকে গ্লোবাল ডিপোজিটারি রিসিট্‌স্ [(Global Depository Receipts (GDR)] বলে—এবং আমেরিকার শেয়ার বাজার যাকে আমেরিকান ডিপোজিটারি রিসিট্‌স্ [American Depository Receipts (ADR)] বলে, এসব শেয়ার বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করে। তবে ইওরোপের শেয়ার বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহের সমস্যা আমেরিকার শেয়ার বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহের তুলনায় অনেক কম।

(ছ) অন্যান্য উৎস (Other Sources) ঃ উপরিউক্ত উৎস ছাড়াও কোম্পানিগুলির আর্থিক সমস্যা মেটানোর জন্য আরও কিছু কার্যকরী উৎসের কথা জানা যায়। তবে এই উৎসগুলি দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সমস্যা মেটানোর জন্যই কার্যকরী। স্বল্পমেয়াদী সমস্যা মোকাবিলা করবার জন্য এই উৎসগুলি তেমন কার্যকরী নয়। এগুলি হল—

(i) **লীজ ও ভাড়া ক্রয় (Lease and Hire Purchase Financing) ঃ** এইজাতীয় ব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে কোম্পানিকে আর্থিক সাহায্য করে না। কোম্পানিগুলি যখন স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করে তখন বহু অর্থ কোম্পানি থেকে নির্গম হয়ে যায় এবং চলতি মূলধনের ভাণ্ডারে টান পড়ে। এমতাবস্থায় কোম্পানিগুলি তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সম্পত্তি ক্রয় করার বদলে সম্পত্তি ভাড়া নেয়। কিছু আর্থিক সংস্থা রয়েছে যারা সম্পত্তি ক্রয় করে কোম্পানিকে সেই সম্পত্তি সরবরাহ করে, তাদেরকে Leasing and Hire Purchase Company বলে। এরা কোম্পানিকে সম্পত্তি সরবরাহ করার বদলে কোম্পানি থেকে উচ্চমূল্যে মাসে মাসে ভাড়া (Rent) নেয়। এর ফলে সম্পত্তি ক্রয় করলে যে অর্থ নির্গত হত সেই পরিমাণ অর্থ নির্গত হয় না এবং এভাবে কোম্পানি যে অর্থ সংরক্ষণ করে সেই অর্থ চলতি মূলধন হিসাবে কারবারে বিনিয়োগ করার সুযোগ পায়।

(ii) **কমার্শিয়াল পেপার (Commercial Paper) ঃ** কমার্শিয়াল পেপার এক ধরনের স্বল্পমেয়াদী হস্তান্তরযোগ্য দলিল যার মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে স্বল্প সময়ের মধ্যে অর্থ ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতিতে ঋণ গ্রহণ করে। এই দলিল বাণিজ্যিক হুণ্ডি থেকে আলাদা, কারণ বাণিজ্যিক হুণ্ডি ধারে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

কর্মাশিয়াল পেপার শুধু স্বল্পমেয়াদী ধার নেবার একটি দলিল। এই পেপার তিন মাস থেকে ছয় মাস পর্যন্ত বহাল থাকে এবং এর সুদ ব্যাঙ্কের সুদের হার থেকে বেশি। ভারতবর্ষে কমার্শিয়াল পেপারের ব্যবহার ১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হয়।

উপরিউক্ত উৎসগুলি ছাড়া আরও কিছু উৎস আছে যেগুলি ভারতবর্ষের কোম্পানির মূলধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সেগুলি হল ঃ

(ক) ফ্যাক্টরিং (Factoring) ;

(খ) ১৮২ দিনের ট্রেজারি বিল (182 Days' Treasury Bills) ;

(গ) সার্টিফিকেট ডিপোজিট (Certificates of Deposit) ;

(ঘ) ভেঞ্চার ক্যাপিটাল (Venture Capital) ইত্যাদি।

৪.১৪ সারাংশ (Summary)

অর্থ কারবারের প্রাণশক্তি। প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। এই সংগৃহীত অর্থ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যয় করে। কিছুটা ব্যয় করে স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ে এবং কিছু অর্থ ব্যয় করে দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার জন্য।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা হল ব্যবস্থাপনার সেই কার্যকরী ক্ষেত্র এবং কর্মপদ্ধতি যার সাহায্যে আর্থিক ব্যবস্থাপক অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ের অর্থাৎ অর্থের আগম ও নির্গম বিষয়ের পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন, এককথায় একটি কারবারি বা সেবা সরবরাহকারী সংস্থার অর্থের সংগ্রহ ও তার ব্যবহার যে ব্যবস্থাপনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কার্যাবলি আছে। সেগুলির মধ্যে প্রধান হল—(i) অর্থলগ্নীকরণ—অর্থাৎ কী জাতীয় সম্পত্তিতে কত অর্থ ব্যয় করা হবে (ii) অর্থ সংস্থান—অর্থাৎ কী ধরনের সূত্র থেকে অর্থ সংগৃহীত হবে; (iii) লভ্যাংশ প্রদান—অর্থাৎ শেয়ার মালিকদের কত পরিমাণ অর্থ লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন করা হবে। এগুলি ছাড়াও আরও কিছু নিয়মমাফিক কাজ আছে, যেমন—হিসাব ও তথ্যাদি সংরক্ষণ, অর্থের আগম ও নির্গমের উপর লক্ষ্য রাখা ইত্যাদি।

আর্থিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য মূলত দুটি—(i) মুনাফার সর্বাধিকীকরণ, এবং (ii) সম্পদ সর্বাধিকীকরণ। মুনাফার সর্বাধিকীকরণ বলতে বোঝায় কত পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি হলে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব। তবে এই উদ্দেশ্যের সমালোচনাও আছে। সম্পদ সর্বাধিকীকরণ বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হিসাবে স্বীকৃত। এই উদ্দেশ্যের মূল বক্তব্য হল প্রতিষ্ঠান তার কর্মপ্রবাহ এমনভাবে পরিচালিত করবে যার ফলে একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠানের মূল্য বৃদ্ধি পাবে, অপরদিকে শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদও বৃদ্ধি পাবে।

মূলধন কাঠামো বলতে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের অর্থের সংস্থানকে বোঝায়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান কত পরিমাণ নিজস্ব মূলধন বিনিয়োগ করবে এবং কত পরিমাণ অর্থ ঋণ হিসাবে সংগ্রহ করবে এর অনুপাতই হল মূলধন কাঠামো। প্রতিষ্ঠানের মূলধন কাঠামো কেমন হবে তা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, যেমন—কোম্পানির আকৃতি, প্রকৃতি, মূলধন বাজারের অবস্থা, মূলধন সংগ্রহের ব্যয়, ঝুঁকি, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

চলতি মূলধন বলতে সেই মূলধনকে বোঝায় যা কারবারের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন হয়। নিত্যনৈমিত্তিক কাজ বলতে কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিকদের পারিশ্রমিক প্রদান, উৎপাদন সংক্রান্ত ও বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যয় ইত্যাদি।

চলতি মূলধন সংগ্রহ হয় দুটি উৎস থেকে—যেমন, স্থায়ী উৎস, ঋণ সংগ্রহ, স্বল্প উৎস ইত্যাদি। এই মূলধন নির্ধারণের জন্য কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করতে হয়, যেমন—কারবারের প্রকৃতি, কারবারের আকৃতি, উৎপাদন সময়, ব্যবসায় চক্র, ক্রয় ও বিক্রয় শর্তাবলি, ঋণের শর্ত, উৎপাদন নীতি, লভ্যাংশ নীতি ইত্যাদি।

কারবারের চলতি মূলধনের সংস্থান দুটি ভাগে ভাগ, যেমন—অভ্যন্তরীণ উৎস ও বাহ্যিক উৎস। এই দুই প্রধান উৎসকে আবার দুটি ভাগে ভাগ, যেমন—স্থায়ী উৎস, সঞ্চিত তহবিল, শেয়ার উৎস, স্বল্প-মেয়াদি ঋণ, ব্যাংক থেকে ঋণ ইত্যাদি।

৪.১৫ সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর সংকেত

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর সংকেত

১। আর্থিক ব্যবস্থাপনা কাকে বলে? — উত্তর — ৪.৩
(What do you mean by Financial Management ?)

২। লভ্যাংশ নীতি বলতে কি বোঝেন?
(What do you mean by Dividend Policy ?) — উত্তর — ৪.৪

৩। আর্থিক ব্যবস্থাপনার নিয়মমাফিক কাজের উল্লেখ করুন।
(Mention Routine functions of Financial Management.)

৪। সম্পদ সর্বাধিকীকরণ কি? — উত্তর — ৪.৫
(What is Wealth maximisation ?)

৫। মুনাফা সর্বাধিকীকরণ কাকে বলে? — উত্তর — ৪.৫
(What is Profit maximisation ?)

৬। মূলধন কাঠামো বলতে কি বোঝেন? — উত্তর — ৪.৬
(What do you mean by Capital Structure ?)

৭। আদর্শ মূলধন কাঠামো কি? — উত্তর — ৪.৬.১
(What is Optimum Capital Structure ?)

৮। ইকুইটির উপর কারবার বলতে কি বোঝেন? — উত্তর — ৪.৭
(What do you mean by Trading on Equity ?)

৯। চলতি মূলধন কাকে বলে? — উত্তর — ৪.৮
(What is Working Capital ?)

১০। স্থির চলতি ও পরিবর্তনশীল চলতি মূলধনের সংজ্ঞা দিন। — উত্তর — ৪.৯
(Define Fixed Working Capital and Variable Working Capital.)

১১। চলতি মূলধনের উৎসগুলি কী কী? উত্তর — ৪.১০

(What are the sources of Working Capital ?)

১২। কমার্শিয়াল পেপার কী? উত্তর — ৪.১৩

(What is commercial Paper ?)

দীর্ঘপ্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত

১। আর্থিক ব্যবস্থাপনা কাকে বলে? এর কার্যাবলি আলোচনা করুন। উত্তর — ৪.৩ এবং ৪.৪

(Define Financial Management. Discuss its functions.

২। আর্থিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করুন। উত্তর — ৪.৫

(Discuss the objectives of Financial Management)

৩। মূলধন কাঠামো বলতে কী বোঝেন? মূলধন কাঠামো নির্বাচনের বিভিন্ন বিবেচ্য বিষয় আলোচনা করুন। উত্তর — ৪.৬ এবং ৪.৭

(What do you mean by Capital Structure? Discuss the various factors on which Capital Structure depends.)

৪। চলতি মূলধন কাকে বলে? চলতি মূলধন নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা করুন।

উত্ত — ৪.৮ এবং ৪.১২

(What is Working Capital? Discuss the factors on which the Working Capital depends.)

৫। অর্থ সংস্থানের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করুন। উত্তর — ৪.১৩

(Discuss the different methods of raising finance.)

৪.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। কারবার ব্যবস্থাপনা—ভদ্র ও সৎপতি

২। ব্যবস্থাপনা পরিচয়—পদ্মলোচন গঙ্গোপাধ্যায়

একক ৫ ❑ কর্মী ব্যবস্থাপনা (Personnel Management)

গঠন (Structure)

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.১ প্রস্তাবনা

৫.৩ কর্মী ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা

৫.৪ কর্মী ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

৫.৫ কর্মী ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৫.৬ কর্মী ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি

৫.৭ মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা সংজ্ঞা

৫.৮ মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

৫.৯ মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনার পদ্ধতি

৫.১০ অনুপ্রাণিতকরণ সংজ্ঞা

৫.১১ অনুপ্রাণিতকরণের গুরুত্ব

৫.১২ কার্যসম্পাদন পর্যালোচনার সংজ্ঞা

৫.১৩ কার্যসম্পাদন পর্যালোচনার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

৫.১৪ যোগ্যতার মান নির্ণয়

৫.১৫ যোগ্যতা মান নির্ণয়ে বিচার্য্য বিষয়

৫.১৬ যোগ্যতা মান নির্ণয় পদ্ধতি

৫.১৭ কার্যসম্পাদন পর্যালোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি

৫.১৮ কর্ম মূল্যায়ন সংজ্ঞা

৫.১৯ কর্ম মূল্যায়নের ধাপ

৫.২০ কর্ম মূল্যায়নের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য

৫.২১ কর্ম মূল্যায়ন পদ্ধতি

৫.২২ কর্ম মূল্যায়নের সুবিধা

৫.২৩ কর্ম মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতা

৫.২৪ কর্মীদের পরিমাণগত কর্ম সম্পাদন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সময় ও গতি বিশ্লেষণ
৫.২৫ শিল্প সম্পর্ক-সংজ্ঞা
৫.২৬ শিল্প সম্পর্কের গুরুত্ব
৫.২৭ শিল্প সম্পর্কের ক্ষেত্র
৫.২৮ মনুষ্যশক্তি পুরস্কৃতকরণ
৫.২৯ কর্মী পুরস্কৃতকরণের পদ্ধতিসমূহ
৫.৩০ প্রেরণামূলক মজুরি পদ্ধতি
৫.৩১ ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ সংজ্ঞা
৫.৩২ ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা
৫.৩৩ ভারতে শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের অবস্থা
৫.৩৪ সারাংশ
৫.৩৫ সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ প্রশ্নাবলী এবং উত্তর সংকেত
৫.৩৬ গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পড়ার পর আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- কর্মী ব্যবস্থাপনা ঃ সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব
- কর্মী ব্যবস্থাপকের কার্যাবলি
- মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা
- অনুপ্রাণিতকরণ
- কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা
- যোগ্যতার মান নির্ণয়
- সময় ও গতি বিশ্লেষণ
- কর্মীদের পুরস্কৃতকরণ
- প্রেরণামূলক মজুরি-পদ্ধতি
- ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ
- ভারতবর্ষে শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের অবস্থা

৫.২ প্রস্তাবনা

একটি সংগঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হল শ্রমিক বা কর্মী। এই কর্মীরাই সংগঠনে শ্রম, বিবেক, বিচারবুদ্ধি ইত্যাদি সরবরাহ করে ও সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য সফল করে। কর্মীরা সংগঠনে প্রবেশ করেই সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োগ করে সংগঠনের উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করবে—এ ধারণা করা ঠিক নয়। কারণ কর্মীরা সংগঠনে প্রাথমিকভাবে যোগদান করে বাঁচার প্রয়োজনে। কিন্তু ব্যবস্থাপক কর্মীদের মধ্যে সেই চেতনার প্রকাশ ঘটান যার ফলে তারা বুঝতে পারে সংগঠনে তাদের প্রয়োজন কতখানি। এই চেতনাই কর্মীদের কাজে উৎসাহ যোগায় ও সংগঠনের উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্যকারী উপাদান হিসাবে কাজ করে। আবার যে কোনও কর্মীর দ্বারা যে কোনও কাজ করা সম্ভব হয় না। প্রতিষ্ঠানের মালিক সেসব কর্মীই নিয়োগ করেন যাদের দ্বারা নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করা সম্ভব। শুধু কর্মী নিয়োগের সাথে সাথেই মালিক বা ব্যবস্থাপকের কাজ শেষ হয় না। কর্মীদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন, সংস্থাপন, তাদের সেবা, নিরাপত্তা ইত্যাদি সরবরাহের মাধ্যমে শ্রমশক্তির উন্নয়ন ও পূর্ণ ব্যবহার করা কর্মী-ব্যবস্থাপকের (personnel Manager) প্রধান কাজ। সুতরাং সংগঠনের এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের মধ্যে কর্মপ্রেরণা সৃষ্টি করাই হল কর্মী-ব্যবস্থাপনার প্রধান লক্ষ্য।

৫.৩ কর্মী ব্যবস্থাপনা (Personnel Management)

সংজ্ঞা (Definition) ঃ ব্যবস্থাপনা বলতে এক বিশেষ কর্মপদ্ধতি বোঝায় যার অন্তর্নিহিত অর্থ হল মানবিক বিষয়-বর্জিত উপাদান (Non-human factor) ও মানবিক উপাদানের (Human factor) মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করা। এই দুই বিশেষ উপাদানের মধ্যে মানবিক উপাদানের গুরুত্ব অসীম, কারণ শিল্পোৎপাদনে মানুষের কর্মদক্ষতা, ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি বিষয় অমানবিক উপাদানকে (যেমন যন্ত্রপাতি) পরিচালিত করতে বিদ্যুতের মতো সাহায্য করে। এ প্রসঙ্গে Urwick-এর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, "....It is also concerned with the power behind the machinery, the wills of the individual men, women who co-operate in the task, which are the steam or electricity, which make the machine go...." অর্থাৎ মানবিক উপাদান যন্ত্রপাতির পিছনে চালিত শক্তি হিসাবে কাজ করে, তাঁদের (পুরুষ মহিলা) অন্তর্নিহিত শক্তিই বাষ্প বা বিদ্যুৎ হিসাবে কাজ করে ও যন্ত্রপাতিকে চালাতে সাহায্য করে।

উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপককে সবচেয়ে বেশি যে উপাদানের উপর নজর ও নিয়ন্ত্রণ রাখতে হয় তা হল মানবিক উপাদান, যাকে আমরা মনুষ্যশক্তি বলে থাকি। প্রতিষ্ঠানে মনুষ্যশক্তির নিয়োগ ও সেই শক্তিকে কার্যকরীভাবে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সাথে সমন্বয় ঘটানো কর্মী ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত বিষয়। 'কার্যকরীভাবে' কর্মীকে কাজে লাগানোর বিষয়টি কর্মী সংগ্রহ ও নির্বাচন থেকে শুরু হয় এবং সাংগঠনিক স্বার্থের সাথে কর্মী স্বার্থের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে তা শেষ হয়। এই বিশেষ কাজ কর্মী ব্যবস্থাপকের উপর ন্যস্ত থাকে। সুতরাং কর্মী ব্যবস্থাপনা হল ব্যবস্থাপনার সেই কৌশল যার সাহায্যে সুযোগ্য ও শক্তিশালী কর্মী সংগ্রহ, তার বিকাশ সাধন ও বজায় রাখার মাধ্যমে সর্বাধিক নিপুণতার সাথে ও সর্বনিম্ন ব্যয়ে সংগঠনের সামগ্রিক কাজ সম্পাদন তথা উদ্দেশ্যপূরণ করা সম্ভব হয়।

কর্মী ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি যেসব সুচিন্তিত বক্তব্য রেখেছেন তাদের মধ্যে কয়েকজনের বক্তব্য পরের পাতায় তুলে ধরা হল।

ফ্লিপোর (Flippo) মতে, "Personnel management is the planning, organising, directing and controlling of procurement, development, compensation, integration and maintenance of people for the purpose of contributing to organisation, individual and social goals." অর্থাৎ "কর্মী সংগ্রহ, উন্নতি, ক্ষতিপূরণ, সংযুক্তিকরণ, ও তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিকল্পনা, নির্দেশদান এবং নিয়ন্ত্রণ হল কর্মী ব্যবস্থাপনা যা সংগঠন, ব্যক্তি ও সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করে।"

National Institute of Personnel Management (NIPM) কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞাটি হল নিম্নরূপ ঃ "Personnel Management, Labour Management or Staff Management means quite simply the task of dealing with human relationships within an organisation." অর্থাৎ "সংগঠনে মানবিক সম্পর্ক বিষয়ে যে ব্যবস্থাপনা জড়িত থাকে তাকে কর্মী ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক ব্যবস্থাপনা বা কর্মচারী ব্যবস্থাপনা বলে। "

উপরের সংজ্ঞাগুলি থেকে যে বিষয় আমরা জানতে পারি তা হল কর্মীদের সঠিকভাবে নির্বাচন, নির্দেশদান ও সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের দিক দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মীদের দিক থেকে সন্তুষ্টি বিধান করাই হল কর্মী ব্যবস্থাপনার কাজ। সুতরাং শিল্পে সতর্কতার সাথে কর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করা ও তা বজায় রাখার মাধ্যমে সংগঠনের উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করা কর্মী ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত বিষয়। সংগঠনের লক্ষ্য পূরণে কর্মীরা যাতে তাদের শ্রমের চূড়ান্ত সরবরাহ করে সেই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব হল কর্মী ব্যবস্থাপকের।

৫.৪ কর্মী ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব (Importance of Personnel Management)

কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। উদ্দেশ্য তখনই সফল হয় যখন সংগঠনের মানবিক এবং অ-মানবিক উপাদানগুলির যথার্থ ব্যবহার সম্ভব হয়। অতীত ব্যবস্থাপনার সাথে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা সংগঠনের অ-মানবিক উপাদানগুলির উপরই মূলত প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু পরবর্তীকাল মানবিক উপাদানের উপর গুরুত্বও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে কাঁচামাল হয়তো কম দামে ক্রয় করা সম্ভব, যন্ত্রপাতিও উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব, কিন্তু উৎপাদন তখনই বৃদ্ধি পায় যখন শ্রমিক বা কর্মী কাজে উৎসাহ পায় এবং তারা তাদের চূড়ান্ত দক্ষতা সংগঠনের কাজে লাগায়। এ প্রসঙ্গে **পিটার ড্রাকার** (Peter Drucker) বলেছেন ঃ ".....the sources capable of enlargement can only be human resources ..... They (all other resources) can be better utilised or worse utilised but they can never have an output greater than the sum of the inputs ..... Man alone of all resources available to him, can grow and develop." অর্থাৎ "শুধু মনুষ্য সম্পদই বিস্তৃতিলাভ করতে পারে। মানুষ ছাড়া অন্যান্য সম্পদের উত্তম ব্যবহার বা খারাপ ব্যবহার করা যায়, কিন্তু তাদের জন্য যে পরিমাণ কাঁচামাল কাজে লাগানো হয়েছিল তার থেকে বেশি উৎপাদন সম্ভব নয়। অন্যান্য সমস্ত সম্পদের মধ্যে একমাত্র মানুষই বাড়তে ও সমৃদ্ধ হতে পারে।"

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সংগঠনের গতিশীলতা নির্ভর করে মনুষ্য সম্পদের কাম্য ব্যবহারের উপর, যা কর্মী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই একমাত্র সম্ভব। সুতরাং কর্মী ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অসীম। নিচে কর্মী ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব আলোচনা করা হল ঃ

(১) কর্মী ব্যবস্থাপনার ফলে মানব সম্পদের কাম্য ব্যবহার সম্ভব হয়।

(২) এই ব্যবস্থাপনা সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে বেগবর্ধক শক্তি হিসাবে কাজ করে যার ফলে প্রতিষ্ঠান সচল থাকে ও তার কর্মপ্রবাহ বজায় রাখতে পারে।

(৩) এই ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সব ক্ষেত্রে, যেমন—উৎপাদন, আর্থিক, বিপণন ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই আবশ্যক। এজন্য এর পরিধি ব্যাপক।

(৪) এই ব্যবস্থাপনার সাহায্যে শ্রমিক সংগ্রহ, নির্বাচন, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, মজুরি প্রদান, সুষ্ঠু পরিবেশ, নিয়মশৃঙ্খলা ইত্যাদি বজায় রাখা সম্ভব হয়।

(৫) এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিল্পে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে চলা সম্ভব হয় যার ফলে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সমস্ত কর্মী যথাযোগ্য মর্যাদা পায়।

(৬) এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শ্রমিক কল্যাণমূলক কার্যকলাপ গ্রহণ করা ও সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়, ফলে শ্রমিকদের আনুগত্য ও মনোবল বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

(৭) এই ব্যবস্থাপনার সাহায্যে শ্রমিকদের দক্ষতা ও যোগ্যতাকে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

৫.৫ কর্মী-ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of Personnel Management)

কাজ সম্পাদনের জন্যই সংগঠনে কর্মী নিয়োগ করা হয়। শুধু কর্মী নিয়োগের মধ্যেই কর্মী ব্যবস্থাপনার কাজ সীমাবদ্ধ থাকে না। মানবিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার, সমস্ত কর্মীদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক ও তাদের সর্বাধিক ব্যক্তিগত বিকাশ ঘটানোই কর্মী ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য। কর্মী ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি এইভাবে তুলে ধরা যায়—

লক্ষ্য (Aims) ঃ কর্মী ব্যবস্থাপনা হল ব্যবস্থাপনার এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে শ্রমিক বা কর্মী সংক্রান্ত বিষয়ের পর্যালোচনা করা হয় এবং সংগঠনের সাথে কর্মীদের সমন্বয় সাধন করা হয় যাতে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উদ্দেশ্য পূরণ সহজ হয়। কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের সদস্য। তারা গোষ্ঠী হিসাবে প্রতিষ্ঠানে তাদের শ্রম দান করে। তারা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত কাজও করতে পারে। ফলে একদিকে যেমন তাদের স্বার্থসিদ্ধি হয়, অপরদিকে প্রতিষ্ঠান তার উদ্দেশ্য পূরণে সমর্থ হয়। শুধু শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনই কর্মী ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য নয়। তাদের কল্যাণ সাধনের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানেরও যখন শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে প্রতিষ্ঠানও কিছু কিছু সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান জনগণকে ন্যূনতম মূল্যে সঠিক গুণ-সম্পন্ন পণ্য সরবরাহ করছে, পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ করছে ইত্যাদি। সুতরাং, প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে কর্মী ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। সংক্ষেপে কর্মী ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য নিচে তুলে ধরা হল।

(১) কর্মীদের মধ্যে কাজের উৎসাহ ও প্রেরণা সৃষ্টি ;

(২) ন্যূনতম ব্যয়ে মানব সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার ;

(৩) কর্মী স্বার্থ ও সংগঠনের স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো ;

(৪) কর্মীদের মধ্যে কল্যাণমূলক কার্যকলাপ সম্প্রসারিত করে কর্মীদের দক্ষতা ও উৎসাহ বৃদ্ধি করা ;

(৫) কর্মীদের অভাব অভিযোগ সাধ্যমতো পূরণ করা ;

(৬) কর্মীদের ব্যক্তিগত ও সাথে সাথে দলগত সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে একটি ঐক্যমত সমন্বিত কর্মীদল গড়ে তুলতে সাহায্য করা; ও

(৭) কর্মীদের দক্ষতা ও যোগ্যতাকে পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগিয়ে সংগঠনের সার্বিক উন্নতি সাধন করা।

উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ

(১) নির্বাচন ও নিয়োগ (Selection and Appointment) ঃ প্রতিষ্ঠানের যে সব বিভাগে নতুন কর্মীর প্রয়োজন, সেসব বিভাগের জন্য কর্মী নির্বাচন ও নিয়োগ কর্মী ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

(২) কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা (Training and Education) ঃ কর্মীদের নিয়োগ করার পর প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যে কাজের জন্য কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে সেই কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করার জন্য কর্মীদের সঠিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার। নচেৎ স্বল্প সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে সেই কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। কর্মী ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হল কর্মীদের সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজে দক্ষ করা।

(৩) কাজের বিশ্লেষণ করা (Job-analysis) ঃ কাজকে বিভিন্ন বিভাগ ও দলে ভাগ করা এবং সেই কাজের জন্য কী জাতীয় কর্মীর প্রয়োজন তার চরিত্র নির্ধারণ করা কর্মী ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে কর্মীদের কী জাতীয় দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য ইত্যাদির প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা কর্মী ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে।

(৪) মাহিনার হার নির্ধারণ (Fixation of scale of pay) ঃ কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও পদমর্যাদা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে মাহিনা প্রদান করা উচিত এবং এই মাহিনার হার কত হবে তা নির্ধারণের দায়িত্ব থাকে কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগের উপর।

(৫) পদোন্নতির ব্যবস্থা করা (Arrangement for promotion) ঃ পদোন্নতি যে কোনও কর্মীর ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। কর্মী ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হল কর্মীদের কাজের দক্ষতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে পদোন্নতির ব্যবস্থা করা।

(৬) সুসম্পর্ক স্থাপন (Establishing good relations) ঃ কর্মী ব্যবস্থাপনার কাজ হল কর্মীর সঙ্গে কর্মীর ও কর্মীর সঙ্গে ব্যবস্থাপকের সুসম্পর্ক স্থাপন করা। সুসম্পর্ক যে কোনও কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে স্বীকৃত। এর ফলে উপযুক্ত কাজের পরিবেশ গড়ে ওঠে এবং একথা অনস্বীকার্য যে উপযুক্ত কাজের পরিবেশ কর্মীর দক্ষতা ও শিল্পে শান্তি বজায় রাখতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে।

(৭) শ্রমিক কল্যাণ (Labour Welfare) ঃ শ্রমিকরা উৎপাদনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শ্রমিকদের কাজে উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার কল্যাণমূলক কাজের ব্যবস্থা করা কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই কল্যাণমূলক কাজ বলতে বোঝায় কারখানার কর্মীদের জন্য বিভিন্ন প্রকার নিরাপত্তা, চিকিৎসা, আমোদ-প্রমোদ, আনুতোষিক, ছুটি ইত্যাদি সংক্রান্ত কাজ। কারখানায় এইসব কল্যাণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৫.৬ কর্মী ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি (Functions of Personnel Management)

কর্মী ব্যবস্থাপকের কাজ মনুষ্যশক্তির বিকাশ ঘটানো। এর প্রথম পদক্ষেপ হল কর্মী নির্বাচন, কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও দায়িত্ব অর্পণ এবং শেষ পদক্ষেপ হল কর্মীদের সাথে সংগঠনের সুসম্পর্ক বজায় রেখে কর্মীদের অবসর গ্রহণ করানো। J. L. Massie-র ভাষায় ঃ "Staffing is the process by which managers select, train, promote and retire subordinates." অর্থাৎ "কর্মী সম্বন্ধীয় বিষয় একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে ব্যবস্থাপক তার অধস্তন কর্মচারীদের নির্বাচন, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি এবং অবসরগ্রহণ সংক্রান্ত কাজ করেন।" এই বিরাট কর্মযজ্ঞের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে কর্মী বিভাগের উপর। কর্মী ব্যবস্থাপনার প্রধান প্রধান কাজগুলি হল—

(১) জনসম্পদ পরিকল্পনা (Human Resource Planning) ঃ জনসম্পদ পরিকল্পনা এমন ভাবে করতে হবে যার ফলে সংগঠনে কর্মীর প্রয়োজন সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। এই পরিকল্পনা যেসব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল সেগুলি হল ঃ

(ক) অন্তর্নিহিত বিষয় — প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে কী জাতীয় দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন, কত পরিমাণ শ্রমিক প্রয়োজন, নতুন কোন্ বিভাগ খোলা বা বন্ধ করা হবে ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ করে জনসম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয়।

(খ) বাহ্যিক বিষয় — শ্রমিকের বাজার অর্থাৎ শ্রমের সরবরাহ কেমন থাকবে তার উপরও জনসম্পদ পরিকল্পনা নির্ভর করে।

(২) কর্মী নিয়োগ (Recruitment) ঃ জনসম্পদ পরিকল্পনার অন্তর্গত বিষয় হিসাবে কর্মী নিয়োগ করা হয়। উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয় ইত্যাদি বিভাগে বিভিন্ন সময়ে কর্মীর প্রয়োজন হয় এবং সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্য কর্মী নিয়োগের যে সব পদ্ধতি আছে [যেমন, কার্য-বিশ্লেষণ (Job analysis) থেকে শুরু করে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া ও পরীক্ষা নেওয়া] সে সব পদ্ধতি অবলম্বন করে কর্মী নিয়োগ করা কর্মী ব্যবস্থাপনার কাজ।

(৩) কর্মীদের আবেশন ও আধুনিকীকরণ (Induction and orientation) ঃ আবেশন ও আধুনিকীকরণের সাহায্যে নির্বাচিত কর্মীদের সংগঠনের অন্যান্য কর্মীদের সাথে সুষ্ঠুভাবে মিলকরণ করানো হয়। নতুন নির্বাচিত কর্মীদের সাথে অন্যান্য কর্মীদের পরিচিত করানো, তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত করা, সংগঠনের নীতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া কর্মী ব্যবস্থাপনার বিশেষ কাজ।

(৪) প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন (Training and Development) ঃ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মী ও দলের কার্যক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায় যা সংগঠনের সার্বিক উন্নতিতে সাহায্য করে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীরা নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে (যেমন, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, অপারেশন রিসার্চ)। ফলে কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। উন্নয়ন পরিকল্পনায় এমনভাবে কর্মীদের শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা বুঝতে পারে যে সংগঠনে নির্দিষ্ট কাজ ছাড়াও সংগঠনের জন্য তাদের আরও কাজ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সুষ্ঠু কর্মী ব্যবস্থাপনা তাদের মনে এই চেতনার উন্মেষ ঘটায়।

(৫) কাজের পর্যালোচনা (Performance appraisal) ঃ কর্মীকে দিয়ে কাজ করাতে হলে সেই কাজের একটি মান (standard) আগে থাকতে নির্ণয় করতে হয়। কারণ কর্মী সেই কাজ করতে কতখানি সমর্থ হয়েছে বা কর্মী তার দক্ষতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে কিনা তার পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এই পর্যালোচনার

উপর কর্মীর মাহিনা ও সংগঠনের উন্নতিও নির্ভর করে। কর্মী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মীদের কাজের পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়।

(৬) পারিশ্রমিকের হার নিধারণ (Determination of the rate of remuneration) : কর্মীরা কাজে যোগদান করে প্রাথমিকভাবে বাঁচানো উদ্দেশ্যে এবং সেজন্য তার প্রয়োজন পারিশ্রমিক। তবে সংগঠনের সর্বস্তরে একই বেতন কাঠামো চালু থাকে না। পারিশ্রমিকের হার নির্ধারণ হয় কর্মীর যোগ্যতা, দক্ষতা ও পদমর্যাদার উপর। পারিশ্রমিকের পরিমাণ কর্মীদের কাজে উৎসাহ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে যা সংগঠনের উদ্দেশ্য সফল করার অন্যতম হাতিয়ার। সুতরাং সঠিক অঙ্কে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করাও কর্মী ব্যবস্থাপনার কাজ।

(৭) নিয়মশৃঙ্খলা ও মনোবল (Discipline and morale) : কর্মীদের মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা করা ও তাদের মনোবল বৃদ্ধি করা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে সফল করার জন্য নিয়মশৃঙ্খলার প্রয়োজন। শিল্পে নিয়মশৃঙ্খলা বজায় থাকলে কর্মী অসন্তোষ বা বিচ্যুতি দূর করা যায়। শৃঙ্খলার সাথে কাজ করলে কাজে প্রাণসঞ্চার হয়। ফলে কর্মীরা কাজে আগ্রহী হয় ও তাদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। কর্মী ব্যবস্থাপনার কাজ হল কর্মীদের নিয়মশৃঙ্খলা বজায় ও মনোবল বৃদ্ধি করতে সাহায্য করা।

(৮) উত্তম পরিবেশ সৃষ্টি করা (Creation of good environment) : পরিবেশ মানুষের মন ও চরিত্রকে সরাসরি প্রভাবিত করে। কাজের ক্ষেত্রে যদি উত্তম পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখা যায় সেক্ষেত্রে কর্মীদের দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। সেজন্য কর্মী ব্যবস্থাপনার কাজ হল কাজের উত্তম পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করা।

(৯) কর্মী সম্পর্ক (Personnel relations) : শিল্পে কর্মী সম্পর্ক অর্থাৎ কর্মীর সঙ্গে কর্মী বা উর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পারস্পরিক সম্পর্ক যদি অস্বাস্থ্যকর হয় বা সুস্থ না হয় সেক্ষেত্রে শিল্পে বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। কর্মী ব্যবস্থাপনার কাজ হল শিল্পে শান্তি বজায় রাখার জন্য কর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করা।

(১০) বদলি (Transfer) : একটি কাজ থেকে অন্য কাজে বা সংগঠনের একটি স্তর (level) থেকে অন্য স্তরে কর্মীদের বদলির ব্যবস্থা করাও কর্মী ব্যবস্থাপনার কাজ। কর্মীদের বদলি দুটি কারণে করা হয়—

(ক) শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ও (খ) উৎসাহ প্রদানের জন্য। কর্মীদের কাজের ফলাফলের ভিত্তিতে কর্মী ব্যবস্থাপনা তাদের বদলির ব্যবস্থা করে।

(১১) পৃথকীকরণ (Separation) : প্রতিষ্ঠান থেকে কর্মীদের বিভিন্ন ভাবে পৃথক করা হয়— যেমন, চাকরি থেকে বরখাস্ত, অবসর গ্রহণ, সাময়িকভাবে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। কর্মীদের কাজ পর্যালোচনা করার পর এই সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় যা কর্মী ব্যবস্থাপনার কাজের অন্তর্গত।

(১২) শ্রমিক কল্যাণ (Labour welfare) : শ্রমিক সল্যাণের জন্য যে বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার পিছনে যে দর্শন কাজ করে তা হল শ্রমিকদের কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি। শ্রমিকরা যাতে কাজে উৎসাহ পায় সে জন্য বিভিন্ন রকম শ্রমিক-কল্যাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যেমন—অবসরকালীন সুবিধা, চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত, বিশ্রাম ও ছুটি ইত্যাদি। এ সব সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ কর্মী ব্যবস্থাপনার কাজ হল শ্রমিক-কল্যাণ বিষয়ের প্রতি নজর রাখা।

৫.৭ মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা (Manpower Planning)

সংজ্ঞা (Definition) ঃ আধুনিক ব্যবস্থাপনা মনুষ্যশক্তির (Manpower) পরিবর্তে মানব সম্পদ (Human Resource) শব্দটি বেশি ব্যবহার করে। কারণ 'man' বলতে শুধু পুরুষকেই বোঝায় অথচ মহিলারাও শ্রমের যোগানের ক্ষেত্রে একটি বড়ো অংশ অধিকার করে থাকে। যাই হোক, প্রচলিত অর্থে একটি প্রতিষ্ঠানের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কত জন (Quantity) ও কী জাতীয় (Quality) শ্রমিক বা কর্মীর প্রয়োজন হবে সে সম্পর্কে পূর্বানুমান করাকে মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা বলে। বস্তুত মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা বলতে সেই পরিকল্পনাকে বোঝায় যার সাহায্যে সংগঠনের সার্বিক উন্নতির জন্য সঠিক সংখ্যায় উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী নিয়োগ করা সম্ভব হয়। সংগঠনে কর্মীর সংখ্যা ও কর্মীর গুণগত মান যদি নির্ধারণ করা না যায়, সেক্ষেত্রে সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য সফল করা সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে Wendell L. French-এর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ "An organisation that does not plan for its human resources well often find that it is not meeting either its personnel requirements or its overall goals effectively." অর্থাৎ "কোনও সংগঠন যদি তার মানবিক সম্পদের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ না করে সে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রতিষ্ঠান তার কর্মীর প্রয়োজনীয়তা বা সার্বিক লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ।" মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা তাই সংগঠনের লক্ষ্য পূরণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে স্বীকৃত। Bruce Coleman (ব্রুশ কোলেম্যান) মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনার সংজ্ঞায় বলেছেন যে মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা হল ঃ "The process of determining manpower requirements and the means for meeting those requirements in order to carry out the integrated plan of the organisation." অর্থাৎ, সংগঠনের পরিকল্পনা সুসংহত ভাবে রূপায়ণের জন্যই মনুষ্যশক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং কীভাবে এই প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হবে তা নির্ণয়ের প্রক্রিয়াই হল মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা।

৫.৮ মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা (Need for Manpower Planning)

যে সব কারণে মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় সেগুলি হল—

(ক) মনুষ্যশক্তি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ (Obtaining information for manpower planning) ঃ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন সময়ে কর্মীর প্রয়োজন হয়। কী জাতীয় কর্মী ও কতজন কর্মীর প্রয়োজন হবে সে সম্বন্ধে সঠিক পূর্বানুমান না করতে পারলে প্রতিষ্ঠানের কাজ ব্যাহত হয়। সেজন্য বিভিন্ন বিভাগ থেকে উপরিউক্ত তথ্য সংগ্রহ করে মনুষ্যশক্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

(খ) প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পূরণ (Realisation of enterprise objective) ঃ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পূরণে কর্মীরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়। কর্মীরা দক্ষ না হলে প্রতিষ্ঠানের কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে যে ধরনের কর্মীর প্রয়োজন হয় সেই পরিকল্পনা সঠিকভাবে গ্রহণ করতে না পারলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পূরণ ব্যাহত হয় এবং সেজন্য মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা আবশ্যক।

(গ) কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন (Distribution of responsibilities among the employees) ঃ কর্মীদের মধ্যে কাজের দায়িত্ব বণ্টনের মাধ্যমে কর্মীদের ব্যক্তিগত দক্ষতা যেমন বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল করাও সম্ভব হয়। এই দায়িত্ব বণ্টন মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্ভব।

সুতারাং কী ভাবে এবং কোন্ জাতীয় কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা হবে তা মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনার দ্বারা স্থির করা হয়।

(ঘ) **ব্যয় সংক্ষেপ (Cost reduction) ঃ** কর্মী সংগ্রহ থেকে শুরু করে প্রশিক্ষণ ও দায়িত্ব বণ্টন সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। যদি সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে কর্মীর গুণগত ও পরিমাণগত মান নির্ধারণ করা সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে সময় সংক্ষেপের সাথে সাথে ব্যয় সংক্ষেপও করা সম্ভব হয়। এজন্যও প্রতিষ্ঠানে মনুষ্যশক্তির পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়।

(ঙ) **ভবিষ্যৎ ব্যয় অনুমান (Estimation of future cost) ঃ** কর্মীদের পারিশ্রমিক প্রদানের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ভবিষ্যতে কর্মীরা কত পারিশ্রমিক পাবে তার সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা আবশ্যিক। সঠিক মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মী সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ ব্যয় অনুমান করা সম্ভব।

(চ) **দক্ষতা বৃদ্ধি (Increase in efficiency) ঃ** নতুন কর্মীদের নতুন কারিগরি বিদ্যায় শিক্ষিত করা জরুরি। নতুন ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়া বা নতুন কলাকৌশল যদি কর্মীরা রপ্ত করতে না পারে, সেক্ষেত্রে কর্মীরা দক্ষতা অর্জন করতে পারে না, ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না ও ব্যয় সংক্ষেপও ঘটে না। মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

(ছ) **ত্রুটি সংশোধন (Rectification of error) ঃ** প্রতিষ্ঠানে কর্মীরা আবশ্যকীয় উপাদান হিসাবে স্বীকৃত। মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে যদি কোনও সমস্যা থাকে তা প্রকাশ করা সম্ভব হয় ও সাংগঠনিক দুর্বলতা দূর করা যায়।

৫.৯ মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা পদ্ধতি (Method of Manpower Planning)

মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উভয় প্রকারই হতে পারে। স্বপ্লকালীন পরিকল্পনায় কর্মীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজে নিয়োগ করা হয় ও দীর্ঘকালীন পরিকল্পনায় কর্মীরা যাতে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যেমন প্রশিক্ষণ, অন্য কাজে বদলি ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়। নিচে উভয় পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

(ক) স্বল্পকালীন মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা (Short-term man-power planning) ঃ

(১) **কাজ পরিবর্তন ও কর্মী অপসারণ (Change of job and removal of employee)—** স্বল্পকালীন মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনায় কর্মীদের কাজের সংশোধনের জন্য কাজের পরিবর্তন করা হয়। যদি উপযুক্ত দক্ষতা অর্জনে তারা ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে অন্য কাজে বদলির ব্যবস্থা করা হয়। সেক্ষেত্রেও যদি তারা ব্যর্থ হয় তাহলে তাদেরকে অপসারণ করে নতুন কর্মী নিয়োগ করা হয়।

(২) **প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা (Arrangement of Training) —** কর্মীরা কাজের ক্ষেত্রে যাতে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে সেজন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া আবশ্যক। এজন্য স্বল্পকালীন মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনায় কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান একটি আবশ্যকীয় শর্ত হিসাবে বিবেচিত হয়।

(খ) দীর্ঘকালীন মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা (Long-term manpower planning) ঃ দীর্ঘকালীন মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনায় কর্মীরা যাতে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য সাধারণত নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে—

(১) **উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Determination of objectives)**— প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য কী ও কীভাবে সেগুলি সফল করা যাবে এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করতে হলে কী জাতীয় ও কত পরিমাণ কর্মীর দরকার সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(২) **সংগঠনের ধরন ও পরিবেশ (Nature and environment of organisation)**— সংগঠনের অন্তর্নিহিত পরিবেশ ও কাঠামোর ধরনের উপর মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা নির্ভর করে। সংগঠন যদি ব্যাপক হয় বা দেশের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে প্রতিষ্ঠানেও যদি পরিবর্তন ঘটে সেক্ষেত্রে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কত পরিমাণ ও কী জাতীয় কর্মী দরকার তা নির্ণয় করা হয়।

(৩) **কর্মী চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ নির্ধারণ (Determination of demand and supply of employee)**— প্রত্যেকটি কাজের জন্য কত কর্মীর প্রয়োজন ও সেই কাজের জন্য কত কর্মী রয়েছে বা আরও কর্মী প্রয়োজন কি না ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করে উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ ও অপ্রয়োজনীয় কর্মী ছাঁটাই করা হয়।

(৪) **কর্মী রেকর্ড সংরক্ষণ (Keeping of records of employees)**— প্রতিষ্ঠানে কত কর্মী রয়েছে, তারা কোন্ স্তরের (level) অন্তর্গত ইত্যাদি বিষয়ের রেকর্ড রাখতে হয় এবং সেই রেকর্ড থেকে তাদের অবস্থান (Position) সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। এর ফলে পরবর্তীকালে মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা করা সহজ হয়।

(৫) **প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা (Arrangement of Training)**— দীর্ঘকালীন মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনায় কর্মীদের দক্ষ হয়ে ওঠার সুযোগ অনেক বেশি। সেজন্য প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

৫.১০ অনুপ্রাণিতকরণ (Motivation)

সংজ্ঞা (Definition) ঃ কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কাজে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে। কর্মীদের কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যবস্থাপক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কারণ কর্মীরা কাজে উৎসাহ না পেলে প্রতিষ্ঠান তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়। অনুপ্রাণিতকরণ হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কর্মীরা স্ব-ইচ্ছায় কাজে অগ্রসর হয়। অনুপ্রাণিতকরণ কীভাবে করা হবে তা ব্যবস্থাপকরা ঠিক করেন। এ কথা বলার দরকার হয় না যে মানুষ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য উপাদান থাকে যা উৎপাদনকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে, যেমন—কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। এ সব উপাদানের দক্ষতা নতুন কারিগরি বিদ্যা প্রয়োগের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু যেখানে প্রতিষ্ঠানকে মূলত কর্মী নিয়ে কাজ করতে হয়, সেখানে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য মানবিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এর ফলে কর্মীরা তাদের শ্রম উজাড় নয়। অনুপ্রাণিতকরণের মাধ্যমে কাজ আদায় তাই বর্তমান ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এই ধারণা অনুযায়ী কর্মীদের কাজ সম্পাদন দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ঃ

কার্য সম্পাদন = ক্ষমতা × অনুপ্রাণিতকরণ

(Performance) = (Ability × Motivaiton)

উপরিউক্ত সূত্রে দেখা যায় যে অনুপ্রাণিতকরণ বৃদ্ধি পেলে কার্য সম্পাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং অনুপ্রাণিতকরণ হল সেই প্রক্রিয়া যার সাহায্যে কর্মীদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায় ও প্রতিষ্ঠানের কাজ সঠিক ভাবে এবং দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে তারা আগ্রহী হয়।

উইলিয়াম স্কট (William G. Scott)-এর ভাষায় ঃ "Motivation means a process of stimulating people to action and to accomplish desired goals." অর্থাৎ "অনুপ্রাণিতকরণ হল একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে কর্মীদের কাজে উদ্বুদ্ধ করা যায় এবং ঈপ্সিত লক্ষ্য পূরণ করা যায়।"

বেরেলসন এবং স্টেনার (Berelson and Steiner)-এর মতে ঃ "Motivation is an inner state that energizes, activates, or moves, and that directs or channels behaviour toward goals." অর্থাৎ "অনুপ্রাণিতকরণ একটি অন্তর্নিহিত বিষয় বা উৎসাহ যোগায় বা কাজে মনোনিবেশ করায় এবং যা মানবিক আচরণকে মূল লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়।"

৫.১১ অনুপ্রাণিতকরণের গুরুত্ব (Importance of Motivation)

সংগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিতকরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কর্মীরা ব্যবস্থাপক দ্বারা অনুপ্রাণিত না হলে সংগঠনের সমস্ত সম্পদের সঠিক ব্যবহার সম্ভব হয় না। ব্যবস্থাপকরা অনুপ্রাণিতকরণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে কর্মীদের আচরণে পরিবর্তন ঘটান। কর্মীরা যদি বুঝতে পারে যে তাদের প্রয়োজন মালিকপক্ষ গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করছেন ও তাদের প্রাপ্য মেটানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন, সেক্ষেত্রে তাদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। একথা অনস্বীকার্য যে প্রয়োজন (Need) কর্মীদের মনে অভাববোধের সৃষ্টি করে যা তাদের কর্ম-প্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করে ও কার্যসম্পাদনের মাধ্যমে তৃপ্তিবোধ জাগ্রত করে। নিচে লেখচিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি দেখানো হল ঃ

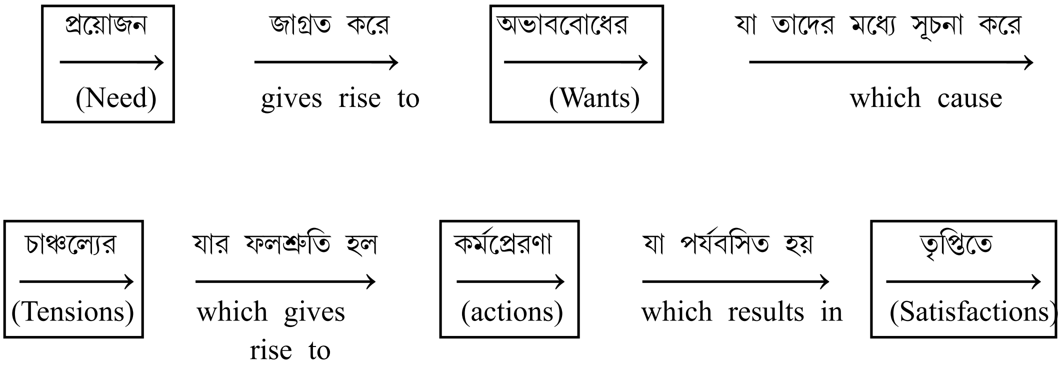

কর্মীদের মনে কর্মচাঞ্চল্যের এই অনুভূতি যথার্থভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয় না যদি তাদেরকে কাজে অনুপ্রাণিত করা না যায়। সুতরাং অনুপ্রাণিতকরণের মাধ্যমে কর্মীরা উদ্বুদ্ধ হয় ও প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করে। অনুপ্রাণিতকরণের গুরুত্বগুলি এইভাবে তুলে ধরা যায় ঃ

(১) এই প্রক্রিয়ায় কর্মীরা কাজে উৎসাহ পায় ও তাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পায়।

(২) প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের কাজের প্রেরণা, উৎপাদিকা শক্তি এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(৩) শ্রমিক আবর্তন (Labour Turnover) ও কাজে অনুপস্থিতির হার হ্রাস পায়।

(৪) শ্রমিকদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায় যা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

(৫) শিল্পে অশান্তির পরিমাণ হ্রাস পায়।

(৬) উৎপাদনের উপাদান বা সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়। ফলে দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায় ও মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(৭) অনুপ্রাণিতকরণের মাধ্যমে মানব সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়।

৫.১২ কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা (Performance Appraisal)

পর্যালোচনা বলতে কোনও কিছুর গুণ বা যোগ্যতার মূল্যায়ন করাকে বোঝায়। কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা বলতে সাধারণত ব্যবস্থাপক দ্বারা অধস্তন কর্মী সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন করাকে বোঝায়। ব্যবস্থাপকের কাছে এই পর্যালোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সমস্যাপূর্ণ কাজের মধ্যে পড়ে। কারণ অধস্তন কর্মীরা কাজ সম্বন্ধে পর্যালোচনা সবসময় সঠিক নাও হতে পারে। কার্যসম্পাদন পর্যালোচনাকে অনেকে কৃতিত্ব যাচাইকরণ (Merit Rating) হিসাবেও ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীর ব্যক্তিত্ব এবং কার্য সম্পাদনের যোগ্যতা ও দক্ষতা যাচাই করার পদ্ধতিকে Merit Rating বলে। তাই কৃতিত্ব যাচাই করা থেকে কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা শব্দটির অর্থ অনেক ব্যাপক।

সংজ্ঞা (Definition) ঃ কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা হল একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অধস্তন কর্মীদের লক্ষ্য, প্রয়োজনীয়তা ও কাজ সম্পাদনের যোগ্যতার মূল্যায়ন করা হয়। প্রতিষ্ঠানে কর্মী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও অনুপ্রাণিতকরণের পর তাদের কাজের পর্যালোচনা করা হয়। এই পর্যালোচনার মাধমে ব্যবস্থাপক জানতে পারেন কর্মীরা কত দক্ষতার সাথে তাদের কাজ সম্পাদন করেছে। পর্যালোচনার ফলে যদি কোনও ত্রুটি দেখা যায়, তাহলে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্মীকে জানানো হয় এবং ব্যবস্থাপক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা সংগঠনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার যার সাহায্যে কর্মীদের পদোন্নতি এবং যোগ্যতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়। কার্য সম্পাদন পর্যালোচনার জন্য তাই দরকার প্রয়োজনীয় তথ্য (Information gathering) সংগ্রহ, যার সাহায্যে কর্মীদের মূল্য, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ের মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়। কার্য সম্পাদন পর্যালোচনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি যে বক্তব্য রেখেছেন নিচে সেগুলি তুলে ধরা হল ঃ

স্কট, ক্লোদিয়ার এবং স্প্রিগেলের (Scott, Clothier & Spriegal)-মতে ঃ "A performance appraisal is a process of evaluating an employee's performance of a job in terms of its requirements." অর্থাৎ "প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী কার্য সম্পাদনে কর্মীর অবদান মূল্যায়ন করা হল কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা।"

হেয়েল (Heyel)-এর মতে ঃ "It is the process of evaluating the performance and qualifications of the employee in terms of the requirements of the job for which he is employed..." অর্থাৎ "কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী যে কাজের জন্য নিয়োজিত হয়েছে, তাদের কার্য সম্পাদন এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা বলে।"

বার্লিউ এবং হল (Berlew & Hall)-এর মতে কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা হল ঃ "....a continuous process of judging the relative worth and ability of an employee in performing his job." অর্থাৎ "কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে একজন কর্মীর আপেক্ষিক মূল্য বা গুরুত্ব ও ক্ষমতা বিচার করার জন্য যে অবিরত প্রক্রিয়া চলে তাকে কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা বলে।"

৫.১৩ কার্য সম্পাদন পর্যালোচনার উদ্দেশ্য (Objectives of Performance Appraisal)

প্রতিটি সংগঠনেরই কিছু উদ্দেশ্য থাকে। সংগঠনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা খুবই প্রয়োজন। এই পর্যালোচনার উদ্দেশ্যগুলি হল ঃ

(১) সংগঠনে কর্মীদের বাস্তব অবস্থা এবং তাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে জানা সম্ভব হয় ;

(২) কাজের ক্ষেত্রে কর্মীদের কোন্ কোন্ স্থানে ত্রুটি বা অযোগ্যতা রয়েছে তা নির্ধারণ করা যায় ;

(৩) কর্মীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য কী কী করণীয় আছে তা নির্ধারণ করা যায় ;

(৪) কর্মীদের কাজে দক্ষতা কতখানি বৃদ্ধি পেলে সংগঠনের ব্যয় হ্রাস পাবে তা দেখানো সম্ভব হয় ;

(৫) কর্মীদের মত প্রকাশের সুযোগ এই পর্যালোচনার মাধ্যমে সম্ভব হয় ; এবং

(৬) সর্বোপরি সংগঠনের উদ্দেশ্য পূরণে এই পর্যালোচনা প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে।

কার্য সম্পাদন পর্যালোচনার গুরুত্ব (Importance of Performance Appraisal) ঃ কর্মী ব্যবস্থাপনায় পদোন্নতি, অনুপ্রাণিতকরণ প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। কার্য সম্পাদন পর্যালোচনার জন্য সব চেয়ে জরুরি হল কর্মী সংক্রান্ত বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া। সঠিক তথ্য কর্মী ব্যবস্থাপককে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। যেমন, কোন্ কর্মীর প্রশিক্ষণ আবশ্যক, কার পদোন্নতি দরকার ইত্যাদি। **ম্যাকগ্রেগর** (McGregor) কার্য সম্পাদন পর্যালোচনার বিষয়ে তিনটি প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন।

(১) এর মাধ্যমে বেতন বৃদ্ধি, বদলি, পদাবনতি বা ছাঁটাই সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য বিচার করা যায়।

(২) এর মাধ্যমে অধস্তন কর্মী কীভাবে কাজ করে ও কাজের ক্ষেত্রে তার আচরণ, ব্যবহার, দক্ষতা বা কর্মজ্ঞান প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সম্বন্ধে জানা যায়।

(৩) এর মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের শিক্ষাদান এবং পরামর্শ দিতে পারেন।

কার্য সম্পাদন পর্যালোচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে **কামিংস্** (Cummings)-এর বক্তব্য হল "The overall objective of performance appraisal is to improve the efficiency of an enterprise by attempting to mobilise the best possible efforts from individuals employed in it. Such appraisal achieves four objectives including the salary reviews, the development and training of individuals, planning job rotations and assists promotions." অর্থাৎ "কার্য সম্পাদন

পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাছ থেকে তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে সংগঠিত করে প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এই পর্যালোচনা চারটি উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করে। এগুলি হল—বেতন পর্যালোচনা, কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও উন্নতিকরণ, কাজের পরিবর্তন সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং পদোন্নতিতে সাহায্য করা।"

সুতরাং বলা যেতে পারে, সঠিক কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা কর্মী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে স্বীকৃত। নিচে এর গুরুত্বগুলি আলোচিত হল—

(১) ব্যবস্থাপকের দৃষ্টিকোণ থেকে (From Manager's point of view) ঃ ব্যবস্থাপকের দৃষ্টিকোণ থেকে এই পর্যালোচনা কর্মীদের যোগ্যতা ও মান বিচারে সাহায্য করে।

(২) কর্মীদের দৃষ্টিকোণ থেকে (From Employee's point of view) ঃ কর্মীদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই পর্যালোচনা তাদের বর্তমান অবস্থা, কীভাবে আরও উন্নতি করা সম্ভব ও কত নিপুণতার সাথে কার্য সম্পাদন করা সম্ভব তা জানতে সাহায্য করে।

(৩) প্রশিক্ষণ (Training) ঃ এই পর্যালোচনার মাধ্যমে কর্মীদের আরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে কিনা তা জানা সম্ভব হয়। যদি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে কী জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মীদের কাজের মানকে আরও সমৃদ্ধ করবে তা জানা যায়।

(৪) সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision-making) ঃ সংগঠনের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কাজে রূপায়ণের জন্য কীরূপ অবস্থার প্রয়োজন তা এই পর্যালোচনার মাধ্যমে স্থির করা যায়।

(৫) অযোগ্য কর্মীদের চিহ্নিতকরণ (Pointing out inefficient employees) ঃ এই পর্যালোচনার মাধ্যমে একেবারে অযোগ্য কর্মীদের চিহ্নিতকরণ ও তাদের বরখাস্ত বা অন্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

(৬) পারস্পরিক সম্পর্ক (Relationship) ঃ এই পর্যালোচনা সংগঠনের বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে।

(৭) ব্যবস্থাপকের কাজের মান (Standard of performance of managers) ঃ ব্যবস্থাপকদের কাজের মান কীভাবে আরও উন্নত করা যায় তাও এই পর্যালোচনার মাধ্যমে জানা সম্ভব হয়।

৫.১৪ যোগ্যতার মান নির্ণয় (Merit Rating)

যোগ্যতার মান নির্ণয় হল কর্মীদের যোগ্যতা নির্ণয়ের একটি নিয়মানুগ বিশ্লেষণ পদ্ধতি। কর্মীদের যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য যে সব বিষয় বিবেচনা করতে হয়, অর্থাৎ কর্মীদের অন্তর্নিহিত গুণ, সে সব বিষয়ের পর্যালোচনা করে প্রতিটি গুণের জন্য নির্দিষ্ট Point দেওয়া হয়। এই সব Point বিবেচনা করে কোন্ কর্মী কোথায় নিযুক্ত হবেন বা কোন্ কর্মীর জন্য কী জাতীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রয়োজন, তাঁদের পারিশ্রমিকের পরিমাণ কত হওয়া উচিত ইত্যাদি নির্ণয় করা সম্ভব হয়। কার্যসম্পাদন পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কর্মীদের যোগ্যতার মান নির্ণয় তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেকক্ষেত্রে কাজকে পরিমাপ করা সম্ভব নয়, কারণ কাজের প্রকৃতিই তাই, যেমন কোনও বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া সংক্রান্ত কাজ। কিন্তু সেই কাজ সম্পাদন করতে কী ধরনের যোগ্যতা আবশ্যক তা যোগ্যতার মান নির্ণয়ের মাধ্যমে সম্ভব হয় এবং এটি একটি মূল্যায়ন পদ্ধতি।

৫.১৫ কর্মীদের যোগ্যতা নির্ণয়ে বিচার্য্য বিষয় (Factors on which Merit Rating of the workers depend)

কর্মী সংস্থাপনের পরবর্তী পর্যায় হল কর্মীর ব্যক্তিগত গুণ নির্ণয়। পদ্ধতিগতভাবে একই প্রতিষ্ঠান একই প্রকার কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন কর্মীর কর্মসম্পাদনের তুলনামূলক বিশ্লেষণকে গুণ নির্ণয় বলে। কর্মীর ব্যক্তিগত গুণের মূল্যায়ন পদ্ধতিতে প্রধানত তিনটি বিষয় বিবেচ্য ঃ (ক) কর্মীর কাজের গুণগত মান, (খ) কর্মীর কাঁচামাল অপচয়ের পরিমাণ এবং (গ) কর্মীর কর্মসম্পাদনের ক্রুটি-বিচ্যুতি। এছাড়া কর্মীদের যোগ্যতা নির্ণয়ে যে সব বিষয় বিবেচনা করতে হয় সেগুলি নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

(ক) কর্মীদের কী পরিমাণ কাজ করতে হবে ;

(খ)কর্মীদের কী ধরনের কাজ করতে হবে ;

(গ)কর্মীদের কী জাতীয় উদ্যম এবং প্রচেষ্টা থাকা উচিত ;

(ঘ) কর্মীদের কী জাতীয় দায়িত্ব নেওয়া উচিত ;

(ঙ)কর্মীদের কী জাতীয় দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং কাজের প্রতি কতটা প্রবণতা আছে তা জানা ;

(চ) কর্মীদের সততা ও সহযোগিতা কতটা আছে ;

(ছ) কর্মীদের শৃঙ্খলা সম্বন্ধে ধারণা কতখানি আছে ;

(জ) কর্মীদের কাজে উপস্থিতি ও নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে ধারণা ;

(ঝ) কর্মীদের বিচার করার ক্ষমতা কতখানি ;

(ঞ) কর্মীদের বিশেষ ধরনের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য কতখানি।

উপরিউক্ত বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করে কর্মী ব্যবস্থাপক কর্মীদের যোগ্যতা নির্ণয় করেন এবং এইসব গুণাবলী বিচার করে কর্মীদের পারিশ্রমিক, পদোন্নতি ইত্যাদি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। এছাড়া গুণ নির্ণয় সংস্থাপনের কাজে ক্রুটির নির্দেশ করে। এটি একটি নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতি। ক্রুটি ধরা পড়লে তা সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়। গুণ নির্ণয়, পদোন্নতি, বদলি, বাধ্যতামূলক কর্মহীনতা (lay off) ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মী ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। ব্যক্তিত্ব মূল্যায়নে কর্মীর স্বাভাবিক যোগ্যতা প্রতিপন্ন হলে তাকে স্থায়ী পদে অধিষ্ঠিত করা হয়।

৫.১৬ যোগ্যতা মান নির্ণয় পদ্ধতি (Methods of Merit Rating)

যোগ্যতার মান নির্ণয় নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে সম্পাদন করা যায়। পদ্ধতিগুলি হল—

(ক) গ্র্যাফিক রেটিং স্কেলস্ (Graphic Rating Scales) ঃ এটি একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মাধ্যমে কর্ম পরিদর্শক (Work Supervisor) কর্মীদের বিভিন্ন গুণাবলীর (যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে) নির্দিষ্ট মান দেন। সেইসব মানগুলিকে বিচার করে যোগ্যতা নির্ণয় করা হয়।

(খ)চেক লিস্টস্ (Check lists) ঃ এই পদ্ধতিতে কর্মীদের কাজের জন্য বিভিন্ন বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। এই বিবরণীতে বিভিন্ন প্রশ্ন থাকে। কর্মীদের কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়। প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে কর্মীদের কাজ সম্পর্কে ও কর্মীদের কাজের প্রতি স্পৃহা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় ও তাঁদের যোগ্যতা নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

(গ)সরাসরি পর্যালোচনা (Direct Appraisal) ঃ এই পদ্ধতি অনুযায়ী কর্মীদের যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া আছে সেই কাজ কর্মীরা কত মনযোগ সহকারে সম্পাদন করছেন, সে সম্পর্কে পরিদর্শক তাঁর মতামত দেবেন। এর ফলে কর্মীদের যোগ্যতা সম্পর্কে সরাসরি ধারণা করা সম্ভব হবে।

(ঘ) কাজের মান (Standard of Performance) ঃ এই পদ্ধতিতে কর্ম-পরিদর্শক কর্মীদের প্রতিটি কাজের জন্য মান নির্দিষ্ট করে দেবেন। কর্মীরা সেই মান অনুযায়ী কাজ করতে কতখানি সমর্থ হচ্ছেন তার মাধ্যমে তাঁদের যোগ্যতার পরিমাপ করা সম্ভব হয়।

৫.১৭ কার্য সম্পাদন পর্যালোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি (Different Methods of Peformance Appraisal)

কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই জরুরি। এই পর্যালোচনার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। তবে এক একটি সংগঠনের পর্যালোচনা পদ্ধতি এক একরকম। বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি এই পর্যালোচনার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে **রক** এবং **লুইস** (Rock and Leuis)-এর বক্তব্য তুলে ধরা যায়। তাঁরা এই পদ্ধতিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, যেমন—সংকীর্ণ ব্যাখ্যা এবং ব্যাপক ব্যাখ্যা (Narrow Interpretation & Broad Interpretation)। প্রথম পদ্ধতির মধ্যে পড়ে প্রলক্ষণ (Trait), পর্যায়করণ (Ranking), কর্মী তুলনা (Employee Comparison) এবং সম্পাদনের মান (Performance Standard) পদ্ধতি। দ্বিতীয়টি হল উদ্দেশ্যমুখী ব্যবস্থাপনা (Management by Objectives)।

কার্য সম্পাদন পর্যালোচনার জন্য যে সব পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় নিচের রেখাচিত্রে তা দেখানো হল ঃ

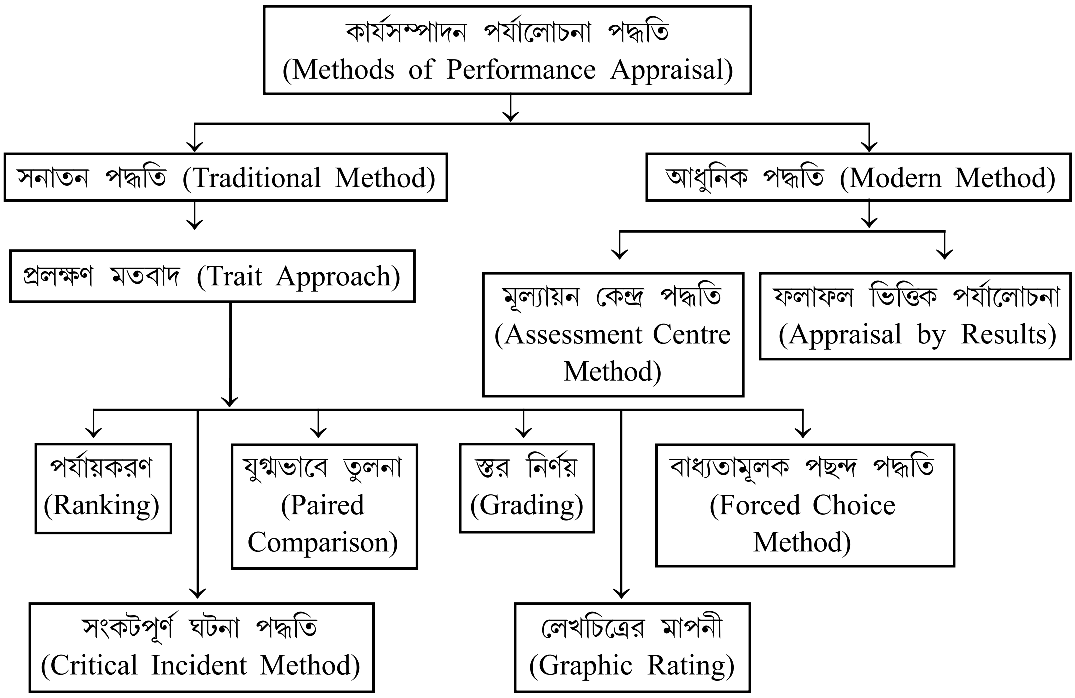

কার্য সম্পাদন পর্যালোচনার ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি বর্তমান। প্রথমটি সনাতন পদ্ধতি ও দ্বিতীয়টি আধুনিক পদ্ধতি। নিচে এই পদ্ধতি দুটি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

(ক) সনাতন পদ্ধতি (Traditional Method) ঃ

প্রলক্ষণ মতবাদ (Trait Approach) ঃ এই মতবাদ কার্য সম্পাদন পর্যালোচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত। যে কোনও কর্মীরই (সাধারণ বা ব্যবস্থাপক) বিশেষ কিছু গুণ (Trait) থাকে। কার্য সম্পাদনের জন্য সেই বিশেষ গুণের প্রয়োগ আবশ্যক। কর্মীর ব্যক্তিগত গুণ সেই কাজ সম্পাদনের কতখানি সাহায্য করেছে তার মূল্যায়ন করা হল প্রলক্ষণ মতবাদের মূল কথা। এই পদ্ধতিতে দশ থেকে পনেরো রকমের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও তার সাথে কাজের চরিত্রের তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং কর্মী সেই কাজগুলি কতখানি যোগ্যতার সাথে সম্পন্ন করতে পেরেছে তার পর্যালোচনা করা হয়। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিচার্য্য বিষয়গুলি হল --কর্মী তার কাজ কতখানি বুঝতে পারছে, কর্মীর নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা, কর্মী কতটা যোগ্যতার সাথে কাজ সম্পাদন করতে পারছে, বিচার করার ক্ষমতা ইত্যাদি। **Koontz and O'Donnell**-এ ভাষায় ঃ "These typical trait-rating evaluation systems might list ten to fifteen personal characteristics, such as ability to get along with people, leadership, analytical competence, industry judgement and intiative. অর্থাৎ "এই বিশেষ প্রলক্ষণ মতবাদ দশ থেকে পনেরোটি ব্যক্তিগত চরিত্র তালিকামুক্ত করে। এগুলি হল কর্মীদের সাথে মিশে যাওয়ার, নেতৃত্ব দেওয়ার, বিচার করার, কাজ করার এবং উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষমতা।"

প্রলক্ষণ মতবাদে পর্যালোচনার যে সব পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় সেগুলি হল—

(১) **পর্যায়করণ (Ranking) ঃ** কর্মীর বিশেষ গুণ ও যোগ্যতার বিচার করে পর্যায়করণ করা হয়। এর ফলে একজন কর্মী থেকে অপর কর্মীর পার্থক্য বিচার করা সম্ভব হয়। যেমন ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এইভাবে পর্যায়করণ করা হয়, ঠিক তেমনি কর্মীদের যোগ্যতার মান ধরে পর্যায়করণ করা হয়। এই পদ্ধতি খুব সহজ ও প্রাচীনতম। তবে এই পদ্ধতি অল্প সংখ্যক কর্মীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা গেলেও, বৃহত্তর ক্ষেত্রে খুব কার্যকরী নয়।

(২) **যুগ্মভাবে তুলনা** (Paired Comparison) ঃ পর্যায়করণ পদ্ধতির থেকে এই পদ্ধতির সামান্য পার্থক্য রয়েছে। এই পদ্ধতি বৃহৎ দলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। প্রতিটি কর্মীকে একবারই অপর কর্মীর সাথে তুলনা করা হয় এবং সাধারণত একটিমাত্র গুণ বিচারের মাধ্যমে কর্মীর কাজ করার ক্ষমতা সম্বন্ধে ধারণা করা হয়। যিনি গুণ বিচার করেন তাঁকে দুটি করে নাম দেওয়া হয়। এদের মধ্যে যে কর্মী উৎকৃষ্ট তাকে চিহ্নিত করা হয় এবং এই ভাবে তুলনা করতে করতে পর্যালোচনার কাজ সমাপ্ত করা হয়। তবে এই পদ্ধতিতে সময় ও শ্রম অনেক বেশি লাগে। কতজন কর্মী থাকলে কতগুলি তুলনা করতে হয় তা নিচের সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়--

তুলনার সংখ্যা = $\frac{n(n\quad 1)}{2}$ [এখানে n= কর্মী সংখ্যা]

কর্মী সংখ্যা	**তুলনার সংখ্যা**
১০	৪৫
২০	১৯০
৫০	১,২২৫
১০০	৪,৯৫০

(৩) **স্তর নির্ণয় (Grading) ঃ** এই পদ্ধতিতে কর্মীদের বিশেষ কতকগুলি গুণকে বা ক্ষমতাকে আগে থেকেই স্থির করে নিয়ে কিছু স্তর নির্ধারণ করা হয় এবং কর্মীদের সেই গুণ বা যোগ্যতা অনুযায়ী সেই স্তরে সংস্থাপন করা হয়। এই স্তরগুলি সাধারণত অতুলনীয়, ভালো, মধ্যম, খারাপ, খুব খারাপ (outstanding, good, average, poor, very poor) ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করা হয়। মাঝে মাঝে এই স্তর নির্ণয় পদ্ধতি বাধ্যতামূলক বণ্টন পদ্ধতিতে (Forced Distribution System) পরিবর্তন করা হয় যেখানে কর্মীদের স্তরকে শতকরা হারে ভাগ করা হয়। সাধারণত বৃহৎ দলের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুবই কার্যকরী।

(৪) **বাধ্যতামূলক পছন্দ পদ্ধতি (Forced-Choice Method) ঃ** এই পদ্ধতিতে নির্ধারকের কাছে অধস্তন কর্মী সম্পর্কিত বিবরণ থাকে এবং এই বিবরণ কত কার্যকরী ভাবে কর্মী সম্বন্ধে ধারণা দেয় মূল্যায়নকারী তার মূল্যায়ন করেন। মূল্যায়নকারী এই বিবরণীতে দুটি করে বিষয় লক্ষ্য করেন, একটি সমর্থনযোগ্য এবং অপরটি অসমর্থনযোগ্য। যদি কর্মীর আচরণ সমর্থনযোগ্য হয় তাহলে মূল্যায়নকারী সেই কর্মীকে নির্বাচন করেন। কর্মী যদি সমর্থন অর্জন করতে না পারে, সেক্ষেত্রে কর্মীকে বাতিল করা হয়। নিচে কিছু যুগ্ম বিবরণীর উল্লেখ করা হল। যেমন--

(১) কর্মী নিয়মিত এবং মনোযোগী কিনা;

(২) পরিশ্রমী এবং সতর্ক কিনা;

(৩) অসৎ এবং বিরক্তিকর কিনা ইত্যাদি।

(৫) **সংকটপূর্ণ ঘটনা পদ্ধতি (Critical Incident Method) ঃ** এই পদ্ধতিতে সাধারণত সংকটপূর্ণ ঘটনা এবং সেই ঘটনা সম্পর্কিত বিষয়ের মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়ন করতে হলে কিছু সন্তোষজনক বিষয়, যা কার্য সম্পাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা নির্ণয় করা হয় এবং বিশেষজ্ঞের দল কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী একটি করে মান (scale) প্রদান করেন। কর্মীরা কাজ করার পর কাজ করতে সফল না বিফল হয়েছে তা পরীক্ষা করে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। যে কর্মী সংকটপূর্ণ অবস্থায় কাজ করতে সফল হয় তাকে উৎসাহিত করা হয় ও প্রয়োজনে ভবিষ্যতে তার দক্ষতাকে কাজে লাগানো হয়।

(৬) **লেখচিত্রের মাপনী (Graphic rating scale) ঃ** একটি কাজ সম্পাদন করার জন্য কী মাত্রায় গুণাবলীর প্রয়োজন তা এই পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারককে একটি বিশেষ গুণের পরিবর্তিত মাত্রা সূচিত করে ক্রমশ এক নিরবচ্ছিন্ন বিষয়বস্তু সরবরাহ করা হয়। নির্ধারক কর্মীদের কাজের প্রতি আগ্রহ পর্যবেক্ষণ করে সেই মাত্রা প্রদান করেন। সাধারণত কর্মীদের কাজের গুণাগুণের উপর ভিত্তি করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঁচটি মাত্রা প্রদান করা হয়। কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গুণগুলি এইরূপ হতে পারে, যেমন--খুব ভালো, ভালো, সাধারণ, খারাপ ইত্যাদি এবং মাত্রা ৪, ৩, ২, ১ প্রদান করা হতে পারে।

(খ) **আধুনিক পদ্ধতি (Modern Method) ঃ**

(১) **ফলাফলভিত্তিক পর্যালোচনা (Appraisal by Results) ঃ** কর্মীদের কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখেই রচনা করতে হয়। কর্মীদের মূল্যায়ন তাদের কাজ সম্পাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। তাই প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও সেই লক্ষ্য পূরণে কর্মীদের কার্য সম্পাদনের পর্যালোচনা করা হল ফলাফলভিত্তিক পর্যালোচনার মূল কথা। এই পদ্ধতি ব্যবস্থাপকদের কাজ পর্যালোচনার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। সংগঠনে ব্যবস্থাপক কতখানি সাফল্যের সাথে কাজ সম্পাদন করতে পেরেছেন তা নির্ণয় করাই হল এই পদ্ধতির বিবেচ্য বিষয়। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণের বিচার এই পদ্ধতির মাধ্যমে করা হয় না। উদ্দেশ্য পূরণে কর্মী বা ব্যবস্থাপক

কতখানি সমর্থ হয়েছে তা নির্ণয় করা হয় এবং সেজন্য এই পদ্ধতি 'উদ্দেশ্যমুখী ব্যবস্থাপনা' বা 'Management by Objectives (MBO)' হিসাবেও পরিচিত। **Peter Drucker** ১৯৫৪ সালে উদ্দেশ্যমুখী ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের গুরুত্বের উপর মন্তব্য করেছেন ঃ "Objectives are needed in every area where performance results directly and vitally effect the survival and prospertity of the business" অর্থাৎ "কার্য সম্পাদন যা সরাসরি এবং বিশেষভাবে করাবারের বেঁচে থাকা ও সমৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে তার জন্য উদ্দেশ্যমুখী ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন।"

ব্যক্তির গুণ বিচারের জায়গায় উদ্দেশ্যের সাফল্যের বিচারকার্য সম্পাদন পর্যালোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।

ফলাফলভিত্তিক পর্যালোচনার বৈশিষ্ট্য (Features of Appraisal by Results) ঃ ফলাফলভিত্তিক পর্যালোচনায় নিচের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় ঃ

(১) **ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মীর মধ্যে মতবিনিময় (Interaction between Superior and Subordinate) ঃ** প্রতিষ্ঠানের উভয় স্তরের কর্মীরা মত বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের কর্তব্য ও দায়িত্বের তালিকা প্রস্তুত করেন।

(২) **উদ্দেশ্যপূরণের উপর গুরুত্ব প্রদান (Placing emphasis on fulfilment of objectives) ঃ** প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কর্তব্য ও দায়িত্বের মাত্রা নির্ধারিত হয় এবং উদ্দেশ্য পূরণের উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়।

(৩) **প্রগতির মূল্যায়ন (Progress Evaluation) ঃ** ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মীরা বছরের বিভিন্ন সময়ে এক জায়গায় মিলিত হয়ে কার্য সম্পাদনের মূল্যায়ন করেন। উদ্দেশ্য পূরণে তাঁরা কতখানি সমর্থ হয়েছেন তাও বিচার করা হয়।

ফলাফলভিত্তিক পর্যালোচনার সীমাবদ্ধতা (Limitations of Appraisal by Results System) ঃ

(১) ফলাফলভিত্তিক পর্যালোচনা কার্য সম্পাদনের উপরই শুধু জোর দেয়। কিন্তু একথাও ঠিক যে অনেক সময় কর্মীর উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে তা সে সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারে না, তার প্রবল মানসিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও। কারণ শারীরিক, সামাজিক বা পারিবারিক কারণও কার্য সম্পাদনে বাধার সৃষ্টি করে। ফলাফলভিত্তিক পর্যালোচনা কর্মীদের এসব বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে না অথচ এইসব বিষয়ের পর্যালোচনা ছাড়া কর্মীর সঠিক পর্যালোচনা সম্ভব নয়।

(২) যে সব কর্মী উৎপাদনের সাথে বা দ্রব্য বিক্রয়ের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত তাদের কাজের পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়। কিন্তু যারা পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করে, যেমন অফিস কর্মচারী বা ব্যবস্থাপকগণ, তাদের ক্ষেত্রে কার্য সম্পাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ফলাফলভিত্তিক পর্যালোচনা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ ব্যর্থ হয়।

(৩) এই পর্যালোচনা তাৎক্ষণিক। বর্তমান অবস্থায় কর্মীর কাজের পর্যালোচনা করা হয়। কিন্তু ভবিষ্যতে কর্মী উন্নয়ন, পদোন্নতি ইত্যাদির ব্যাপারে বর্তমান কার্যকলাপ খুব গুরুত্ব পায় না।

(৪) ব্যবস্থাপনার পরিধির উপর এই পদ্ধতির কার্যকারিতা নির্ভর করে। যদি এই পরিধি ব্যাপক হয়, সেক্ষেত্রে সমস্ত কর্মীর কার্যকারিতা নিপুণতার সাথে বিচার করা সম্ভব হয় না ও কর্মী মহলে এর গুরুত্ব হ্রাস পায় ও মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়।

(২) **মূল্যায়ন কেন্দ্র পদ্ধতি (Assessment Centre Method) ঃ** এই পদ্ধতি প্রথমে ১৯৩০ সালে **সিমনিয়েট** (Simoniet) জার্মান সৈন্যদের মধ্যে প্রয়োগ করেন। এই পদ্ধতিতে কয়েকজন মূল্যায়নকারী নিয়ে একটি গোষ্ঠী তৈরি করা হয়। তারা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কর্মীর অবদান বিভিন্ন মান দ্বারা নিরূপণ করেন। এই মূল্যায়ন কর্মীদের কাজ করার ক্ষমতা ও পদোন্নয়নে তার ভূমিকা নির্ণয়ে সাহায্য করে।

৫.১৮ কর্ম মূল্যায়ন (Job Evaluation)

সংজ্ঞা (Definition) ঃ বিভিন্ন কাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Relative importance) বা আপেক্ষিক মূল্য (Relative worth) বিশ্লেষণ (Analysis) ও যাচাইকরণ করাতে কর্ম মূল্যায়ন বলে। কাজের গুরুত্ব ও মূল্য কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, যেমন--দক্ষতা, যোগ্যতা, দায়িত্ব, বাধাবিঘ্ন, জ্ঞান, কাজের পরিবেশ ইত্যাদি এই বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে কাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা হয় ও কর্ম মূল্যায়ন করা হয়। এই কর্ম মূল্যায়নের ব্যবহারিক কার্যকারিতা হল পারিশ্রমিক বা বেতন কাঠামো নির্ধারণ। যেহেতু সব কাজের গুরুত্ব সমান নয় সেজন্য বেতন কাঠামোও বিভিন্ন ধরনের হয়। বেতন কাঠামো কী হওয়া উচিত তা নির্ধারণের জন্য মূল্যায়ন করা হয়। তবে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন ভাবে এই বিষয়ের সংজ্ঞা দিয়েছেন।

টি. লুসির (T. Lucey) মতানুযায়ী ঃ “This is a technique which seeks to show in a reasonable objective manner the relative worth of job.” অর্থাৎ “এটি একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে একটি কাজের আপেক্ষিক মূল্য যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ণয় করা যায়।”

কিমবল ও কিমবল (Kimball and Kimball) এর মতে ঃ “an effort to determine the relative value of every job in a plant to determine what the fair basic wage for such a job should be.” অর্থাৎ “কোনও কাজের উপযুক্ত মজুরি কী হওয়া উচিত তা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কারখানায় সেই কাজের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণের প্রচেষ্টাই হল কর্ম মূল্যায়ন।”

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলি পর্যালোচনা করলে কার্য মূল্যায়ন সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি সেটি হল কোনও প্রতিষ্ঠানে পারিশ্রমিকের অসামঞ্জস্যতা দূর করার জন্য কাজের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণের এটি একটি গুণগত পরিমাপ পদ্ধতি। এর উদ্দেশ্য হল কাজের জন্য কত অর্থ প্রধান করতে হবে তা নির্ধারণ করা নয়, কাজের আপেক্ষিক মূল্য নির্ণয় করা।

৫.১৯ কর্ম মূল্যায়নের ধাপ (Steps in Job Evaluation)

কর্ম মূল্যায়ন বলতে বোঝায় কাজের মূল্যায়ন করা এবং একই প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য কাজের মূল্যের সাথে ঐ কাজের মূল্যের বস্তুগত তুলনা করা। এই মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট কিছু ধাপ অনুসরণ করা হয় এবং সেগুলি হল—

(১) এর মাধ্যমে কাজের সম্পূর্ণ পরীক্ষা করা হয়;

(২) কাজের বিবরণ তৈরি ও কাজের সার্থক সম্পাদনের জন্য কী ভাবে কাজ করতে হবে তার বিশ্লেষণ করা হয়;

(৩) একটি কাজের সাথে অন্য কাজের তুলনা করা হয়;

(৪) প্রতিষ্ঠানের কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী কাজকে পরপর সাজানো হয়;

(৫) অর্থের সাথে সম্পর্ক যুক্ত করে কাজের পরম্পরা ঠিক করা হয়।

Dale Yoder এবং অন্যান্যরা কর্ম মূল্যায়নের ধাপগুলিকে এই তালিকার মাধ্যমে দেখিয়েছেন।

কর্ম মূল্যায়ন (Job Evaluation)

কাজের স্তরীকরণ (Job Grading) | কাজের দাম নির্ধারণ (Job Pricing)

1. **কাজের বিশ্লেষণ (Job Analysis)**
2. **কাজের শ্রেণীবিভাগ (Job Classification)**
5. **কাজের স্তরীকরণ (Job Grading)**

4. **অভ্যন্তরীণ বেতন তালিকা প্রস্তুতকরণ (Internal Salary Scheduling)**
5. **বাহ্যিক কাজের দাম নিরূপণ (External Job Pricing)**

৫.২০ কর্ম মূল্যায়নের গুরুত্ব (Importance of Job Evaluation)

কোন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মীর পারিশ্রমিকের মধ্যে সামঞ্জস্য আনার জন্য বা উপযুক্ত পারিশ্রমিক নির্ধারণের জন্য কাজের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণের প্রচেষ্টা হল কর্ম মূল্যায়ন। প্রতিষ্ঠানে যে সব বিভিন্ন পদ আছে তাদের তুলনামূলক মূল্য নির্ধারণের এটি একটি কার্যকরী পদ্ধতি। এ প্রসঙ্গে আই. এল. ও (ILO)-এর রিপোর্টের অংশবিশেষ নিচে তুলে ধরা হল ঃ

"The aim of the majority of systems of job evaluation is to establish, on agreed logical basis, the relative values of different jobs in a given plant or machinery."

অর্থাৎ "কোন নির্দিষ্ট কারখানায় বা যন্ত্রের সাথে জড়িত বিভিন্ন কাজের আপেক্ষিক মূল্য যুক্তিসঙ্গতভাবে নিরূপণ করা হল কর্ম মূল্যায়নের অধিকাংশ পদ্ধতির লক্ষ্য।"

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে কর্ম মূল্যায়নের ফলে বিভিন্ন পদের পৃথকীকরণ ও গুরুত্ব বিচার করা সম্ভব হয়। এর ফলে বিভিন্ন প্রকার কাজের জন্য দেয় পারিশ্রমিকের হারের মধ্যে অসামঞ্জস্য দূর করা যায়। শুধু অসামঞ্জস্য দূর করা নয়, এই মূল্যায়নের ফলে যোগ্যতা অনুসারে পারিশ্রমিক প্রদান করা সম্ভব হয়, ফলে সুস্থ শ্রমিক-ব্যবস্থাপক সম্পর্ক বজায় রাখা যায়।

কর্ম-মূল্যায়নের উদ্দেশ্য (Objectives of Job Evaluation)

কর্ম মূল্যায়নের উদ্দেশ্যগুলি এইভাবে তুলে ধরা যায়--

(১) **পারিশ্রমিক (Remuneration)** ঃ কর্ম মূল্যায়নের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল উপযুক্ত ও ন্যায্য পারিশ্রমিকের পরিমাণ স্থির করা। যদি কোনও কাজের জন্য উচ্চ যোগ্যতা, দক্ষতা ও দায়িত্বের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

(২) **পদোন্নতি (Promotion)** ঃ কর্ম মূল্যায়নের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকদের পক্ষে কর্মীদের পদোন্নতি কীভাবে হবে, প্রশিক্ষণ কী ভাবে দেওয়া হবে, তাদের কী ভাবে বিভিন্ন কাজে স্থাপন করা হবে ইত্যাদি বিষয় জানা সম্ভব হয়।

(৩) পরিবেশের মান (Standard of environment) ঃ কাজের পরিবেশের মান উন্নয়নের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। কর্ম মূল্যায়নের মাধ্যমে তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

(৪) **কাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Relative importance of job) ঃ** কর্ম মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিটি কাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

(৫) **বেতন কাঠামো (Salary structure) ঃ** কাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণের মাধ্যমে মজুরি বা বেতন কাঠামো প্রস্তুত করা সম্ভব হয়।

(৬) **ক্ষমতা ও দায়িত্ব (Authority & Responsibility) ঃ** কর্মীদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা ও ভার অর্পণ করা কর্ম মূল্যায়নের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়।

(৭) **শ্রমিক অসন্তোষ হ্রাস (Reduction of resentment of employee) ঃ** কর্ম মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি কর্মনীতি নির্ধারণ করা সম্ভব হয়, যা পরবর্তী পর্যায়ে কর্মীদের মধ্যে কোনও অসন্তোষ প্রকাশ পেলে, তা মেটাতে সাহায্য করে।

(৮) **জাতীয় মজুরি কাঠামো (National wage structure) ঃ** প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে কর্ম মূল্যায়ন সঠিক পদ্ধতিতে হলে জাতীয় স্তরে মজুরি কাঠামো স্থির করা সহজ হয়।

৫.২১ কর্ম মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methods of Job evaluation)

একটি কাজকে অন্য কাজের সাথে তুলনা করে তার আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা হয় এবং এই কাজ কর্ম মূল্যায়নের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। কর্ম মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। রেখাচিত্রের মাধ্যমে তা দেখান হল ঃ

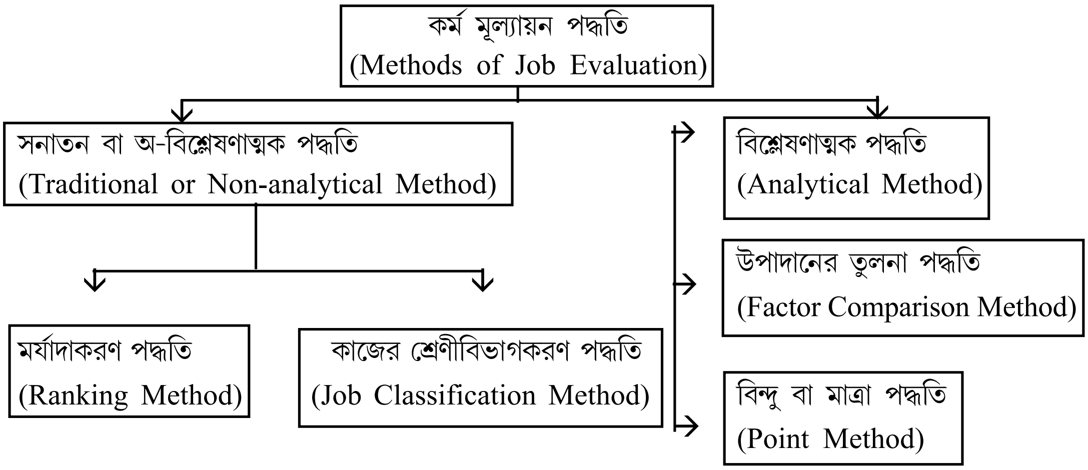

উপরের রেখাচিত্র থেকে জানা যায় যে কর্ম মূল্যায়ন পদ্ধতি মূলত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত--সনাতন বা অ-বিশ্লেষণাত্মক এবং বিশ্লেষণাত্মক। এই দুটি পদ্ধতির প্রধান পার্থক্য হল প্রথমটি সম্পূর্ণ কাজকে গুরুত্ব দেয় এবং দ্বিতীয়টি কাজের পারিশ্রমিককে গুরুত্ব দেয়। পরের পৃষ্ঠায় উভয়প্রকার পদ্ধতি আলোচনা করা হল।

(১) **মর্যাদা পদ্ধতি (Ranking Method) ঃ** এই পদ্ধতি সাধারণত ছোটো সংস্থায় প্রয়োগ করা হয় যেখানে ব্যবস্থাপক প্রায় সব কাজই জানেন। ব্যবস্থাপক কাজগুলিকে কাজের মর্যাদা অনুযায়ী পরপর সাজান। অর্থাৎ উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তরে বা বিপরীতক্রম অনুযায়ী অর্থাৎ নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর অনুযায়ী কাজগুলি সাজানো হয়। তবে কাজকে সাজানোর আগে প্রতিটি কাজের বিশ্লেষণ ও গুরুত্ব সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

এই পদ্ধতির সুবিধা হল (Advantages of this system) ঃ

(ক) খুব সহজ ও সরল পদ্ধতি বলে কর্মী, ব্যবস্থাপক ও শ্রমিক সংঘ সহজে বুঝতে পারে।

(খ) এই পদ্ধতির জন্য সময়, শ্রম ও অর্থ কম লাগে।

(গ) কাজ সম্পাদনে যন্ত্রের প্রয়োজন এই পদ্ধতিতে গুরুত্ব পায় না। ফলে পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসুবিধা কম হয়।

এই পদ্ধতির অসুবিধা হল (Disadvantages of this system) ঃ

(ক) এই পদ্ধতিতে কাজের মূল্যের পরিমাপ করা হয় না, ফলে কর্মীদের যোগ্যতা বিচার গুরুত্ব পায় না।

(খ) কাজের গুরুত্বের তুলনা করা হয়, কিন্তু একটি কাজ থেকে অন্য কাজ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা এই পদ্ধতিতে জানা সম্ভব হয় না।

(২) কাজের শ্রেণীবিভাগকরণ পদ্ধতি (Job Classification Method) ঃ

কাজের শ্রেণীবিভাগকরণ বা কাজের স্তরীকরণ এই পদ্ধতি অনুযায়ী করা হয়। এই পদ্ধতিতে একটি নির্ধারক বা মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয় যারা প্রত্যেকটি কাজের বৈশিষ্ট্য, কাজের জন্য নির্দিষ্ট দায়িত্ব, কাজের উপাদান ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করেন ও সেইমতো কাজের শ্রেণীবিন্যাস করেন। সুতরাং এই পদ্ধতিতে কাজের বিভিন্ন শ্রেণী এবং প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য পৃথক বেতন-স্তর নির্ণয় করা হয়।

এই পদ্ধতির সুবিধা (Advantages of this system) ঃ

(ক) এই পদ্ধতি সরল ও সহজবোধ্য

(খ) বেশি সংখ্যক কাজকে অল্প সংখ্যক স্তরে বিভক্ত করা যায়।

(গ) কাজের স্তরীকরণ করা হয় বেতনের স্তর নির্ণয় করার জন্য।

এই পদ্ধতির অসুবিধা (Disadvantages of this system) ঃ

(ক) কাজকে যথেষ্ট গভীরতার সাথে বিশ্লেষণ না করে কাজের স্তরীকরণ করা হয়। ফলে কাজের স্তরীকরণ বিজ্ঞানসম্মত হয় না।

(খ) ছোটো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি উপযোগী কিন্তু বড়ো প্রতিষ্ঠান এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে সাফল্য আসে না।

(৩) **উপাদানের তুলনা পদ্ধতি (Factor Comparison Method) ঃ**

এই পদ্ধতিতে সমস্ত রকম কাজের মূল্যায়ন না করে শুধু মূল কাজগুলি (Key Jobs) বেছে নেওয়া হয়। এরপর বেছে নেওয়া কাজগুলিকে পুনরায় এইভাবে বিশ্লেষণ করা হয়—

(ক) কর্মীর কতখানি মানসিকতার প্রয়োজন (Mental application);

(খ) কর্মীর কতখানি শারীরিক দক্ষতার প্রয়োজন (Physical application);

(গ) কর্মীর কতখানি দক্ষতার প্রয়োজন (Skill required),

(ঘ) কর্মীর কতটা দায়িত্ব (Responsibility); এবং

(ঙ) কাজের কী অবস্থা (Working condition)।

বিশ্লেষণের পর উপরিউক্ত উপাদানগুলির মূল্যায়ন করা হয়। এই মূল্যায়নের মাধ্যমে কাজের গুরুত্ব নির্ণয় করা হয় ও সমস্ত কাজগুলির মধ্যে প্রধান কাজ কোন্‌টি তা নির্বাচন করা হয়। অন্যান্য কাজকে তুলনা করার জন্য প্রধান কাজকে মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সমস্ত কাজের মূল্যায়ন করার সময় তাদের প্রত্যেককে অর্থমূল্য দেখানো হয়।

(৪) **বিন্দু বা মাত্রা পদ্ধতি (Point Method) ঃ** কর্ম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যে সব পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে এই পদ্ধতিটিই বেশি প্রচলিত। এই পদ্ধতিতে কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী কতকগুলি বিষয়ের উপর পয়েন্ট বা মাত্রা দেওয়া হয় এবং সেই পয়েন্টগুলি একত্রে যোগ করে এক একটি কাজের মূল্য ঠিক করা হয়। এই বিষয়গুলি হল--

(ক) মানসিক প্রয়োগ বা শিক্ষা (Mental application or education) ;

(খ) দৈহিক প্রয়োগ বা চেষ্টা (Physical application or effort) ;

(গ) যোগ্যতা, বিশেষ জ্ঞান বা দক্ষতা (Experience, special expertise or skill) ;

(ঘ) কাজের সফলতা বা ব্যর্থতার দায়িত্ব (Responsibility for achievements or failures) ;

(ঙ) কাজের ঝামেলা বা জটিল শ্রেণীর কাজ (Job hazards or complex nature of job) ;

(চ) কাজের অবস্থা (Working Conditions)।

এগুলি নির্ধারণ করার পর প্রকৃতি অনুযায়ী ও প্রতিটি কাজের অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলির গুরুত্ব অনুসারে বিন্দু বা পয়েন্ট আরোপ করা হয় এবং মূল্যায়ন করা হয়। পয়েন্ট বা বিন্দুর সাহায্যে মজুরির হার নির্ণয় করাও সম্ভব হয়।

৫.২২ কর্ম মূল্যায়নের সুবিধা (Advantages of Job Evaluation)

কর্ম মূল্যায়নের সুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

(১) **কাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় (Determination of relative importance of job) ঃ** কর্ম মূল্যায়নের মাধ্যমে কাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা যায়। কাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করার ফলে কোন্ কাজের কী বেতন হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

(২) **মানক বেতন কাঠামো নির্ণয় (Determination of standardised wage structure) ঃ** কর্ম মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি যুক্তিসঙ্গত ও মানক বেতন কাঠামো তৈরি করা সম্ভব হয় যার ফলে কর্মীরা কোনও অসন্তোষ প্রকাশের সুযোগ পায় না।

(৩) **কর্মীদের পদোন্নতি, নির্বাচন ও সংস্থাপনে সাহায্য করে (Help in promotion, selection and placement of workers)** ঃ কাজের বিশ্লেষণ এবং সঠিক বিবরণ কর্ম মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই উপাদানগুলি কর্মীদের পদোন্নতি, নির্বাচন ও কাজে স্থাপন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(৪) **বেতন কাঠামোতে নমনীয়তা (Flexibility in wage structure)** ঃ কর্ম মূল্যায়নের মাধ্যমে কাজের বিভিন্ন অবস্থাতে কী বেতন হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করা যায়। সেই দিক দিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটলে বা শ্রমিক সংঘ বেতন বাড়ানোর আবেদন জানালে কী জাতীয় বেতন হওয়া উচিত কর্ম মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে তা নির্ধারণ করা সহজ হয়।

(৫) **কর্মী বিরোধের নিষ্পত্তি (Settlement of workers' dispute)** ঃ কর্ম মূল্যায়নের মাধ্যমে সন্তোষজনক বেতন কাঠামো তৈরি করা যায়। এর ফলে কর্মীদের মধ্যে কোনও রকম অসন্তোষ বা বিরোধ দেখা দেওয়ার সুযোগ থাকে না।

(৬) **কর্মী সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ (Other personnel functions)** ঃ কর্মী সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ যেমন কৃতিত্ব যাচাইকরণ (Merit Rating), উৎসাহবর্ধক মজুরি পরিকল্পনা, কাজের অবস্থার উন্নতিকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলির মূল্যায়ন ও উন্নতি ঘযানো কর্ম মূল্যায়নের মাধ্যমে সম্ভব হয়।

৫.২৩ কর্ম মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতা(Limitations of Job Evaluation)

কর্ম মূল্যায়নের যে সব সীমাবদ্ধতা দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি হল--

(১) **বস্তুগত উপাদানের উপর জোর (Emphasis on objective factor)** ঃ কর্ম মূল্যায়ন পদ্ধতিতে শুধু কাজের বস্তুগত উপাদানগুলি বিবেচনা করা হয়। কিন্তু কাজের যে গুণগত দিক আছে সেগুলি কর্মমূল্যায়নে উপেক্ষিত হয়।

(২) **জটিল পদ্ধতি (Complex Method)** ঃ যে সব পদ্ধতিতে কর্ম মূল্যায়ন করা হয় তা অনেক সময় কর্মীদের বোধগম্য হয় না, কারণ পদ্ধতিগুলি জটিল। ফলে পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে কর্মীদের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়।

(৩) **কর্ম মূল্যায়ন পরিদর্শক দ্বারা সম্পন্ন হয় (Job-evaluation is done by Supervisor)** ঃ কর্ম মূল্যায়ন পরিদর্শক দ্বারা সম্পাদিত হয়। যেহেতু পরিদর্শকরা সবসময় এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হন না সেক্ষেত্রে মূল্যায়নও ত্রুটিমুক্ত হতে পারে না।

(৪) **সমস্ত প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য হয় না (Not applicable to all firms)** ঃ কর্ম মূল্যায়ন পদ্ধতি জটিল ও ব্যয়সাধ্য। সেজন্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কর্ম মূল্যায়ন পদ্ধতি সফলতার সাথে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

(৫) **কর্মী-সম্পর্কে সমস্যা (Problems in labour relations)** ঃ কর্ম মূল্যায়ন পদ্ধতি কর্মীদের মানবিক, সামাজিক ও মানসিক সম্পর্কে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে যখন এই পদ্ধতি প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিকভাবে ব্যবহৃত হয়।

(৬) **সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব (Lack of Overall outlook)** ঃ কর্ম মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ উপাদানের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়। শিল্পের সামগ্রিক উপাদানগুলি বিবেচনা করে না। ফলে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব লক্ষ্য করা যায়।

৫.২৪ কর্মীদের পরিমাণগত কর্ম সম্পাদন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সময় ও গতি বিশ্লেষণ (Time and Motion Study in Evaluating Quantitative Performance of Workers)

কর্মীদের কর্ম সম্পাদন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সময় ও গতি বিশ্লেষণ খুব কার্যকরী পদ্ধতি। নিচে এই দুটি পদ্ধতি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা হল ঃ

সময় বিশ্লেষণ (Time Study) ঃ সময় বিশ্লেষণ কর্মীদের কাজ পরিমাপ করার একটি পদ্ধতি। কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে কতখানি সময় লাগবে তার পদ্ধতিগত নথিভুক্তকরণ ও বিশ্লেষণ হল সময় বিশ্লেষণ। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক **টেলর** (Taylor) সময় বিশ্লেষণ ধারণাটি প্রথম প্রয়োগ করেন। সময় বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করতে কত সময় লাগতে পারে তার একটি মান (Standard) স্থির করা হয়। এই মান নির্ধারণের মাধ্যমে কর্মীদের পারিশ্রমিক, দক্ষতা ইত্যাদি বিচার করা সম্ভব হয়।

সময় সমীক্ষা ঃ ফ্রাঙ্কলীন মুর এর মতে সময়ের দিক হতে উৎপাদনের মান নিরূপণের পদ্ধতিকে সময় সমীক্ষা বলে। নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের মনা নির্ধারণকে সময় সমীক্ষা বলে।

টেলর ও ফ্রাঙ্ক গিলব্রেথ সময় সমীক্ষা করেন। কোনও একটি কাজ সম্পাদনে যে সময়ের প্রয়োজন তা বিশ্লেষণ ও স্থিরীকরণ করা সময়-সমীক্ষার উদ্দেশ্য। কোনও কাজ সম্পাদনের কত সময় লাগা উচিত তা স্থির করা সময় সমীক্ষার বৈশিষ্ট্য। বস্তুত এটি গড় সময় ধরে করা হয়। এই গড় সময় সাধারণ অবস্থায় কর্মরত একজন সাধারণ শ্রমিকের নৈপুণ্যের উপর ভিত্তি করে স্থির করা হয়।

সময়-সমীক্ষার ক্ষেত্রে **টেলর** একটি সুবিন্যস্ত সময় (adjusted time) নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। একটি কাজের বিভিন্ন উপাদানগুলি (elements) সময়-সমীক্ষা করে এদের গড় (average) নির্ধারণ করতে হবে, গড় নির্ধারণে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময় ধরা উচিত নয়। উপাদান মানের (elements standards) গড়গুলির যোগফল মোট সময় নির্দেশ করে। মোট সময়কে দক্ষতার হার বা হারের উপাদান (rating factor) দিয়ে গুণ করে সুবিন্যস্ত সময় (adjusted time) পাওয়া যায়। সুবিন্যস্ত সময়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রস্তুতি ও ক্লান্তিজনিত কিছু সময় যোগ করলে 'মান সময়' বা standard time বার করা যায়। সুতরাং

Standard time = (Actuals or Total of Average of Elements Time × Rating Factor) + Allowances.

ধরা যাক, কোনও কাজে একজন কর্মীর গড় সময় লাগে ৫০ মিনিট এবং ধরা যাক তার দক্ষতা ৬০%; সুতরাং কাজটি করতে তার সময় লাগা উচিত × ৫০ = ৩০ মিনিট। এই ৩০ মিনিট হল সুবিন্যস্ত সময় বা Adjusted time। আরও ধরা যাক যে, তার ব্যক্তিগত প্রস্তুতি ও ক্লান্তির জন্য ৫ মিনিট সময় লাগে, সুতরাং মান সময় বা

Standard time = ৩০ মি. + ৫ মি.
= ৩৫ মিনিট।

সময় বিশ্লেষণের ধাপ (Steps in Time Study) ঃ সময় বিশ্লেষণ নিম্নলিখিত ধাপ অনুসরণের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় ঃ

(ক) কাজ করার জন্য যে পদ্ধতি অনুসৃত হবে, যে যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হবে এবং কাজের পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ের বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

(খ) কর্মীদের নির্বাচন করার ক্ষেত্রে তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, কোন্ সাংস্কৃতিক পরিবেশ সে গড়ে উঠেছে ইত্যাদি বিষয়ের বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

(গ) কাজগুলি ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করে সেগুলির জন্য কত সময় দরকার তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

(ঘ) সময়গুলি স্টপ ওয়াচের (এক ধরনের ঘড়ি) মাধ্যমে পরিমাপ করা দরকার।

(ঙ) কর্মীদের কত সময় বিশ্রাম দেওয়া উচিত, ক্লান্তি সমীক্ষা (Fatigue Study) ইত্যাদি বিচার করা উচিত।

গতি বিশ্লেষণ (Motion Study) ঃ বি. ডব্লু নাইবেল (B. W. Niebel) এর মতে, "কর্মীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনার বিভিন্ন অংশের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করাকে গতি সমীক্ষা বলে।" কর্মীদের কার্য পর্যালোচনা গতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। সবচেয়ে ভালোভাবে, কোনও সময় নষ্ট না করে, ন্যূনতম চলনের (Movement) মাধ্যমে কর্মী বা যন্ত্রপাতিকে কাজে লাগানো হল গতি বিশ্লেষণ বা গতি সমীক্ষা। **গিলব্রেথ** (Gilbreth) এই গতি সমীক্ষার প্রধান প্রবর্তক। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে অকার্যকরী, অপ্রয়োজনীয় এবং অব্যবহারযোগী চলন নির্ধারণও দূর করা যায়। এই বিশ্লেষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কাজকে কত সহজ ও ভালোভাবে সম্পাদন করা যায় সে সম্পর্কে আলোকপাত করা।

গতি সমীক্ষার পদক্ষেপ (Procedure for a Motion Study) ঃ

গতি সমীক্ষা সার্থকভাবে সম্পাদনের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে ঃ

(ক) কাজের সাধারণ এবং বিস্তারিত পর্যালোচনা করা ;

(খ) সংশ্লিষ্ট কাজ করার জন্য সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি অবলম্বন থেকে জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করা পর্যন্ত বিভিন্ন উপায় নির্ধারণ করা ;

(গ) কাজকে সহজভাবে সম্পাদন করার জন্য যে ছন্দের প্রয়োজন তা নির্ণয় করা ;

(ঘ) কাজের পরিবেশকে উন্নত করা;

(ঙ) কাজের গুণগত মান উন্নত করার জন্য কত সহজভাবে কাজ করা উচিত তাও গতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিচার করা।

৫.২৫ শিল্প সম্পর্ক (Industrial Relations)

সংজ্ঞা (Definition) ঃ শিল্পে কর্মরত বিভিন্ন ব্যক্তি বা কর্মীদের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকে শিল্প সম্পর্ক বলে। শিল্পে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করার ক্ষেত্রে শিল্প সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কর্মীরা সমাজবদ্ধ জীব। **কার্ল মার্কসের** ভাষায়, "সমাজ যেমন মানুষকে প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে তোলে, তেমনি মানুষ সমাজ সৃষ্টির কারিগর" (Just as society itself produces man as man, so is society produced by him.)। মানুষ যেমন সমাজ গড়ার কারিগর, তেমনি কোনও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি মানুষের প্রত্যক্ষ

সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব হয় না। **ফ্রেডেরিক হারবিনসনের** (Frederic Harbinson) মতে ঃ "Human beings are the active agents who accumulate capital, exploit natural resources, build social, economic and political organisation and carry forward national development." অর্থাৎ, "মানুষ হল কার্যকরী প্রতিনিধি যারা মূলধন সংগ্রহ করে, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করে এবং জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।" বিভিন্ন সমাজ মানুষকে বিভিন্নভাবে গড়ে তোলে, যার ফলে মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হওয়া সত্ত্বেও একজন মানুষ অন্য মানুষ থেকে পৃথক। মানুষের এই পৃথক সত্তা থাকা সত্ত্বেও সমস্ত মানুষ সাধারণত এক দিক দিয়ে পৃথক নয় এবং তা হল মানুষ আত্মসচেতন। মানুষ নিজের প্রয়োজনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। এই প্রয়োজন যখন অন্য কারোর দ্বারা ব্যাহত হয় তখন তাদের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে।

বর্তমানে কারখানা পদ্ধতিতে উৎপাদন করতে হলে দু'টি দলের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আবশ্যক--(১) প্রত্যক্ষ শ্রমিক (Direct Labour) এবং (২) ব্যবস্থাপক (Manager)। দুটি দলই একই উদ্দেশ্যে কাজ করে এবং তা হল প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি। এই উদ্দেশ্য সাধনে দুটি দলেরই প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে এবং তারা কাজে যোগদান করে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। কিন্তু তাদের মধ্যে যদি সুসম্পর্ক না থাতে তাহলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল হয় না। অর্থাৎ পারস্পরিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠানকে শক্ত ভিত্তিভূমির উপর দাঁড় করাতে সাহায্য করে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই সম্পর্ক সব সময় ভালো থাকে না, কারণ মানুষের প্রয়োজনের বিভিন্নতা সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসাবে দেখা দেয়। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে শিল্পে যন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মানুষের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে কর্মী ও মালিকের মধ্যে ব্যবধানও বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে ব্যবস্থাপক মালিকের হয়ে কর্মীদের পরিচালনা করতে শুরু করেন। কিন্তু যেহেতু ব্যবস্থাপক মালিকের হয়ে কাজ করেন, সেহেতু কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যেও সাধারণত সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে না। ফলে শিল্প সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে যা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পূরণে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করে।

ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বর্তমানে যে ধারা প্রবাহিত হচ্ছে তা হল মানবিক সম্পর্ক ধারণা। এই ধারণায় কর্মীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করানো গুরুত্ব পায়। যেহেতু কর্মীরাও সংগঠিত, সেহেতু ব্যবস্থাপকগণ কর্মী-বিরোধী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তা শিল্পে অশান্তির সূচনা করে। তাই কর্মীদের প্রতিষ্ঠান-বিরোধী না করে, প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধিতে তাদের পরিচালিত করাই হল ব্যবস্থাপকদের কাজ। সেজন্য শিল্প সম্পর্ক যাতে সহজ ও উন্নত হয় তার জন্য সতর্ক সৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা যে ধারণা পাই তা হল নিয়োগকর্তা ও কর্মীর মধ্যে স্থাপিত সম্পর্কই হল শিল্প সম্পর্ক। ব্যাপক অর্থে শিল্প সম্পর্ক শব্দটি বিভিন্ন সংঘের মধ্যে, রাষ্ট্র ও সংঘের মধ্যে এবং নিয়োগকর্তা ও সরকারের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্ককে বোঝায়। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সম্পর্ক হল ব্যবস্থাপক ও শ্রমিক সংঘের মধ্যে সম্পর্ক। বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে কর্মী সম্পর্ক, শ্রমিক সম্পর্ক, জন সম্পর্ক, ক্রেতা সম্পর্ক ইত্যাদিও শিল্প সম্পর্কের আওতায় পড়ে। শিল্প সম্পর্ক সম্বন্ধে Encyclopedia Brittanica-তে যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা হল ঃ The Industrial relations include individual relations and joint consultation between employers and work people at the place of work, collective relations between employers and the organisations and the trade unions and the part played by the state in regulating these relations. অর্থাৎ, "শিল্প সম্পর্কের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয় হল মালিক এবং কাজে নিযুক্ত কর্মীদের ব্যক্তিগত এবং যুক্ত পরামর্শ। মালিক, সংগঠন, শ্রমিক সংঘ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘবদ্ধ সম্পর্কও শিল্প সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত।"

শিল্প সম্পর্ক সম্বন্ধে **হেনরি রিচার্ডসনের** (Henry Richardson) বক্তব্য হল ঃ "Industrial relation is an art, the art of living together for purposes of production." অর্থাৎ, "উৎপাদনের উদ্দেশ্যে একত্রে বসবাস করার জন্য প্রয়োজনীয় কলা হল শিল্প সম্পর্ক।"

শিল্প সম্পর্ক তিনটি উপাদানের সাহায্যে গড়ে ওঠে, সেগুলি হল—(১) ব্যবস্থাপনা, (২) শ্রমিক সংঘ ও (৩) সরকার কর্তৃক সৃষ্টি আইন। যদি শিল্প সম্পর্ক ভালো থাকে তাহলে নিম্নলিখিত সুফলগুলি পাওয়া যায় ঃ

(ক) উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি ঘটে ;

(খ) মজুরির হার বৃদ্ধি পায় ;

(গ) লভ্যাংশের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ;

(ঘ) অবণ্টিত মুনাফার সর্বাধিক ব্যবহার সম্ভব হয়;

(ঙ) দ্রব্যের দাম কম হয় ;

(চ) দ্রব্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পায় ;

(ছ) সম্পূর্ণ গুণগত ব্যবস্থাপনা (Total Quality Management-TQM) অর্জন সহজ হয়; ও

(জ) শিল্পে শান্তি বিরাজ করে।

৫.২৬ শিল্প সম্পর্কের গুরুত্ব বা শিল্প সম্পর্ক কর্মচারীর প্রণোদনা, শৃঙ্খলা ও আত্মবিশ্বাসের হাতিয়ার (Importance of Industrial Relations or Industrial Relations is an effective tool for personnel motivation & morale)

শিল্প প্রতিষ্ঠানে মালিক ও কর্মীদের মধ্যে যে সম্পর্ক দেখা যায় তাকে শিল্প সম্পর্ক বলে। শিল্প সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল--শ্রমিক ও তাদের শ্রমিক সংঘ, ব্যবস্থাপনা ও নিয়োগকর্তাদের সংগঠন। শিল্প সম্পর্ক শ্রমিক কর্মচারীর প্রণোদনা, শৃঙ্খলা ও আত্মবিশ্বাসজনিত নৈতিক শক্তির একটি কার্যকরী হাতিয়ার। তাই যে কোনও শিল্পে শিল্প সম্পর্ক সুস্থ হওয়া আবশ্যক।

শিল্প সম্পর্কের গুরুত্ব আলোচনা করা হল ঃ

১। **কর্মচারীদের প্রণোদনা (Motivation to employees)** ঃ কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে। কর্মীদের কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি করার জন্য যা প্রয়োজন (যেমন উপযুক্ত বেতন, কাজের ভালো পরিবেশ ইত্যাদি) মালিক যদি তা সরবরাহ না করে তাহলে শিল্পে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সে জন্য কর্মচারী ও মালিকপক্ষের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক থাকা দরকার যাতে শিল্প সম্পর্ক ভালো থাকে ও কর্মীরা কাজে উৎসাহ পায়।

২। **উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পায় (Increases productivity)** ঃ সুস্থ শিল্প সম্পর্ক কর্মীদের মধ্যে কাজের ইচ্ছা জাগ্রত করে, ফলে ন্যূনতম খরচ বহন করে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়, যাকে আমরা উৎপাদিকাশক্তি বলি। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির জন্য শিল্প সম্পর্কের গুরুত্ব অসীম।

৩। **প্রতিযোগিতামূলক পণ্যের দাম (Competitive price of the product) ঃ** শিল্প সম্পর্ক সুস্থ থাকলে সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় এবং পণ্যের দাম হ্রাস পায়। পণ্যের দাম হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে শিল্পের মালিক সেই পণ্যদ্রব্য কত দামে বাজারে বিক্রি করতে সমর্থ হয়, ফলে বিক্রয় বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিষ্ঠানের আয় ও মুনাফা বাড়ে।

৪। **শিল্পে নিয়মানুবর্তিতা থাকে (Maintains industrial discipline) ঃ** সুস্থ শিল্প সম্পর্কের অর্থই হল শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ও মালিকদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। মালিক যেমন শ্রমিকদের দিকে দৃষ্টি দেবেন, ঠিক তেমনি শ্রমিকরাও মালিকরা যা চান তা পূরণে সচেষ্ট হবেন। উভয়েরই যদি উভয়ের স্বার্থ দেখে তাহলে শিল্পে নিয়মানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলা বজায় থাকে। অর্থাৎ শিল্প সম্পর্ক শিল্পে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৫। কর্মীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে **(Increases self-confidence) ঃ** সুস্থ শিল্প সম্পর্ক কর্মীদের আত্মবিশ্বাসকে জাগ্রত করে। কর্মীরা যদি বুঝতে পারে যে মালিক তাদের প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ তাহলে কাজের ক্ষেত্রে সামান্য ভুল-ত্রুটিও দূর করে তারা উৎপাদন কাম্য পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টাই তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে।

৫.২৭ শিল্প সম্পর্কের ক্ষেত্র (Areas of Industrial Relations)

শিল্প সম্পর্ক মানবিক সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানবিক শক্তির চূড়ান্ত ব্যবহার তখনই সম্ভব হয় যখন শিল্প সম্পর্ক সুস্থ থাকে। শিল্প সম্পর্ক যেসব ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে সেগুলি হল ঃ

(১) যেখানে যুক্তিপূর্ণ মজুরি নীতি অনুসৃত হয় না অর্থাৎ যথার্থ মজুরি এবং সম্পূর্ণ মজুরি পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে ;

(২) যেখানে শ্রমিকদের সহযোগিতা থাকে না সেখানে শ্রমিকদের সহযোগিতা পাওয়ার ক্ষেত্রে ;

(৩) কর্মীদের নিয়মানুবর্তিতার যেখানে অভাব দেখা যায় অর্থাৎ শিল্পে নিয়মানুবর্তিতা আনার ক্ষেত্রে ;

(৪) শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ যেখানে দেখতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকরাও যাতে ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করতে পারে সে সকল ক্ষেত্রে ;

(৫) শ্রমিক অসন্তোষজনিত সমস্যার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষ হলে যৌথ দরকষাকষি বা অন্যান্য শ্রম-বিরোধ নিষ্পত্তি-সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ করে শ্রমিক অসন্তোষ রোধ করা যায় ; এবং

(৬) সর্বোপরি, শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫.২৮ মনুষ্যশক্তি পুরস্কৃতকরণ (Manpower Rewarding)

মনুষ্যশক্তি উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাঁদেরকে যোগ্যতা অনুযায়ী পুরস্কৃত না করা হলে একদিকে যেমন উৎপাদন ব্যাহত হবে, অপরদিকে তেমনি প্রতিষ্ঠানে আয়ের পরিমাণ হ্রাস পাবে। এখানে পুরস্কৃতকরণ অর্থে কর্মীদের পারিশ্রমিক, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি বোঝায়। কর্মীরা তাঁদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম প্রদান করে। এর পরিবর্তে তাদের যে প্রতিদান দেওয়া হয় সেগুলি একত্রে পুরস্কৃতকরণ বলে। এই পুরস্কৃতকরণের পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকারের। এখানে এই পদ্ধতিগুলি উল্লেখ করা হল।

৫.২৯ কর্মী পুরস্কৃতকরণের পদ্ধতি সমূহ (Methods of Manpower Rewarding)

নিচের পদ্ধতিগুলি গ্রহণের মাধ্যমে কর্মীদের পুরস্কৃতকরণের ব্যবস্থা করা হয় ঃ

(১) মজুরি প্রদান (Payment of Wages) ;

(২) বোনাস প্রসান (Payment of Bonus) ;

(৩) অসুস্থকালীন সুবিধা (Sickness benefits) ;

(৪) চিকিৎসার সুবিধা (Medical benefits) ;

(৫) অক্ষমতাকালীন সুবিধা (Disablement benefits) ;

(৬) প্রসূতিকালীন সুবিধা (Maternity benefits) ;

(৭) পোষ্যদের সুবিধা (Dependants benefits); ইত্যাদি।

(১) **মজুরি প্রদান (Payment of Wages) ঃ** মজুরি প্রদান কর্মী পারিশ্রমিকের অন্তর্গত বিষয়। প্রতিষ্ঠানে শ্রমদানের পরিবর্তে কর্মীরা প্রতিষ্ঠান থেকে যে অর্থ পায় তাকে পারিশ্রমিক (Remuneration) বা মজুরি বলে। কর্মীদের পারিশ্রমিক দু'ভাবে নির্ণয় করা হয়–

(১) সময়ভিত্তিক হারে (Time-rate System); ও

(২) উৎপাদনভিত্তিক হারে (Piece-rate System)।

এই পদ্ধতিগুলি আবার শিল্পের প্রকৃতি ও আকৃতির উপর নির্ভরশীল।

(১) **সময়ভিত্তিক হার ঃ** কর্মীরা প্রতিষ্ঠানে কাজ সম্পাদন করার জন্য যে সময় ব্যয় করে সেই সময়ের সাথে ঘণ্টা-প্রতি শ্রমের মূল্য গুণ করলে সময়ভিত্তিক মজুরির পরিমাণ পাওয়া যায়।

(২) **উৎপাদনভিত্তিক হার ঃ** কর্মীরা যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে তার সাথে প্রতি-একক উৎপাদিত দ্রব্য-প্রতি শ্রমের মূল্য গুণ করলে উৎপাদনভিত্তিক মজুরির পরিমাণ পাওয়া যায়।

সাধারণ দক্ষতার সাথে যারা কাজ সম্পাদন করে তাদের ক্ষেত্রে মজুরি যে কোনও একটি পদ্ধতির মাধ্যমে প্রদান করা যায়। কিন্তু অধিক দক্ষতার সাথে যারা কাজ সম্পাদন করে তাদের ক্ষেত্রে শুধু উপরিলিখিত পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে নির্ধারিত মজুরি প্রদান করলেই চলে না। প্রেরণাপ্রদ মজুরি, যা অতিরিক্ত মজুরি নামেও পরিচিত, প্রদানের মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে অধিক কর্মপ্রচেষ্টা, দক্ষতা ও উৎসাহ বৃদ্ধি করা হয়। প্রেরণাপ্রদ মজুরি পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন--

(১) প্রেরণাপ্রদ বোনাস (Incentive Bonus) ;

(২) প্রিমিয়াম বোনাস (Premium Bonus) ;

(৩) দক্ষতা বোনাস (Efficiency Bonus) ;

(৪) টাস্ক বোনাস (Task Bonus) ;

(৫) উৎপাদন বোনাস (Production Bonus) ইত্যাদি।

কর্মীদের অতিরিক্ত মজুরি প্রদান ছাড়াও তাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য 'মজুরি ছাড়া অন্যান্য সুবিধা' (Nonmonetary benefits) যেমন, পদোন্নতির সুযোগ (Promotional facilities), উন্নত কাজের পরিবেশ (Better working conditions), চিকিৎসার সুযোগ (Medical benefits) ইত্যাদিও প্রদান করা হয়।

৫.৩০ প্রেরণামূলক মজুরি পদ্ধতি (Incentive Wages Plans)

শুধু সময়ভিত্তিক বা উৎপাদনভিত্তিক মজুরি পদ্ধতি শিল্পে শ্রমিকদের কাজে উৎসাহ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে না। শ্রমিকদের উৎসাহ ও মনোবল বৃদ্ধি করার জন্য এই দুটি পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটিয়ে বিভিন্ন প্রেরণামূলক মজুরি পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে। নিচে বিভিন্ন ধরনের প্রেরণামূলক মজুরি পদ্ধতি আলোচনা করা হল।

(১) **Halsey Premium Bonus Plan** ঃ আমেরিকার F.A. Halsey এই পদ্ধতির উদ্ভাবক। এই পদ্ধতিতে তিনি বলেছেন যে কোনো উৎপাদন কাজের জন্য নির্দিষ্ট আদর্শমানের সময় (Standard time) থেকে কোনো শ্রমিক যতটা কম সময়ে তা সম্পন্ন করতে পারে, সেই সময়ের জন্য সে ঘণ্টাভিত্তিক মজুরি ছাড়াও বোনাস পাবে। এই বোনাসের পরিমাণ হল বাঁচানো সময়ের (Time Saved) ৫০ শতাংশ। একেই Premium Bonus বলা হয়।

Halsey Premium Bonus Plan অনুযায়ী শ্রমিকের মোট মজুরি

= ব্যয়িত সময় × ঘণ্টাভিত্তিক মজুরির হার + ৫০% × সময় সংক্ষেপণ × ঘণ্টাভিত্তিক মজুরির হার।

(Time Taken × Rate per hour + 50% × Time Saved × Rate per hour)

(২) **Halsey-weir Premium Bonus Plan** ঃ Halsey Premium Bonus পদ্ধতির সাথে এই পদ্ধতির একমাত্র পার্থক্য হল ৫০ শতাংশের জায়গায় ৩০ শতাংশ বোনাসের ব্যবহার। পদ্ধতিতে মোট মজুরি = ব্যয়িত সময় × ঘণ্টা-প্রতি মজুরির হার + ৩০% × সময় সংক্ষেপণ × ঘণ্টা-প্রতি মজুরির হার।

= Time Taken × Rate per hour + 30% × Time Saved × Rate per hour

(৩) **Rowan Premium Bonus Plan** ঃ এই পদ্ধতিতে প্রিমিয়াম নির্ধারণের সময় সরাসরি ৫০% বা ৩০% নিয়ম প্রয়োগ করা হয় না। Rowan-এর মতে, প্রিমিয়াম নির্ধারিত হবে মালিক কর্তৃক প্রদত্ত আদর্শ সময় ও শ্রমিক কর্তৃক ব্যয়িত প্রকৃত সময়ের অনুপাত অনুযায়ী। এই সূত্র অনুযায়ী,

$$\text{মজুরি} = \text{গৃহীত সময়} \times \text{ঘণ্টা-প্রতি মজুরির হার} + \frac{\text{সময় সংক্ষেপণ}}{\text{প্রদত্ত সময়}} \times \text{গৃহীত সময়} \times \text{ঘণ্টা-প্রতি মজুরির হার।}$$

$$\left(\text{Time Taken} \times \text{Rate per hour} + \frac{\text{Time Saved}}{\text{Time Allowed}} \times \text{Time Taken} \times \text{Rate per hour}\right)$$

(৪) **Barth Premium Bonus Plan** ঃ এই পদ্ধতিতে উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত কর্মীকে কোনও রকম সময়ভিত্তিক নিশ্চিত মজুরি (Guaranteed Time Rate Wages) দেওয়া হয় না। প্রত্যেকটি উৎপাদন কাজের

জন্য আদর্শ মানের সময় নির্ধারণ করা হয় ও শ্রমিক সেই কাজ সম্পন্ন করার পর নিচে লিখিত সূত্রের সাহায্যে তার মজুরি নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ শ্রমিকের মোট মজুরি =

ঘণ্টাভিত্তিক মজুরির হার × $\sqrt{\text{কাজ সম্পাদনের আদর্শ মানের সময় × শ্রমিক দ্বারা ব্যয়িত সময়}}$

(Rate Per Hour × $\sqrt{\text{Standard Time × Time Taken by the wor ker}}$)।

(৫) **Taylor's Differential Piece-rate System : F. W. Taylor** এই পদ্ধতির উদ্ভাবক। দক্ষ কর্মীদের প্রেরণা দেওয়ার জন্য তিনি এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এই পদ্ধতিতে দক্ষতার ভিত্তিতে দুটি পৃথক মজুরির হার নির্দিষ্ট করা থাকে। যদি কোনও শ্রমিকের দক্ষতা আদর্শ মানের দক্ষতার ১০০% থেকে নিচুস্তরের হয় সেক্ষেত্রে যে হারে সে মজুরি পাবে, দক্ষতা ১০০% থেকে বেশি হলে শ্রমিক অতিরিক্ত হারে বেতন পাবে।

(৬) **Merrick Differential Piece-rate System ঃ** এই পদ্ধতি Taylor প্রবর্তিত পদ্ধতির পরিবর্তিত রূপ। Taylor মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের সুপারিশ করেছেন। Merrick সেক্ষেত্রে দক্ষতার ভিত্তিতে তিনটি মজুরি হারের কথা বলেছেন। এখানে তালিকার সাহায্যে বিষয়টিকে দেখানো হল ঃ

দক্ষতার স্তর (Efficiency)	প্রযোজ্য উৎপাদনভিত্তিক মজুরির হার। (Piece-rate applicable)
আদর্শমানের দক্ষতার ৮৩ % পর্যন্ত (Up to 83 % efficiency)	সাধারণ হার (Normal rate)
দক্ষতা ৮৩ % থেকে বেশি কিন্তু ১০০% -এর বেশি নয় (Above 83 % but up to 100%)	সাধারণ হার + সাধারণ হারের ১০% (Normal rate + 10% of Normal rate)
দক্ষতা ১০০% থেকে বেশি (Efficiency above 100%)	সাধারণ হার + সাধারণ হারের ৩০% (Normal rate + 30% of Normal rate)

(৭) **Emerson's Efficiency Plan ঃ** এই পদ্ধতি সময়ভিত্তিক ও উৎপাদনভিত্তিক মজুরি ব্যবস্থার মিশ্রণে প্রস্তুত। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি কাজের জন্য একটি আদর্শ মান নির্ধারণ করা হয় যা শ্রমিকের দক্ষতার ১০০% -এর সমান। যদি কোনও শ্রমিক কাজ সম্পাদন করার সময় ১০০% দক্ষতার নিচে থাকে বা উপরে পৌঁছতে সমর্থ হয়, সেক্ষেত্রে সেই স্তর অনুযায়ী নির্ধারিত হারে মজুরি পায়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী শ্রমিকের দক্ষতার পরিমাপ এই ভাবে করা হয়–

(ক) সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকের দক্ষতা (Efficiency on the basis of Time) $= \frac{\text{সময়ের আদর্শ মান (Standard Time)}}{\text{ব্যয়িত সময় (Time Taken)}} \times 100$

(খ) উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকের দক্ষতা (Efficiency on the basis of Production) $= \frac{\text{সম্পাদিত কাজের পরিমাণ (Actual Production)}}{\text{সম্পাদিত কাজের আর্দশ মান (Standard Production}} \times 100$

এই পদ্ধতির মাধ্যমে মজুরি নির্ধারণের সূত্র ঃ

দক্ষতার স্তর (Level of Efficiency)	প্রযোজ্য মজুরির হার (Applicable wage Rate)
আদর্শ মান দক্ষতার ৬৬ % থেকে কম হলে (Efficiency below 66 %)	সাধারণ সময়ভিত্তিক মজুরির হার (Hourly Rate of Wages)
আদর্শ মান দক্ষতার ৬৬ % থেকে বেশি কিন্তু ১০০% থেকে কম হলে-- (Efficiency is greater than 66 % but below 100%)	মজুরির হারের স্তরভিত্তিক বৃদ্ধি হবে। (Payments are made on the basis of Step bonus rate)
আদর্শ মান দক্ষতার ১০০% থেকে বেশি হলে-ঃ (Above 100% efficiency)	দক্ষতার ১০০%-এর উর্ধ্বে প্রতি ১% অধিক দক্ষতার জন্য মজুরির হার ১% করে বৃদ্ধি হবে (Additional bonus of 1% of the hourly rate for each 1% increase in efficiency beyond 100% efficiency level)

(৮) **Gantt Task and Bonus Scheme** ঃ সময়ভিত্তিক মজুরি, উৎপাদনভিত্তিক অতিরিক্ত মজুরি ও বোনাসের সংমিশ্রণে এই পদ্ধতিটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ

(ক) দৈনিক মজুরির পরিমাণ সুনিশ্চিত (Guaranteed Daily Wages) থাকে।

(খ) আদর্শ মান সময়ের (Standard Time) মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে পারলে বোনাস প্রদান করা হয়।

(গ) আদর্শ মান থেকে নিচুস্তরের কাজ সম্পাদিত হলে সুনিশ্চিত দৈনিক মজুরি দেওয়া হয়।

(ঘ) আদর্শ মান থেকে উঁচুস্তরে কাজ সম্পাদন করতে পারলে উৎসাহবর্ধক উৎপাদনভিত্তিক অতিরিক্ত মজুরি প্রদান করা হয়।

(৯) **Bedaux Scheme or 'Points' Scheme** ঃ এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হলে নিখুঁত ভাবে সময় সমীক্ষা (Time Study) ও গতি সমীক্ষা (Motion Study) করতে হয়। এই পদ্ধতিতে আদর্শ সময়ের প্রত্যেক মিনিটকে একটি করে পয়েন্ট দেওয়া হয় যাকে Bedaux Point বা 'B' বলে। শ্রমিক যতগুলি কাজ করবে তাদের নির্ধারিত B-গুলির সাথে শ্রমিকের কাজের B-গুলির তুলনা করা হয়। যদি শ্রমিকের B থেকে আদর্শ সময়ের B বেশি হয়, সেক্ষেত্রে দুই B-এর পার্থক্যের মজুরির ৭৫% শ্রমিক পাবে। যদি শ্রমিকের B, আদর্শ B-গুলির সমান বা বেশি হয়, তাহলে সে কাজের জন্য সময়ভিত্তিক মজুরি পাবে।

৫.৩১ ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ (Workers' Participation in Management)

সংজ্ঞা (Definition) ঃ প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রবাহকে সচল রাখার ক্ষেত্রে কর্মীদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবস্থাপনায় যারা যুক্ত তাদের অন্যতম দায়িত্ব হল কর্মীকে দিয়ে কাজ সম্পাদন করানো। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায় দাস-যুগে শ্রমিকদের নিয়ে পশুর মতো পরিশ্রম করানো হত। পরবর্তীকালে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে ব্যবস্থাপনায় নতুন নতুন ধারণার প্রবর্তন হয় যার মধ্যে আধুনিক যুগের মানবিক সম্পর্ক মতবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই মতবাদে মানবিক মূল্যবোধের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কর্মীর মানবিক মূল্যবোধ তখনই জাগ্রত হয় যখন তাকে ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। অতীতে ব্যবস্থাপক ও কর্মীর মধ্যে প্রচুর ব্যবধান ছিল এবং সেই ব্যবধান ব্যবস্থাপকরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে রক্ষা করতেন। কারণ, তাঁরা মনে করতেন যে ব্যবস্থাপকরা জন্মসূত্রে বিশেষ কৌলিন্যের অধিকারী এবং ব্যবস্থাপক তৈরি হওয়া সম্ভব নয় (Managers are born, not made)। পরবর্তীকালে এই ধারণার পরিবর্তন হয় এবং শিল্পে শান্তি বজায় ও উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবস্থাপনায় বিশেষ পরিবর্তন আনা হয়। শিল্পে গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার প্রসার ঘটে এবং সেই সূত্র ধরে শ্রমিককে ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। এর ফলে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের মধ্যে দীর্ঘদিনের যে ব্যবধান ছিল তা অনেকটাই কমে আসে। শিল্পে শৃঙ্খলা আসে ও কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি পায়।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে শিল্প একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবেও গণ্য হয়। তাই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখা ও তার সমৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থাপক, কর্মীবৃন্দ ও সমাজের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতার আবশ্যক। **ডঃ মেট্রাস** (Dr. Mehtras)-এর মতে, ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ বলতে বোঝায় ঃ "a principle of democratic administration of industry, sharing the decision-making power by the ranks of an industrial organisation, through the proper representatives, at all appropriate levels of management, in the entire ranges of managerial action." অর্থাৎ অংশগ্রহণ বলতে বোঝায় "শিল্পে গণতান্ত্রিক পরিচালনার নীতি যা শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিচালন সংক্রান্ত কাজের জন্য ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধির মাধ্যমে সাধারণ কর্মীদের অংশগ্রহণ"।

কীথ ডেভিসের (Keith Davis) ভাষায় ঃ "It is a mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to goals and share responsibilities in them." অর্থাৎ "অংশগ্রহণ হল দলীয় অবস্থায় কোনও ব্যক্তির মানসিক এবং আবেগের দিক যা তাকে দলীয় লক্ষ্যপূরণে ও পারস্পরিক দায়িত্ব বণ্টনে উৎসাহিত করে।"

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ সুস্থ শিল্পসম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করে। শ্রমিককে যদি ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে তারা নিজেদেরকে শেয়ারহোল্ডার হিসাবে মনে করবে। ফলে মানসিকতার দিক দিয়ে তারা সংগঠনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে নিজেদেরকে চিহ্নিত করবে। Gandhiji এ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তা হল ঃ "If labourers are co-equal owners, their organisations should have the same access to the transactions of the business as shareholders."

অর্থাৎ ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ হল এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ব্যবস্থাপক ও কর্মীরা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে কাজ সম্পাদনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে যেসব বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি হল ঃ

(১) ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপক ও কর্মী উভয়ে অংশগ্রহণ করে;

(২) সকল কর্মী ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। কর্মীদের প্রতিনিধি অর্থাৎ তাদের মনোনীত ব্যক্তিরা শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে;

(৩) ব্যবস্থাপনার একাধিক স্তরে কাজ সম্পাদনের জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়;

(৪) সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করানো হয়, এর ফলে শ্রমিকদের আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

৫.৩২ ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা (Need for Workers' Participation in Management)

শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করার জন্য ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ করা একটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হল--

(১) **মানবিক সম্পর্কের উন্নতি (Development of human relation)** ঃ এই ব্যবস্থায় কর্মীদের মানবিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শ্রমিকদের সংগঠনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে শ্রমিক মালিক সম্পর্ক উন্নত হয় ও শিল্পে শান্তি বজায় থাকে।

(২) **উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পায় (Increases productivity)** ঃ এই ব্যবস্থায় শ্রমিককে আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যেহেতু তারা ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে কাজ করে তাই তাদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

(৩) **সিদ্ধান্তগ্রহণ সহজ হয় (Facilitates decision-making)** ঃ সংগঠনে সিদ্ধান্তগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সিদ্ধান্ত যদি শ্রমিকদের অজান্তে গ্রহণ করা হয় তাহলে শ্রমিক-অসন্তোষ দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে। সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ সেই সম্ভাবনা অনেকাংশে লাঘব করে। তাই শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ একটি কার্যকরী পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃতি হয়।

(৪) **সিদ্ধান্ত রূপায়ণে সাহায্য করে (Helps to implement decision)** ঃ সিদ্ধান্ত রূপায়ণে শ্রমিকদের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। শ্রমিকরা ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করলে সিদ্ধান্ত ওয়াকিবহাল থাকে ও সিদ্ধান্ত

কার্যকর করতে কোনও সমস্যা থাকলে সে সম্বন্ধেও তাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকে। সুতরাং দ্রুত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্যও ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের প্রয়োজন হয়।

(৫) **শিল্পে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠান করা (Establishing democracy in industry)** ঃ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠন পরিচালনা করা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি আদর্শ পদ্ধতি। ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগ হলে শ্রমিক-মালিক উভয়ই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে। ফলে প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য সফল করা সম্ভব হয়।

(৬) **শিল্প-বিরোধ হ্রাস পায় (Reduces industrial dispute)** ঃ শিল্প-বিরোধ যে কোনও শিল্পের ক্ষেত্রে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করে। ফলস্বরূপ উৎপাদন ব্যাহত হয়, শ্রমিক মালিক সম্পর্ক খারাপ হয়। শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার সাথে সাথে এই বিরোধের সম্ভাবনা হ্রাস পায় ও শিল্পে শান্তি বজায় থাকে।

(৭) **জাতীয় উন্নতিতে সাহায্য করে (Helps in national development)** ঃ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যত দ্রুত ঘটবে, দেশের সার্বিক উন্নতিও সেইভাবে বৃদ্ধি পাবে। এই উন্নয়ন তখনই সম্ভব হয় যখন শিল্পে শান্তি বাজায় থাকে ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়। শ্রমিকরা যদি ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে তাহলে এই উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভবনা সৃষ্টি হয় ও সামগ্রিক ভাবে জাতীয় উন্নতি সম্ভব হয়।

৫.৩৩ ভারতে শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের অবস্থা (Position of Workers' Participation in Management in India)

ভারতে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। সরকারি শ্রমনীতিতেও এই ব্যবস্থা গুরুত্ব পেয়েছে। ১৯৪৭ সালের শিল্প বিরোধ আইনে (Industrial Disputes Act) Works Committee গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু এই কমিটি গঠন খুব কার্যকরী হয়নি। শ্রমিকদের প্রত্যক্ষভাবে ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে ও কীভাবে তা কার্যকরী করা যায় সে সম্বন্ধে ধারণা নেবার জন্য ১৯৫৬ সালে ভারত সরকারের উৎসাহে একটি সমীক্ষক দল (Study group) ইওরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্প ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ পদ্ধতি পরিদর্শন করেন এবং দেশে ফিরে এসে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। তাঁদের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার শিল্প ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের নীতি গ্রহণ করেন। শুধু মাত্র বেসরকারি সংস্থায় নয়, সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানেও এই ব্যবস্থা চালু করা হয়। সরকারি সংস্থার ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এ্যাডমিনস্ট্রেটিভ রিফরমস্ কমিটি (Administrative Reforms Committee) নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন। কমিটির মতে, "সরকারি সংস্থা যৌথ পরামর্শ কার্যক্রম স্থাপনের উদ্দেশ্যে নেতৃত্বের ভূমিকা নেবে। যদি এইজাতীয় সংস্থা উদ্দীপিত হয়ে কাজ করে এবং ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ স্তর থেকে যথাযথ সাহায্য পায়, সেক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থাগুলি দৃষ্টান্ত প্রকৃতই স্থাপন করতে পারবে।"

"We feel that public enterprises should take the lead in setting up joint consulttative machinery. If such councils function with the spirit and perspective that should characterise such institutions and if they receive the requisite support from the top management of the undertakings the public sector will really be able to set an example in harmony and co-operation." বেসরকারি সংস্থার দিক থেকে The Tata Iron and Steel Co. Ltd. এর ব্যবস্থাপকদের মন্তব্য থেকে শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। এই সংস্থার মতে ঃ "an increasing measure of association of the works employees will aid in promoting increased productivity, in giving employees a better understanding of their role in the working of the industry and in satisfying the urge for self-expression." অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করানোর পদক্ষেপ উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে, শিল্পে তারা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করবে এবং নিজেদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাবে।"

যাহোক, ভারতে শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ সম্বন্ধে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলি আলোচনা করা হল—

(১) **ওয়ার্কস্ কমিটি (Works Committee)** ঃ স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৪৭ সালে শিল্প বিরোধ আইনে 'ওয়ার্কস্ কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়। এই আইনের ৩ নং ধারায় বলা হয়েছে যে সব প্রতিষ্ঠানে ১০০ জন বা তার বেশি শ্রমিক কর্মরত অথবা বিগত ১২ মাসের যে কোনও দিন কাজ করেছে, সরকার (ক্ষেত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার) সেসব প্রতিষ্ঠানে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ অনুযায়ী মালিককে একটি ওয়ার্কস্ কমিটি গঠনের নির্দেশ দিতে পারেন। শ্রমিকদের প্রতিনিধির সংখ্যা মালিকের প্রতিনিধির সংখ্যার তুলনায় কম হতে পারবে না। ঐ প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকদের সাথে বা ঐ প্রতিষ্ঠানে ১৯২৬ সালের ট্রেড ইউনিয়ন আইন অনুযায়ী নিবন্ধিকৃত কোনও ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে তার সাথে পরামর্শ করে শ্রমিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে। কিন্তু এই কমিটি ও তার কাজ খুব আশাপ্রদ ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

(২) **জয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল বা যৌথ ব্যবস্থাপনা পর্ষদ (Joint Management Council)** ঃ ওয়ার্কস্ কমিটি প্রস্তুত খুব সন্তোষজনক না হওয়ার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্প পরিচালনার ব্যাপারে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৫৬ সালে তদানীন্তন সরকারের উদ্যোগে একটি সমীক্ষক দল ইওরোপের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়েছিল শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ পদ্ধতি পরিদর্শনের জন্য। তাঁদের সুপারিশের ফলেই Joint Management Council (JMC) ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সব প্রতিষ্ঠানে অন্তত ৫০০ জন শ্রমিক কাজ করে সেগুলিতে JMC গঠন করতে হবে, অবশ্য যদি প্রতিষ্ঠানে একটি সুসংগত শ্রমিক সংঘ থাকে। এই পর্ষদের কাজ হবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা;

(খ) শিল্পে উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করা;

(গ) শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা;

(ঘ) শ্রমিকরা যাতে দায়িত্বের সাথে ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে সেই চেষ্টা করা, ইত্যাদি।

১৯৫৮ সালে অনুষ্ঠিত শ্রমিক, মালিক ও সরকার— এই তিনপক্ষের (Tripartite Agreement) পঞ্চদশ যুক্ত অধিবেশনের অনুমোদন অনুযায়ী পরীক্ষামূলকভাবে ৫০টি শিল্পে এই পরিকল্পনা চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা

হয় এবং তাদের মধ্যে কয়েকটি সরকারি প্রতিষ্ঠানও ছিল। ১৯৫৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সরকারি ক্ষেত্রে মাত্র ৮টি প্রতিষ্ঠানে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় এবং ১৯৬০ সালের মার্চ মাসের পর আরও ৬টি প্রতিষ্ঠানে এই ব্যবস্থা চালু হয়। ভারতীয় শ্রম সম্মেলনে যে সাব-কমিটি এই ব্যবস্থা চালু করার সপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেই কমিটিকে একটি স্বাধীন সংস্থা হিসাবে চালু করা হয় এবং এই কমিটি (Committee of Labour Management Corporation নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে এই পরিকল্পনা সরকারের শ্রম নীতির অন্যতম অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে।

যদিও সমস্ত শিল্পে এই ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়নি, তথাপি কিছু কিছু শিল্পে এই ব্যবস্থা কিছু সাফল্য অর্জন করেছিল।

(৩) **নতুন পরিকল্পনা (New Scheme) ঃ** শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭৫ সালে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ণের জন্য ১৯৭৫ সালের ৩০ শে অক্টোবর এরূপ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হয়। এই পদ্ধতিতে শ্রমিককে ব্যবস্থাপনায় দুভাবে অংশগ্রহণ (Two-tier participation) করতে বলা হয়—(ক) কর্মশালায় (Shop level) এবং (খ) সমগ্র প্রতিষ্ঠানে (Enterprise level)। কর্মশালায় 'শপ কাউন্সিল' (Shop Council) এবং প্রতিষ্ঠানের দিক দিয়ে জয়েন্ট কাউন্সিল (Joint Council) হিসাবে তারা পরিচিত। দুটি কাউন্সিলেই সমসংখ্যক শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের প্রতিনিধি থাকে। শপ কাউন্সিল 'শপের' উৎপাদিকাশক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে নজর রাখে এবং জয়েন্ট কাউন্সিল সমগ্র প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের কল্যাণ (Welfare) , প্রশিক্ষণ (Training), নিরাপত্তা (Safety), স্বাস্থ্য (Health), পুরস্কার (Rewards) এবং অন্যান্য সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখে।

প্রাথমিক পর্যায়ে এই কাউন্সিল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার অধীনে উৎপাদনকারী সংস্থা ও খনি শিল্পে গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে বাণিজ্যিক সংস্থাতেও এই কাউন্সিল কার্যকর করা হচ্ছে। ১৯৭৭ সাল থেকে যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০০ জন বা তার বেশি শ্রমিক কাজ করে সে সব ক্ষেত্রে এই কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে।

এই কাউন্সিলের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করার জন্য ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই ১৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন এবং এই কমিটি শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে আরও গুরুত্ব দেয় এবং প্রায় প্রতিটি শিল্পে এই পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য সুপারিশ করে।

ভারতবর্ষে শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে সব পদ্ধতি প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে তা আলোচিত হল। তবে এ ব্যাপারে ১৯৬৯ সালে গৃহীত জাতীয় শ্রম কমিশনের সুপারিশ (Recommendations of the National Labour Commission, 1969) একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রী বি. পি. গজেন্দ্রগদ্‌করের সভাপতিত্বে এই কমিশন গঠিত হয়। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই কমিশন গঠন অভূতপূর্ব ও এই কমিশনের সুপারিশগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি সাধন ও শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার সপক্ষে এই কমিশন বিভিন্ন সুপারিশ গহণ করেন যার মধ্যে পরোক্ষভাবে শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণও স্থান পেয়েছে।

৫.৩৪ সারাংশ (Summary)

সংগঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হল শ্রমিক বা কর্মী। কর্মীরা সগঠনে শ্রম, বিবেক, বিচারবুদ্ধি ইত্যাদি সরবরাহ করে যা সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য সফল করে। কর্মী ব্যবস্থাপনা হল ব্যবস্থাপনার সেই কৌশল যার

সাহায্যে সুযোগ্য ও শক্তিশালী কর্মী সংগ্রহ, তার বিকাশসাধন ও বজায় রাখার মাধ্যমে সর্বাধিক নিপুণতার সাথে ও সর্বনিম্ন ব্যয়ে সংগঠনের সামগ্রিক কাজ সম্পাদন তথা উদ্দেশ্যপূরণ সম্ভব হয়।

কর্মী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানব সম্পদের কাম্য ব্যবহার সম্ভব হয়। এর সাহায্যে শ্রমিক সংগ্রহ, নির্বাচন, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, মজুরি প্রদান, সুষ্ঠু পরিবেশ, নিয়মশৃঙ্খলা ও শ্রমিক কল্যাণ ইত্যাদি বজায় রাখা সম্ভব হয়।

কর্মী ব্যবস্থাপনার কার্যাবলির মধ্যে যেগুলি অন্যতম সেগুলি হল জনসম্পদ পরিকল্পনা করা, কর্মী নিয়োগ, কর্মীদের আধুনিকীকরণ, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন, কাজের পর্যালোচনা, পারিশ্রমিকের হার নির্ণয়, নিয়মশৃঙ্খলা ও মনোবল বৃদ্ধি, কাজের উত্তম পরিবেশ সৃষ্টি, কর্মী সম্পর্ক, বদলি, শ্রমিক কল্যাণ।

মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা বলতে সেই পরিকল্পনাকে বোঝায় যার সাহায্যে সংগঠনের সার্বিক উন্নতির জন্য সঠিক সংখ্যায় উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী নিয়োগ সম্ভব হয়। যে সব কারণে মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনার প্রয়োজন সেগুলি হল ঃ মনুষ্যশক্তি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যপূরণ, কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন, ব্যয় সংক্ষেপ, দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনার দুটি পদ্ধতি বর্তমান—স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন পদ্ধতি। স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা পদ্ধতির মধ্যে যেগুলি প্রধান সেগুলি হল কাজ পরিবর্তন ও কমী অপসারণ, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, সংগঠনের প্রকৃতি ও পরিবেশ স্থির করা, কর্মীদের রেকর্ড সংরক্ষণ ইত্যাদি।

কর্মীদের অনুপ্রাণিতকরণ হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কর্মীরা স্ব-ইচ্ছায় কাজে অগ্রসর হয়। অনুপ্রাণিতকরণ বৃদ্ধি পেলে কার্য সম্পাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। সংগঠনে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিতকরণের গুরুত্ব প্রধান। অনুপ্রাণিতকরণের ফলে কর্মীরা কাজে উৎসাহ পায়, কাজে অনুপস্থিতির হার হ্রাস পায়, কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায়, শিল্পে অশান্তির পরিমাণ কমে এবং সর্বোপরি মানবসম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়।

কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা হল একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অধস্তন কর্মীদের মূল্য, প্রয়োজনীয়তা ও কাজ সম্পাদনের যোগ্যতার মূল্যায়ন করা হয়। শুধুমাত্র কর্মী নয়, কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে যে কোনও কর্মীর আপেক্ষিক মূল্য ও ক্ষমতা বিচার করার জন্য যে অবিরত প্রক্রিয়া চলে তাকে কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা বলে।

এই পর্যালোচনার মাধ্যমে কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, বদলি, পদাবনতি বা ছাটাঁই সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য বিচার করা যায়, কর্মীদের আচরণ সম্বন্ধেও ধারণা করা যায়।

কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে কর্মীদের যোগ্যতার মান নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর্মীদের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত গুণ আছে সে সব গুণের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হল যোগ্যতার মান নির্ণয়। এই যোগ্যতার নির্ণয়ের জন্য কতগুলি পদ্ধতি আছে, যেমন— গ্রাফিক রেটিং, স্কেলস্, চেক লিস্টস্ সরাসরি পর্যালোচনা, কাজের মান।

কার্য সম্পাদন পর্যালোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে—সনাতন পদ্ধতি ও আধুনিক পদ্ধতি। প্রতিটি পদ্ধতিরই আবার উপভোগ আছে। এইসব পদ্ধতি অনুসরণ করে কর্মীদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা, উদ্যোগ নেবার ক্ষমতা ইত্যাদি বিচার করা সম্ভব হয়।

কর্ম মূল্যায়ন কার্য সম্পাদন পর্যালোচনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কর্ম মূল্যায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব বা আপেক্ষিক মূল্য বিশ্লেষণ ও যাচাইকরণ সম্ভব হয়। এই মূল্যায়নের ব্যবহারিক কার্যকারিতা হল কর্মীদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা। কর্ম মূল্যায়নের মাধ্যমে কাজের স্তরীকরণ (Job grading) ও কাজের দাম নির্ধারণ (Job Pricing) করা সম্ভব হয়। এর ফলে কর্মীদের পারিশ্রমিক, পদোন্নতি, কাজের পরিবেশের মান, বেতন কাঠামো, ক্ষমতা ও দায়িত্ব, শ্রমিক অসন্তোষ হ্রাস ইত্যাদি সম্ভব।

কর্ম মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে—সনাতন পদ্ধতি ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি। উভয় পদ্ধতিরও আবার উপভাগ আছে। এইসব পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে উপরিউক্ত মূল্যায়ন সম্ভব হয়।

কর্মীদের পরিমাণগত কর্ম সম্পাদন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সময় ও গতি সমীক্ষা খুব কার্যকরী মাধ্যম। সময় সমীক্ষা বা সময় বিশ্লেষণের মাধ্যমে কর্মীরা কাজের ক্ষেত্রে কতখানি সময় ব্যয় করবে সে সম্পর্কে ধারণা করা যায়। গতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে কর্মী বা যন্ত্রপাতির কত কম ব্যবহারে কাজের গতি বাড়ানো সম্ভব তা জানা যায়।

উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কর্মীদের একত্রে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় কলা হল শিল্প সম্পর্ক। শিল্পে অশান্তির যেন কোনও সূচনা না হয় সেজন্য শিল্পসম্পর্ক ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। সুস্থ শিল্পসম্পর্ক উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি ঘটায়, মজুরির হার বৃদ্ধি করায়, দ্রব্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়, শিল্পে শান্তি বিরাজ করে, কর্মীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।

কর্মীরা কাজে অংশগ্রহণ করে বিভিন্নভাবে আর্থিক দিক থেকে উন্নতি করার জন্য। আর্থিক উন্নতি হয় মজুরি বোনাস, অসুস্থতাকালীন সুবিধা, চিকিৎসার সুবিধা ইত্যাদির মাধ্যমে।

কর্মীদের মজুরি প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে হয়—সময়ভিত্তিক হার ও উৎপাদনভিত্তিক হার। এর পাশাপাশি তাঁদের আবার প্রেরণামূলক মজুরি প্রদানও করা হয়। প্রেরণামূলক মজুরি প্রদানের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, যেমন— হ্যালসে প্রিমিয়াম প্ল্যান, রোয়ান প্রিমিয়াম প্ল্যান, টেলারের ডিফারেনসিয়াল পিস-রেট সিস্টেম ইত্যাদি। সমস্ত প্রেরণামূলক মজুরি প্রদানের মূলে আলোচ্য বিষয় হল শ্রমিকদের উচ্চহারে মজুরি প্রদান করলে তাঁরা কাজে উৎসাহ পাবেন, যার ফলে উৎপাদিকাশক্তি পাবে।

কর্মীদের কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি করার পন্থা হিসাবে ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের অংশগ্রহণ হল এমন একটি হাতিয়ার যার মাধ্যমে ব্যবস্থাপক ও কর্মীরা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে কাজ সম্পাদনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ পায়। এই বিশেষ পদ্ধতির ফলে মানবিক সম্পর্কের উন্নতি হয়, উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পায়, বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয় ও সিদ্ধান্ত রূপায়ণে সাহায্য করে, শিল্পে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়, শিল্প বিরোধ হ্রাস পায় ও জাতীয় উন্নতিতে সাহ্যয্য করে।

ভারতবর্ষে শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ওয়ার্কস কমিটির, জয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল ইত্যাদি গঠন করা হয়। তবে ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ সম্বন্ধে ১৯৬৯ সাল জাতীয় শ্রম কমিশনের সুপারিশ একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি সাধন ও শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার সপক্ষে এই কমিশন বিভিন্ন সুপারিশ গ্রহণ করেন যার মধ্যে শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হিসাবে স্থান পেয়েছে।

৩.৩৫ সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ প্রশ্নাবলী এবং উত্তর সংকেত

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত

(১) কর্মী ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দিন। উত্তর— ৫.৩

(Define Personnel Management)

(২) মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা কী? উত্তর— ৫.৭

(What is Manpower Planning ?)

(৩) অনুপ্রাণিতকরণ কাকে বলে? উত্তর— ৫.১০

(What is Motivation ?)

(৪) কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা বলতে কী বোঝেন? উত্তর— ৫.১২

(What do you mean by Performance Appraisal ?)

(৫) কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখ করুন। উত্তর— ৫.১৩

(Mention the objectives of Performance Appraisal.)

(৬) যোগ্যতার মান নির্ণয় বলতে কি বোঝেন! উত্তর— ৫. ১৪

(What do you mean by Merit Rating ?)

(৭) প্রলক্ষণ মতবাদ কী ? উত্তর— ৫.১৭

(What is Trait Appraoch ?)

(৮) ফলাফল ভিত্তিক পর্যালোচনার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন। উত্তর— ৫.১৭

(Mention the features of Appraisal by Results.)

(৯) কর্ম মূল্যায়ন কাকে বলে? উত্তর—৫.১৮

(What is Job Evaluation)

(১০) উপাদান তুলনা পদ্ধতি কী? উত্তর— ৫.২১

(What is factor comparison Method ?)

(১১) সময় বিশ্লেষণ কাকে বলে ? উত্তর— ৫.২৪

(What is Time Study ?)

(১২) গতি বিশ্লেষণ কী উত্তর— ৫.২৪

(What is Motion Study?)

(১৩) শিল্প সম্পর্ক বলতে কী বোঝেন ? উত্তর—৫.২৫

(What do you mean by Industrial Relation?)

(১৪) মজুরি প্রদান কাকে বলে ? উত্তর— ৫.২৯

(What is payment of Wages ?)

(১৫) প্রেরণামূলক মজুরি পদ্ধতি কী ? উত্তর— ৫.৩০

(What is Incentive wages plans ?)

(১৬) প্রেরণামূলক মজুরির দুটি পদ্ধতি সম্বন্ধে লিখুন । উত্তর— ৫.৩০

(Write two methods of Incentive wage plans.)

(১৭) ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বলতে কী বোঝেন ? উত্তর— ৫.৩১

(What do you mean by workers' participation in management ?)

(১৮) ওয়ার্কস কমিটি বলতে কী বোঝেন?

(What is Works Committee ?)

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী ও উত্তর সংকেত

১। কর্মী ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা করুন। উত্তর— ৫.৪, ৫.৫

(Discuss the importance, aims and objectives of Personnel Management)

২। কর্মী ব্যবস্থাপনা কাকে বলে ? এর কার্যাবলি আলোচনা করুন। উত্তর— ৫.৩, ৫.৬

(What is Personnel Management ? Discuss its importance.)

৩। মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনার সংজ্ঞা দিন। এর প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি অলোচনা করুন।

(Define Manpower Planning. Discuss its importance and method.)

উত্তর— ৫.৭, ৫.৮, ৫.৯

৪। অনুপ্রাণিতকরণের সংজ্ঞা দিন। এর গুরুত্ব আলোচনা করুন। উত্তর— ৫.১০, ৫.১১

(Define Motivatinon. Discuss its importance.)

৫. কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা কাকে বলে? এর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব আলোচনা করুন।

উত্তর— ৫.১২, ৫.১৩

(What is Performance Appraisal ? Discuss its objectives and importances.)

৬। যোগ্যাতার মান নির্ণয় বলতে কী বোঝেন? এই মান নির্ণয়ের বিচার্য্য বিষয় ও পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করুন। উত্তর— ৫.১৪, ৫.১৫,৫.১৬

(What do you mean by Merit Rating ? Discuss its factors and methods.)

৭। কর্ম মূল্যায়নের সংজ্ঞা দিন। এর গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন। এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলি কী কী ?

উত্তর— ৫.১৮, ৫.২০, ৫.২২, ৫.২৩

(Define Job Evaluation. Discuss its importance and objectives. What are its advantages and disadvantages ?)

৮। সময় ও গতি বিশ্লেষণ বলতে কী বোঝেন? এদের ধাপসমূহ আলোচনা করুন। উত্তর— ৫.২৪

(What do you mean by Time Study and Motion Study ? Discuss their steps/procedures.)

৯। "উৎপাদনের উদ্দেশ্যে একত্রে বসবাস করার জন্য প্রয়োজনীয় কলা হল শিল্প সম্পর্ক"— আলোচনা করুন।
উত্তর— ৫.২৫

("Industrial relation is the art, the art of living together for the purposes of production."— Discuss).

১০। শিল্প সম্পর্কের গুরুত্ব ও ক্ষেত্রগুলি কী কী? উত্তর— ৫.২৬,৫.২৭

(What are the importances and areas of industrial relations ?)

১১। কর্মী পুরস্কৃতকরণের পদ্ধতি সমূহ কী কী? প্রেরণামূলক মজুরি পদ্ধতি সম্বন্ধে যে কোনও চারটি আলোচনা করুন। উত্তর— ৫.২৯, ৫.৩০

(What are the methods of manpower rewarding ? Discuss any four of the incentive wage plans.)

১২। ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বলতে কী বোঝেন ? এর প্রয়োজনীয়তা কী ? ভারতবর্ষে শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা দিন। উত্তর— ৫.৩১, ৫.৩২, ৫.৩৩

(What do you mean by workers' participation in Management. Discuss its importances. Give an idea about position of workers' participation in Management in India.)

৫.৩৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। কারবার ব্যবস্থাপনা— অশোক সৎপতি ও বিশ্বজিৎ ভদ্র

২। কারবার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা — গুহ ও মুখার্জী

৩। Business Management — Gupta, Sarma, Bhalla.

ই. সি. ও. - ৬
বাণিজ্য বিষয়ের
ঐচ্ছিক পাঠক্রম

পর্যায়
৩৭

একক ১ সম্পদ ❑(Resource)

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ সম্পদের অর্থ, সংজ্ঞা, গুণগত বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি

- ১.৩.১ সম্পদের অর্থ
- ১.৩.২ সম্পদের সংজ্ঞা
- ১.৩.৩ সম্পদের গুণগত বৈশিষ্ট্য
- ১.৩.৪ সম্পদের প্রকৃতি

১.৪ সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব

১.৫ সম্পদের প্রকারভেদ, বাধা ও নিরপেক্ষ সামগ্রী

- ১.৫.১ সম্পদের প্রকারভেদ
- ১.৫.২ বাধা
- ১.৫.৩ নিরপেক্ষ সামগ্রী

১.৬ গচ্ছিত সম্পদ ও প্রবহমান সম্পদ

- ১.৬.১ সঞ্চিত বা গচ্ছিত সম্পদ
- ১.৬.২ প্রবহমান সম্পদ

১.৭ সম্পদ সৃষ্টির উপাদান

- ১.৭.১ প্রকৃতি
- ১.৭.২ মানুষ
- ১.৭.৩ সংস্কৃতি

১.৮ সম্পদ সচেতনতা

১.৯ সম্পদ উন্নয়নের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি

১.১০ সারাংশ

১.১১ অনুশীলনী

১.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

সম্পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই সম্পদ সম্পর্কে আমাদের বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই একক থেকে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারব।

- সম্পদ কাকে বলে,
- সম্পদের বৈশিষ্ট্য,
- সম্পদের প্রকৃতি,
- সম্পদের শ্রেণীবিভাগ,
- সম্পদ সৃষ্টির বিভিন্ন উপাদান।

১.২ প্রস্তাবনা

কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সম্পদ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেসব দেশ সম্পদে সমৃদ্ধ সেসব দেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত, আর যেসব দেশে সম্পদের অভাব রয়েছে সেসব দেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর। অবশ্য, সম্পদ থাকলেই কোনো দেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত হবে এ কথা বলা যায় না। সম্পদের কার্যকরী ভূমিকা থাকলে তবেই কোনো দেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সম্পদের কার্যকরী ভূমিকা প্রসারিত হয় ও সম্পদের পরিমাণ বাড়ে এবং সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাপকতর হয়।

সম্পদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হলে সম্পদ বলতে কি বোঝায়, সম্পদের কার্যকারিতা, সম্পদসৃষ্টির উপাদান ও সম্পদ সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা প্রভৃতি আলোচনা একান্ত প্রয়োজন।

১.৩ সম্পদের অর্থ, সংজ্ঞা, গুণগত বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি

১.৩.১ সম্পদের অর্থ

সম্পদ বলতে এমন সব বস্তু বা অ-বস্তুকে বোঝায় যা মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদাপূরণ বা অভাবমোচন করে। সম্পদ মানুষের অভাবমোচন করে, তা ব্যক্তিগতই হোক অথবা সামাজিকই হোক। জল, সূর্যকিরণ, বায়ু, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, লৌহ আকরিক, কয়লা— এ সকল বস্তু বা অ-বস্তু সম্পদ— কেননা এগুলির প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদা পূরণ করতে পারে।

১.৩.২ সম্পদের সংজ্ঞা

সম্পদ শাস্ত্রের প্রখ্যাত প্রবক্তা ই. ডবল্যু. জিমারম্যান (E.W. Zimmerman) -এর মতে সম্পদ হল এমন বস্তু বা অবস্তু "যা এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার মাধ্যম হিসাবে কার্য করে, যে লক্ষ্য হল ব্যক্তিগত চাহিদাপূরণ অথবা সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন......."[Resource serves "as means of attaining given ends, i.e. individual wants and social objectives....."]

১.৩.৩ সম্পদের গুণগত বৈশিষ্ট্য

এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সব বস্তু বা অ-বস্তু সম্পদ নয়। সম্পদ হিসাবে গণ্য হতে হলে কোন বস্তু বা অ-বস্তুর দুটি গুণ থাকা বিশেষ প্রয়োজন, যথাঃ (১) উপযোগিতা ও (২) কার্যকারিতা।

(১) **উপযোগিতা (Utility)** ঃ সম্পদ বলে গণ্য হতে হলে কোনো বস্তু বা অ-বস্তুর প্রথমত উপযোগিতা বা অভাবমোচনের ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। জল, সূর্যকিরণ, বায়ু, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, কয়লা ইত্যাদি সম্পদ কারণ, প্রথমত এদের প্রত্যেকের উপযোগিতা বা অভাবমোচনের ক্ষমতা রয়েছে;

(২) **কার্যকারিতা (Functionability)** ঃ সম্পদ বলে গণ্য হতে হলে দ্বিতীয় কোনো বস্তু বা অ-বস্তুর কার্যকারিতা থাকা প্রয়োজন। কেবলমাত্র উপযোগিতা থাকলেই কোনো বস্তু বা অ-বস্তুকে সম্পদ বলা যাবে না। বস্তু বা অ-বস্তুটির উপযোগিতা কার্যকরী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কোনো বস্তু বা অ-বস্তু এর উপযোগিতা বা অভাবমোচনের ক্ষমতাকে কার্যকরী করে মানুষের অভাবমোচন করলে তবেই তাকে সম্পদ বলা যাবে। জল, সূর্যকিরণ, বায়ু, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা কয়লা ইত্যাদি এদের উপযোগতি ও কার্যকারিতার দ্বারা মানুষের অভাবমোচন করলেই এগুলিকে সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হবে।

১.৩.৪ সম্পদের প্রকৃতি (Nature of Resources)

সম্পদের প্রকৃতি হল ঃ

(১) সম্পদ বস্তুগত বা অ-বস্তুগত হতে পারে। লৌহ-আকরিক, কয়লা, কৃষিজ ফসল প্রভৃতি বস্তুগত সম্পদ। আবার, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আইনকানুন ইত্যাদি অ-বস্তুগত সম্পদ।

(২) বিশ্বের প্রায় সব সম্পদ সীমিত (Limited) । কালক্রমে একদিন এসব সম্পদ নিঃশেষিত হবে। অবশ্য কয়েকটি সম্পদ অসীম (unlimited) যেমন সৌরশক্তি ও বায়ুশক্তি। এমনকি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদিও অসীম কেননা, কালক্রমে এসবের বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ ঘটে।

(৩) কোনো কোনো সম্পদ একবারের বেশি ব্যবহার করা যায় না, যেমন কয়লা। এক নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়লা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে তাকে আবার সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায় না। কোনো কোনো সম্পদ আবার পুনর্ব্যবহারযোগ্য। যেমন কর্ষণজোগ্য জমি। একবার কোনো জমিতে ফসল চায় করলে পুনরায় সময়মতো সেই জমিতে ফসল চাষ করা যায়।

(৪) কোনো একটি সম্পদকে নানাভাবে ব্যবহার করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে খনি থেকে উত্তোলিত খনিজ তেল পরিশোধন করে যেমন পাওয়া যায় গ্যাসোলিন বা পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ইত্যাদি তেমনই পাওয়া যায় পিচ্ছিলকারক পদার্থ (Lubricant), পিচ, রং, নানাবিধ প্রসাধন সামগ্রী (cosmetics), ঔষধ ন্যাপথা ইত্যাদি, যা নানা কাজে ব্যবহার করা যায়।

(৫) সম্পদ গতিশীল। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সম্পদের কার্যকারিতা ও পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, আবার, ব্যবহার ও অপচয়ের ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পদের পরিমাণ হ্রাস পায়। অর্থাৎ, সম্পদ পরিমাণে বাড়ে অথবা কমে। সম্পদ সবসময় একরকম থাকে না। এই হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পদের গতিশীলতার সৃষ্টি করে।

১.৪ সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব (Functional Theory of Resource

সম্পদ বলতে কোনো বস্তু বা অ-বস্তুকে বোঝায় না, বস্তু বা অ-বস্তুর কার্যকারিতাকেই বোঝায়। একখণ্ড লৌহ-আকরিক সম্পদ বলে পরিগণিত হয় এর আকৃতি, বর্ণ বা প্রাচুর্যের জন্য নয়, এর কার্যকারিতা (এবং উপযোগিতার) জন্যই। অর্থাৎ লৌহ-আকরিক সম্পদ নয়, লৌহ-আকরিকের কার্যকারিতার সম্পদ। লৌহ-আকরিক কার্যকারিতার (এবং উপযোগিতা) ফলে যদি তা মানুষের অভাবমোচন বা চাহিদা পূরণ করে তবেই লৌহ-আকরিক সম্পদ বলা হবে। জিমারমান-এর মতে: “সম্পদ কোন বস্তুকে বা পদার্থকে নির্দেশ করে না, কোন বস্তু

বা পদার্থ যে কার্য সম্পাদন করে তাকেই নির্দেশ করে ["Resources does not refer to a thing or substace, but to a function which a thing or substance performs......."]

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ পৃথিবীর নীচে সঞ্চিত বিপুল খনিজ সম্পদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। তারা ঐসব বিপুল খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও ব্যবহার জানত না। ফলে, ঐসব সম্পদ মানুষের অভাবমোচন করতে পারে না বলে এগুলি সম্পদ হিসাবে গণ্য হত না। এগুলি মানুষের কোনো উপকার বা অপকার করত না। প্রকৃতপক্ষে এগুলি ছিল "নিরপেক্ষ সামগ্রী" (Neutral stuff) । পরবর্তীকালে যখন মানুষ স্বীয় বুদ্ধি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে ক্রমে ক্রমে এসব অগণিত "নিরপেক্ষ সামগ্রী"-কে উত্তোলন করে এদের কার্যকরী করে মানুষের অভাব মোচনের কাজে নিয়োজিত করল তখনই এগুলি ক্রমে ক্রমে সম্পদে পরিণত হল।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ইউরেনিয়াম যুগ যুগ ধরে মাটির নীচে চাপা পড়ে ছিল। এটি মানুষের কোনো কাজে লাগত না। এটি মানুষের কোনো অপকারও করত না। বর্তমানে প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নত মানুষ এটিকে খনি থেকে তুলে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কাজে লাগাচ্ছে। এখন ইউরেনিয়ামের কার্যকারিতা অর্থাৎ এর তাপ উৎপাদনকারী ক্ষমতা মানুষের শক্তির অভাব পূরণ করছে। মাটির নীচে থাকা অবস্থায় এটি ছিল একটি নিরপেক্ষ সামগ্রী (Neutral stuff) । এর কার্যকারিতা বর্তমানে একে সম্পদে রূপান্তরিত করেছে।

পৃথিবীতে অনেক জায়গায় আজও অগণিত খনিজ ভাণ্ডার সঞ্চিত আছে। নানা কারণে মানুষের পক্ষে এসব খনিজ সম্পদের আহরণ ও ব্যবহার সম্ভব হয়নি। ফলে, অভাব-মোচনের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বে কার্যকারিতার অভাবে এগুলি 'নিরপেক্ষ সামগ্রী' হিসাবেই পরিচিত।

সম্পদের কার্যকারিতা কতকগুলি কারণের ওপর নির্ভর করে, যথা ঃ

(১) **জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি ঃ** সম্পদের কার্যকারিতা প্রধানত নির্ভর করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, অর্থাৎ সংস্কৃতির অগ্রগতির ওপর। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা অর্থাৎ সংস্কৃতি প্রাকৃতিক উপকরণসমূহে কার্যকারিতা আরোপ করে তাকে সম্পদে পরিণত করে। প্রকৃতির অগাধ ভাণ্ডার সাংস্কৃতিক উন্নতির অভাবে এতদিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। প্রযুক্তির উন্নতির ফলে এইসব অব্যবহৃত পদার্থ বর্তমানে বহুব্যবহৃত সম্পদে রূপান্তরিত হয়েছে। পূর্বের স্বল্পব্যবহৃত সম্পদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেয়ে এগুলি বর্তমানে বিপুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

রবার গাছের রস (Latex) থেকে প্রাপ্ত রবারের বিশেষ কোনো ব্যবহার আদিম মানুষের জানা ছিল না। রবারের প্রকৃত কার্যকারিতা শুরু হল চার্লস গুডইয়ার-এর ভালক্যানিজেশন (Vulcanisation) পদ্ধতি আবিষ্কারের পর। এই পদ্ধতি আবিষ্কারের পর থেকে রবারের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হল গাড়ির টায়ার ও টিউব উৎপাদনের কাজে। এছাড়া অন্যান্য বহু কাজে প্রচুর পরিমাণে রবারের ব্যবহার শুরু হল। রবারের কার্যকারিতা এক ধাক্কায় অনেকগুণ বেড়ে গেল। সেই সঙ্গে বাড়ল চাহিদা ও উৎপাদন।

(২) **প্রগতিশীল সরকারের কর্মকুশলতা ঃ** সরকারের প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও কর্মকুশলতা সম্পদ সৃষ্টি ও তার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লবের আগে অর্থাৎ জারের আমলে সাবেক, সোভিয়েত ইউনিয়নে সম্পদের পরিমাণ ছিল নগণ্য। দেশের বিপুল উপকরণের অধিকাংশই ছিল 'নিরপেক্ষ সামগ্রী' সম্পদ নয়। কিন্তু, বিপ্লবের পর অর্থাৎ ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের পর দেশের প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক সরকার ক্রমেই দেশের এইসব নিরপেক্ষ সামগ্রী'-কে সম্পদে রূপান্তরিত করে এবং এগুলি কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেশকে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছে।

পদার্থের কার্যকারিতা পৃথিবীর সর্বত্র সমান নয়। একই পদার্থের কার্যকারিতা স্থানভেদে বেশি বা কম হতে পারে। ভারত বা বাংলাদেশের কৃষিজমির তুলনায় জাপান বা জার্মানির কৃষিজমির কার্যকারিতা অনেক বেশি।

(৩) **চাহিদা ঃ** ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদা, সম্পদ সৃষ্টি ও এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। প্রয়োজন মানুষকে আবিষ্কার করতে শেখায়। মানুষ যত উন্নত হচ্ছে তার প্রয়োজন তথা চাহিদা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে সম্পদের কার্যকারিতা। নদীর জল কেবল পানীয় জলের চাহিদা মেটায় না। তার থেকে পাওয়া যায় জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ। সম্পদ ও কার্যকারিতার সম্পর্ক নিম্নলিখিত উপায়ে উপস্থিত করা যেতে পারে।

বস্তু + কার্যকারিতা = সম্পদ।

অবস্তু + কার্যকারিতা = সম্পদ।

বস্তু – কার্যকারিতা = সম্পদ নয়।

অবস্তু – কার্যকারিতা = সম্পদ নয়।

১.৫ সম্পদের প্রকারভেদ, বাধা ও নিরপেক্ষ সামগ্রী (Resource, Resistance and Neutral Stuff) :

পৃথিবীর সমস্ত বস্তু বা অবস্তুকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই তিনটি ভাগ হল সম্পদ, বাধা ও নিরপেক্ষ সামগ্রী।

১.৫.১ সম্পদের প্রকারভেদ (Types of Resources)

যেসব বস্তু বা অবস্তু মানুষের চাহিদা পূরণ করে তাকে আমরা সম্পদ বলি।

বিশ্বের সম্পদ প্রধানত তিন রকমের। যথা— (১) **প্রাকৃতিক সম্পদ,** (২) **মানবিক সম্পদ ও** (৩) **সাংস্কৃতিক সম্পদ।**

(১) **প্রাকৃতিক সম্পদ ঃ** এই সম্পদ সরাসরি প্রকৃতির দান, মানুষ একে সৃষ্টি করতে পারে না। যেমন— জল, বাতাস, সূর্যালোক, মাটি, পশুপাখি প্রভৃতি।

(২) **মানবিক সম্পদ ঃ** এই সম্পদ হল মানুষ ও মানুষের দৈহিক শক্তি। যেমন— জনসংখ্যা, শ্রমশক্তি।

(৩) **সাংস্কৃতিক সম্পদ ঃ** এই সম্পদ মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত উদ্ভাবনী ক্ষমতা। শিক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান, বিচারবুদ্ধি, প্রযুক্তিবিদ্যা, আইনকানুন, নীতি প্রণয়ন প্রভৃতিকে বলা হয় সাংস্কৃতিক সম্পদ। আবার অন্যভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় মানুষ প্রকৃতির দান, অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সংস্কৃতি মানুষের দান অর্থাৎ মানবিক সম্পদ। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় প্রাকৃতিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক সমস্ত কিছুই প্রাকৃতিক সম্পদ।

১.৫.২ বাধা (Resistances)

পৃথিবীর যে সমস্ত বস্তু বা অবস্তু সম্পদ সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ বাধার সৃষ্টি করে এবং সম্পদের ধ্বংসসাধন করে তাকে বলা হয় বাধা।

বাধা তিন প্রকারের হতে পারে। যথা—(১) প্রাকৃতিক বাধা, (২) মানবিক বাধা, (৩) সাংস্কৃতিক বাধা।

(১) **প্রাকৃতিক বাধা ঃ** অর্থাৎ প্রকৃতিসৃষ্ট বাধাগুলি হল ঝড়, ভূমিকম্প, বন্যা, দাবানল। দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত, মরুভূমি, হিংস্র ও বিষাক্ত পশু প্রভৃতি। দুর্গম পর্বত যাতায়াতের পথে বাধাস্বরূপ, মরুভূমি কৃষিকাজে বাধাস্বরূপ, বন্যা, ঝড়, ভূমিকম্প সম্পদের বিনাশকারী।

(২) **মানবিক বাধা ঃ** বা মনুষ্যসৃষ্ট বাধা হল অতিরিক্ত জনসংখ্যা, শারীরিক রুগ্নতা, কর্মবিমুখতা, উদ্যমহীনতা প্রভৃতি।

(৩) **সাংস্কৃতিক বাধা ঃ** বা সংস্কৃতির দ্বারা সৃষ্ট বাধাগুলি হল — জাতিভেদ প্রথা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, অপ্রচলিত প্রযুক্তি প্রভৃতি। প্রাকৃতিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক সবরকম বাধার কিছু অংশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ সৃষ্টিতে বাধা না দিয়ে সম্পদ সৃষ্টির কাজে লেগেছে। যেমন— মরুভূমিতে জলসেচ করে উৎপন্ন হচ্ছে উচ্চশ্রেণীর তুলা।

১.৫.৩ নিরপেক্ষ সামগ্রী (Neutral Stuff)

যে সমস্ত বস্তু বা অবস্তু মানুষের অভাবপূরণে কোনো সাহায্য করে না, অর্থাৎ কোনো উপকার করে না বা অপকারও করে না, তাকে বলা হয় নিরপেক্ষ সামগ্রী। এগুলি সম্পদ নয় আবার বাধাও নয়। অনাবিষ্কৃত খনিজ পদার্থ, মানবমনের অপ্রকাশিত চিন্তাভাবনা নিরপেক্ষ সামগ্রীর উদাহরণ। নিরপেক্ষ সামগ্রী জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা বা সংস্কৃতির সংস্পর্শে সম্পদেত রূপান্তরিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, সরকারি কর্মকুশলতার ফলে পূর্বে যা ছিল নিরপেক্ষ সামগ্রী বর্তমানে তা অতি প্রয়োজনীয় সম্পদে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার, বর্তমানে যা নিরপেক্ষ সামগ্রী ভবিষ্যতে তা হয়ে উঠতে পারে সম্পদ। খনিজ তেল একসময় ব্যবহার করা হত না; বর্তমানে এর ব্যবহার ছাড়া মানুষের সভ্যতা পঙ্গু। এক সামান্য পরিমাণ ইউরেনিয়ামের মধ্যে যে এত বিপুল শক্তি লুক্কায়িত আছে তা আগে অনুমান করাও ছিল কঠিন। সরলবর্গীয় বৃক্ষের কাঠ এক সময় মানুষের বিশেষ কোনো কাজে লাগত না, আজকে কাগজশিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে এই কাষ্ঠসম্পদ।

১.৬ গচ্ছিত ও প্রবহমান সম্পদ (Fund and Flow resources)

স্থায়িত্বের দিক থেকে সম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—গচ্ছিত সম্পদ ও প্রবহমান সম্পদ।

১.৬.১ সঞ্চিত বা গচ্ছিত সম্পদ

প্রকৃতিতে যে সকল সম্পদের পরিমাণ নির্দিষ্ট এবং ব্যবহারের ফলে যে সম্পদ ক্রমাগত নিঃশেষিত হয় সে সকল সম্পদকে বলা হয় গচ্ছিত বা সঞ্চিত সম্পদ। একে ক্ষয়িষ্ণু (Exhaustible) বা অপুনর্ভব (Non-renewable) সম্পদও বলা হয়। প্রকৃতি তার নিজের খেয়ালে এই সম্পদ সৃষ্টি করেছে। মানুষ এগুলো সৃষ্টি করতে পারে না। গচ্ছিত সম্পদের উদাহরণ হল কয়লা, খনিজ তেল, লোহা, তামা, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি।

গচ্ছিত সম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা— আবর্তনযোগ্য সঞ্চিত বা গচ্ছিত সম্পদ ও অনাবর্তনীয় গচ্ছিত সম্পদ।

(ক) **আবর্তনযোগ্য সঞ্চিত বা গচ্ছিত সম্পদ (Revolving Fund Resource)** ঃ যে গচ্ছিত সম্পদ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা যায় অর্থাৎ একবার ব্যবহার করার পর কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে আবার ব্যবহার করা যায় তাকে আবর্তনযোগ্য গচ্ছিত সম্পদ বলে। যেমন লোহাকে যন্ত্রপাতি তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়। সেই লোহার যন্ত্রপাতি অকেজো হয়ে গেলে তাকে ফেলে না দিয়ে তাকে গলিয়ে নতুনভাবে লোহার জিনিস বা যন্ত্রপাতি উৎপাদন করা হয়। তামা, সোনা, অ্যালুমিনিয়াম, প্ল্যাস্টিক প্রভৃতি আবর্তনযোগ্য সম্পদের উদাহরণ।

(খ) **অনাবর্তনীয় গচ্ছিত সম্পদ** (Non-revolving Fund Resource) ঃ যে গচ্ছিত সম্পদ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা যায় না অর্থাৎ একবার ব্যবহার করলে ফুরিয়ে যায় তাকে বলা হয় অনাবর্তনীয় গচ্ছিত সম্পদ। যেমন জ্বালানি তেল, কয়লা, জিপসাম প্রভৃতি।

১.৬.২ প্রবহমান সম্পদ (Flow Resource)

প্রকৃতিতে যে সকল সম্পদ ব্যবহারের ফলে ফুরিয়ে যায় না বা ব্যবহারের ফলে সাময়িকভাবে পরিমাণে কমে গেলেও প্রাকৃতিক উপায়ে তা আবার পূরণ হয়ে যায় তাকে বলা হয় প্রবহমান সম্পদ। যেমন, সূর্যালোক, বায়ু, জল যতই ব্যবহার করা হোক না কেন কোনোদিনই ফুরাবে না। বনভূমির কাঠ কেটে নিলে প্রাকৃতিক উপায়ে তা আবার উৎপন্ন হয়। প্রবহমান সম্পদ দু'ধরনের। যথা — (১) **অফুরন্ত প্রবহমান সম্পদ,** (২) **পুনর্ভব বা পূরণশীল প্রবহমান সম্পদ।**

(১) **অফুরন্ত প্রবহমান সম্পদ** (Inexhustible Flow Resource) ঃ যে সম্পদ কোনোদিনই নিঃশেষিত হবে না তাকে বলা হয় অফুরন্ত প্রবহমান সম্পদ। যতদিন সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, নক্ষত্র থাকবে ততদিনই মানুষ এ সম্পদ পেতে থাকবে। প্রকৃতিতে এদের যোগান অফুরান বা অসীম। সূর্যালোক, জল, বাতাস, প্রভৃতি হল অফুরন্ত প্রবহমান সম্পদ।

(২) **পুনর্ভব প্রবহমান সম্পদ** (Renewable Flow Resource) ঃ যে সকল প্রবহমান সম্পদ ব্যবহারের ফলে পরিমাণে সাময়িকভাবে হ্রাস পায় কিন্তু প্রাকৃতিক উপায়ে তা আবার পূরণ হয়ে যায় তাকে বলা হয় পুনর্ভব বা পূরণশীল প্রবহমান সম্পদ। সমস্ত জৈব সম্পদ পুনর্ভব সম্পদ। যেমন— গবাদিপশু, মাছ, উদ্ভিদ প্রভৃতি। অতি ব্যবহারের ফলে এবং পরিবেশ দূষণের ফলে এইসব পুনর্ভব সম্পদ ক্রমাগত পরিমাণে কমতে থাকে ও একসময় অবলুপ্ত হতে পারে। জন্মানোর হারের তুলনায় ব্যবহারের মাত্রা বেশি হলে পুনর্ভব সম্পদও ক্ষয় পেতে থাকে। বায়ুদূষণ, জলদূষণ ও মৃত্তিকাদূষণের জন্য ও অনেক জৈবপদার্থ প্রকৃতি থেকে চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে। আগের তুলনায় গঙ্গানদীতে ইলিশ অনেক কমে গেছে, উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে সামান্য উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। উত্তর সাগরে তিমির সংখ্যা অনেক কমে গেছে। এই প্রবহমান সম্পদগুলি পুনর্ভব হলেও স্বাভাবিক উপায়ে এদের পরিমাণ বাড়ছে না। এই অবস্থায় এ সকল প্রবহমান সম্পদকে বলা হয় রুদ্ধ প্রবহমান সম্পদ (Choked Flow Resource).

১.৭ সম্পদ সৃষ্টির উপাদান (Resource-creating Factors)

প্রকৃতি, মানুষ ও সংস্কৃতির যৌথ প্রচেষ্টায় তৈরি হয় সম্পদ। এই তিনটি উপাদানের কোনটি এককভাবে সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে না। প্রকৃতি যোগায় কাঁচামাল, মানুষ তার বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে সেই কাঁচামালকে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে সম্পদে পরিণত করে। যেমন খনিজ তেল প্রকৃতির দান। মানুষ তার বিজ্ঞান প্রযুক্তি প্রয়োগ করে একে মাটির তলা থেকে তুলে শোধন করে ব্যবহার করছে। এইভাবে প্রকৃতি, মানুষ সংস্কৃতির মিলিত প্রচেষ্টায় বহু নিরপেক্ষ সামগ্রী সম্পদে পরিণত হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনে হতে প্রকৃতি একাই সম্পদের সৃষ্টিকর্তা। যেমন বাতাস, জল ও গাছের ফল সরাসরি প্রকৃতির দান। এই সম্পদগুলি সরাসরি প্রকৃতি থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষের ব্যবহারের পূর্বে এই পদার্থগুলি সম্পদে পরিণত হয় না। মানুষের অভাবমোচন করলে তবে তা সম্পদ বলে গণ্য হয়। সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষ ও সংস্কৃতি এই তিনটি উপাদানের গুরুত্ব পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা হল।

১.৭.১ প্রকৃতি (Nature)

সম্পদের মূল উৎস হল প্রকৃতি। প্রকৃতি সম্পদের কাঁচামালের যোগানদাতা। প্রকৃতি ছাড়া কোনো সম্পদ সৃষ্টি করা যায় না। জিমারম্যানের মতে — প্রকৃতি হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এমন সমস্ত বস্তু বা মানুষের দ্বারা প্রভাবিত বা পরিবর্তিত হয়নি ("Nature is the cosmos in so far it is unaffected by the Man.") ।

প্রকৃতির দান সর্বত্র সমানভাবে বণ্টিত হয়নি। প্রকৃতি কোথাও মুক্ত হস্ত আবার কোথাও সে অতিকৃপণ। প্রাকৃতিক সম্পদের পাচুর্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া উন্নতির চরম শিখরে আবার প্রকৃতির অবহেলায় মধ্য আফ্রিকার দেশগুলো সবদিক থেকে অনুন্নত। প্রকৃতি কখনও বন্ধুর মতো মানুষকে সাহায্য করে আবার কখনও শত্রুর মতো মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। সে যেমন আলো, হাওয়া, জল, গাছপালা দিয়ে মানুষকে লালনপালন করে তেমনি ঝড়, ভূমিকম্প, বন্যা, কীটপতঙ্গ, হিংস্র জন্তু দিয়ে মানুষের বাঁচার পথে বাধা হয়ে দাড়ায়।

মানুষ সংস্কৃতির সহযোগিতায় সম্পদ সৃষ্টি করে ঠিকই কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি-নির্ভর। প্রকৃতিই ঠিক করে দেয় কোথায় কি সম্পদ উৎপন্ন হবে, কোথায় তা হবে না। ব্রাজিলের কফি চাষ, ভারত শ্রীলঙ্কার চা, মালয়েশিয়ার রাবার, কানাডার নরম কাঠের উৎপাদনও প্রকৃতির দ্বারা নির্দিষ্ট। উপসাগরীয় দেশগুলোতে খনিজ তেলের উৎপাদনও ঠিক করে দেয় প্রকৃতি। তাই জিমারম্যানের কথায়— স্বীয় অভাবমোচনের জন্য মানুষ তার কলাকৌশলের উন্নতি ঘটায় প্রকৃতি নির্ধারিত পরিসীমার মধ্যে (Nature sets limits within which man can develop his arts to satisfy his wants) ।

১.৭.২ মানুষ (Man)

সম্পদ সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে আছে মানুষ। মানুষকে বাদ দিলে সম্পদের কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

মানুষ নিজেই একটি সম্পদ ও সম্পদ সৃষ্টিকারী উপাদান। মানুষকে সম্পদ-সৃষ্টিকারী উপাদান হিসাবে গণ্য করাই শ্রেয়। **জিমারম্যান**-এর মতে "সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষ এক অনন্য ভূমিকা (unique role) পালন করে।" সম্পদ মানুষের দ্বারা ও মানুষের জন্য সৃষ্টি হয়।

মানুষ দুটি স্তরে বাস করে, যথাঃ (১) **পশুস্তরে** (Animal Level) ঃ পশু-স্তরের মানুষ হল জ্ঞান-বিজ্ঞানে সংস্রব-বর্জিত মানুষ, যে মানুষ কেবল আপন ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করতেই ব্যস্ত। (২) মানবিক স্তরে (Human Level or Supra-animal Level) ঃ মানবিক স্তরের মানুষ বলতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা অর্থাৎ, সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ মানুষকে বোঝায়। মানবিক স্তরের মানুষ কেবলমাত্র আপন ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করে না, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে সংস্কৃতির সাহায্যে প্রাকৃতিক সব বাধা দূর করে অগণিত 'নিরপেক্ষ সামগ্রী' কে সম্পদে রূপান্তরিত করে। এ-কাজ পশুস্তরের মানুষের সাধ্যের অতীত।

মানুষের অভাববোধ ও চাহিদাই সম্পদ সৃষ্টির জন্য দায়ী। মানুষের অভাব-মোচনের জন্যই সম্পদের উৎপত্তি। আদিম মানুষের চাহিদা ছিল অতি অল্প। তারা পশুর মতো বনে ও পাহাড়ের গুহায় বসবাস করত এবং শিকার করে, বনের ফলমুল সংগ্রহ করে খাদ্যসংগ্রহ করত। প্রকৃতির অধিকাংশ পদার্থ তখন ছিল নিরপেক্ষ সামগ্রী। তারা প্রকৃতিকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারেনি। তাই সম্পদের পরিমাণও ছিল খুব অল্প। বর্তমানে জ্ঞানবিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতির ফলে মানুষ প্রকৃতির এক বিরাট অংশকে তার ভোগ ব্যবহারের কাজে লাগাচ্ছে। মানুষের ব্যবহারের জন্য সমুদ্রের তলা থেকে তোলা হয় পেট্রোলিয়াম, কান্তার মরুর মাটি খুঁড়ে তোলা হয় লোহা, তামা, সোনা, শাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্য থেকে আনা হয় মূল্যবান কাঠ। সম্পদের খোঁজে মানুষ পৌঁছে যায় চাঁদে, গাড়ি দেয় মঙ্গলগ্রহে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মানুষ একদিকে যেমন সম্পদ সৃষ্টিকারী, অপরদিকে সম্পদ ব্যবহারকারী। মানুষের এই দুই ভূমিকাকে **জিমারম্যান 'মানুষের দ্বৈত ভূমিকা'** (Dual Role of Man) নামে অভিহিত করেছেন।

১.৭.৩ সংস্কৃতি (Culture)

জিমারম্যান-এর মতে "সংস্কৃতি বলতে বোঝায় শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সভ্য ব্যবহার পাশব প্রবৃত্তির দমন, দ্বন্দ্বের পরিবর্তে সহযোগিতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা।" সংস্কৃতি মানুষের উন্নতির প্রধান বাহক। সংস্কৃতিহীন মানুষ পশুর সমান। সংস্কৃতির সহায়তায় মানুষ প্রকৃতিদত্ত পদার্থকে সম্পদে পরিণত করে। সংস্কৃতি মানুষের মস্তিষ্ক-প্রসূত হলেও সম্পদ সৃষ্টিতে এর অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য একে সম্পদ সৃষ্টির একটি স্বতন্ত্র উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়।

সংস্কৃতি মানুষকে পশুমানবের স্তর থেকে সভ্যসমাজের স্তরে উন্নীত করে। সংস্কৃতি প্রকৃতির নিরপেক্ষ সামগ্রীকে সম্পদে পরিণত করে। এমনকি, প্রাকৃতিক বাধাসমূহকে মানুষ তার সংস্কৃতির সহায়তায় সম্পদে রূপান্তরিত করছে। কেরালার সমুদ্র উপকূলের মোনাজাইট বালি এই সেদিন পর্যন্ত ছিল 'নিরপেক্ষ সামগ্রী', সংস্কৃতির সহায়তায় তা আজ অমূল্য থোরিয়ামের উৎস হিসাবে সম্পদে পরিণত হয়েছে। খরস্রোতা নদী একসময় মানুষের কাছে বাধা হিসাবে গণ্য হত। আজ সেই নদীর খরস্রোতকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন হচ্ছে হাজার হাজার মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ।

মানুষের জ্ঞান হল সকল সম্পদের জননী। যে দেশের মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্থাৎ সংস্কৃতিতে যত উন্নত সে দেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে তত উন্নত। প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব সত্ত্বেও জাপান বিশ্বের এক উন্নত দেশে পরিণত হয়েছে তার অত্যাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করে। সংস্কৃতি যত উন্নত হয় মানুষ ততই নতুন নতুন জিনিস অর্থাৎ সম্পদ খুঁজে পায়। মানুষের সম্মুখে নতুন নতুন সম্পদ সৃষ্টির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

সম্পদ সৃষ্টির উপাদান হিসাবে প্রকৃতি, মানুষ ও সংস্কৃতি—এই তিনটির ভূমিকা অপরিহার্য। এদের মিলিত প্রচেষ্টায় সম্পদ সৃষ্টি হয়। এই তিনটি উপাদানকে বলা হয় সম্পদ সৃষ্টির ত্রয়ী (Trinity of Resource Creation)। রবার গাছ প্রকৃতির দান। মানুষ তার থেকে রস (latex) সংগ্রহ করে। সংস্কৃতি সেই রসের সঙ্গে রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিল্পে ব্যবহারযোগ্য রবার উৎপন্ন করে। এইভাবে রবার সম্পদে পরিণত হয়। সুতরাং সম্পদ সৃষ্টির জন্য প্রকৃতি, মানুষ ও সংস্কৃতির মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন।

১.৮ সম্পদ সচেতনতা (Resource Consciousness)

আদিম যুগে মানুষের চাহিদা ছিল খুব অল্প। সম্পদ সম্বন্ধে তাদের বিশেষ ধারণা ছিল না। আগুনের ব্যবহার ও চাকা আবিষ্কারের পর মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীতে ব্যাপক পরিবর্তন হল। সম্পদের ব্যবহারে এল প্রবল গতি। মানুষ প্রচুর পরিমাণে সম্পদ সৃষ্টি ও ব্যবহার করতে শুরু করল। শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে মানুষের হাতে এল অগাধ ক্ষমতাসম্পন্ন জড়শক্তি। অর্থাৎ, যে শক্তি জড় পদার্থ, যেমন—কয়লা, খনিজ তেল ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন শক্তি। জড়শক্তির ব্যবহারে সম্পদ সৃষ্টির পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়ে তুলল। হাতে তৈরি জিনিসের তুলনায় কলকারখানার মেসিনে তৈরি দ্রব্যের পরিমাণ ও গুণাগুণ অনেক বেশি। এইভাবে সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষ সচেতন হয়ে উঠল।

সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ দেখল কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের পরিমাণও সীমিত। ব্যবহারের ফলে সেগুলির পরিমাণ ক্রমাগত কমতে থাকে। প্রবহমান সম্পদ অতি ব্যবহারের ফলে কমতে থাকে। মানুষ

এইসব সম্পদের অপচয় রোধ ও সংরক্ষণে প্রয়াসী হল। সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণে সরকারি আইন ও বিধিনিষেধ প্রয়োগের ব্যবস্থা হল।

সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে পরিবেশের অবনমন ঘটে। বায়ু, জল ও মৃত্তিকা দূষিত হয়ে পড়ে। বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়। পরিবেশ দূষণ না করে বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি না করে কীভাবে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা যায় তার প্রচেষ্টা চলছে। পরিবেশ দুষণকারী সম্পদের ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশের পক্ষে মঙ্গলজনক সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সম্পদ সচেতনতার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধুনিক উদাহরণ হল স্থায়ী উন্নয়নের (Sustainable Development) ভাবনা। আমাদের ভাবী প্রজন্মও যাতে প্রাকৃতিক সম্পদ ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারে এবং দূষণমুক্ত বায়ু, জল ও মৃত্তিকা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করাই হল স্থায়ী উন্নয়নের মূল ভাবধারা।

১.৯ সম্পদ উন্নয়নে সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি (Recent Trend in Resource)

শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ সৃষ্টির গতিপ্রকৃতি উন্নত হচ্ছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানের উন্নতির চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাহিদার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সম্পদের উৎপাদন ও যোগান দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে। সম্পদ উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত বিপুল চাহিদা বৃদ্ধির জন্য যোগান বজায় রাখতে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তায় প্রচুর পরিমাণে সম্পদ উৎপাদন করা হচ্ছে। প্রয়োজন মেটাতে মানুষ সংস্কৃতিকে উন্নত থেকে উন্নততর করছে। এই উন্নত সংস্কৃতি তথা প্রযুক্তির হাত ধরে মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদের খোঁজে পাড়ি দিচ্ছে মহাসাগরের তলদেশে, দুর্গম মরুভূমিতে, শাপদসঙ্কুল অরণ্যে, বরফে আবৃত মেরুপ্রদেশে।

দ্বিতীয়, মানুষের মধ্যে সম্পদের উপলব্ধি দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্পদের কার্যকারিতা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে যে পরিমাণ সম্পদ ব্যবহার করে যে কাজ পাওয়া যেত বর্তমানে সেই একই পরিমাণ সম্পদ ব্যবহার করে তার থেকে অনেক বেশি কাজ পাওয়া যায়। যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা বেড়ে যাওয়ায় এক লিটার পেট্রোল বা ডিজেল খরচ করে একটা মোটরগাড়ি পূর্বের তুলনায় বেশি পথ চলে যেতে পারে। ধানের তুষ এখন কেবল জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত হয় না, তুষ থেকে উপকারী ভোজ্যতেল তৈরি হয়। আখের ছিবড়ে কাগজশিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

তৃতীয়ত, বর্তমানে পরিবেশকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সম্পদের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এতদিন অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে মানুষ সম্পদ ব্যবহার করেছে। বায়ু, জল, মৃত্তিকা প্রাকৃতিক পরিবেশের এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান দারুণভাবে দূষিত হয়ে পড়েছে। শহর ও শিল্পাঞ্চলে বায়ুদূষণ, জলদূষণ ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। মৃত্তিকাদূষণের ফলে শস্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। সম্পদের উন্নয়ন করতে গিয়ে পরিবেশ রক্ষার দিকটি বিবেচনা করতে হবে।

চতুর্থত, গচ্ছিত সম্পদ (Fund Resource) যাতে দ্রুত নিঃশেষিত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। মিডো (Meadow)-এর "দি লিমিট্স টু গ্রোথ" (The Limits to Growth) রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, অধিকাংশ খনিজ সম্পদ আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ফুরিয়ে যাবে। মানবসভ্যতা এক ভয়ংকর সমস্যার সম্মুখীন হবে। সুতরাং সম্পদ সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। গচ্ছিত সম্পদের পরিবর্তে প্রবহমান সম্পদ ব্যবহার করতে হবে। পরবর্তী প্রজন্ম যাতে প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করতে পারে, সম্পদ উন্নয়নের সময় সে কথাও মাথায় রাখা প্রয়োজন।

সম্পদ উন্নয়নের গতিপ্রকৃতিতে দেখা যায় সম্পদ সৃষ্টি ও ব্যবহারে পূর্বের তুলনায় মানুষের চিন্তাভাবনার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। সম্পদ উন্নয়নে সম্পদের পরিমাণের সঙ্গে এর গুণগত বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। নিছক সম্পদ উন্নয়নের পরিবর্তে সম্পদের স্থায়ী উন্নয়ন (Sustainable resource development) কীভাবে করা যায় বিশ্বব্যাপী তারই চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে।

১.১০ সারাংশ

সম্পদ সম্বন্ধে মানুষের একটা ভুল ধারণা আছে। সাধারণত মনে করা হয় সমস্ত ব্যবহার্য জিনিসই সম্পদ। কিন্তু এই ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন **জিমারম্যান**। তিনি বলেছেন কোনো বস্তু বা অবস্তু যে কার্য করতে পারে তা সম্পদ। এখান থেকে উদ্ভব হয়েছে সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব। বিশ্বের বিভিন্ন বস্তুকে কীভাবে সম্পদ, বাধা ও নিরপেক্ষ সামগ্রীতে বিভক্ত করা যায় তা আলোচিত হয়েছে এই এককে। সম্পদ কীভাবে সৃষ্টি হয় এবং একে প্রধানত কোন কোন ভাগে ভাগ করা যায় তা আলোচনা করা হয়েছে। সম্পদ সম্বন্ধে মানুষের সচেতনতা কীভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাও আমরা এই একক থেকে জানতে পারব।

১.১১ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী ঃ

১। সম্পদের সংজ্ঞা দিন। এর বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি আলোচনা করুন।

২। কোনো বস্তুকে সম্পদ বলা হয় না কেন? সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্বের আলোকে তা আলোচনা করুন।

৩। উদাহরণসহ সম্পদ সৃষ্টির উপাদানগুলির যৌথ প্রচেষ্টায় কিভাবে সম্পদ সৃষ্টি হয় তার বর্ণনা দিন।

৪। সম্পদ সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তা দেখান। সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ আলোচনা করুন।

৫। টীকা লিখুন—(ক) গচ্ছিত সম্পদ, (খ) প্রবহমান সম্পদ, (গ) আবর্তনযোগ্য গচ্ছিত সম্পদ, (ঘ) রুদ্ধ প্রবহমান সম্পদ, (ঙ) বাধা, (চ) নিরপেক্ষ সামগ্রী।

১.১২ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Zimmermann E. W.—World Resources and Industries.

(২) Alexander E. W.—Economic Geography.

(৩) তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌতম মল্লিক—অর্থনৈতিক সম্পদ সমীক্ষা।

(৪) অনীশ চট্টোপাধ্যায়—বি. কম সম্পদ সমীক্ষা।

একক ২ ❑ সম্পদরূপে মানুষ (Man as Resource)

সম্পদের মধ্যে মানবসম্পদের স্থান শীর্ষে। মানুষের বাসভূমি বলে এই পৃথিবী প্রাণচঞ্চল, কর্মচঞ্চল ও সমৃদ্ধ, আর এই সমৃদ্ধির কৃতিত্ব প্রাপ্য মানুষের সৃজনশীলতা ও কর্ম-প্রয়াসের।

মানবসম্পদ সম্পর্কিত অনুশীলন সম্পদশাস্ত্রের অন্যতম ক্ষেত্র। কেননা সম্পদশাস্ত্রবিদ্‌দের কাছে মানুষই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়, যে-মানুষ একাধারে বস্তুসামগ্রী ও পরিষেবার উৎপাদক, ব্যবহারকারী ও বিনিময়কারী।

একক ২(ক) ❑ জনসংখ্যার পরিমাণগত অবস্থা

গঠন

২(ক).১ উদ্দেশ্য

২(ক).২ প্রস্তাবনা

২(ক).৩ মনুষ্যসম্পদ

২(ক).৪ বিশ্বজনসংখ্যার বর্তমান আকার

২(ক).৫ পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল

২(ক).৫.১ ঘনত্ব অনুসারে জনসংখ্যার বণ্টন

২(ক).৬ বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি

২(ক).৭ জনসংখ্যা অভিক্ষেপণ

২(ক).৮ সারাংশ

২(ক).৯ অনুশীলনী

২ (ক).১ উদ্দেশ্য

মানুষকে সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হয়। এই এককে পৃথিবীর মনুষ্যসম্পদের পরিমাণগত অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। এই এককটি পাঠ করে জানা যাবে—

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা,

জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি,

পৃথিবীর বিভিন্ন ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল।

২ (ক).২ প্রস্তাবনা

সম্পদ সৃষ্টিকারী উপাদান হিসাবে মানুষের স্থান শীর্ষে। মানুষ ছাড়া সম্পদের কথা চিন্তা করা যায় না। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পর থেকে জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, কখনও ধীরগতিতে, আবার কখনও দ্রুতগতিতে। খ্রিস্টাব্দ শুরু হওয়ার পর থেকে বিশ্বের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছে ষোলশ পঞ্চাশ বছর।

কিন্তু, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছে মাত্র পঞ্চাশ বছর। জনসংখ্যার এই দ্রুত বৃদ্ধি বিশ্বের জনসংখ্যা বিস্ফোরণ সূচিত করে।

২(ক).৩ মনুষ্যসম্পদ

সম্পদশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের ভূমিকা চারভাবে ভাবা যায়, যথা ঃ (১) মানুষ নিজেই সম্পদ, (২) মানুষ সম্পদের সৃষ্টিকর্তা, (৩) মানুষ সম্পদের ভোগকর্তা এবং (৪) মানুষই সম্পদের ধ্বংসকর্তা। এর মধ্যে দুটি ভূমিকা প্রধান। মানুষ সম্পদ সৃষ্টিকারী ও সম্পদ ভোগকারী। একে বলা হয় মানুষের দ্বৈত ভূমিকা (Dual role of man)। সকল মানুষকে সম্পদ বলা যায় না। অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় মানুষই সম্পদ।

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পর থেকে জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে। ১ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২৫ কোটি। বর্তমানে এই জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬০০ কোটিতে। কোনও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ওই দেশের মানুষের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না। জনসংখ্যা বেশি হলে সম্পদের চাহিদা বা ব্যবহার বেশি হবে, তা ঠিক নয়। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি এবং সম্পদের ব্যবহার নির্ভর করে মানুষের গুণগতমান ও জীবনযাত্রার ওপর। দেশের জনসমষ্টির অধিকাংশ উৎপাদনশীল হলে অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। অপরপক্ষে অধিক অনুৎপাদক জনসমষ্টির ভরণপোষণের চাপে অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয়। জাপানের জনসংখ্যা অধিক হলেও জনগণের কর্মকুশলতা উচ্চমানের হওয়ায় সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি এত বেশি। ভারতের জনগণ তত কর্মদক্ষ নয় বলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি এত মন্থর।

২(ক).৪ বিশ্ব জনসংখ্যার বর্তমান আকার

বর্তমানে অর্থাৎ ২০০০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের জনসংখ্যা প্রায় ৬০০ কোটি। ১ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ২৫ কোটি। অর্থাৎ গত ২০০০ বছরে বিশ্বের জনসংখ্যা বেড়েছে ২৪ গুণ।

সারণি-১

পৃথিবীর জনসংখ্যা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার

খ্রিস্টাব্দ	জনসংখ্যা (কোটি)	গড়বার্ষিক বৃদ্ধি (কোটি)
০০০১	২৫	—
১৬৫০	৫৪.৫	০.০১৭৮
১৭৫০	৭২.৮৪	০.১৪৩৪
১৮০০	৯০.৫৬	০.৩৫৪৪
১৮৫০	১১৭.১০	০.৫৩০৮
১৯০০	১৬০.৮০	০.৮৭৪
১৯৫০	২৪৮.৬০	১.৭৫৬
১৯৯০	৫২৮.২০	৬.৯৯
২০০০	৬০০	৭.১৮

উপরিউক্ত সারণি থেকে দেখা যায় খ্রিস্টাব্দ শুরু হওয়ার পর প্রথমবার জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছে প্রায় ষোলশ পঞ্চাশ বছর, অর্থাৎ ১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। দ্বিতীয়বার জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছে ২০০ বছরের কম অর্থাৎ ১৬৫০ থেকে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তৃতীয়বার জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছে ১০০ বছরের কম অর্থাৎ ১৮৫০ থেকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। শেষবার অর্থাৎ চতুর্থবার জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছে মাত্র ৪০ বছর অর্থাৎ ১৯৫০ থেকে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ। বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে বছরে প্রায় ১,৭৮,০০০। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে তা গিয়ে দাঁড়িয়েছে বছরে ৭,১৮,০০,০০০। জনসংখ্যার এই বিপুল বৃদ্ধি-হার নিঃসন্দেহে মানবজাতির এক চরম সমস্যা। জনসংখ্যার এই লাগামহীন বৃদ্ধিকে এককথায় জনসংখ্যার বিস্ফোরণ (Population explosion) বলা যেতে পারে।

২(ক).৫ পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল (Areas of Population Concentration)

পৃথিবীর জনবসতি সর্বত্র সমান নয়। কোনও অঞ্চলে জনবসতি খুব ঘন আবার কোনও অঞ্চলে জনবসতি একেবারেই নেই। **পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার নব্বই শতাংশ বাস করে স্থলভাগের মাত্র দশ শতাংশ স্থানে**। অপরপক্ষে জনসংখ্যার **দশ শতাংশ বসবাস করে পৃথিবীর মোট স্থলভাগের নব্বই শতাংশ স্থানে**। মরু অঞ্চল বা তুন্দ্রা অঞ্চল জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে, আবার চীন জাপান ভারতের শহরাঞ্চলে তিলধারণের জায়গা নেই।

২(ক).৫.১. ঘনত্ব অনুসারে জনসংখ্যার বণ্টন

জনঘনত্বের পার্থক্য অনুসারে পৃথিবীকে চারভাগে ভাগ করা যায়—(১) অতি-বিরল জনবসতি অঞ্চল—জনবসতি প্রতি বর্গকিমিতে ১০ জন বা তার কম, (২) বিরল-বসতি অঞ্চল—জনবসতি প্রতি বর্গকিমিতে ১১-৫০ জন, (৩) মধ্যমবসতি অঞ্চল—জনবসতি প্রতি বর্গকিমিতে ৫১-১৫০ জন, (৪) ঘনবসতি অঞ্চল—জনবসতি প্রতি বর্গকিমিতে ১৫০ জনের বেশি।

(১) অতিবিরল বসতি অঞ্চল ঃ পৃথিবীর যে সমস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের জীবনযাপনের পক্ষে অতি প্রতিকূল সে সব অঞ্চলে প্রতি বর্গকিমিতে **১০ জন বা তার, কম** লোক বসবাস করে। কোন কোন অঞ্চল জনশূন্য, যেমন, মরুভূমি অঞ্চলে (সাহারা, কালাহারি, আটাকামা, গোবি, থর); নিরক্ষীয় বনভূমিতে (আমাজন অববাহিকা, কঙ্গো অববাহিকা); তুন্দ্রা অঞ্চলে (কানাডার উত্তরাংশ, গ্রীনল্যান্ড, আলাস্কা); উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে (হিমালয়, আল্পস, আন্দিজ, রকি প্রভৃতি) অতিবিরল জনবসতি দেখা যায়।

(২) বিরলবসতি অঞ্চল ঃ প্রাকৃতিক পরিবেশ জীবনধারণের তেমন উপযোগী না হওয়ায় পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে জনবসতি তেমন ঘন নয়। এ সব অঞ্চলে জনবসতি **প্রতি বর্গকিমিতে ১১ থেকে ৫০ জন**। ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমিতে এরকম জনবসতি দেখা যায়। সাভানা, প্রেইরী, পম্পাস, ডাউনস, স্টেপস প্রভৃতি তৃণভূমি অঞ্চলে বিরল বসতি পরিলক্ষিত হয়।

(৩) মধ্যমবসতি অঞ্চল ঃ পৃথিবীর অধিকাংশ বসতিযুক্ত অঞ্চল মধ্যম বসতিপূর্ণ। এসব অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে **৫১ থেকে ১৫০ জন**। পৃথিবীর যেসব অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ কৃষিকাজের

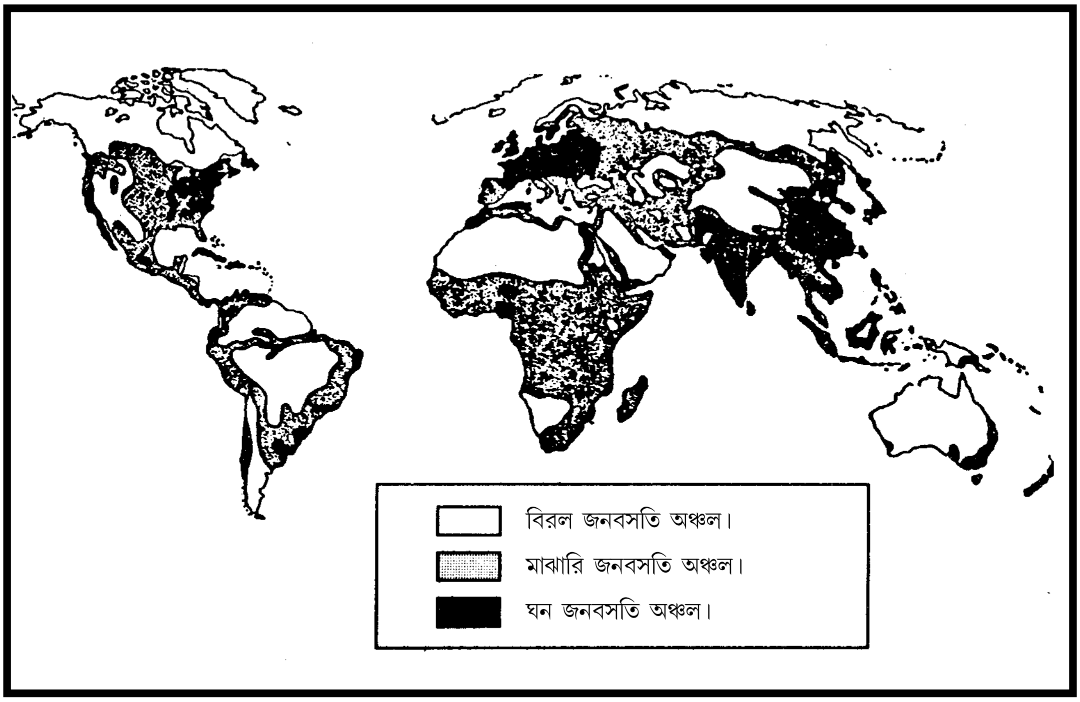

বিশ্বে জনবসতির বণ্টন

সহায়ক সেসব অঞ্চলে এরকম জনবসতি পরিলক্ষিত হয়। এসব অঞ্চলে শিল্প বাণিজ্যও পরপর উন্নতিলাভ করে। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকার উত্তরাংশ ও ওশানিয়াতে এরকম জনবসতি দেখা যায়।

(৪) **ঘনবসতি অঞ্চল ঃ** পৃথিবীর যেসব অঞ্চলে ভূপ্রকৃতি সমতল, মৃত্তিকা উর্বর, জলবায়ু, মানব জীবনযাত্রা ও কৃষিকাজের উপযোগী সেসব অঞ্চলে জনবসতি নিবিড়। এসব অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে **১৫০ জনের বেশি**। যেসব অঞ্চলে খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় সেসব অঞ্চলে জনবসতি বেশ ঘন। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল (ভারত, বাংলাদেশ, মায়ান্‌মার, থাইল্যান্ড); পূর্ব এশিয়ার চীন, জাপান, ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল; উত্তর আমেরিকার লরেন্সীয় জলবায়ু অঞ্চলে এরকম জনবসতি দেখা যায়।

চীন, ভারত, বাংলাদেশ, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি প্রভৃতি দেশের জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে ২৫০ জনের অধিক।

২(ক).৬ বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি

বিশ্বে জনসংখ্যার বর্তমানে বৃদ্ধির হার বছরে ১.৪ শতাংশ। জনসংখ্যা **বৃদ্ধির হার সর্বত্র সমান নয়**। উন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রায় স্থিতাবস্থায় এসে পৌঁছেছে। কোনো কোনো দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক। অর্থাৎ এসব দেশে জনসংখ্যা কমছে। উদাহরণ হিসাবে রোমানিয়া, ইউক্রেন, জর্জিয়া, হাঙ্গেরী ও পর্তুগালের নাম উল্লেখ করা যায়। স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। শিক্ষার অভাব ও দারিদ্র্য এসব দেশে

সারণি-২

মহাদেশ অনুযায়ী জনঘনত্ব (১৯৯০-৯৫)			
মহাদেশ	আয়তন (বর্গ কিমি)	জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার (বার্ষিক শতাংশ)	জনঘনত্ব/বর্গ কিমি
এশিয়া	৩১৭৬৪০০০	১.৫	১১১
ইউরোপ	২২৯৮৬০০০	০.২	৩২
আফ্রিকা	৩০৩০৬০০০	২.৭	২৫
দক্ষিণ আমেরিকা	২০৫৩৩০০০	১.৭	২৪
উত্তর আমেরিকা	২১৫১৭০০০	১.০	১৪
ওশানিয়া	৮৫৩৭০০০	১.৪	৩
পৃথিবী	১৩৫৬৪১০০০	১.৫	৪৩

উৎস : UN Statistical Year Book 1997, Published in 2000.

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। মোজাম্বিকে জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধিহার ৩.৬ শতাংশ, কঙ্গোতে ৩ শতাংশ, পাকিস্থানে ২.৯ শতাংশ এবং ভারতে ১.৯ শতাংশ। নিম্নের সারণিতে কয়েকটি উন্নত ও কয়েকটি উন্নতিশীল দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেওয়া হল।

সারণি-৩

কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার (১৯৯০-৯৭)	
দেশ	জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার (শতাংশ)
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	১.০
কানাডা	১.১
ফ্রান্স	০.৫
জাপান	০.২
রুমানিয়া	(–) ০.৪
ইউক্রেন	(–) ০.৩
মোজাম্বিক	৩.৬
কঙ্গো	৩.০
পাকিস্তান	২.৯
ভারত	১.৯
ব্রাজিল	১.৪

উৎস : UN Statistical Year Book 1997, Published in 2000.

২(ক).৭ জনসংখ্যা অভিক্ষেপণ (Population Projection)

রাষ্ট্রসংঘের Department of Economic and Social Affairs-এর জনসংখ্যা বিভাগের ১৯৯৮ সালের সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, ২০৫০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৯৪০ কোটিতে, ২১০০ খ্রিস্টাব্দে ১০৪০

কোটিতে এবং ২১৫০ খ্রিস্টাব্দের ১০৮০ কোটিতে। জনসংখ্যা স্থিতিশীল হবে ২২০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি, যখন জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ১১০০ কোটিতে।*

সারণি-৪

বিশ্ব জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি	
বছর	**জনসংখ্যা (কোটি)**
১৯৫০	২৫০
১৯৯৫	৫৭০
২০৫০	৯৪০
২১০০	১০৪০
২১৫০	১০৮০

উৎস : World Population Projections to 2150, UN, 1998.

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত অসমান। ১৯৯৫ খ্রিস্টাবাদকে ভিত্তি করে পরবর্তী ১৫৫ বছরে আফ্রিকার জনসংখ্যা প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ৭০ কোটি থেকে আফ্রিকার জনসংখ্যা ২১৫০ খ্রিস্টাব্দে বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ২৮০ কোটিতে। চীনের জনসংখ্যা এই ১৫৫ বছরে ১২০ কোটি থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ১৫০ কোটিতে, ভারতের জনসংখ্যা ৯০ কোটি থেকে ১৭০ কোটিতে দাঁড়াবে। অপরপক্ষে ইউরোপের জনসংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপের জনসংখ্যা ৭২.৮ কোটি থেকে ২১৫০ খ্রিস্টাব্দে কমে গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ৫৯.৫ কোটিতে। ১৫৫ বছরে এই জনসংখ্যা হ্রাসের হার ১৮ শতাংশ।

সারণি-৫

মহাদেশ অনুসারে জনসংখ্যা, বৃদ্ধিহার, ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা					
মহাদেশ ও দেশসমূহ	**মোট জনসংখ্যা মধ্য ১৯১৯ (কোটি)**	**বার্ষিক স্বাভাবিক বৃদ্ধি (শতাংশ)**	**দ্বিগুণ হওয়ার সময় (বছরে)**	**ভবিষ্যৎজনসংখ্যা**	
				২০১০ খ্রিঃ (কোটি)	**২০২৫ খ্রিঃ (কোটি)**
পৃথিবী	**৫৯৮.২**	**১.৪**	**৪৯**	**৬৮৮.৩**	**৮০৫৪**
বেশি অনুন্নত দেশ	১১৮.১	০.১	৫৮৩	১২১.৬	১২৪১
স্বল্পোন্নত দেশ	৪৮০.০	১.৭	৪০	৫৬৬.৭	৬৮১৩
আফ্রিকা	৭৭.১	২.৫	২৮	৯৭.৯	১২৯০
উত্তর আমেরিকা	৩০.৩	০.৬	১১৯	৩৩.৩	৩৭.৪
ল্যাটিন আমেরিকা	৫১.২	১.৮	৩৮	৬০.০	৭০.৯
এশিয়া	৩৬৩.৭	১.৫	৪৬	৪২০.৬	৪৯২.৩
ইউরোপ	৭২.৪	–০.১	—	৭৩.৯	৭১.৮
ওশানিয়া	৩.০	১.১	৬৪	৩.৪	৪.১
ভারত	৯৮.৬৬	১.৯	৩৭	১১৬.৭৩	১৪১.৪৩

উৎস : World Population Data Sheet, ’99, Population Reference Bureau, USA.

* প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে মধ্যম সন্তানধারণ ক্ষমতা (medium fertility scenario) অনুযায়ী অর্থাৎ ধরা হয়েছে প্রতিস্থাপন স্তর (replacement level) হবে মহিলাপিছু দুটি সন্তানের সামান্য বেশি।

২(ক).৮ সারাংশ

পৃথিবীর জনসংখ্যা বিপুল বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৬০০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। পৃথিবীতে কোনো কোনো অঞ্চলে জনঘনত্ব বেশি এবং কোথায় কম তা এই এককে আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বের জনসংখ্যা অস্বাভাবিক গতিতে বেড়ে চলেছে। ১ খ্রিস্টাব্দে থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জনসংখ্যা কী হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, কোন মহাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার বেশি, কোন কোন দেশে জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কোন কোন দেশে জনসংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে তা দেখানো হয়েছে এই এককে। যেমন বর্তমান পৃথিবীর পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার ১.৪% কিন্তু আফ্রিকার কোনো কোনো দেশে এই হার ৩.৪% বা তার বেশি। এইভাবে বৃদ্ধি পেলে বিশ্ব জনসংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার একটি চিত্র এই এককে তুলে ধরা হয়েছে।

২(ক).৯ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী ঃ

১। সম্পদ হিসাবে মানুষের গুরুত্ব আলোচনা করুন। বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা কত?

২। বসতি ঘনত্বের দিক থেকে বিশ্বকে কটি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়? ঘনবসতি অঞ্চলগুলি কোথায় অবস্থিত লিখুন।

৩। বিশ্বের জনসংখ্যা কী হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে? অতীতে এই বৃদ্ধি কেমন ছিল? ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কেমন হবে বলে আপনি মনে করেন?

৪। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ (সংক্ষেপে উত্তর দিন)**

(ক) মানুষের দ্বৈত ভূমিকা।

(খ) গত ৫০ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার।

(গ) অতি বিরলবসতি অঞ্চল।

(ঘ) ভারতের জনসংখ্যা কোনো কোনো মহাদেশের জনসংখ্যার থেকে বেশি?

(ঙ) ২০৫০ ও ২১০০ খ্রিস্টাব্দে জনসংখ্যা কেমন হবে?

একক ২(খ) ❑ জনসংখ্যার ব্যবধান (Demographic Gap)

গঠন

২(খ).১ উদ্দেশ্য

২(খ).২ প্রস্তাবনা

২(খ).৩ জনসংখ্যার ব্যবধান বা ফাঁক : অর্থ ও তাৎপর্য

২(খ).৪ কয়েকটি দেশে জনসংখ্যার বৈসাদৃশ্য

২(খ).৫ উন্নত ও অনুন্নত/উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা ও খাদ্যশস্যের বার্ষিক বৃদ্ধি ও তার তাৎপর্য

২(খ).৬ জনসংখ্যা ও ক্ষুধা : আফ্রিকা প্রসঙ্গ

২(খ).৭ জনসংখ্যা কাঠামো ও জনসংখ্যা পিরামিড

২(খ).৭.১ জাপানের জনসংখ্যা কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

২(খ).৭.২ ভারতের জনসংখ্যা কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

২(খ).৮ সারাংশ

২(খ).৯ অনুশীলনী

২(খ).১ উদ্দেশ্য

বর্তমানে পৃথিবীতে জনসংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কিন্তু এই বৃদ্ধি কীভাবে ঘটেছে তা এই এককে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককটি পাঠ করে নীচের বিষয়গুলি বুঝতে পারবেন—

- উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের জন্মহার ও মৃত্যুহার।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্য উৎপাদনের সম্পর্ক।
- বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা কাঠামো।

২(খ).২ প্রস্তাবনা

বিশ্বের জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অবশ্য, জনসংখ্যার শতকরা বৃদ্ধির হার দেশভেদে বিভিন্ন। উন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার কম। অন্যদিকে অনুন্নত দেশে জনসংখ্যার শতকরা বৃদ্ধির হার বেশি। অনুন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে নিদারুণ খাদ্যসমস্যা। তাছাড়া এসব দেশে উৎপাদনশীল জনসংখ্যার পরিমাণ, অর্থাৎ ২০ বছরের বেশি বয়স্ক মানুষের সংখ্যা কম হওয়ায় সমস্যা আরও তীব্র হয়েছে।

২(খ).৩ জনসংখ্যার ব্যবধান বা ফাঁক (Demographic Gap)—অর্থ ও তাৎপর্য

পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এই জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণ মানুষের জন্মহার বেশি এবং মৃত্যুহার কম। এক বছরে বিশ্বে যত মানুষ জন্মলাভ করেছে ঠিক তত মানুষের মৃত্যু হচ্ছে না। বছরে ৩০০ কোটি মানুষের জন্ম হলে মৃত্যু হচ্ছে ২০০ কোটি মানুষের। সুতরাং ১০০ কোটি লোক প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যার এই জন্মহার ও মৃত্যুহারের পার্থক্যকে বলা হয় জনসংখ্যার ব্যবধান। জনসংখ্যার ব্যবধান যত বেশি হবে বিশ্বের জনসংখ্যা তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। জনসংখ্যা ব্যবধান কম হলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হবে কম। জনসংখ্যা ব্যবধান শূন্য হলে, অর্থাৎ মানুষের জন্মহার ও মৃত্যুহার সমান হলে পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না। জনসংখ্যা স্থিতিশীল হয়ে পড়বে। আবার জনসংখ্যার ব্যবধান ঋণাত্মক (Negative) হলে অর্থাৎ জন্মহারের তুলনায় মৃত্যুহার বেশি হলে জনসংখ্যা কমতে থাকবে। এই জনসংখ্যা ব্যবধান থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ণয় করা হয়। মনে করা যাক, কোনো দেশে জনসংখ্যার বার্ষিক মৃত্যুহার ১ শতাংশ এবং জন্মহার ২ শতাংশ। সুতরাং ঐ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১ শতাংশ।

২(খ).৪ কয়েকটি দেশে জনসংখ্যার বৈসাদৃশ্য (Demographic Contrasts in some selected Countries)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বিভিন্ন। কোনো দেশে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই কম, ফলে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি অল্প। উন্নত দেশগুলিতে এ রকম জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেখা যায়। ইউরোপের কয়েকটি উন্নত দেশে জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। এসব দেশে জনসংখ্যার মৃত্যুহার জন্মহারের তুলনায় বেশি। যেমন—ইটালিতে প্রতি হাজারে জন্মহার ৯ এবং মৃত্যুহার ১০; জার্মানিতে প্রতি হাজারে জন্মহার ৯ এবং মৃত্যুহার ১১। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশসমূহে জন্মহার মৃত্যুহারের তুলনায় অনেক বেশি। যেমন পাকিস্তানে জন্মহার ৩৬ এবং মৃত্যুহার ৮ প্রতি হাজারে। ইথিওপিয়াতে জন্মহার প্রতি হাজারে ৪৮ এবং মৃত্যুহার ১৬। ভারতে যথাক্রমে ২৫ ও ৯। এ সব দেশে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি অনেক বেশি।

সারণি-১
বিশ্বের কয়েকটি দেশে জন্মহার ও মৃত্যুহার

দেশ	জনসংখ্যা (কোটি)	জন্মহার (প্রতি হাজারে)	মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)
জাপান	১২.৬৪	১০	৮
ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য	৫.৮৮	১২	১১
জার্মানি	৮.২৮	৯	১১
বেলজিয়াম	১.০২	১১	১১
ইটালি	৫.৭২	৯	১০
ভারত	১০০.৭৩	২৫	৯
পাকিস্তান	১৫.৫৯	৩৬	৮
ইথিওপিয়া	৬.৬২	৪৮	১৬
মোজাম্বিক	১.৯৭	৪৩	১৮

উৎস : World Resource : 1998-99, Oxford University Press.

জনসংখ্যার বৃদ্ধি কেবলমাত্র জন্মহার ও মৃত্যুহারের ব্যবধানের ওপর নির্ভর করে না। কোনো দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস আরও দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। কিছু লোক যদি দেশত্যাগ করে অন্য দেশে চলে যায় তবে দেশে জনসংখ্যা হ্রাস পায়। আবার অন্য দেশ থেকে কিছু লোক কোনো দেশে এসে বসবাস করলে সে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মানুষের দেশত্যাগ করে চলে যাওয়াকে বলে **প্রবসন** (Emigration) এবং অন্যদেশ থেকে এসে কোনো দেশে বসবাস করাকে বলে **অভিবাসন** (Immigration)।

২(ক).৫ উন্নত ও অনুন্নত উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা এবং খাদ্যশস্যের বার্ষিক বৃদ্ধি ও তার তাৎপর্য

উন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার অনেক কম, প্রায় শূন্যের কাছাকাছি। ফলে এসব দেশে জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধি নেই বললেই চলে। কোনো কোনো দেশে জনসংখ্যা স্থিতিশীল হয়ে গেছে অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। আবার কোনো কোনো দেশে জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে। ইউক্রেন, রাশিয়া, পর্তুগাল, হাঙ্গেরির জনসংখ্যা নিম্নমুখী। উন্নত দেশের কয়েকটিতে মাথাপিছু খাদ্যশস্য উৎপাদন অনেক বেশি আবার কোনো কোনো উন্নত দেশে মাথাপিছু খাদ্যশস্য উৎপাদন অনেক কম। উন্নত দেশেগুলির মধ্যে যে দেশে খাদ্যশস্য কম উৎপাদিত হয় আর্থিক অবস্থা সচ্ছল থাকায় তারা অন্যান্য উন্নত দেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে। যেমন ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ও জাপানে মাথাপিছু খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে বছরে ৩৬০ কেজি ও ৯৭ কেজি। যুক্তরাজ্য খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও জাপানকে খাদ্য আমদানি করতে হয়। কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উন্নত দেশে প্রচুর খাদ্য উদ্বৃত্ত হয়। এরা খাদ্যশস্য রপ্তানি করে। কানাডাতে মাথাপিছু খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ বছরে ১৭১৫ কেজি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১১৮৩ কেজি।

১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ খ্রিঃ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি বেশি না হওয়ায় এ দেশে খাদ্যাভাব ঘটেনি। যুক্তরাজ্যে ১৯৯৮ থেকে ১৯৯৯ খ্রিঃ এই এক বছরে খাদ্য উৎপাদন কমেছে ৩.২৪ শতাংশ। জাপানে ১৯৯৮ থেকে ১৯৯৯ খ্রিঃ খাদ্য উৎপাদন ২.৯১ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা ঘটেনি।

অনুন্নত দেশসমূহে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। প্রতি বছর এই দেশগুলিতে জনসংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সব দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন হয় অনুন্নত প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে। উন্নত কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে এই দেশগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ আছে। উন্নত দেশগুলিতে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির তেমন সুযোগ নেই, কারণ এরা উৎপাদনশীলতার প্রায় চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলিতে মাথাপিছু খাদ্যশস্য উৎপাদন অনেক কম। ইথিওপিয়া ও সোমালিয়াতে মাথাপিছু খাদ্যশস্য উৎপাদন যথাক্রমে বছরে ১৩৭ কেজি ও ২১ কেজি। এদের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ যে এরা বিদেশ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না। রাষ্ট্রসংঘ থেকে খাদ্য সরবরাহ না করলে এ দেশগুলিতে খাদ্য সংকট চরম আকার নেয়। ভারত ও বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহ কৃষি উৎপাদনে মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই দেশগুলিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে খাদ্যাভাব দেখা দেয় না। প্রতি বছর এ সব দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

সারণি-২

কয়েকটি দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি

দেশ	বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতাংশ)	মাথাপিছু বার্ষিক খাদ্যশস্য উৎপাদন (কেজি)	বার্ষিক খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার (শতাংশ)
ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য	০.১	৩৬০	(–) ৩.২৪
জাপান	০.২	৯৭	২.৯১
ভারত	১.৬	২৩০	২.৩৭
বাংলাদেশ	১.৬	২৫১	৫.৫৪

উৎস : World Resource : 1998-99, এবং FAO Production Year Book, 1999, Published in 2001.

২(ক).৬ জনসংখ্যা ও ক্ষুধা : আফ্রিকা প্রসঙ্গ

অধিক জন্মহার, অধিক মৃত্যুহার, অধিক হারে শিশুমৃত্যু এবং জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির হারের সঙ্গে ক্ষুধার সম্পর্ক বেশ নিবিড়। আফ্রিকার নিরক্ষীয় ও ক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশগুলিতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন অত্যন্ত অল্প। প্রতিকূল জলবায়ু ও অবৈজ্ঞানিক কৃষিকাজের জন্য এ সব দেশে কৃষিশস্য উৎপাদন তেমন হয় না। অস্ট্রেলিয়ার লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৮৭ লক্ষ এবং ইথিওপিয়ার লোকসংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ১১ লক্ষ। অস্ট্রেলিয়া বছরে প্রায় ৩ কোটি ১১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করে। আফ্রিকার দেশ ইথিওপিয়া বছরে মাত্র ৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করে। অস্ট্রেলিয়াতে মাথাপিছু খাদ্যশস্য উৎপাদন বছরে ১৬৬৩ কেজি, ইথিওপিয়াতে মাত্র ১৩৭ কেজি। আফ্রিকার অপর দেশ সোমালিয়াতে খাদ্যশস্য উৎপাদন বছরে মাথাপিছু মাত্র ২১ কেজি। ঘানা, রোয়াভা, মোজাম্বিক, কঙ্গো, জাম্বিয়া প্রভৃতি দেশেও খাদ্যের অভাব প্রকট। ক্ষুধা ও অপুষ্টি এ সব দেশের অধিবাসীদের নিত্যসঙ্গী। উন্নত দেশে জনপ্রতি প্রতিদিন খাদ্যে ক্যালরী গ্রহণের পরিমাণ ৩০০০-এর ওপর। আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলিতে জনপ্রতি প্রতিদিন খাদ্যের মাধ্যমে ক্যালরী গ্রহণের পরিমাণ ১৫০০-এর কাছাকাছি।

দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও অপুষ্টির জন্য আফ্রিকার বিশেষত মধ্য আফ্রিকার দেশগুলিতে অপুষ্টিজনিত ও পতঙ্গবাহিত রোগের প্রকোপ অনেক বেশি। উন্নত দেশে ম্যালেরিয়া প্রায় নির্মূল হয়ে গেছে। এখনও আফ্রিকার মালাউইতে প্রতিলক্ষ জনসংখ্যায় ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা ৪৯,৪১০, জাম্বিয়াতে ৪৪,৪৯৮। মালউইতে যক্ষ্মা আক্রান্তের সংখ্যা এক লক্ষে ১৭২ জন এবং জাম্বিয়াতে ১৩৫ জন।

অত্যাধিক জন্মহার ও মৃত্যুহার এবং জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিহার এ দেশগুলির অনগ্রসরতার জন্য অনেকাংশে দায়ী। ইথিওপিয়াতে বার্ষিক জন্মহার ৪.৮ শতাংশ এবং বার্ষিক মৃত্যুহার ১.৬ শতাংশ অর্থাৎ জনসংখ্যার নীট বৃদ্ধি ৩.২ শতাংশ। আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলির অবস্থা প্রায় একই রকম।

২(খ).৭ জনসংখ্যা কাঠামো (Population Structure) জনসংখ্যা পিরামিড (Population Pyramid)

কোন দেশের জনসংখ্যাকে বয়সভিত্তিক ও নারী-পুরুষভিত্তিক বিশ্লেষণ করে দেখানোকে বলা হয় জনসংখ্যা কাঠামো। এই কাঠামোর আকৃতি রেখচিত্রে পিরামিডের মতো হয় বলে একে জনসংখ্যা পিরামিড বলা হয়। একে

বয়স-লিঙ্গ পিরামিডও (Age-Sex Pyramid) বলে। এই রেখাচিত্রের অনুভূমিক অক্ষের ডানদিকে নারী ও বাঁদিকে পুরুষ এবং উলম্ব অক্ষে (vertical axis) বয়স দেখানো হয়। অনুভূমিক অক্ষে নারী-পুরুষের সংখ্যা শতাংশে দেখানো হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি বিভিন্ন। এই আর্থ-সামাজিক পরিবেশের ওপর নির্ভর করে জনসংখ্যা পিরামিডের আকৃতির তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। নীচে ভারত ও জাপানের জনসংখ্যা পিরামিড দেওয়া হল। এই দুটি জনসংখ্যা পিরামিডের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে উন্নয়নশীল দেশ ও উন্নত দেশের জনসম্পদ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাবে। এর থেকে দেখা যায় উৎপাদনশীল লোকের সংখ্যা বেশি থাকায় জাপান উন্নতি লাভ করেছে। অপরপক্ষে উৎপাদনশীল জনগণের সংখ্যা কম থাকায় ভারত এখনও অনেক অনুন্নত।

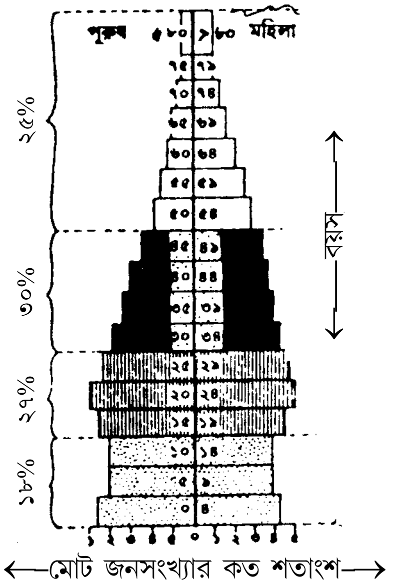

জাপানের জনসংখ্যা পিরামিড

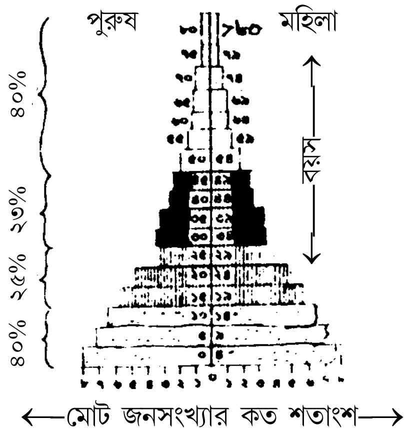

জাপানের জনসংখ্যা পিরামিড

২(খ).৭.১ জাপানের জনসংখ্যা কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

জাপান একটি উন্নত দেশ। অন্যান্য উন্নত দেশের জনসংখ্যা পিরামিডের মতো। জাপানের জনসংখ্যা পিরামিডের মধ্যভাগ স্ফীত, নীচের দিক সংকীর্ণ। এ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার ক্রমশ হ্রাস পাওয়ায় জনসংখ্যার মধ্যে শিশু ও কিশোরের সংখ্যা অল্প। ১৪ বছর পর্যন্ত শিশু ও কিশোর মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৮ শতাংশ। জনসংখ্যার মধ্যে যুবক ও পূর্ণবয়স্ক জনগণের সংখ্যা অনেক বেশি। ১৫ বছর থেকে ৪৯ বছর পর্যন্ত মানুষের মোট জনসংখ্যা ৫৭ শতাংশ। এই পর্যায়ে সকলেই কর্মক্ষম ও উৎপাদনশীল। জনসংখ্যায় এই দলভুক্ত লোক যত বেশি থাকবে সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি তত ত্বরান্বিত হবে। জাপানে বয়স্ক জনসংখ্যাও কম নয়। ৫০ বছর বা তার ওপরের মানুষের পরিমাণ মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ। তাই পিরামিডের শীর্ষদেশ যথেষ্ট স্থূল। এর থেকে বোঝা যায় জাপানের মানুষের গড় আয়ু অধিক। এ দেশের বয়স্ক লোকেরাও যথেষ্ট উৎপাদনশীল। তারা পরনির্ভর নয়।

২(খ).৭.২ ভারতের জনসংখ্যা কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

ভারত একটি উন্নয়নশীল দেশ। অন্যান্য অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের জনসংখ্যা পিরামিডের মতো ভারতের জনসংখ্যা পিরামিডের নিম্নভাগ স্ফীত। পিরামিড ক্রমশ ওপরের দিকে সরু হয়ে উঠে গেছে। ভারতে মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশই শিশু বা কিশোর যাদের বয়স ১৪ বছর পর্যন্ত। জন্মহার বেশি হওয়াতে এবং জন্মহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় পিরামিডের নীচের অংশের স্ফীতি সর্বাধিক। শিশু মৃত্যুহার বেশি হওয়ায় এটি ওপরের দিকে ক্রমশ সংকীর্ণ হয়েছে। ১৪ বছর পর্যন্ত জনসংখ্যা সাধারণত অনুৎপাদক ও পরনির্ভর। তাই ভারতে পরনির্ভর জনসংখ্যার অনুপাত বেশি। ভারতে ১৫ বছর থেকে ৪৯ বছর পর্যন্ত জনসংখ্যার পরিমাণ মাত্র ৪৮ শতাংশ যা অন্য দেশের তুলনায় কম। এরাই প্রকৃত উৎপাদক জনগোষ্ঠী। ভারতে বয়স্ক জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার মাত্র ১২ শতাংশ। অর্থাৎ ভারতীয়দের গড় আয়ু কম। পরনির্ভর বা অনুৎপাদক জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় অর্থনৈতিক উন্নতির গতি এত মন্থর। শিশুমৃত্যুর হার বেশি হওয়ায় আর্থিক অবস্থার ওপর এর একটি বিরূপ প্রভাব পড়ে।

২(খ).৮ সারাংশ

জনসংখ্যার ব্যবধান, অর্থাৎ জন্মহার ও মৃত্যুহারের পার্থক্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধি সূচিত করে। দেখা যায় উন্নত দেশে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই কম এবং এদের মধ্যে ব্যবধানও অল্প, ফলে এ সব দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুব কম। অপরপক্ষে, অনুন্নত দেশে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই অনেক বেশি। মৃত্যুহারের তুলনায় জন্মহার অনেক বেশি হওয়ার ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধিহার খুব দ্রুত। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় কোনো কোনো দেশে খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে। সারা পৃথিবীর উৎপাদন বিবেচনা করলে কোথাও খাদ্যসংকট হওয়ার কথা নয়। কোনো দেশ উন্নত বা অনুন্নত তা জানা যায় সে দেশের জনসংখ্যা পিরামিডের আকৃতি দেখে। জনসংখ্যা পিরামিডের মধ্যভাগ স্ফীত হলে উৎপাদনশীল লোকের সংখ্যা বেশি থাকে।

২(খ).৯ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী ঃ

১। জনসংখ্যার ব্যবধান বা ফাঁক বলতে কী বোঝেন? এর তাৎপর্য আলোচনা করুন।

২। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা বৈসাদৃশ্য দেখান।

৩। উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্যশস্য উৎপাদনের একটি চিত্র তুলে ধরুন।

৪। জনসংখ্যার সঙ্গে ক্ষুধার সম্পর্ক আফ্রিকার উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৫। জনসংখ্যা পিরামিড কাকে বলে? একটি উন্নত দেশ ও একটি উন্নয়নশীল দেশের জনসংখ্যা কাঠামোর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৬। টীকা লিখুন—প্রবসন ও অভিবাসন।

একক ২(গ) ❑ জনসংখ্যার সমস্যা

গঠন

২(গ).১ উদ্দেশ্য

২(গ).২ প্রস্তাবনা

২(গ).৩ জনসংখ্যার সমস্যা

২(গ).৪ স্থিতিশীল জনসংখ্যার প্রয়োজনীয়তা

২(গ).৫ স্থিতিশীল জনসংখ্যার দেশ

২(গ).৬ বোসরাপ তত্ত্ব

২(গ).৭ সারাংশ

২(গ).৮ অনুশীলনী

২(গ).৯ গ্রন্থপঞ্জী

২(গ).১০ উত্তর সংকেত

২(গ).১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়বার পর আপনি জানতে পারবেন--

- জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত বিভিন্ন সমস্যা।
- জনসংখ্যা স্থিতিশীল রাখার কারণ।
- জনসংখ্যার দিক থেকে স্থিতিশীল দেশসমূহ।
- ইস্টার বোসরাপ-এর জনসংখ্যা তত্ত্ব।

২(গ).২ প্রস্তাবনা

বিশ্বের সর্বোত্তম সম্পদ হল মানবসম্পদ। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনসংখ্যার অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছে নানা সমস্যার। জনসংখ্যার সাম্প্রতিক বৃদ্ধির কারণ নানাবিধ। জনসংখ্যার বৃদ্ধি যদি নিয়ন্ত্রণ করা না যায় তবে মানবসভ্যতা এক প্রকট সমস্যার সম্মুখীন হবে। এ সমস্যা থেকে অব্যাহতি পেতে হলে বিশ্বের, অনুন্নত দেশের জনসংখ্যা স্থিতিশীল করা একান্ত প্রয়োজন।

২(গ).৩ জনসংখ্যা সমস্যা (Population Problem)

মানবসম্পদ বিশ্বের সর্বোত্তম সম্পদ হলেও জনসংখ্যার অতিমাত্রায় বৃদ্ধি সারা পৃথিবীতে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। উৎপাদনশীল জনগণের হাতে উৎপাদনের সুযোগ না থাকলে তাদের পূর্ণক্ষমতা ব্যবহার করা যায় না। ফলে উৎপাদন কম হয় এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় না। বিগত একান্ন বছরে (১৯৫০-২০০১) জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে প্রায় আড়াই গুণ। জনসংখ্যার এই ভয়াবহ বৃদ্ধিকে জনবিস্ফোরণ (Population Explosion) আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ দ্রুত নিঃশেষিত হচ্ছে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে বনভূমি। বৃদ্ধি পাচ্ছে পরিবেশ দূষণ।

জনসংখ্যার দ্রুতহারে বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলি হল--(ক) চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি, (খ) জীবনদায়ী ঔষধের আবিষ্কার ও ব্যবহার, (গ) কৃষি উৎপাদনে বিশাল অগ্রগতি, (ঘ) জন্ম নিয়ন্ত্রণের অভাব ও ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং (ঙ) শিল্পের উন্নতি। আধুনিক প্রযুক্তিতে মৃত্যুহার বহু পরিমাণে কমে গেলেও জন্মহার কমানোর কোনো ফলপ্রসূ ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে। ফলে এসব দেশে জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। এই দেশগুলিতে অর্ধেকের বেশি লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। মধ্য আফ্রিকার দেশগুলিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুর্দশা বেড়েই চলেছে। বিশ্বে সামগ্রিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি যেখানে ১.৪ শতাংশ আফ্রিকার অনুন্নত দেশসমূহে এটি ৩ শতাংশ বা তারও বেশি। যেমন, ইথিওওপিয়াতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.২ শতাংশ।

জনসংখ্যা দ্রুত নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারলে মানবসভ্যতা এক প্রকট সমস্যার সম্মুখীন হবে। মিডো (Meadow)-এর মতে এভাবে চলতে থাকলে একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পৌঁছে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবে এক প্রকট অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং সমগ্র বিশ্বব্যবস্থা ভেঙে পড়বে।

২(গ).৪ স্থিতিশীল জনসংখ্যার প্রয়োজনীয়তা (Need for Population Stabilisation)

জনসংখ্যায় স্থিতিশীলতা না আনতে পারলে মনুষ্যসভ্যতা এক অভাবনীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ কমতে থাকবে। এমতাবস্থায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলেও মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন ততটা বৃদ্ধি পাবে না। এক সময় ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনবিধি (Law of Diminishing Return) কার্যকরী হবে এবং উৎপাদন আর বাড়ানো সম্ভব হবে না। ফলে মাথাপিছু খাদ্যশস্য উৎপাদন কমতে থাকবে। জনসংখ্যায় স্থিতিশীলতা আনতে না পারলে দেশে শিশু ও অনুৎপাদনশীল জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। পরনির্ভর জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পাবে। দেশের আর্থিক ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। এতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ কমতে থাকে এবং সম্পদ উৎপাদনের তুলনায় ভোগের পরিমাণ বাড়ে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয়। ভারতসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধির ফলে এরকম পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। জনসংখ্যার চাপে অপুষ্টি, দুর্বলতা ও রোগের প্রকোপে জনগণের সাধারণ স্বাস্থ্য অত্যন্ত নিম্নমানের। উন্নতদেশে একজন ব্যক্তি দিনে যত ক্যালরি ও যত গ্রাম প্রোটিন গ্রহণ করে অনুন্নত দেশের একজন ব্যক্তি তার তুলনায় অনেক কম ক্যালরি ও প্রোটিন পায়। পরপৃষ্ঠার সারণি থেকে তা বোঝা যাবে।

সারণি—১

মাথাপিছু ক্যালরি ও প্রোটিন গ্রহণ ঃ ১৯৯৭

দেশ	দৈনিক মাথাপিছু ক্যালরি	দৈনিক মাথাপিছু প্রোটিন (গ্রাম)
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	৩৬৯৯	১১২
ব্রিঃ যুক্তরাজ্য	৩২৭৬	৯৫
অস্ট্রেলিয়া	৩২২৪	১০৭
চীন	২৮৯৭	৭৮
ভারত	২৪৯৬	৫৯
ইথিওপিয়া	১৮৫৮	৫৪

উৎস : Human Development Report, 2000.

অপুষ্টির জন্য জনাকীর্ণ দেশে রোগের প্রকোপ অনেক বেশি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও অস্ট্রেলিয়ায় প্রতি ১ লক্ষ জনসংখ্যায় যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা ৯ ও ১১; জাম্বিয়া ও ভারতে এই সংখ্যা যথাক্রমে ১৩৫ ও ১৩০। জনসংখ্যা স্থিতিশীল হলে মানুষের মাথাপিছু পুষ্টিসহায়ক খাদ্যের পরিমাণ বাড়ানো যাবে এবং মানুষের মধ্যে রোগের প্রকোপ অনেক কমে যাবে।

২(গ).৫ স্থিতিশীল জনসংখ্যার দেশ (Countries achieving stable population)

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা স্থিতিশীল হয়ে পড়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের দিক থেকে এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলি অনেক এগিয়ে। ইউরোপ মহাদেশের অধিকাংশ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক (negative)। এদেশগুলিতে জন্মহার অপেক্ষা মৃত্যুহার বেশি। অর্থাৎ গত বছর যে জনসংখ্যা ছিল বর্তমান বছরে জনসংখ্যা তার থেকে কম। আগামী বছরে জনসংখ্যা আরও কমে যাবে। সারা ইউরোপ মহাদেশে জনসংখ্যা স্থিতিশীল অর্থাৎ জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার শূন্য শতাংশ অর্থাৎ একেবারে বাড়ছে না। ইউরোপের হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, ইউক্রেন, রাশিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশে জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে। যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্সে বৃদ্ধির হার শূন্যের কাছাকাছি। আগামী দু-এক বছরে এদেশগুলিতে জনসংখ্যা স্থিতিশীল হয়ে গেলে ইউরোপ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঋণাত্মক হবে।

সারণি--২

স্থিতিশীল জনসংখ্যার দেশ ও মহাদেশ

দেশ	জনসংখ্যা বৃদ্ধি (শতাংশ)	মহাদেশ	জনসংখ্যা বৃদ্ধি (শতাংশ)
হাঙ্গেরী	--০.৬	ইউরোপ	০.০
বুলগেরিয়া	--০.৫	উত্তর আমেরিকা	০.৮
ইউক্রেন	--০.৪	ওশিয়ানিয়া	১.৩
রাশিয়া	--০.৩	এশিয়া	১.৪
রুমানিয়া	--০.২	দক্ষিণ আমেরিকা	১.৫
পর্তুগাল	--০.১	আফ্রিকা	২.৬

উৎস : World Resource : 1998-1999.

২(গ).৬ বোসরাপ তত্ত্ব (Boserup Hypothesis)

ইস্টার বোসরাপ (Ester Boserup)-এর জনসংখ্যা সংক্রান্ত তত্ত্বের মূল বিষয় হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৃষিকাজকে আরও বেশি নিবিড় করতে সাহায্য করে। তিনি বলেছেন, "জমির ওপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ কৃষি প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটায়।" তবে এটাই কৃষিপ্রযুক্তি উন্নতির একমাত্র শর্ত নয়। কৃষিজমিতে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ও মূলধনের পরিমাণ এই উভয় উপাদানের বৃদ্ধি কৃষিপ্রযুক্তির উন্নতি ঘটতে সাহায্য করে। আদিম কৃষিকাজ থেকে শুরু করে বর্তমানের অতি উন্নত বহুফসলী কৃষি পর্যন্ত সর্বত্রই দেখা গেছে কৃষি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে কৃষি শ্রমিকের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

প্রাচীন যুগে কৃষির জন্য জমির স্বল্পতা ছিল না। জনসংখ্যা কম থাকায় কম জমি চাষ করা হত। কোনো কোনো ঋতুতে মানুষ কর্মহীন হয়ে বসে থাকত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বেশি জমিতে চাষ করা সম্ভব হচ্ছে এবং মানুষের কর্মহীনতা কমেছে। আধুনিক কৃষিপদ্ধতি প্রয়োগ করে কৃষিকাজ করতে অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। জমিতে লাঙ্গল দেওয়া, ফসল তোলা, ফসল ঝাড়াই বাছাই-এর যন্ত্রপাতি চালাতে, সার ঔষধ প্রয়োগ করতে, জমিকে ফসল উৎপাদনের উপযোগী করে তুলতে প্রচুর কৃষি শ্রমিক কাজে লাগাতে হয়। বোসরাপ তত্ত্ব ম্যালথাসের জনসংখ্যা সংক্রান্ত তত্ত্বের বিপরীত। ম্যালথাস বলেছিলেন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব নয়। অপরপক্ষে বোসরাপ বলেছেন যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে চাই জনসংখ্যার বৃদ্ধি।

ভারতের দীর্ঘমেয়াদী কৃষি উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বোসরাপের তত্ত্ব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। ভারতের জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি শুরু হয়েছে। ১৯২০-২১ খ্রীঃ থেকে। ১৯৩১ খ্রীঃ ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বছরে গড়ে ১.১০ শতাংশ, ১৯৬১ খ্রীঃ বৃদ্ধির হার ছিল বছরে গড়ে ২.১৫ শতাংশ। ভারতের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ থেকে। ১৯০০ খ্রীঃ থেকে ১৯৪৬ খ্রীঃ পর্যন্ত ভারতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল বছরে ০.৬২ শতাংশ। ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বছরে এই বৃদ্ধি দাঁড়ায় ২.১৮ শতাংশ। কৃষি উন্নতির ফলে ভারতীয়দের মাথাপিছু আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতার সময় বা তার পূর্বে মাথাপিছু আয় প্রায় থমকে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৫০-৫১ আর্থিক বছরের পর তা বছরে ১.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

বোসরাপ তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এটি কেবল জীবিকাভিত্তিক কৃষির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাস্তবে এটা প্রমাণ করা শক্ত যে জনসংখ্যা বৃদ্ধিই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তবু বোসরাপ তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে বলা যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত চাপ কৃষিতে নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে প্রভাবিত করে।

২(গ).৭ সারাংশ

বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এক প্রকট সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, মানবসভ্যতা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই জনসংখ্যা স্থিতিশীল করা প্রয়োজন। স্থিতিশীলতা এসেছে ইউরোপ মহাদেশে। অনেক উন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক। আফ্রিকা, এশিয়া মহাদেশের দেশগুলিতে জনসংখ্যা এখন দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারা বিশ্বে জনসংখ্যার বৃদ্ধিহার পূর্বের তুলনায় কমেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সুফলও যে বর্তমান তা দেখিয়েছেন মিসেস বোসরাপ তাঁর জনসংখ্যা সংক্রান্ত তত্ত্বে।

২(গ).৮ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী :

(১) জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান সমস্যা কোনটি? জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির কারণগুলি কী কী?

(২) বিশ্বে জনসংখ্যায় স্থিতিশীলতা প্রয়োজন আছে কী? কোন কোন দেশে জনসংখ্যায় স্থিতিশীলতা এসেছে?

(৩) বোসরাপ তত্ত্ব সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী :

(৪) শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(ক) মৃত্যুহার_______ ও জন্মনিয়ন্ত্রণের _______ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

(খ) বিশ্বের সামগ্রিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার_______শতাংশ এবং আফ্রিকা মহাদেশের অনুন্নত দেশে এই বৃদ্ধিহার_______শতাংশের বেশি।

(গ) জনসংখ্যার এই ভয়াবহ বৃদ্ধিকে_______আখ্যা দেওয়া যায়।

(ঘ) বোসরাপ বলেছেন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে কৃষি উৎপাদন _______ পায়।

২(গ).৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। Leong and Morgan–Economic and Human Geography.

২। Barun S. Mitra–Population : The Ultimate Resource.

৩। R. J. Johnston–Dictionary of Human Geography.

৪। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌতম মল্লিক--অর্থনৈতিক সম্পদ সমীক্ষা।

৫। Prithwish Roy–Resource Studies.

২(গ).১০ উত্তর সংকেত

১। (ক) হ্রাস, অভাবে,

(খ) ১.৪, ৩,

(গ) জনবিস্ফোরণ

(ঘ) বৃদ্ধি।

একক ৩ ❑ সম্পদরূপে সংস্কৃতি (Culture as Resource)

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ প্রস্তাবনা
৩.৩ সংস্কৃতির অর্থ ও সংজ্ঞা
৩.৩.১ সংস্কৃতির অর্থ
৩.৩.২ সংস্কৃতির সংজ্ঞা
৩.৪ সংস্কৃতির কার্য
৩.৪.১ সম্পদের প্রসারণ
৩.৪.২ বাধার সঙ্কোচন
৩.৫ সংস্কৃতি ও কৃষি
৩.৬ সারাংশ
৩.৭ অনুশীলনী
৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

সংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এই এককে সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন--

- সংস্কৃতি কাকে বলে
- সংস্কৃতির কাজ।
- কৃষিতে সংস্কৃতির ভূমিকা।

৩.২ প্রস্তাবনা

সংস্কৃতি, অর্থাৎ প্রধানত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদরূপে গণ্য করা হয়। সংস্কৃতি সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষকে সহায়তা করে। সংস্কৃতি একদিকে সম্পদের প্রসারণ ঘটায়, আবার অন্যদিকে সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষ যেসব বাধার সম্মুখীন হয় তার সঙ্কোচন ঘটায়। এভাবে সংস্কৃতি বিশ্বে ক্রমশ সম্পদসৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে।

৩.৩ সংস্কৃতির অর্থ ও সংজ্ঞা

৩.৩.১ সংস্কৃতির অর্থ

মানুষ অন্যান্য জীবজন্তুর মতোই এক প্রাকৃতিক জীব। মানুষ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সংস্কৃতি অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতির জন্যই মানুষ অন্যান্য পশুর থেকে পৃথক ও উন্নত। মেটানোর জন্য মানুষ প্রকৃতির নিরপেক্ষ উপাদানকে সম্পদে পরিণত করে। মানুষের চাহিদা যত বৃদ্ধি পায় সংস্কৃতির উন্নতিও হয় তত বেশি। সংস্কৃতির উন্নতি ঘটলে মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটে।

৩.৩.২ সংস্কৃতির সংজ্ঞা

মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা, প্রযুক্তিবিদ্যা, সাহিত্য, ধর্ম, আইন বিচার, রীতিনীতি, প্রশাসন ইত্যাদি একত্রে সংস্কৃতি নামে পরিচিত। **জিমারম্যান**-এর ভাষায় সংস্কৃতি হল, "বিদ্যা, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, ধর্ম, সুসভ্য ব্যবহার, পাশব প্রবৃত্তির দমন, সংঘাতের পরিবর্তে সহযোগিতা, বন্য আইনের স্থলে ন্যায় ও সুবিচারের প্রতিষ্ঠা।" ("Culture means education, learning experience, religion, civilised behaviour, suppression of vicious animal instincts, co-operation replacing conflict, the law of fair play and justice suppressing the law of jungle."–World Resource and Industries, E. W. Zimmermann, 1951)।

৩.৪ সংস্কৃতির কার্য

সংস্কৃতি ছাড়া মানুষের অগ্রগতি সম্ভব নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি মানুষকে আজ যেখানে পৌঁছে দিয়েছে তা দু-তিন শতাব্দী আগে ছিল মানুষের কল্পনাতীত। ভবিষ্যতে সংস্কৃতির হাত ধরে মানুষ কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে তাও মানুষের অজানা।

সংস্কৃতির কাজ দ্বিবিধ--সম্পদের প্রসারণ ও বাধার সংকোচন (Culture has dual functions–enlarging resources and reducing resistance.)। জিমারম্যান একে সংস্কৃতির দ্বৈতকার্য (dual functions of culture) নামে অভিহিত করেছেন।

৩.৪.১ সম্পদের প্রসারণ

সংস্কৃতির একটি প্রধান কাজ হল সম্পদের প্রসার ঘটানো। পরিমাণগতভাবে ও গুণগতভাবে সম্পদের বৃদ্ধি ঘটছে দিনের পর দিন। আদিম যুগের বন্য মানুষ থেকে শুরু করে আজকের তথ্যপ্রযুক্তির যুগে সুসভ্য মানুষ কারোরই চাহিদার শেষ নেই। এই অফুরন্ত চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ প্রকৃতির মধ্যে প্রাপ্ত অসংখ্য পদার্থকে সম্পদে রূপান্তরিত করে চলেছে। এ সব সম্ভব হচ্ছে সংস্কৃতির সৌজন্যে। কাল যা ছিল মানুষের কাছে অপ্রয়োজনীয় আজকে তার গুরুত্ব অসীম। আদিম মানুষের কাছে রবার গাছের আঠার (Latex) কোনো মূল্য ছিল না। সংস্কৃতির সহায়তায় রবার আজ অমূল্য সম্পদ। মাটির নীচের খনিজ পদার্থ এক সময় 'নিরপেক্ষ সামগ্রী' ছিল, আজ তা মানুষের কাছে অপরিহার্য সম্পদ। এইভাবে হাজার হাজার 'নিরপেক্ষ সামগ্রী' সংস্কৃতির স্পর্শে সম্পদে পরিণত হচ্ছে। এ সবই সম্পদের পরিমাণগত সম্প্রসারণ সূচিত করে।

সংস্কৃতির কল্যাণে সম্পদের উৎকর্ষ বা কার্যকারিতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্প বিপ্লবের প্রথম যুগে একটন লৌহ-আকরিক নিষ্কাশনের জন্য কয়লার প্রয়োজন হত প্রায় ৭ টন। বর্তমানে এক টন লৌহ-আকরিক নিষ্কাশনের জন্য এক টন কয়লাই যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে কয়লা সম্পদের উৎকর্ষ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়লা শুধু লৌহ ইস্পাত শিল্প বা তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নয় এর থেকে পাওয়া যায় নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থ, যার থেকে তৈরি হয় রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও আরও অনেক ধরনের উপকারী দ্রব্য। সংস্কৃতির উন্নতিকে কাজে লাগিয়ে কৃষিজমির উৎপাদন ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যে জমিতে বছরে একবার একটিমাত্র ফসল ফলানো হত সে জমিতে বর্তমানে বছরে তিনবার বা চারবার বিভিন্ন রকম ফসল ফলানো হচ্ছে। উচ্চফলনশীল বীজ, উন্নত সার, কার্যকরী কীটনাশক, আধুনিক যন্ত্রপাতি জলসেচের ব্যবহারে ফসলের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সংস্কৃতির উন্নতিতে মানুষের কর্মদক্ষতাও অনেক বেড়েছে। কম্প্যুটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করে একজন মানুষ একাই বহু মানুষের কাজ করে দিতে পারে। এ সবই হল সম্পদের গুণগত সম্প্রসারণ।

৩.৪.২ বাধার সংকোচন

সংস্কৃতির অপর প্রধান কাজ হল বাধার সংকোচন ঘটানো বা বাধাকে দূর করা। সম্পদ সৃষ্টির প্রধান অন্তরায় হল প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বাধা। প্রাকৃতিক বাধাগুলি হল বন্যা, খরা, ঝড়, ভূমিকম্প, বিষাক্ত কীটপতঙ্গ প্রভৃতি। সংস্কৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এ সব প্রাকৃতিক বাধাকে অনেকাংশে অতিক্রম করতে পেরেছে। বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা রূপায়িত করে নদীতে বন্যার প্রবণতা কমানো হয়েছে এবং নদীর অতিরিক্ত জলকে বাঁধের সাহায্যে ধরে রেখে সারা বছর ধরে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে, জলসেচ করে কৃষিজ ফসল ফলানো হচ্ছে, মাছ চাষ করা হচ্ছে। বন্যার মতো একটি ভয়ঙ্কর বাধাকে সম্পদে রূপান্তরিত করার কৃতিত্ব সংস্কৃতির। খরা, অনুর্বর মৃত্তিকা, ফসল বিনষ্টকারী কীটপতঙ্গ, ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক বাধা দূরীকরণে সংস্কৃতির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কেবল প্রাকৃতিক বাধা নয়, মানবিক বাধা দূরীভূত করার কাজও সংস্কৃতির। মানুষের অজ্ঞতা, ধর্মান্ধতা, নিবুর্দ্ধিতা, নিষ্ঠুরতা, অবৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ প্রভৃতি বাধা সম্পদ সৃষ্টির অন্তরায়। উন্নত সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ মানুষের ভিতর থেকে এ সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর হয়।

৩.৫ সংস্কৃতি ও কৃষি

অতীতে মানুষ পেশীশক্তি ও পশুশক্তির সাহায্যে কৃষিকাজ করত। তখন কৃষির জমিপিছু উৎপাদনশীলতা ছিল অত্যন্ত কম। যদিও জমির উর্বরতা শক্তি ছিল বেশি। সংস্কৃতির উন্নতির ফলে মানুষ বর্তমানে জৈবশক্তির (Animate energy) পরিবর্তে জড়শক্তি (Inanimate energy) ব্যবহার করছে। ফলে কৃষি ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ।

প্রথমত, জড়শক্তির প্রয়োগে কৃষিব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। ট্রাক্টর, হারভেস্টর, প্রভৃতি কৃষি যন্ত্রপাতির সাহায্যে কম সময়ে বহু জমি চাষ ও বহু জমি থেকে ফসল আহরণ করা হচ্ছে। রাসায়নিক সার, কীটনাশক দ্রব্য, উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার করে হেক্টর প্রতি পূর্বের তুলনায় অনেক গুণ বেশি ফসল ফলানো হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতির সহায়তায় অ-কর্ষিত জমিকে কৃষিজমিতে পরিণত করা হচ্ছে। বৃষ্টিপাতের অভাবে যেসব জমিতে কৃষিকাজ করা যেত না সেখানে কূপ, নলকূপ বা খালের সাহায্যে জলসেচ করে কৃষিকাজ করা হচ্ছে। রাজস্থানের উত্তরাংশে পূর্বে কৃষিকাজ সম্ভব ছিল না। ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনার শতদ্রু নদীর ওপর নির্মিত হারিকী

ব্যারাজ (Harikee Barrage) থেকে খাল কেটে বর্তমানে এ সব অঞ্চলে জলসেচ করা হচ্ছে এবং উন্নতমানের কৃষিজ ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে। বরফাবৃত তুন্দ্রা অঞ্চলে পাইপ লাইনে গরমজল পাঠিয়ে বরফ গলিয়ে গমচাষ করা হচ্ছে।

তৃতীয়ত, সংস্কৃতির উন্নতির ফলে কৃষি ফসলের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি ফসলকে বহুবিধ উপায়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। ধান থেকে চাল, খড় ছাড়াও বর্তমানে উৎপাদিত হচ্ছে তুষের তেল, খড় থেকে উৎপন্ন হচ্ছে কাগজ। পাট থেকে শুধু চটের থলে নয় উৎপাদিত হচ্ছে গালিচা, কার্পেট এমন কি বস্ত্র। আলু, আখ থেকে উৎপন্ন হচ্ছে অ্যালকোহল যা গাড়ির জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩.৬ সারাংশ

সংস্কৃতি ছাড়া মানুষ সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে না। সংস্কৃতির সাহায্যে মানুষ প্রাকৃতিক ও মানবিক বাধাসমূহ দূর করতে পারে। যে বস্তু পৃথিবীতে বহুদিন ধরে অব্যবহৃত হয়ে পড়েছিল সংস্কৃতির ছোঁয়ায় সেগুলি সম্পদে পরিণত হয়। অর্থাৎ মানুষের কাজে লাগে। এইভাবে বাধা ও নিরপেক্ষ সামগ্রীকে ক্রমাগত সম্পদে পরিণত করে সংস্কৃতি সম্পদের প্রসারণ ঘটায়। সংস্কৃতির হাত ধরে আসে উন্নত প্রযুক্তি। মানুষের অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গে কৃষিকাজের উন্নতিতে এই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

৩.৭ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী ঃ

১। সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিন। সংস্কৃতির কার্যাবলী আলোচনা করুন।

২। বাধার সংকোচন করে কীভাবে সংস্কৃতি সম্পদের প্রসারণ ঘটায়? ভারতের উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৩। উদাহরণসহ সম্পদের প্রসারণে সংস্কৃতির ভূমিকা আলোচনা করুন।

৪। সংস্কৃতি কীভাবে কৃষিকাজকে প্রভাবিত করে?

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Zimmermann E. W.–World Resources and Industries.

(২) Alexander E. W.–Economic Geography.

(৩) অনীশ চট্টোপাধ্যায়--বি. কম সম্পদ সমীক্ষা।

(৪) তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌতম মল্লিক--অর্থনৈতিক সম্পদ সমীক্ষা।

একক ৪ ❑ সম্পদরূপে ভূমি (Land as Resource)

সভ্য মানুষের কাছে ভূমি এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদরূপে বিবেচিত। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির প্রয়োজনীয়তা মানুষের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠল। আদিম মানুষের কাছে ভূমি ছিল মানুষের দুই জীবিকা কৃষিকার্য ও পশুপালনের অবলম্বন। মানুষের উদ্ভাবিত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের ফলে দ্বি-মাত্রিক ভূমি পরিণত হল ত্রি-মাত্রিক ভূমিতে। ভূমির উপরিভাগকে অবলম্বন করে শুধু কৃষিকার্য ও পশুপালন নয়, ভূমির গভীর থেকে মানুষ আহরণ করতে শিখল অগণিত খনিজ সম্পদ। ভূমির উপরিভাগের প্রকৃতিদত্ত বনভূমিকেও মানুষ পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে শিখল, আর এসব কৃষিজ, খনিজ ও বনজ সম্পদের সহায়তায় মানুষ গড়ে তুলল নানাপ্রকার শিল্পকারখানা। দেখা দিল কৃষি ও শিল্পের সমারোহ, যা সূচিত করল অভাবনীয় কর্মকাণ্ডের।

একক ৪ (ক) ❑ ভূমি প্রকৃতির প্রধান অভিব্যক্তি

গঠন

৪(ক).১ উদ্দেশ্য
৪(ক).২ প্রস্তাবনা
৪(ক).৩ ভূমি প্রকৃতির প্রধান অভিব্যক্তি
৪(ক).৪ দ্বি-মাত্রিক ও ত্রি-মাত্রিক ভূমির ধারণা
৪(ক).৫ ভূমির ব্যবহারের ধরন
৪(ক).৬ ভূমি ও কৃষিকার্য
৪(ক).৭ ভূমির কৃষিযোগ্যতা
    ৪(ক).৭.১ ভূমির কৃষিযোগ্যতার প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতা
    ৪(ক).৭.২ ভূমির কৃষিযোগ্যতার সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতা
৪(ক).৮ সারাংশ
৪(ক).৯ অনুশীলনী
৪(ক).১০ উত্তর সংকেত

৪ (ক).১ উদ্দেশ্য

প্রকৃতির দান ভূমি হল একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। তাই ভূমির কাম্য ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন।

- ভূমির ব্যবহার।
- ভূমির কৃষিযোগ্যতা।

৪ (ক).২ প্রস্তাবনা

প্রকৃতির অন্যতম উপাদান ভূমি এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। ভূমি প্রকৃতির প্রধান অভিব্যক্তি। ভূমি সম্পর্কে মানুষের ধারণা কালক্রমে পরিবর্তিত হয়েছে। মানুষের উদ্ভাবিত প্রযুক্তিবিদ্যার ফলে দ্বি-মাত্রিক ভূমি পরিণত হয়েছে ত্রি-মাত্রিক ভূমিতে। ভূমির উপরিভাগে কৃষিকার্য ও পশুপালন ছাড়া ভূমির গভীর থেকে মানুষ আহরণ করতে শিখল অগণিত খনিজ সম্পদ। আর এ-সব খনিজ সম্পদের সহায়তায় মানুষ গড়ে তুলল নানাপ্রকার শিল্পকারখানা, যা সূচিত করল এক অভাবনীয় কর্মকাণ্ডের।

৪(ক).৩ ভূমি প্রকৃতির প্রধান অবিব্যক্তি (Land, a Major Manifestation of Nature)

প্রকৃতির প্রধান দানগুলির মধ্যে একটি হল ভূমি বা মাটি। মাটির ওপর নির্ভর করে সমস্ত জীবকুল ও উদ্ভিদকুল বেঁচে আছে। উদ্ভিদ ছাড়া কোনও জীব বা প্রাণী সরাসরি খাদ্য তৈরি করতে পারে না। খাদ্যের জন্য সবাইকে উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করতে হয়। উদ্ভিদ খাদ্য তৈরির জন্য মাটি থেকে জল বা খনিজ লবণ সংগ্রহ করে। সুতরাং বলা যায় সমস্ত জীব ও প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য মাটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মাটিতে জলীয় উপাদান ও খনিজ পদার্থ ঠিকমতো না থাকলে উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। অনুর্বর মৃত্তিকাতে মানুষ চাষাবাদ বা বৃক্ষরোপণ করতে পারে না। সেজন্য অনুর্বর মৃত্তিকা অঞ্চলে মানুষের বসবাস তেমন নেই। পৃথিবীর উর্বর মৃত্তিকা অঞ্চলে ঘন জনবসতি লক্ষ্য করা যায়। নদী বা হ্রদের উপকূলে উর্বর ও আর্দ্র মৃত্তিকা থাকার জন্য মানুষ সহজে খাদ্য উৎপাদন করতে পারে, ফলে এসব অঞ্চলে জনঘনত্ব বৃদ্ধি পায়।

৪(ক).৪ দ্বি-মাত্রিক (Two Dimensional) ও ত্রি-মাত্রিক (Three Dimensional) ভূমির ধারণা

পূর্বে মানুষের কাছে সমস্ত ভূমি ছিল দ্বি-মাত্রিক। তারা কেবল মাটির উপরিভাগ ব্যবহার করত। চাষ-আবাদ, গৃহনির্মাণ, ঘরবাড়ি তৈরির কাজে জমির উপরিতল ব্যবহৃত হত। জমির উপরিতল পরিমাপের জন্য কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ--এই দুটি দিক বিবেচনা করা হয়, অর্থাৎ জমির ক্ষেত্রফল পরিমাপ করা হয়। এই দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সম্বলিত জমিকে বলা হয় **দ্বি-মাত্রিক জমি** (Two Dimensional Land)। যে জমির কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের দিক ব্যবহার করা হয়, তাকে দ্বি-মাত্রিক জমি বলা হয়। বর্গমিটার বা বর্গফুটে এসব জমির পরিমাপ করা হয়।

দ্বিমাত্রিক জমি = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ।

ত্রিমাত্রিক জমি (Three Dimensional Land) বলতে জমির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতাকে বোঝায়। বর্তমানে জমির কেবল উপরিতল ব্যবহৃত হয় না, জমির নিম্ন অংশও ব্যবহৃত হয়। জমির নিচ থেকে প্রচুর ধাতব, অধাতব খনিজ, খনিজ তেল ও অন্যান্য জ্বালানি প্রচুর পরিমাণে উত্তোলন করা হয়। সুতরাং জমি বর্তমানে শুধু চাষবাস, বনজ সম্পদ উৎপাদন ও পশুপালনের জন্য ব্যবহৃত হয় না, জমির নীচের খনিজ পদার্থের জন্য জমির ব্যবহার বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন জমিকে শুধু দৈর্ঘ্য প্রস্থের দিকে নয় একে গভীরতার দিকেও পরিমাপ করা হয়। এই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা সম্বলিত জমিকে বলা হয় ত্রিমাত্রিক জমি। এ ক্ষেত্রে জমির ক্ষেত্রফল নয় আয়তন দেখা হয়, একে ঘনমিটার বা ঘনফুটে পরিমাপ করা হয়। মরুভূমি অঞ্চলের জমিতে কৃষিকাজ বা পশুপালন করা দুঃসাধ্য

তাই এই জমি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। কিন্তু এসব জমিতে যদি খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত হয় তবে এর গুরুত্ব হাজারগুণ বৃদ্ধি পায় এবং এসব জমি বহু মূল্যবান জমিতে পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের মরুভূমির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত হওয়ার পর এ অঞ্চলে জনবসতি গড়ে উঠেছে ও অর্থনৈতিক কাজকর্ম বৃদ্ধি পেয়েছে।

ত্রিমাত্রিক জমি = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × গভীরতা।

৪(ক).৫ ভূমির ব্যবহারের ধরন (Land-use Pattern)

মানুষের কাছে ভূমির ব্যবহার নানাবিধ। কৃষিকাজ, পশুপালন, মৎস্যচাষ, বনভূমি, বাসস্থান, শিল্প-কারখানা স্থাপন, পরিবহন প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে মানুষ ভূমিকে ব্যবহার করে। আগে ভূমিভাগের অধিকাংশ অংশ ছিল বনাবৃত। বনভূমি থেকে মানুষ তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করত। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজে চাষ করতে শিখল। প্রয়োজন হল ফাঁকা জমির। সেদিন থেকে বনাঞ্চল ক্রমশ পরিণত হতে লাগল কৃষিজমিতে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বনাঞ্চল, মরুঅঞ্চল ও পতিত জমি ক্রমশ কৃষিজমিতে পরিণত হচ্ছে। পরিবহন, বাসস্থান ও শিল্প স্থাপনের জন্য জমির ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মরুঅঞ্চলে জলের অভাবে এবং মেরুঅঞ্চল বরাফাবৃত থাকায় ভূমির ব্যবহার তেমনভাবে হয় না। নিম্নে সারণিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভূমি ব্যবহারের একটি ধারণা দেওয়া হল।

সারণি

ভূমির ব্যবহার

দেশ	মোট জমি (বর্গ কিমি)	কৃষিজমি (শতাংশ)	পশুচারণ ভূমি (শতাংশ)	বনভূমি (শতাংশ)	বাসস্থান নির্মাণ শিল্প-কারখানা স্থাপন ও অন্যান্য ব্যবহার এবং অব্যবহার্য ভূমি
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৯১,৫৮,৯৬০	১৯	২৫	৩০	২৬
কানাডা	৯২,২০,৯৭০	৫	৩	৫৪	৩৮
রাশিয়া	১,৬৯,৯৫,৮০০	৮	৪	৪৬	৪২
জাপান	৩,৭৪,৭৪৪	১১	২	৬৭	২০
যুক্তরাষ্ট্র	২,৪১,৫৯০	২৫	৪৬	১০	১৯
ব্রাজিল	৮৪,৫৬,৫১০	৫	২২	৫৮	১৫
অস্ট্রেলিয়া	৭৬,১৭,৯৩০	৬	৫৪	১৯	২১
ভারত	২৯,৭৩,১৯০	৫৬	৪	২৩	১৭
পৃথিবী	১৪,৮৯,৪০,০০০	১০	২৬	৩২	৩২

উৎস ঃ The World Factbook, 1999.

৪(ক).৬ ভূমি ও কৃষিকার্য

ভূমি ছাড়া কৃষিকার্য সম্ভব নয়। জমির উর্বরতা বা কৃষিযোগ্যতার ওপর ফসলের উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে। মাটিতে উদ্ভিদের গ্রহণের উপযোগী খনিজ পদার্থ ও জল নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকলে তবেই চাষাবাদ সম্ভব। মাটিতে প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের উপস্থিতি মাটিতে উর্বরতা বৃদ্ধি করে। নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, সালফার, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি খনিজ পদার্থ ও জৈব-রসায়ন প্রয়োজন অনুসারে থাকলে জমিতে শস্য ভালো জন্মায়। মাটিতে জলধারণ ক্ষমতা উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফসল উৎপাদনে বিশেষ সহায়তা করে। বেলে মাটির জলধারণ ক্ষমতা কম বলে এই মাটিতে সহজে চাষ করা যায় না। কাদামাটি ও কৃষ্ণ মৃত্তিকার জলধারণ ক্ষমতা বেশি হওয়ায় এসব মাটিতে ধান, পাট, তুলা গম ও অন্যান্য ফসল ভালো জন্মায়।

৪(ক).৭ ভূমির কৃষিযোগ্যতা (Cultivability of Land)

চাষ-আবাদ শুরু প্রথম যুগ থেকে ভূমির কৃষিযোগ্যতা বা ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আগে এক হেক্টর জমিতে যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হত বর্তমানে ঐ একই পরিমাণ জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ অনেক বেশি। আগে একটা জমি বছরে একবার একটি ফসল চাষ করা হত। বর্তমানে একই জমিতে বছরে দু'বার, তিনবার বা আরও বেশিবার বিভিন্ন ফসল চাষ করা হচ্ছে। পৃথিবীর সবদেশে বা একটি দেশের সমস্ত অঞ্চলে ভূমির কৃষিযোগ্যতা বা ফসলের উৎপাদনশীলতা সমান নয়। ভূমির কৃষিযোগ্যতা নির্ভর করে কয়েকটি প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের ওপর।

৪(ক)৭.১ ভূমির কৃষিযোগ্যতার প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতা (Physical Factors Limiting Cultivability)

কৃষির প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতাগুলি হল তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, মৃত্তিকা ও ভূ-প্রকৃতি। এই চারটি বিষয়কে একসঙ্গে **কৃষির প্রাকৃতিক চতুঃসীমা** (Four Physical Frontiers of Cultivability) বলা হয়।

(১) **তাপমাত্রা (Temperature)** ঃ উদ্ভিদের জন্মলাভ ও বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পরিমিত তাপমাত্রা। খুব কম তাপমাত্রাযুক্ত অঞ্চলে যেমন উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না খুব বেশি তাপমাত্রাযুক্ত অঞ্চলেও উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। দেখা গেছে ১০° সেলসিয়াসের কম তাপমাত্রাযুক্ত অঞ্চলে উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না, তাই কৃষিকাজ সম্ভব হয় না। তুন্দ্রা অঞ্চলে কৃষিকাজ কষ্টসাধ্য। এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকাল স্বল্পস্থায়ী। স্বল্পকালীন গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পেলে কিছু কিছু নিকৃষ্টশ্রেণীর দানাশস্য চাষ করা হয়। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে থাকলে ভূমিভাগ বরফাবৃত হয়ে থাকে, ফলে কৃষিকাজ সম্ভবপর হয় না। বিভিন্ন ফসলের জন্য তাপমাত্রাও বিভিন্ন রকমের প্রয়োজন। কম তাপমাত্রায় গমের চাষ ভালো হয়, কিন্তু ধানচাষের জন্য প্রয়োজন মোটামুটি মাঝারি বা উচ্চ তাপমাত্রা।

(২) **আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত (Moisture and Rainfall)** ঃ উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধির জন্য মাটিতে জলের উপস্থিতি ও বাতাসে জলীয়বাষ্পের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, কুয়াশা, শিশির প্রভৃতি মাটি এবং বাতাসে আর্দ্রতা বৃদ্ধি করে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারাবছর ধরে বৃষ্টি হয় তাই মাটির আর্দ্রতা ও বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি। তাই এই অঞ্চলে উদ্ভিদ বেশ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং বনভূমির ঘনত্ব বেশি। মরু অঞ্চলে জলের অভাবে গাছপালা জন্মাতে পারে না। স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম

ফসল জন্মায়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৫০-১০০ সেমি. হলে গম, তুলা, আলু ভালো জন্মায়, আবার বৃষ্টিপাত ১০০ থেকে ২০০ সেমি. হলে ধান, পাট, ইক্ষু চাষের সুবিধা হয়। ২০০ সেমির বেশি বৃষ্টিপাত অঞ্চলে কফি, কোকো, রাবারের চাষ হয়।

(৩) **মৃত্তিকা (Soil) ঃ** মাটির গ্রথন বা বুনন (texture), মাটিতে জৈব ও রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি ফসল উৎপাদনের ওপর প্রত্যক্ষ বিস্তার করে। মাটির জলধারণ ক্ষমতা নির্ভর করে তার গ্রথনের ওপর। বেলেমাটির তুলনায় এঁটেল মাটি ও দোঁয়াশ মাটির জলধারণ ক্ষমতা বেশি তাই এঁটেল ও দোঁয়াশ মাটিতে ফসল ভালো জন্মায়। যে মাটিতে নাইট্রোজেন (N), ফসফরাস (P) ও পটাসিয়াম (K) উপযুক্ত পরিমাণে থাকে সে মাটি বেশ উর্বর ও তার কৃষিযোগ্যতা অধিক। নদীবিধৌত সমভূমি অঞ্চলের পলিমাটিতে ফসল ভালো জন্মায়।

(৪) **ভূমিরূপ (Landform) ঃ** পার্বত্যভূমি, মালভূমি ও সমভূমি এই তিন রকমের ভূমিরূপে মধ্যে সমভূমির কৃষিযোগ্যতা সর্বাধিক। সমভূমিতে জল দাঁড়াতে পারে তাই ধান, পাট, ইক্ষু ভালো জন্মায়। ঈষৎ ঢালযুক্ত সমতলভূমিতে গম, কার্পাস, ভুট্টা জন্মায়। পৃথিবীর অধিকাংশ সমভূমি নদীর পলিমাটি দ্বারা গঠিত তাই বেশ উর্বর এবং কৃষিকাজে উন্নত। মালভূমি বা পার্বত্যভূমি কৃষিকাজের উপযোগী নয়। তবে কিছু কিছু ফসল কেবল খাড়া ঢালযুক্ত উচ্চভূমিতে চাষ করা হয়; যেমন--চা, কফি, কোকো, কমলালেবু, আপেল প্রভৃতি। পার্বত্য অঞ্চলে ধাপ কেটে কেটে দানাশস্য ও অন্যান্য খাদ্যফসলের চাষ হয়।

৪(ক).৭.২ ভূমির কৃষিযোগ্যতার সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতা (Cultural Factors Limiting Cultivability)

কৃষিকার্যের প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতা ছাড়াও কতকগুলি সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতা আছে। কৃষির প্রাকৃতিক বিষয়গুলি ঠিকমতো পাওয়া গেলেও অ-প্রাকৃতিক বিষয়গুলির জন্য ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। কৃষিকাজের এই মনুষ্যসৃষ্ট সীমাবদ্ধতাগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) **অন্য কাজে ভূমির ব্যবহার ঃ** কৃষিযোগ্য জমিকে কৃষিকাজে ব্যবহার করে বসতবাড়ি নির্মাণ, শিল্পস্থাপন, নগর স্থাপন, রেলপথ, সড়কপথ নির্মাণ, বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করা হয়। এতে জমির কৃষিযোগ্যতা বিনষ্ট হয়। জনসংখ্যার ওপর কৃষিযোগ্য জমির হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে। জনসংখ্যা বেশি হলে একদিকে যেমন বাসস্থান ও অন্যান্য কাজে কৃষিজমি বিনষ্ট হয় অপরদিকে কৃষিপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় পতিত জমিকে কৃষিজমিতে রূপান্তরিত করা হয়। জনসংখ্যা কম থাকলে কৃষিপণ্যের চাহিদা কম থাকে, ফলে কৃষিযোগ্য জমিতে পশুপালন বা অন্যান্য কাজ করা হয়। যেমন আর্জেন্টিনা ও অস্ট্রেলিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে পশুপালন প্রাধান্য লাভ করেছে।

(২) **বিশেষ বিশেষ কৃষিপণ্যের চাহিদা ঃ** মানুষের চাহিদা অনুযায়ী জমিতে ফসলের চাষ করা হয়। এ ক্ষেত্রে একটি শস্য অপরটির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেয়। যে জমিতে ভালো তুলা জন্মাতে পারে সেখানে কোনও কোনও ক্ষেত্রে মানুষের চাহিদার কথা মাথায় রেখে গমচাষ করা হয়। দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র উপকূলবর্তী সমভূমিতে ইক্ষুর উৎপাদনশীলতা বেশি হলেও এসব জমিতে ধান ও অন্যান্য ফসল চাষ করা হয়। আর্জেন্টিনার তৃণভূমি গমচাষের উপযোগী কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে মাংসের চাহিদা অধিক থাকায় এ অঞ্চলে মাংসপ্রদায়ী গবাদি পশুর চাষ বেশি করা হয়।

(৩) **কৃষি পদ্ধতি ঃ** ইউরোপ ও আমেরিকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগে হেক্টর-পিছু কৃষিপণ্যের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষিণ, এশিয়া, লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার দেশগুলিতে আদিম কৃষিপদ্ধতি ব্যবহার করে কৃষিপণ্যের উৎপাদন তেমনভাবে বাড়েনি। উন্নত দেশে জলসেচ, উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বীজশোধন করে, শস্যাবর্তন পদ্ধতি কাজে লাগিয়েও ফসল উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে। তুন্দ্রা অঞ্চলে ভারনালাইজেশন (Vernalisation) পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে পাকার উপযোগী গমচাষ করা সম্ভব হচ্ছে।

(৪) **শক্তির ব্যবহার ঃ** অনুন্নত দেশে এখনও পশুশক্তি ও পেশীশক্তি অর্থাৎ জৈবশক্তির সাহায্যে কৃষিকাজ করা হয়। বলদ, মহিষ প্রভৃতি পশুকে কাজে লাগিয়ে কৃষিশ্রমিকের দৈহিক শ্রমের সাহায্যে কৃষিকাজ করা হয়। উন্নত দেশে কৃষির যান্ত্রীকরণ ঘটেছে। জৈবশক্তির বদলে ব্যবহৃত হচ্ছে জড়শক্তি। বলদে টানা লাঙ্গলের পরিবর্তে ট্রাক্টর ব্যবহার করা হচ্ছে। যন্ত্র ব্যবহারের ফলে একজন শ্রমিক অনেক বেশি জমি চাষ করতে পারে। এতে কৃষির উৎপাদনশীলতা বা ভূমির কৃষিযোগ্যতা বাড়ে ও উৎপাদন ব্যয় অনেক কম পড়ে।

৪(ক).৮ সারাংশ

মানুষের কাছে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ তার সবরকম অর্থনৈতিক কাজ ভূমির সাহায্যেই করে থাকে। খাদ্য উৎপাদন, গৃহনির্মাণ, খনিজ পদার্থ সংগ্রহ, শিল্পস্থাপন, বনজসম্পদ সংগ্রহ সবই নির্ভর করে ভূমির ওপর। পূর্বে মানুষ কীভাবে ভূমির ব্যবহার করত আর এখন কীভাবে ভূমির ব্যবহার হচ্ছে তা এই এককে আলোচনা করা হয়েছে। পৃথিবীর কত পরিমাণ ভূমি কৃষিকাজে, কত পরিমাণ বনভূমি ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয় তা দেখানো হয়েছে।

সব জমিতে চাষবাস করা যায় না কেন এবং সর্বত্র একই শস্যের চাষ হয় না কেন তা আলোচিত হয়েছে। কৃষির উৎপাদনে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতাসমূহ এই এককে বর্ণিত হয়েছে।

৪(ক).৯ অনুশীলনী

তত্ত্বগত প্রশ্নাবলী ঃ

১। দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক ভূমি বলতে কী বোঝায় উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

২। ভূমির কৃষিযোগ্যতা কোন কোন প্রাকৃতিক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে? বিভিন্ন শস্যের উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা করুন।

৩। কৃষির সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতাগুলো কী কী? এগুলো কিভাবে কোন শস্যচাষকে প্রভাবিত করে?

বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী ঃ

৪। **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) দ্বিমাত্রিক জমি =—×—

(খ) ত্রিমাত্রিক জমি=—×—×—

(গ) মেরু অঞ্চল—থাকায় কৃষিকাজ হয় না।

(ঘ) —মাটির জলধারণ ক্ষমতা কম।

(ঙ) এশিয়ার তুলনায় ইউরোপের দেশগুলোতে কৃষির উৎপাদনশীলতা—।

(চ) বর্তমানে কৃষিতে —শক্তির তুলনায়—শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪(ক).১০ উত্তর সংকেত

(ক) দৈর্ঘ্য×প্রস্থ

(খ) দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×গভীরতা

(গ) বরফাবৃত

(ঘ) বেলে

(ঙ) অধিক

(চ) জৈব, জড়।

একক ৪(খ) ❑ বিশ্বের প্রধান প্রধান কৃষিপদ্ধতি

গঠন

৪(খ).১ উদ্দেশ্য

৪(খ).২ প্রস্তাবনা

৪(খ).৩ বিশ্বের কৃষি-পদ্ধতির বিভাগ

৪(খ).৪ জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষি ও এর বৈশিষ্ট্য

৪(খ).৪.১ জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষি অঞ্চল

৪(খ).৪.২ জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষির ভবিষ্যৎ

৪(খ).৫ প্রগাঢ় জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষি ও এর বৈশিষ্ট্য

৪(খ).৫.১ প্রগাঢ় জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষি অঞ্চল ও এর ভবিষ্যৎ

৪(খ).৬ মিশ্রকৃষি ও এর বৈশিষ্ট্য

৪(খ).৬.১ মিশ্রকৃষি অঞ্চল

৪(খ).৬.২ মিশ্রকৃষির গুরুত্ব

৪(খ).৭ বাণিজ্যিক দানাশস্য কৃষি

৪(খ).৭.১ বাণিজ্যিক দানাশস্য কৃষির বৈশিষ্ট্য

৪(খ).৮ ভূমধ্যসাগরীয় কৃষি

৪(খ).৮.১ ভূমধ্যসাগরীয় কৃষির বৈশিষ্ট্য

৪(খ).৮.২ ভূমধ্যসাগরীয় কৃষি-অঞ্চল

৪(খ).৮.৩ ভূমধ্যসাগরীয় কৃষির প্রধান ফসল

৪(খ).৯ বাগিচা-কৃষি

৪(খ).৯.১ বাগিচা-কৃষির বৈশিষ্ট্য

৪(খ).৯.২ বাগিচা-কৃষি অঞ্চল

৪(খ).৯.৩ বাগিচা-কৃষির প্রধান ফসল

৪(খ).১০ ভন থুনেন-এর কৃষিজমি ব্যবহার মডেল

৪(খ).১০.১ ভন থুনেন-এর মডেলের সমালোচনা

৪(খ).১০.১ ভন থুনেন-এর মডেলের গুরুত্ব

৪(খ).১১ সারাংশ

৪(খ).১২ অনুশীলনী

৪(খ).১৩ উত্তর সংকেত

৪(খ).১ উদ্দেশ্য

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পদ্ধতিতে কৃষিকার্য হয়। কোনও কোনও অঞ্চলে আদিম কৃষিপদ্ধতি বজায় রাখলেও বর্তমানে কৃষি পদ্ধতিতে বিশেষ উন্নতি লক্ষ্য করা যাবে। এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন–

- বিভিন্ন ধরনের কৃষি পদ্ধতি,
- ভন থুনেন-এর কৃষিজমি ব্যবহার সম্পর্কিত তত্ত্ব।

৪(খ).২ প্রস্তাবনা

কৃষি হল মানুষের প্রাচীনতম জীবিকার অন্যতম। বিবর্তনের ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিশ্বের কৃষি-পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়েছে নানা পরিবর্তন। প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কৃষি-পদ্ধতি প্রচলিত। এ-সব কৃষি-পদ্ধতির আলোচনা কৃষি সম্পর্কে মানুষের মনে সম্যক ধারণা সৃষ্টির সহায়ক হবে।

৪(খ).৩ বিশ্বের কৃষি-পদ্ধতির বিভাগ

মানুষের প্রাথমিক ও প্রধান অর্থনৈতিক কার্যকলাপ হল কৃষিকাজ। বিশ্বের সর্বত্র কৃষিকাজ একইরকমভাবে হয় না। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের কৃষিকাজ দেখা যায়। ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের কৃষি পদ্ধতিকে প্রধানত ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। যথা--(১) জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষি, (২) প্রগাঢ় জীবিকা ভিত্তিক কৃষি, (৩) বাণিজ্যিক কৃষি, (৪) মিশ্রকৃষি, (৫) ভূমধ্যসাগরীয় কৃষি ও (৬) বাগিচা কৃষি। কৃষিজমির পরিমাণ ও জনসংখ্যা অনুসারে কৃষি-পদ্ধতি প্রধানত দু-রকমের--(১) প্রগাঢ় কৃষি ও (২) ব্যাপক কৃষি।

নিম্নে কয়েকটি কৃষিপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

কৃষি-পদ্ধতি

- ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ অনুসারে
  - (১)(২) জীবিকাসত্তা ভিত্তিক কৃষি
  - (৩) প্রগাঢ় জীবিকা সত্তাভিত্তিক কৃষি
  - (৪) বাণিজ্যিক দানাশস্য কৃষি
  - (৫) মিশ্র কৃষি
  - (৬) ভূমধ্যসাগরীয় কৃষি
  - (ক) বাগিচা কৃষি
- কৃষিজমির পরিমাণ ও জনসংখ্যা অনুসারে
  - (খ) প্রগাঢ় কৃষি
  - ব্যাপক কৃষি

৪(খ).৪ জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষি (Subsistence Farming)

কৃষকদের নিজেদের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় ফসল উৎপাদনের জন্য অনেক ক্ষেত্রে বনভূমি পরিষ্কার করে অথবা অগ্নি-সংযোগে বনভূমি বিনাশ করে আদিম অনুন্নত প্রথায় যে কৃষিকার্য করা হয় তাকে জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষি বলা হয়। এ ধরনের কৃষিতে ফসলের কোনও উদ্বৃত্ত থাকে না।

এ ধরনের কৃষি মালয়শিয়া-র 'লাদাং' ('Ladang') ও 'ওরাং-আসলি' ('Orang Asli); ল্যাটিন আমেরিকার আমাজন অববাহিকায় 'মিলপা' ('Milpa') 'রোকা' ('Roka'); শ্রীলঙ্কায় 'চেনা' ('Chena') ও ইন্দোনেশিয়ার সারাওয়াক-এ 'ইবান' ('Iban') নামেই অধিক পরিচিত।

বিশ্বের যে সমস্ত অঞ্চলে জনঘনত্ব বেশি, কৃষি জমির পরিমাণ কম এবং কৃষি ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ কম সে সব অঞ্চলে জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষিপদ্ধতি প্রচলিত। এ ধরনের কৃষিপদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ

(ক) কৃষিকাজ প্রধানত **প্রকৃতিনির্ভর**। প্রাকৃতিক বৃষ্টিপাত ও মৃত্তিকার স্বাভাবিক উর্বরাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ফসল উৎপাদন করা হয়। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে ফসল উৎপাদন প্রায়শই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(খ) জনসংখ্যা অধিক হওয়ার দরুন মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ খুব কম এবং জমির ওপর চাপ অত্যন্ত বেশি। মাথাপিছু ফসল উৎপাদনের পরিমাণও অল্প।

(গ) কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগ প্রায় নেই বললেই চলে। পুরানো কৃষিপদ্ধতি যেমন পশুতে টানা লাঙ্গল, কোদাল, কাস্তে প্রভৃতি উপকরণের সাহায্যে কৃষিকাজ করা হয়।

(ঘ) রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার তেমনভাবে নেই, তাই হেক্টর পিছু ফসল উৎপাদন অত্যন্ত কম।

(ঙ) কৃষিপণ্যের উৎপাদন ব্যয় বেশি। কৃষিপণ্য বাজারে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করা হয় না বলে উৎপাদন ব্যয় কমানোর প্রচেষ্টা থাকে না।

(চ) এই পদ্ধতিতে সাধারণত খাদ্যশস্য যেমন--গম, ধান ও নিকৃষ্ট দানাশস্য চাষ করা হয়।

(ছ) কৃষিশ্রমিকরা নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, রুগ্ন ও ঈশ্বরবিশ্বাসী। দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী। এদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশি।

(জ) এ ধরনের কৃষিকাজ অবৈজ্ঞানিক উপায়ে করা হয় বলে পরিবেশের অবনমন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বনভূমি ধ্বংস, ভূমিক্ষয়, ভূমির উর্বরতা হ্রাস প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।

(ঞ) জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষিপদ্ধতি সাধারণত একফসলী। বছরে একটা জমিতে একবারই ফসল উৎপাদন করা হয়। যেহেতু কৃষিকাজ বৃষ্টিনির্ভর সেহেতু বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে কৃষিকাজ করা হয় না।

৪(খ).৪.১ জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষি অঞ্চল

বিশ্বের অধিকাংশ কৃষিনির্ভর দেশে জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষিকাজ করা হয়। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ যেমন ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান, মায়ান্মার, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াতে এই পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করা হয়। আফ্রিকার ক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশসমূহে যেমন মিশর, সুদান,

ইথিওপিয়া, কেনিয়াতে এবং ল্যাটিন আমেরিকার আমাজন অববাহিকায় জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষিকাজ প্রচলিত আছে।

৪(খ).৪.২ জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষির ভবিষ্যৎ

জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষিব্যবস্থা ক্রমশ অবলুপ্ত হয়ে চলেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে, জৈবশক্তির পরিবর্তে জড়শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটছে। জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষি অঞ্চলে ক্রমশ আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নত বীজ ও রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও উন্নত পদ্ধতি প্রয়োগ করে কৃষিফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো হচ্ছে। কৃষির প্রাকৃতিক নির্ভরতা কমিয়ে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই কৃষিপদ্ধতি ক্রমশ উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে অর্থাৎ প্রাচীন জীবিকাভিত্তিক কৃষি প্রগাঢ় বা নিবিড় জীবিকাভিত্তিক কৃষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

৪(খ).৫ প্রগাঢ় জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষি ও এর বৈশিষ্ট্য (Intensive subsistence Agriculture)

যে পদ্ধতিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করে জীবনধারণ ও জীবিকার জন্য কৃষিকাজ করা হয় তাকে বলা হয় প্রগাঢ় বা নিবিড় জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষি। যে সকল অঞ্চলে জনসংখ্যা অত্যন্ত বেশি এবং অনুপাতে কৃষিজমির পরিমাণ কম সেখানে অত্যধিক শ্রম বিনিয়োগ করে এই ধরনের কৃষিকাজ করা হয়। একে শ্রম-নিবিড় কৃষিও বলা চলে।

এই কৃষিপদ্ধতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ

(ক) জনঘনত্ব বেশি ও কৃষিজমির পরিমাণ কম হওয়ায় জমির ওপর চাপ অত্যন্ত বেশি।

(খ) কৃষিশ্রমিক সহজলভ্য ও কৃষিকাজ শ্রমনিবিড়। একই জমিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রমিক নিযুক্ত থাকে। ছদ্ম বেকারত্ব (Disguised unemployment) এই অঞ্চলের এক প্রধান সমস্যা।

(গ) জনসংখ্যার অধিকাংশ কৃষিনির্ভর। শিল্পের তেমন উন্নতি না হওয়ায় কৃষি ছাড়া অন্য কাজের সুযোগ নেই বললেই চলে।

(ঘ) কৃষিশ্রমিকের যোগান বেশি তাই মজুরি কম।

(ঙ) কৃষিপণ্যের মাথাপিছু উৎপাদন স্বল্প।

(চ) কৃষিতে জলসেচ, কৃষি যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ, উচ্চফলনশীল বীজ ইত্যাদি আধুনিক কৃষিপদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়।

(ছ) পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিভক্ত হওয়ায় কৃষিজমির আকার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে পড়ে, ফলে জমিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

(জ) খাদ্যফসল যেমন ধান ও গমের চাষের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(ঝ) উন্নয়নশীল দেশে জৈব ও জড়শক্তির সহাবস্থান পরিলক্ষিত হয়।

(ঞ) বহুফসলী। একই জমিতে বছরে দুটো বা তার অধিক ফসল ফলানো হয়। অর্থাৎ কৃষি-জমি দ্বিফসলী বা

৪(খ).৫.১ প্রগাঢ় জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষি অঞ্চল ও এর ভবিষ্যৎ

পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রগাঢ় জীবিকাভিত্তিক কৃষিপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পূর্ব এশিয়ার চীন, জাপান, দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মায়ানমার-এর জনবসতি ঘন। এদের মধ্যে জাপান ছাড়া অন্যান্য দেশ মূলত কৃষিনির্ভর। এই দেশগুলির জাতীয় আয়ের সিংহভাগ আসে কৃষি থেকে। ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে প্রগাঢ় জীবিকাসত্তাভিত্তিক চাষের পাশাপাশি অনেক অঞ্চলে প্রাচীন জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষিপদ্ধতি চালু আছে। বিপুল জনসংখ্যার খাদ্যসমস্যা মেটাতে একই জমিতে বছরে অনেকবার চাষ করা হয়। কৃষি প্রগাঢ় পদ্ধতির প্রচলনের ফলে দেশগুলি খাদ্যশস্য মোটামুটি স্বনির্ভর। এই দেশগুলিতে প্রাচীন জীবিকাভিত্তিক কৃষি ক্রমশ লোপ পাচ্ছে এবং নিবিড় জীবিকাভিত্তিক কৃষিপদ্ধতি চালু হচ্ছে।

৪(খ).৬ মিশ্র কৃষি ও এর বৈশিষ্ট্য (Mixed Farming)

শিল্পাঞ্চলে জনগণের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে একই জমিতে ফসল উৎপাদন ও পশুপাখি পালন করা হয়। এরকম কৃষিপদ্ধতিকে বলা হয় মিশ্রকৃষি। মিশ্রকৃষি পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য, পশুখাদ্য, শকসব্জি, দুধ, ডিম, মাংস, পশম ইত্যাদি উৎপাদন করা হয়। গম, ভুট্টা চাষের সঙ্গে সঙ্গে হাঁস, মুরগি, গবাদিপশু ও শূকর চাষ চলে। মিশ্রকৃষি পদ্ধতি হল জীবিকাভিত্তিক ও বাণিজ্যিক কৃষিপদ্ধতির মাঝামাঝি একটি কৃষিব্যবস্থা। এই কৃষিপদ্ধতির প্রধান **বৈশিষ্ট্যসমূহ** হল ঃ

(ক) শহরাঞ্চল ও শিল্পাঞ্চল যেখানে জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব অধিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত সেসব অঞ্চলে মিশ্রকৃষির প্রচলন আছে।

(খ) কৃষিতে জলসেচ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি কীটনাশক ও জৈবসার প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ করা হয়।

(গ) এই ধরনের কৃষিতে শস্যাবর্তন পদ্ধতি, অর্থাৎ এক এক বছরে এক একটি ফসলের চাষ বিশেষভাবে মেনে চলা হয়।

(ঘ) কৃষিশ্রমিক সারাবছর কাজ পায়।

(ঙ) মাথাপিছু উৎপাদনশীলতা অনেক বেশি।

(চ) ফসল ও পশুজাত দ্রব্যের কিছু অংশ নিজ প্রয়োজনে রেখে বাকিটা বাজারে বিক্রি করা হয়।

(ছ) পশুখাদ্য হিসাবে সাধারণত ভুট্টা ও সয়াবিনের চাষ প্রাধান্য পায়। মাংসপ্রদায়ী গবাদি পশুর স্বাস্থ্যবৃদ্ধির জন্য পশুখাদ্য হিসাবে ভুট্টা বেশ উপযোগী।

৪(খ).৬.১ মিশ্রকৃষি অঞ্চল

উত্তর-পূর্ব ইউরোপের ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে মিশ্রকৃষি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউক্রেন, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকাতেও মিশ্রকৃষি পদ্ধতি বিস্তৃতিলাভ করেছে।

৪(খ).৬.২ মিশ্রকৃষির গুরুত্ব

শিল্পসভ্যতার যুগে মিশ্রকৃষি উপযোগী। এই কৃষিব্যবস্থার সুবিধাগুলি হল ঃ

(১) এই কৃষিব্যবস্থায় কৃষকের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম। একই জমিতে একসঙ্গে অনেক প্রকার ফসল উৎপাদন ও পশুপালন করা হয় বলে কোনো নির্দিষ্ট ফসলের উৎপাদন কম হলে বা দাম কমে গেলে অন্য ফসলের চাষ বা পশুপালনের সাহায্যে সেই ঘাটতি পূরণ করা যায়।

(২) এই কৃষিব্যবস্থায় সারাবছরই জমিতে কিছু না কিছু কাজ থাকে। ফলে কৃষক শ্রমিকের মধ্যে ঋতুগত বেকারত্ব থাকে না।

(৩) শস্যাবর্তন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় বলে কৃষিজমির উর্বরতা শক্তি বজায় থাকে।

(৪) কৃষিকাজে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, উন্নত প্রযুক্তি ও উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার করা হয় বলে উৎপাদনশীলতা বেশি, ফলে কৃষিকাজ বেশ লাভজনক।

৪(খ).৭ বাণিজ্যিক দানাশস্য কৃষি (Commercial Grain Farming)

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের দেশসমূহে বিশাল বিশাল কৃষিজমিতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দানাশস্যের অর্থাৎ গম, ভুট্টা প্রভৃতির চাষ করা হয়। এ ধরনের কৃষিতে খুব বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয়। কৃষিতে শ্রমিকের নিয়োগ খুব কম। একটিই দানাশস্য এ ক্ষেত্রে উৎপাদন করা হয়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের জলবায়ুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রধানত গমের চাষ করা হয়। সীমিত অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশের বাজারে প্রচুর গম রপ্তানি করা হয়।

উত্তর আমেরিকার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, প্রেইরী অঞ্চল; দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনার পম্পাস অঞ্চল; দক্ষিণ আফ্রিকার ভেল্ড, অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডের ডাউনস্ তৃণভূমি অঞ্চল ও রাশিয়ার স্টেপস্ তৃণভূমির ব্যাপক অঞ্চলে এ ধরনের শস্য চাষ করা হয়। এ ছাড়া জার্মানি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডে ব্যাপক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গমের চাষ করা হয়।

৪(খ).৭.১ বাণিজ্যিক দানাশস্য কৃষির বৈশিষ্ট্য

(১) **জমির পরিমাণ**--এ ধরনের কৃষিকাজে নিয়োজিত জমির পরিমাণ বিশাল। লোকবসতি কম হওয়ায় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে মানুষ-জমির অনুপাত অনুসারে মাথাপিছু জমির পরিমাণ অনেক বেশি। বিস্তীর্ণ তৃণভূমি কৃষিকাজের জন্য ব্যবহার করা যায়।

(২) **বড় আকৃতির জ্যোত (Large size of holdings) ঃ** এক একটি কৃষিজোতের আয়তন বেশ বড়। গড়ে ৩০০ হেক্টরের বেশি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত জোতের আয়তন ৩৫০ থেকে ৮০০ হেক্টর।

(৩) **শ্রমিকের ব্যবহার কম ঃ** দেশগুলিতে জনসংখ্যার চাপ বেশি না থাকায় এবং শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকের চাহিদা থাকায় কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বেশ অল্প। শ্রমিকের মজুরি যথেষ্ট বেশি। শ্রমিকেরা শিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক ও কর্মদক্ষ।

(৪) **যন্ত্রপাতির ব্যবহার বেশি ঃ** জমিতে বীজবোনা থেকে আরম্ভ করে ফসল তোলা সবই করা হয় যন্ত্রের সাহায্যে। ট্রাক্টর, হারভেস্টর, কম্বাইন থ্রেসার প্রভৃতি আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে সবরকম কৃষিকাজ করা হয়।

কৃষিজোতের আয়তন বড় হওয়ার জন্য কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার সহজতর হয়েছে। বিশাল কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশক ছড়ানোর জন্য অনেক সময় হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়।

(৫) **প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন ঃ** বাণিজ্যিক দানাশস্য কৃষিতে প্রচুর মূলধনের দরকার হয়। কৃষিতে যন্ত্রপাতি প্রয়োগ, প্রচুর সার, কীটনাশক ও উন্নত বীজ ব্যবহার করার জন্য এবং কৃষিজ ফসল সংরক্ষণ ও বিক্রির জন্য মূলধন দরকার।

(৬) **মাথাপিছু উৎপাদন বেশি ঃ** এই ব্যাপক বাণিজ্যিক কৃষিতে মাথাপিছু উৎপাদন অনেক বেশি। বিশাল এলাকা জুড়ে চাষ হলেও কৃষি শ্রমিক থাকে অল্প। শস্যের মোট উৎপাদন অধিক হওয়ায় মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

(৭) **জমিপিছু উৎপাদন কম ঃ** বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চাষ করা হয় বলে ব্যাপক বাণিজ্যিক কৃষিতে জমি পিছু অর্থাৎ হেক্টর পিছু উৎপাদন তেমন বৃদ্ধি পায় না।

(৮) **একফসলী ঃ** এই কৃষিব্যবস্থায় সারাবছর ধরে একটি শস্যেরই চাষ করা হয়। বাণিজ্যিক দানাশস্য কৃষিতে গমের চাষ প্রধান। একে 'ওয়ান ক্রপ স্পেশালাইজেশন' (One crop specialisation) বলা হয়।

(৯) **বাজারের ওপর নির্ভরশীল ঃ** জনসংখ্যা কম থাকায় দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা কম। এই কৃষির উদ্দেশ্য হল বিদেশের বাজারে শস্য বিক্রি করা। আন্তর্জাতিক বাজারে গমের দাম পড়ে গেলে এই কৃষিব্যবস্থায় তার ব্যাপক প্রভাব পড়ে। আর্জেন্টিনা কানাডা প্রভৃতি দেশ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রচুর গম রপ্তানি করে। গমের বাজারদর স্থিতিশীল রাখার জন্য মাঝে মাঝে অতিরিক্ত গম সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয় বা অন্যভাবে নষ্ট করা হয়।

(১০) **কৃষি লাভদায়ক কাজ ঃ** বাণিজ্যিক দানাশস্য কৃষি একটি প্রধান লাভদায়ক অর্থনৈতিক কাজ। লাভজনক না হলে এই তৃণভূমি অঞ্চলগুলিতে কৃষিকাজ তেমনভাবে প্রসারলাভ করতো না।

৪(খ).৮ ভূমধ্যসাগরীয় কৃষি (Mediterranean Agriculture)

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কৃষিকার্য প্রচলিত তা ভূমধ্যসাগরীয় কৃষি নামে পরিচিত।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে জলবায়ুর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে বৃষ্টিপাত শীতকালেই সীবাবদ্ধ। গ্রীষ্মকাল থাকে বৃষ্টিহীন শুষ্ক। শীতকালীন বৃষ্টিপাতের কারণে এখানে শীতকালীন ফসলের চাষ প্রাধান্য লাভ করেছে। অবশ্য গ্রীষ্মকালে বৃষ্টির অভাব জলসেচের সাহায্যে পূরণ করে এখানে গ্রীষ্মেও কৃষিকার্য চলে। এই কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল **ফলচাষে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি**।

৪(খ).৮.১ ভূমধ্যসাগরীয় কৃষির বৈশিষ্ট্য

ভূমধ্যসাগরীয় কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ

(১) শীতকালীন বৃষ্টিপাতের কারণে এখানে কৃষিকার্য প্রধানত শীতকালেই সীমাবদ্ধ। অবশ্য, গ্রীষ্মকালে বৃষ্টির অভাব জলসেচের সাহায্যে পূরণ করেও এখানে কৃষিকার্য চলে;

(২) এই অঞ্চলে শীতকালীন ফসলের (যেমন গম, বীট, মিলেট প্রভৃতি) চাষই প্রাধান্য লাভ করেছে;

(৩) এই অঞ্চল ফলচাষে বিশ্ববিখ্যাত। এই অঞ্চলের রৌদ্রকরোজ্জ্বল আবহাওয়া ফল পরিণত ও পাকার পক্ষে আদর্শ;

(৪) এই অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ প্রকৃতি এমনই যে, এগুলির মূল দীর্ঘ ও মাটির অভ্যন্তরে প্রসারিত। ফলে গ্রীষ্মের খরা সত্ত্বেও এরা মৃত্তিকার গভীরে সঞ্চিত জল সংগ্রহের মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে। উদাহরণ জলপাই গাছ ও আঙ্গুর লতা।

(৫) হেক্টর-প্রতি বেশ মূলধন নিয়োগ ও নিবিড় শ্রম প্রয়োগ ভূমধ্যসাগরীয় কৃষির অন্যতম প্রধান শর্ত।

৪(খ).৮.২ ভূমধ্যসাগরীয় কৃষি-অঞ্চল

ভূমধ্যসাগরীয় কৃষির প্রধান অঞ্চলগুলি হল : (ক) **ভূমধ্যসাগরীয় তীরবর্তী** (১) ইউরোপের পর্তুগাল, স্পেন, দঃ ফ্রান্স, ইটালি, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি; (২) আফ্রিকার আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া ও মরক্কো; (৩) এশিয়ার সিরিয়া, ইস্রায়েল প্রভৃতি এবং (খ) **ভূমধ্যসাগরের বহির্ভূত** (১) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণাংশ; (২) দক্ষিণ আমেরিকার মধ্য চিলি, (৩) দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন এবং (৪) অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের এক ক্ষুদ্র এলাকা।

৪(খ).৮.৩ ভূমধ্যসাগরীয় কৃষির প্রধান অঞ্চল

ভূমধ্যসাগরীয় কৃষির প্রধান ফসল হল গম (ইটালির আর্নো সমভূমি, ক্যালিফোর্নিয়ার সান জোয়াকিন উপত্যকা, মধ্য চিলি প্রভৃতি অঞ্চল), বীট (ক্যালিফোর্নিয়া) মিলেট, বার্লি, গাজর প্রভৃতি। এ ছাড়া ফলচাষে এই অঞ্চলের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। এই অঞ্চলকে বলা হয় **'বিশ্বের ফলের বাগানের দেশ'** (Orchard Land of the World)। এই অঞ্চলে উৎপন্ন প্রধান ফল হল আঙ্গুর। বিশ্বের আঙ্গুর উৎপাদনের ৭৫ শতাংশ এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। আঙ্গুর উৎপাদনের প্রধান অঞ্চল হল স্পেনের 'হুয়ের্তা' (Huerta), ফ্রান্সের রোন উপত্যকা, পর্তুগালের ডাউরো উপত্যকা, চিলির 'হাচিয়েন্ডা' নামের বড় বড় খামার। অন্যান্য ফল হল জলপাই (ইটালির আর্নো সমভূমি ও আপুলা, স্পেনের তাগুস উপত্যকা, ফ্রান্স, ক্যালিফোর্নিয়া, আলজেরিয়া, টিউনিসিয়া ও মরক্কো), কমলালেবু (স্পেনের মালাগা অঞ্চল, ফ্রান্স, ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতি)। অন্যান্য ফলের মধ্যে আপেল, স্ট্রবেরী ও খোবানি (Apricot) উল্লেখযোগ্য।

৪(খ).৯ বাগিচা-কৃষি (Plantation Farming)

পূর্বে ইউরোপিয় মূলধন ও দেশীয় শ্রমিকের (indigenous labour) সহায়তায় পরিচালিত বাণিজ্যিক কৃষিই (Commercial Farming) বাগিচা-কৃষি নামে সমধিক পরিচিত।

৪(খ).৯.১ বাগিচা-কৃষির বৈশিষ্ট্য

বাগিচা কৃষির বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ

(১) বিদেশি মূলধন বিনিয়োগ (এককালে; বর্তমানে অবশ্য দেশীয় মূলধন বিনিয়োগ) ও দেশীয় শ্রমিকের নিয়োগ;

(২) এক একটি অঞ্চলে একটি ফসলের চাষ এবং তা এমনই ফসল যা একবার রোপণ করলে এক নাগাড়ে কয়েকবছর তা থেকে উৎপাদন পাওয়া যায়;

(৩) চাষের জন্য বৃহৎ আয়তনের জমির ব্যবহার। এই কৃষিতে বাগিচাগুলির (Plantations) আয়তন বেশ বড় হয়। একটি বাগিচার আয়তন কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয় প্রায় ২৫০০ হেক্টর।

৪(খ).৯.২ বাগিচা-কৃষির অঞ্চল

বাগিচা কৃষির প্রধান অঞ্চলগুলি হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, বোর্নিও এবং ভারত ও শ্রীলঙ্কা; দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল, চিলি প্রভৃতি।

৪(খ).৯.৩ বাগিচা-কৃষির প্রধান ফসল

বাগিচা-কৃষির প্রধান ফসল হল রবার, চা, কফি, কোকো ও কিউবার ইক্ষু। রবার উৎপাদনে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চা উৎপাদনে ভারত, শ্রীলঙ্কা, কফি উৎপাদনে ব্রাজিল, কোলম্বিয়া এবং কোকো উৎপাদনে আফ্রিকার ঘানা বিখ্যাত।

৪(খ).১০ ভন থুনেন-এর কৃষিজমি ব্যবহার মডেল (Von Thunen's Agricultural Land-use Model)

জার্মান পণ্ডিত জোহান হেনরীচ ভনথুনেন (জন্ম ১৭৮৩, মৃত্যু ১৮৫০) মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির একটি স্থানভিত্তিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রবর্তন করেন। এটি কৃষিকার্যে ব্যবহৃত ভূমি সংক্রান্ত প্রথম সমীক্ষা। রষ্টক শহরের নিকটে অবস্থিত একটি কৃষিফার্মের সঙ্গে চল্লিশ বছর ধরে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভনথুনেন তাঁর মতবাদটি রচনা করেন। তাঁর তত্ত্বে তিনি দেখাতে চেয়েছেন শহরের চারদিকে ঘিরে থাকা কৃষিক্ষেত্রসমূহ কী কী শস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং কেমনভাবে ব্যবহৃত হয়। তিনি তাঁর তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কতকগুলি বিষয় অনুমান করে নিয়েছেন।

অনুমানসমূহ (Premises) ঃ

(১) একটি মাত্র শহরকে কেন্দ্র করে চারিদিকে কৃষিক্ষেত্র গড়ে উঠবে। কৃষি অঞ্চলটি অপরাপর অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন।

(২) উক্ত কৃষি অঞ্চলটি এই অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত শহরের একমাত্র সরবরাহকারী অঞ্চল। শহরটি ওই কৃষিক্ষেত্রের একমাত্র বাজার।

(৩) সমগ্র কৃষি অঞ্চলটির ভূমিরূপ, মৃত্তিকা, জলবায়ু ও অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদান একইরকম।

(৪) কৃষকরা বাজারের চাহিদা অনুযায়ী শস্য উৎপাদন করে এবং তাদের উদ্দেশ্য হল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা।

স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত (Postulate) ঃ

দূরত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার শস্য উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি শহরটিকে কেন্দ্রে রেখে বলয়ের মতো অবস্থান করবে। শহর, অর্থাৎ বাজার থেকে কতদূরে কোন শস্য উৎপাদিত হবে তা নির্ভর করে পণ্যটির বাজারদর, উৎপাদন ব্যয় ও পরিবহন ব্যয়ের ওপর। বাজারদর হল বাজারে ওই পণ্যটি কী দামে বিক্রি হবে। উৎপাদন ব্যয় হল শ্রমিক, সার, বীজ, ঔষধ প্রভৃতির খরচ। পরিবহন ব্যয় হল কৃষিপণ্যের জমি থেকে বাজার পর্যন্ত বহনের খরচ। এই তিনটি বিষয় বিবেচনা করে কীভাবে মুনাফা অর্জন করা যাবে তা দেখানোর জন্য তিনি একটি সূত্রের সাহায্যে নিয়েছেন।

$P = v - (E+T)$

যেখানে P হল মুনাফা, V হল পণ্যটির বাজারদর

E হল উৎপাদন ব্যয় এবং T হল পরিবহন ব্যয়।

বাজারদর এবং উৎপাদন ব্যয় একই থাকলে দূরত্ব যত বৃদ্ধি পাবে পরিবহন ব্যয় সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে এবং পণ্যটি বিক্রি করে মুনাফার পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাবে। পরিবহন বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াবে যখন মুনাফা বলতে আর কিছুই থাকবে না। অর্থাৎ একটা দূরত্বে গিয়ে শস্য উৎপাদন লাভজনক হবে না।

শহরের নিকটবর্তী কৃষকদের নিকট সমস্ত শস্যই লাভদায়ক। এ ক্ষেত্রে তারা তাদের পছন্দমতো শস্য উৎপাদন করতে পারেন। যতই দূরে যাওয়া যাবে কৃষকদের কাছে পছন্দের স্বাধীনতা কমতে থাকবে। মুনাফা সর্বাধিক করার জন্য তারা নির্দিষ্ট কিছু ফসল চাষ করতে বাধ্য হবেন। অর্থাৎ দূরের কৃষকেরা পরিবহন ব্যয় বিবেচনা করে মুনাফাদায়ী শস্য উৎপাদন করবেন এবং নিকটবর্তী কৃষকেরা তাঁর সর্বাধিক পছন্দের শস্যটি উৎপাদন করবেন। ভন থুনেনের মতে এইভাবে শহরে চারিদিকে ছয়টি কৃষিবলয় গড়ে উঠবে।

প্রথম বলয়--বাজার, অর্থাৎ শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলের জমি ব্যবহৃত হয় তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় এমন পণ্য উৎপাদনের জন্য, যেমন দুধ, শাকসব্জি প্রভৃতি। এই পচনশীল দ্রব্য দূর থেকে আনলে নষ্ট হয়ে যায়। চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এসব দ্রব্য উৎপাদনকারী বলয়ের পরিধি কিছুটা বৃদ্ধি পায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভন থুনেনের সময় পরিবহন ব্যবস্থা ছিল ধীরগতি।

দ্বিতীয় বলয়--দ্বিতীয় কৃষি অঞ্চলের কৃষকেরা জ্বালানি কাঠ উৎপন্ন করে। সে যুগে কাঠই ছিল জ্বালানির প্রধান উৎস। রান্না করতে এবং ঘর গরম রাখতে প্রচুর কাঠের প্রয়োজন হত। ভন থুনেন দেখিয়েছেন যে দুধ এবং সব্জির পর কাঠই হল লাভজনক ফসল।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বলয়--এই কৃষি অঞ্চলগুলি বনভূমির বাইরে অবস্থিত। এগুলোতে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ফসল চাষ করা হয়। দূরত্ব অনুসারে তিনটি বলয়ে খাদ্যশস্য উৎপাদনের নিবিড়তা কমে থাকে। এই বলয়গুলিতে শস্যাবর্তন পদ্ধতিতে বিভিন্ন শস্য চাষ করা হয়। তৃতীয় বলয়ে শস্য উৎপাদনের নিবিড়তা সর্বাধিক। এখানে পতিত জমি প্রায় নেই। চতুর্থ বলয়ে প্রায় ১৪ শতাংশ ও পঞ্চম বলয়ে প্রায় ৩৩ শতাংশ পতিত জমি থেকে যায়। চতুর্থ ও পঞ্চম বলয়ে কম নিবিড় কৃষিকার্য সম্পন্ন হয়। পঞ্চম বলয়ে মোট ভূমির এক তৃতীয়াংশ শস্য উৎপাদন ও বাকি অংশ পশুপালনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ষষ্ঠ বলয়--সবচেয়ে শেষের অঞ্চলটি ব্যবহার করা হয় পশুপালনের জন্য। এই পশুপালন অঞ্চলে দু-রকম পশুজ দ্রব্য উৎপন্ন হয়। যথা; (ক) মাংস : মাংসের জন্য এখানে মাংসপ্রদায়ী পশু পালিত হয়, যেগুলোকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে বাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে পরিবহন ব্যয় একেবারেই নেই। (খ) চীজ, যেটি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না এবং মূল্য বেশি বলে পরিবহন ব্যয় বেশি হলেও লাভজনক হয়ে দাঁড়ায়।

ভন থুনেন মডেল চিত্রের 'খ' বিভাগে দেখানো হয়েছে কৃষি অঞ্চলে শহর ছুঁয়ে যাওয়া একটি নদীর উপস্থিতি কীভাবে মডেলের রূপান্তর ঘটাতে পারে। নদী পরিবহন স্থলপথ পরিবহন অপেক্ষা সস্তা বলে নদীর প্রবাহ বরাবর কৃষিবলয়সমূহ অনেকটা দূর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে।

৪(খ).১০.১ ভন থুনেন মডেলের সমালোচনা

ভন থুনেনের মতবাদ অনুযায়ী কিছু কিছু অঞ্চলে ভূমির ব্যবহার পরিলক্ষিত হলেও পুরোপুরি ভন থুনেন তত্ত্ব অনুযায়ী কৃষিজমি ব্যবহৃত হচ্ছে তা বলা শক্ত। সভ্যতার বিবর্তনে বহু উপাদানের পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ করে পরিবহন ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। পূর্বের ঘোড়াগাড়ির বা গরুরগাড়ির জায়গায় এসেছে প্রচণ্ড দ্রুতগামী রেলগাড়ি ও ট্রাক। ফলে ভন থুনেনের তত্ত্ব অনেকটা যুক্তিহীন হয়ে পড়েছে। তাঁর সরল স্বীকার্যগুলি বাস্তবে প্রযুক্ত হচ্ছে না। যেমন--

(১) সম্পদ ব্যবহারে অনেক পরিবর্তন এসেছে। জ্বালানি হিসাবে কাঠের ব্যবহার প্রায় উঠেই গেছে।

(২) দ্রুতগামী ও সস্তা পরিবহন ব্যবস্থা এবং হিমায়ন যন্ত্র ও হিমঘরের সুবিধা থাকায় পচনশীল দ্রব্য বাজার থেকে বহুদূরে উৎপাদিত হচ্ছে এবং পণ্য জমিয়ে রেখে ব্যবসায়ীরা মূল্যবৃদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে। অর্থাৎ শস্য নির্বাচন দূরত্বের ওপর তেমনভাবে নির্ভরশীল নয়।

(৩) ভন থুনেনের মতবাদ অনুযায়ী পরিবহন ব্যয় দূরত্বের সঙ্গে সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ভূমিরূপের পার্থক্য থাকলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। যেমন--পার্বত্য অঞ্চলে পরিবহন ব্যয় সমতল ভূমি অপেক্ষা বেশি।

(৪) এই মতবাদ মিশ্রকৃষির উপস্থিতির জন্য কেবলমাত্র মধ্য অক্ষাংশে অর্থাৎ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। উষ্ণ অঞ্চলে ও শীতল অঞ্চলে এটি প্রয়োগযোগ্য নয়।

৪(খ).১০.২ ভন থুনেন মডেলের গুরুত্ব

কিছু সমালোচনা থাকলেও ভন থুনেন তত্ত্ব নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কার্যাবলির অবস্থান তত্ত্ব হিসাবে পথপ্রদর্শক। এটি ভূমির ব্যবহার সমীক্ষার পরিবহন ব্যয় ও বাজার থেকে দূরত্বের ওপর ধারণা দিয়েছে, যার সঙ্গে অবস্থান সাপেক্ষ খাজনার ধারণা অন্তর্ভুক্ত। এই ধারণা শহরের ভূমি ব্যবহার সমীক্ষায় যেমন উপযোগী গ্রাম্যভূমি ব্যবহার সমীক্ষার ক্ষেত্রেও সমান উপযোগী। কৃষকেরা পরের মরসুমে কি ফসল কোন জমিতে উৎপন্ন করবে তার একটা ধারণাও ভন থুনেনের তত্ত্ব থেকে পাওয়া যায়। উৎপাদন শুরুর সময়ে বাজারের সম্ভাব্য যোগান সম্বন্ধে কৃষকেরা জানতে পারে।

৪(খ).১১ সারাংশ

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে কোন কোন পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করা হয় এবং কেন সে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় এই এককে তা আলোচনা করা হয়েছে। জীবিকা সত্তাভিত্তিক কৃষি, নিবিড় কৃষি, মিশ্র কৃষি, বাণিজ্যিক কৃষি, ভূমধ্যসাগরীয় কৃষি, বাগিচা-কৃষি পদ্ধতিগুলির বৈশিষ্ট্য কী এবং ভবিষ্যতে এই কৃষিপদ্ধতিগুলির পরিণতি কী হবে তার একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ ভন থুনেন নামে এক জার্মান পণ্ডিত কৃষিজমি ব্যবহারের একটি সমীক্ষা প্রকাশ করেন। এই এককে ভন থুনেন তত্ত্বটি তুলে ধরা হয়েছে এবং এই তত্ত্বটি বর্তমানে জমির ব্যবহারের দিক থেকে কতটা প্রযোজ্য তা আলোচিত হয়েছে।

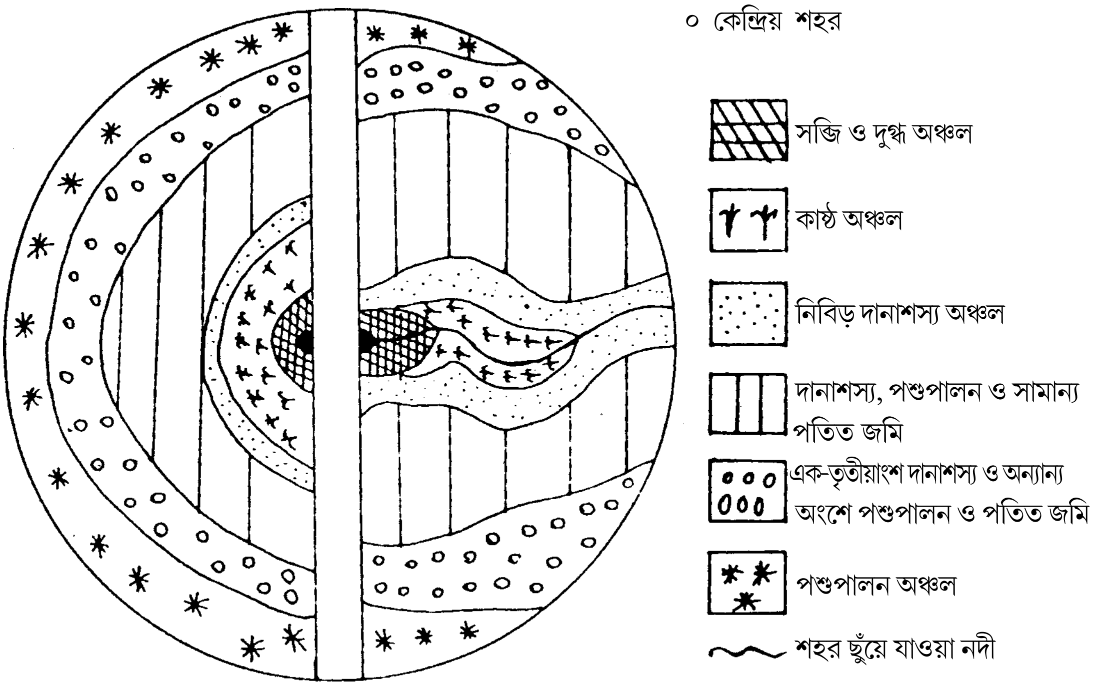

৪(খ)১২ অনুশীলনী

তত্ত্বগত প্রশ্নাবলী ঃ

১। বিশ্বের কৃষিপদ্ধতিগুলিকে কীভাবে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করবেন? জীবিকাভিত্তিক কৃষির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২। জীবিকাসত্তা কৃষি কোন কোন স্থানে দেখা যায়? ভবিষ্যতে এ ধরনের কৃষি টিকে থাকবে কী?

৩। প্রগাঢ় জীবিকাভিত্তিক কৃষি কোথায় দেখা যায়? এই কৃষির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। এ ধরনের কৃষির ভবিষ্যৎ কেমন?

৪। মিশ্রকৃষির সুবিধাগুলি কী কী? উদাহরণসহ এই কৃষির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। এ ধরনের কৃষিকাজ কোথায় দেখা যায়?

৫। বাণিজ্যিক দানাশস্য কৃষি বলতে কী বোঝায়? এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৬। ভূমধ্যসাগরীয় কৃষির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। এই কৃষির প্রধান ফসল কী কী?

৭। বাগিচা কৃষি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৮। ভন থুনেন তত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। এই তত্ত্ব বর্তমানে কতটা প্রযোজ্য? এই মডেলের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী ঃ

৯। **এককথায় উত্তর দিতে হবে।**

(ক) কোন ধরনের কৃষিকাজ প্রধানত প্রকৃতিনির্ভর?

(খ) কোন ধরনের কৃষিতে শস্য উৎপাদন ও পশুপালন একসঙ্গে করা হয়?

(গ) প্রেইরী অঞ্চলে কোন ধরনের কৃষিকাজ করা হয়?

(ঘ) ভন থুনেন মডেলে ১ম বলয়ে কী শস্যের চাষ হয়?

(ঙ) দুটি পচনশীল কৃষি পণ্যের নাম লিখুন।

১০। **ঠিক উত্তরটি রেখে ভুলটি কেটে দিন।**

(ক) মিশ্রকৃষি গ্রামাঞ্চলে/শহরাঞ্চলে দেখা যায়।

(খ) জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষি একটি উন্নত/অনুন্নত কৃষিপদ্ধতি।

(গ) প্রগাঢ় জীবিকাভিত্তিক কৃষিতে শ্রমিকের যোগান কম/বেশি।

(ঘ) ভন থুনেন কৃষিকাজের/শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

(ঙ) জমিতে বছরে দুইয়ের অধিক ফসল ফলানো হলে তা বলে দ্বিফসলী/বহুফসলী।

৪(খ).১৩ উত্তর সংকেত

৯। (ক) জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষি

(খ) মিশ্র কৃষি

(গ) বাণিজ্যিক দানাশস্য কৃষি

(ঘ) শাকসব্জি

(ঙ) দুগ্ধ, শাশসব্জি।

১০। (ক) শহরাঞ্চলে

(খ) অনুন্নত

(গ) বেশি

(ঘ) কৃষিকাজের

(ঙ) বহুফসলী।

একক ৪(গ) ❑ বিশ্বের খাদ্যশস্য ও অন্যান্য শস্য উৎপাদন

গঠন

৪(গ).১ উদ্দেশ্য
৪(গ).২ প্রস্তাবনা
৪(গ).৩ শস্যের শ্রেণীবিভাগ
৪(গ).৪ গম
৪(গ).৪.১ গম চাষের অনুকূল অবস্থা
৪(গ).৪.২ বিশ্বের প্রধান গম উৎপাদক অঞ্চল
৪(গ).৫ ধান
৪(গ).৫.১ ধান চাষের অনুকূল অবস্থা
৪(গ).৫.২ বিশ্বের প্রধান ধান উৎপাদক অঞ্চল
৪(গ).৬ ইক্ষু
৪(গ).৬.১ ইক্ষু চাষের অনুকূল অবস্থা
৪(গ).৬.২ বিশ্বের প্রধান ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চল
৪(গ).৭ চা
৪(গ).৭.১ চা চাষের অনুকূল অবস্থা
৪(গ).৭.২ বিশ্বের প্রধান চা উৎপাদক অঞ্চল
৪(গ).৮ কফি
৪(গ).৮.১ কফি চাষের অনুকূল অবস্থা
৪(গ).৮.২ বিশ্বের প্রধান কফি উৎপাদক অঞ্চল
৪(গ).৯ কার্পাস
৪(গ).৯.১ কার্পাস চাষের অনুকূল অবস্থা
৪(গ).৯.২ বিশ্বের প্রধান কার্পাস উৎপাদক অঞ্চল
৪(গ).১০ পাট
৪(গ).১০.১ পাট চাষের অনুকূল অবস্থা
৪(গ).১০.২ বিশ্বের প্রধান পাট উৎপাদক অঞ্চল
৪(গ).১১ সারাংশ
৪(গ).১২ অনুশীলনী
৪(গ).১৩ উত্তর সংকেত

৪(গ).১ উদ্দেশ্য

ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ইত্যাদির বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল উৎপাদিত হয়। এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন--

- শস্যের শ্রেণীবিভাগ,
- শস্য উৎপাদনকারী দেশসমূহ,
- গুরুত্বপূর্ণ শস্য উৎপাদনে বিশ্বে বিভিন্ন দেশের স্থান।

৪(গ).২ প্রস্তাবনা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কৃষিজ ফসল উৎপাদনে বিভিন্নতা লক্ষণীয়। প্রধানত প্রাকৃতিক কারণে এই বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বের কোন্ কোন্ দেশ কোন্ কোন্ ফসল উৎপাদনে বিশিষ্ট এবং উৎপাদন চাহিদার তুলনায় বেশি, আর কোন্ দেশে কোন্ কোন্ ফসলের উৎপাদন চাহিদার তুলনায় কম সে সম্পর্কে ধারণা ফসলের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করবে।

৪(গ).৩ শস্যের শ্রেণীবিভাগ

কৃষিজ শস্যকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন--(ক) **খাদ্যশস্য** : যে শস্য আমরা খাই। যেমন--দানাশস্য ধান, গম, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি; (খ) **শর্করা শস্য** : ইক্ষু ও বীট; (গ) **বাগিচা শস্য বা পানীয় শস্য** : চা, কফি, কোকো; (ঘ) **তন্তুশস্য** : কার্পাস, পাট, প্রভৃতি; (ঙ) **অন্যান্য শস্য** : রবার।

(ক) খাদ্যশস্য [FOOD CROPS]

প্রথমে আমরা খাদ্যশস্য নিয়ে আলোচনা করছি।

৪(গ).৪ গম

গম বিশ্বের প্রধান খাদ্যশস্য। বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মানুষ গম খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। শীতকালীন গম ও বাসন্তিক গম এই দুই ধরনের গম চাষ করা হয়। বিশ্বের শতকরা ৮০ ভাগ হল শীতকালীন গম। গম থেকে বিভিন্ন প্রকারের উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করা হয়। গমের খোলা থেকে পশুখাদ্য ও খড় থেকে কাগজ তৈরি করা হয়।

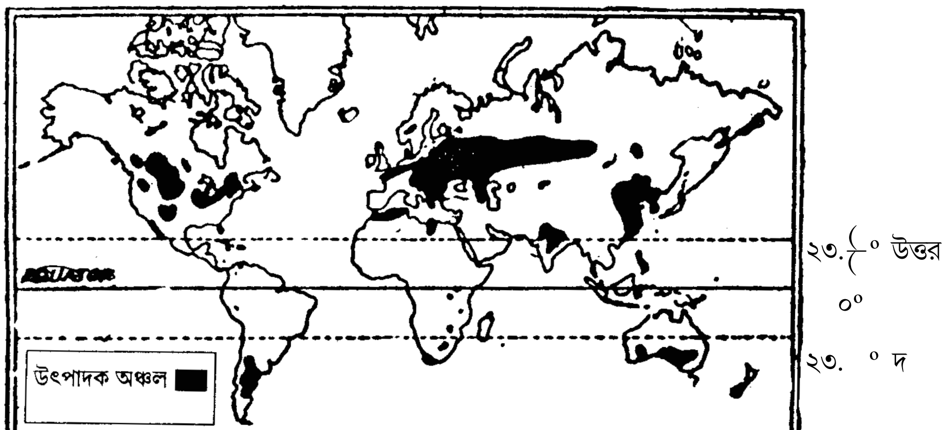

বিশ্বের গম উৎপাদক অঞ্চল

৪(গ).৪.১ গম চাষের অনুকূল অবস্থা

১৪° সেলসিয়াস থেকে ২০° সেলসিয়াস ও ৪০ সেমি. থেকে ৭০ সেমি. বৃষ্টিপাত অঞ্চলে গম চাষ ভালো হয়। উর্বর ভারি দোঁয়াশ মাটিতে এবং সামান্য ঢালু জমিতে গম চাষ ভালো হয়। গম নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফসল।

৪(গ).৪.২ বিশ্বের প্রধান গম উৎপাদক অঞ্চল

(১) **চীন প্রজাতন্ত্র ঃ** গম উৎপাদনে চীন প্রজাতন্ত্র বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৯৯৯ খ্রিঃ চীন প্রজাতন্ত্র ১১.৪৪ কোটি মেট্রিক টন গম উৎপন্ন করেছিল। চীনের নদী অববাহিকা অঞ্চলগুলি যেমন হোয়াং-হো, ইয়াং-সি-কিয়াং ও সিকিয়াং নদী অববাহিকায় উন্নত প্রথায় প্রচুর গমের চাষ করা হয়। মাঞ্চুরিয়া সমভূমি গম উৎপাদনে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বেশি থাকায় চীন বিদেশের বাজারে গম রপ্তানি করতে পারে না।

বিশ্বে গম উৎপাদন ঃ ১৯৯৯

দেশ	গম উৎপাদন (কোটি মেট্রিক টন)	দেশ	হেক্টরপিছু উৎপাদন (কেজি)
চীন	১১.৪৪	আয়ারল্যান্ড	৮১৪৭
ভারত	৭.৭৮	যুক্তরাষ্ট্র	৮০৫১
আ. যুক্তরাষ্ট্র	৬.২৭	জার্মানি	৭৫৪৩
ফ্রান্স	৩.৭০	ফ্রান্স	৭২৩৫
রাশিয়া	৩.১০	চীন	৩৯৬৯
কানাডা	২.৮৫	ভারত	২৫৮৩
তুরস্ক	১.৮০		
পৃথিবী	**৫৮.৩৬**	**পৃথিবী**	**২৭১১**

উৎস : FAO Production Year Book--1999, Published in 2001

(২) **ভারত :** গম উৎপাদনে ভারত বর্তমানে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশ গম উৎপাদনে এগিয়ে আছে। এছাড়া সারা দেশের প্রায় সব রাজ্যে কম-বেশি গমের চাষ করা হয়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক রাজ্যে প্রচুর গমের চাষ হয়। ভারতে গম রবিশস্য বা শীতকালীন শস্য হিসাবে উৎপাদন করা হয়। লোকসংখ্যা অধিক হওয়ায় ভারত গম রপ্তানি করতে পারে না।

(৩) **আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র :** বিশ্বে গম উৎপাদনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয়। এদেশের উত্তর মধ্যাঞ্চলে বিস্তীর্ণ প্রেইরি তৃণভূমি অঞ্চলে উর্বর চারনোজেম বা কৃষ্ণমৃত্তিকায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গম উৎপাদিত হয়। এদেশে শীতকালীন

ও বাসন্তিক গম চাষের পৃথক অঞ্চল আছে। (ক) **বাসন্তিক গম বলয়** : উত্তর ডাকোটা, দক্ষিণ ডাকোটা, মিনিসোটা, মনটানা। এই অঞ্চলে লোহিত নদী উপত্যকায় এত বেশি গম উৎপাদন হয় যে একে বলা হয় 'বিশ্বের রুটির ঝুড়ি' (Bread Basket of the World) (খ) **শীতকালীন গম বলয়** : কনসাস, কালোরাডো, টেক্সাস, মিসৌরি। এ ছাড়া কলম্বিয়া নদী অববাহিকা এবং সংলগ্ন অঞ্চলে সাদা নরম গম চাষ করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গমের চাষ হয় বাণিজ্যিক কৃষি পদ্ধতিতে। কৃষিতে শ্রমিকের তুলনায় যন্ত্রপাতির ব্যবহার অধিক।

(৪) **ফ্রান্স** : ফ্রান্সের পারী উপত্যকা গম উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে, সেন, লোয়ার নদী অববাহিকায় গমের চাষ করা হয়। ফ্রান্সে হেক্টরপিছু গমের উৎপাদন ৭২৩৫ কেজি। ভারতের তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেশি। গম উৎপাদন ও হেক্টরপিছু উৎপাদন উভয় দিক থেকে ফ্রান্স পৃথিবীর **চতুর্থ** স্থান অধিকার করে।

(৫) **রাশিয়া** : রাশিয়ার স্টেপ তৃণভূমি অঞ্চলে চারনোজেম মৃত্তিকা বলয়ে অধিকাংশ গম চাষ করা হয়। ভলগা উপত্যকা, ট্রান্স ইউরাল ও সাইবেরিয়া অঞ্চলে বাসন্তিক গমের চাষ হয়। শীতকালীন গমের জন্য ককেসাস অঞ্চল প্রসিদ্ধ। রাশিয়াতে জনসংখ্যার তুলনায় জমির আয়তন বেশি হওয়ায় ব্যাপক বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। তাই হেক্টর পিছু উৎপাদন অনেক কম।

কানাডার প্রেইরি অঞ্চলের আলবার্টা, ম্যানিটোবা, সাসকানুয়ান, অস্ট্রেলিয়া মারে-ডার্লিং অববাহিকা, আর্জেন্টিনার পম্পাস তৃণভূমি অঞ্চলে, তুরস্ক ও পাকিস্তানে যথেষ্ট পরিমাণে গমের চাষ হয়।

৪ (গ). ৫ ধান

গমের পর বিশ্বের অপর প্রধান খাদ্যশস্য হল ধান। গম প্রধানত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে চাষ করা হয়। ধানের চাষ হয় ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে। মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল ধান চাষের জন্য প্রসিদ্ধ।

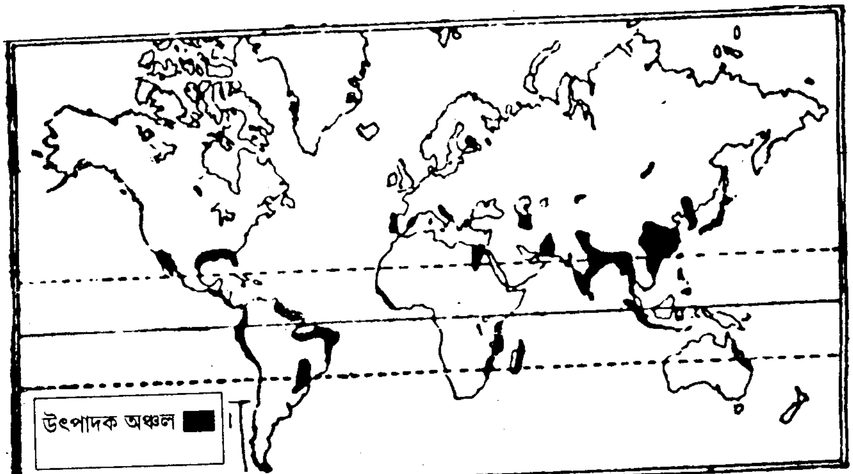

বিশ্বের ধান উৎপাদক অঞ্চল

৪ (গ). ৫.১ ধান চাষের অনুকূল অবস্থা

ধান চাষের জন্য অধিক বৃষ্টিপাত (১০০ সেমি. থেকে ২০০ সেমি.) ও মাঝারি উষ্ণতা (২০° সে থেকে ৩০° সে) প্রয়োজন হয়। উর্বর পলিমাটি সমৃদ্ধ নিচু সমভূমিতে ধানের চাষ ভালো হয়। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে উন্নতমানের কিছু ধান চাষ করা হয়।

৪ (গ). ৫.২ বিশ্বের প্রধান প্রধান উৎপাদক অঞ্চল

(১) **চীন প্রজাতন্ত্র**—গম উৎপাদনের মতো ধান উৎপাদনেও চীন পৃথিবীতে **প্রথম** স্থান অধিকার করে। ইয়াং সিকিয়াং ও সিকিয়াং নদীর মধ্য ও নিম্ন অববাহিকা ধান উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। দক্ষিণ-পূর্বের উপকূলভাগ ও সেচুয়ান বা জেকোয়ান অববাহিকায় প্রচুর ধান চাষ হয়। হুনান প্রদেশে সবচেয়ে বেশি ধান উৎপাদন হয় বলে একে চীনের 'ধান্যপাত্র' (Rice Bowl) বলা হয়। কোয়াং-টুং, কিয়াংসি, ইউনান, কিউচাউ প্রদেশে ধানের ফলন ভালো। ১৯৯৯ খ্রিঃ চীন মোট ২০.০৫ কোটি মেট্রিক টন ধান উৎপাদন করেছিল।

বিশ্বে ধান উৎপাদন : ১৯৯৯

দেশ	**ধান উৎপাদন (কোটি মেট্রিক টন)**	**দেশ**	**হেক্টরপিছু উৎপাদন (কেজি)**
চীন	২০.০৫	অস্ট্রেলিয়া	১০,০৭১
ভারত	১৩.৯২	গ্রীস	৯,৩৭৫
ইন্দোনেশিয়া	৪.৯৫	স্পেন	৭৫৩৯
ভিয়েতনাম	৩.১৪	জাপান	৬৪১৪
বাংলাদেশ	২.৯৯	চীন	৬৩২১
থাইল্যান্ড	২.৩৩	ইন্দোনেশিয়া	৪২৬১
		ব্রাজিল	৩০৯২
		ভারত	২৯২৯
পৃথিবী	৫৯.৬৫	পৃথিবী	৩৮৪৫

উৎস : FAO Production Year Book—1999, Published in 2001.

(২) **ভারত**—ধান উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে **দ্বিতীয়** স্থান অধিকার করে। ১৯৯৯ খ্রিঃ ভারতে ধানের উৎপাদন ছিল ১৩.৯২ কোটি মেট্রিক টন। দেশের নদী বিধৌত সমভূমি অঞ্চলসমূহ ধান চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী, মহানদী, কৃষ্ণা, কাবেরী ও শতদ্রু অববাহিকায় ধান উৎপাদক অঞ্চলগুলি অবস্থিত। ভারতের উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, ওড়িশা, অসমে প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপাদন হয়। ভারতের মৌসুমী জলবায়ু ধানচাষের সহায়ক। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক প্রথায় কিছু ধানচাষ হলেও অধিকাংশ ধানচাষ পুরনো পদ্ধতিতে হয় বলে হেক্টরপিছু উৎপাদন ক্ষমতা খুব কম। মাত্র ২৯২৯ কেজি।

(৩) **ইন্দোনেশিয়া**—বিশ্বে ধান উৎপাদক হিসাবে **তৃতীয়** স্থান অধিকার করে ইন্দোনেশিয়া। ধান এদেশের প্রধান শস্য। জাভা, সুমাত্রা, কালিমাস্তান দ্বীপসমূহের সমভূমি অঞ্চলে ধান চাষ হয়। দ্বীপগুলির মাটি পলিগঠিত বলে ধানের ফলন ভালো হয়। হেক্টরপিছু ধান উৎপাদনে ইন্দোনেশিয়া উল্লেখযোগ্য। এদেশে প্রতি হেক্টরে গড়ে ৪২৬১ কেজি ধান উৎপাদিত হয়।

(৪) **ভিয়েতনাম**—ধান উৎপাদনে ভিয়েতনাম **চতুর্থ**। মেকং বদ্বীপে, লোহিত নদীর অববাহিকা, টনকিং উপত্যকা ও উপকূলবর্তী সমভূমিতে ধানচাষ করা হয়। এখানে মৌসুমী জলবায়ু ধানচাষের পক্ষে উপযোগী।

(৫) **বাংলাদেশ**—বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। নদী-উপনদী সমৃদ্ধ এই দেশের অনেকাংশ পলিগঠিত সমভূমি। পদ্মা, মেঘনা, অববাহিকায় ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর প্রভৃতি জেলায় ধানচাষ করা হয়। ভারতের মতো বাংলাদেশেও সাবেকি প্রথায় ধানচাষ হয় বলে হেক্টরপিছু উৎপাদন অনেক কম। হেক্টরপিছু মাত্র ২৮৫২ কেজি।

থাইল্যান্ডের মেনাম অববাহিকা ; জাপানের হনসু দ্বীপের উপকূলবর্তী সমভূমি ; মায়ানমারের ইরাবতী উপত্যকা; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া, ফ্লোরিডা, ক্যালিফোর্ণিয়াতে ধানের চাষ ভাল হয়। তবে পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যেসব দেশে ধানের মোট উৎপাদন কম সেসব দেশে হেক্টরপিছু উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেশি। হেক্টরপিছু উৎপাদনে সবার ওপরে আছে অস্ট্রেলিয়া। এদেশের প্রতি হেক্টর গড়ে ১০,০৭১ কেজি ধান উৎপন্ন হয়।

(খ) শর্করা শস্য [SUGAR CROPS]

এখন আমরা শর্করা শস্য নিয়ে আলোচনা করছি।

৪ (গ). ৬ ইক্ষু

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শর্করা হল ইক্ষু বা আখ। ইক্ষু থেকে চিনি উৎপাদন করা হয়। বীট থেকে চিনি উৎপাদন করা হলেও তার গুণমান নিম্ন এবং পরিমাণেও অল্প। ইক্ষু থেকে চিনি ছাড়াও গুড় ও সুরাসার (Alcohol) তৈরি হয়। আখের ছিবড়া থেকে কাগজ ও শব্দ নিরোধক বোর্ড প্রস্তুত করা হয়।

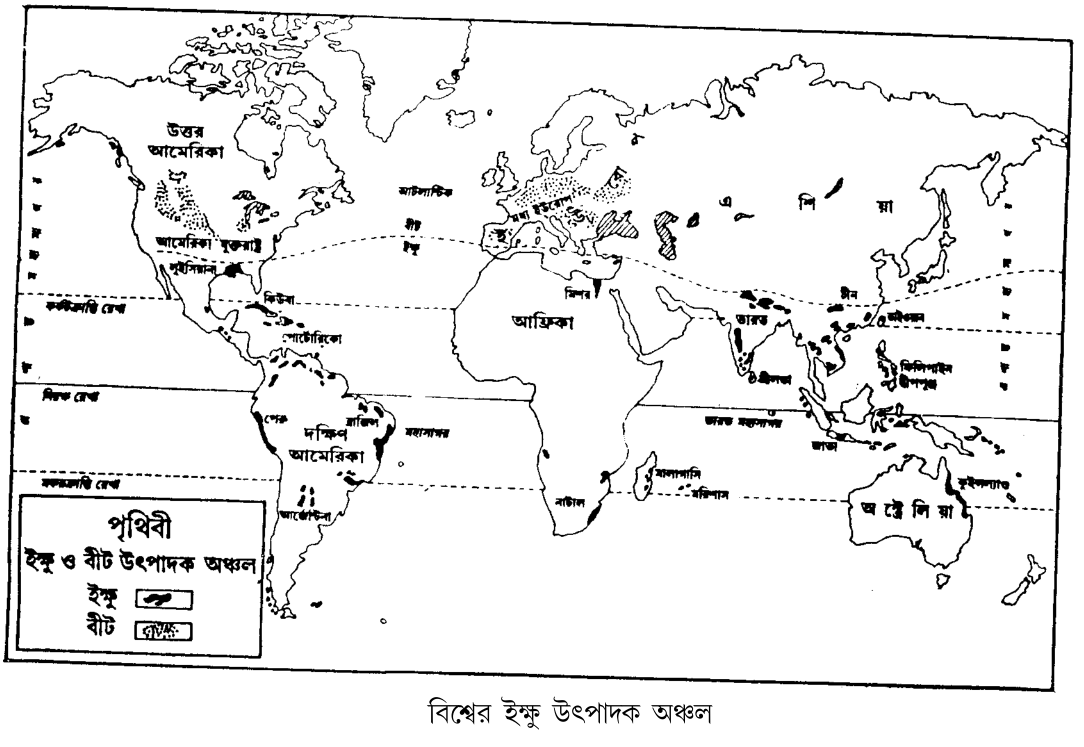

বিশ্বের ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চল

৪ (গ). ৬.১ ইক্ষু চাষের অনুকূল অবস্থা

ইক্ষু ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল। ২০° থেকে ২৭° সেলসিয়াস উষ্ণতা ও ১০০ থেকে ১৫০ সেমি. বৃষ্টিপাত আখ চাষের উপযোগী। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে আখের শর্করার পরিমাণ কমে যায়। চুন ও লবণ মিশ্রিত দোঁয়াশ মাটিতে আখ ভাল হয়।

৪ (গ). ৬.২ বিশ্বের প্রধান ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চল

(১) **ব্রাজিল**—১৯৯৯ খ্রিঃ মোট ৩৩.৩৪ কোটি মেট্রিক টন আখ উৎপাদন করে ব্রাজিল বিশ্বে **প্রথম** স্থান অধিকার করে। দেশের পূর্ব ও দক্ষিণভাগের উপকূলীয় অঞ্চলে সবেচেয়ে বেশি আখ উৎপন্ন হয়। ব্রাজিলের পূর্ব-মধ্য মালভূমি অঞ্চল আখ উৎপাদনে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। দেশের প্রায় অর্ধেক আখ এই অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। উর্বর মাটি ও উপযোগী জলবায়ু ব্রাজিলের এই অঞ্চলে আখচাষে সহায়তা করেছে।

বিশ্বে ঈক্ষু উৎপাদন : ১৯৯৯

দেশ	ইক্ষু উৎপাদন (কোটি মেট্রিক টন)	দেশ	হেক্টরপিছু উৎপাদন (কেজি)
ব্রাজিল	৩৩.৩৩	পেরু	১,১৫,০০০
ভারত	২৮.২২	কলম্বিয়া	৯৪,৭৮৬
চীন	৮.৯৪	অস্ট্রেলিয়া	৮৮,৯৬৯
পাকিস্তান	৫.৩১	চীন	৮৫,২৯৪
থাইল্যান্ড	৫.২৮	ব্রাজিল	৬৮,৫৭৯
অস্ট্রেলিয়া	৩.৬৯	ভারত	৬৮,০১২
কলম্বিয়া	৩.৬৯	থাইল্যান্ড	৫৫,৯১৪
কিউবা	৩.৫০	পাকিস্তান	৫০,২৭৯
পৃথিবী	১২৭.৪৭	পৃথিবী	৬৫,৬৯০

উৎস : FAO Production Year Book—1999, Published in 2001.

(২) **ভারত—**ইক্ষু উৎপাদনেও বিশ্বে ভারত **দ্বিতীয়**। ১৯৯৯ খ্রিঃ ভারত মোট প্রায় ২৮ কোটি ২২ লক্ষ মেট্রিক টন আখ উৎপাদন করে। ভারতের মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমির উত্তরপ্রদেশ, বিহার; উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পাঞ্জাব, হরিয়ানা; দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে অধিক পরিমাণে আখ উৎপাদিত হয়। দাক্ষিণাত্যের জলবায়ু ও মাটি আখচাষের বিশেষ উপযোগী। ভারতে হেক্টরপিছু মাত্র ৬৮,০১২ কেজি আখ উৎপন্ন হয়।

(৩) **চীন**—আখ উৎপাদনে চীনের স্থান **তৃতীয়**। চীনের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশগুলিতে যেমন হুনান, কিয়াংসু, ফুকিয়েন-এ প্রচুর আখচাষ করা হয়। হেক্টর পিছু আখ উৎপাদনে চীন ব্রাজিল ও ভারতের থেকে এগিয়ে। হেক্টরপিছু ৮৫,২৯৪ কেজি।

(৪) **পাকিস্তানের সিন্ধু অববাহিকা** ; (৫) **থাইল্যান্ডের** মেকং ও মেনাম অববাহিকা ; (৬) **অস্ট্রেলিয়ার** কুইন্সল্যান্ড ; (৭) **কিউবার** মাতানজাস থেকে হোলগুইন অঞ্চলের সামুদ্রিক জলবায়ুতে আখের চাষ ভাল হয়।

(গ) বাগিচা শস্য
[PLANTATION CROPS]
বা পানীয় শস্য
[BEVERAGE CROPS]

৪ (গ). ৭ চা

বাগানের মতো সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগিয়ে তার থেকে বছরের পর বছর ফসল তোলা হয় বলে চা, কফি, রাবারকে বলা হয় বাগিচা ফসল। বাগিচা ফসলের মধ্যে চা, কফি ও কোকো পানীয় ফসল।

৪ (গ). ৭.১ চা চাষের অনুকূল অবস্থা

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পানীয় ফসল হল চা। চা ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের পার্বত্য এলাকার বাণিজ্যিক শস্য। অধিক বৃষ্টিপাত (১৫০ থেকে ২৫০ সেমি.), মাঝারি উষ্ণতা (১৫° সে থেকে ২৫° সে), লৌহমিশ্রিত মাটি, পাহাড়ী ঢালু জমি চা চাষের উপযোগী।

৪ (গ). ৭.২ বিশ্বের প্রধান চা উৎপাদক অঞ্চল

(১) **ভারত** : চা উৎপাদনে ভারত বিশ্বে **প্রথম** স্থান অধিকার করে। ১৯৯৯ খ্রিঃ ভারত ৭.৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন চা উৎপন্ন করে। ভারতের অসম ও পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে সর্বাধিক বেশি চা চাষ হয়। ভারতের মোট চা উৎপাদনের ৫০ শতাংশ জন্মায় অসম-এ। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং সারা বিশ্বে উৎকৃষ্ট চায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় ভারতের মোট ২৫ শতাংশ চা উৎপাদন হয়। অসম-এর লখিমপুর, কামরূপ, দারাং, শিবসাগরের চা চাষ হয়। ত্রিপুরা, হিমাচল প্রদেশ, কেরালা, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর পার্বত্য অঞ্চলে কিছু চায়ের চাষ করা হয়। ভারতে হেক্টরপিছু চা উৎপাদন ১৫৪৯ কেজি। চা রপ্তানিতে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এবং প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে।

বিশ্বে চা-এর উৎপাদন : ১৯৯৯

দেশ	**চা উৎপাদন (কোটি মেট্রিক টন)**	**দেশ**	**হেক্টরপিছু উৎপাদন (কেজি)**
ভারত	৭.৪৯	জর্জিয়া	২০০০
চীন	৭.২৩	কেনিয়া	১৯৩০
শ্রীলঙ্কা	২.৮০	ভারত	১৫৯৪
কেনিয়া	২.২০	শ্রীলঙ্কা	১৪৭০
ইন্দোনেশিয়া	১.৫২	ইন্দোনেশিয়া	১৩৮৬
পৃথিবী	২৮.৭২	পৃথিবী	১২৫৪

উৎস : FAO Production Year Book—1999, Published in 2001.

(২) **চীন**—চা উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে চীন। তবে উৎপাদনশীলতার দিক থেকে চীন অনেক পিছিয়ে। মাত্র হেক্টর পিছু ৮৫৬ কেজি। ১৯৯৯ খ্রীঃ চীন ৭.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন চা উৎপাদন করে। চীনে প্রধানত সবুজ চা উৎপন্ন হয়। এ দেশের হুনান, নুপে, সেনসি, কিয়াংসি অঞ্চলে চাষ করা হয়।

(৩) **শ্রীলঙ্কা**—ভারতের মতো শ্রীলঙ্কা কালো চা উৎপন্ন করে। শ্রীলঙ্কা চা উৎপাদনে **তৃতীয়**। এ দেশের কাণ্ডি ও তার দক্ষিণে পার্বত্য অঞ্চলে উন্নতমানের চা চাষ করা হয়। অধিক বৃষ্টিপাত ও উপযোগী উষ্ণতা এখানে চায়ের মান ও পরিমাণ উভয়দিককে উন্নত করেছে। রপ্তানি বাণিজ্যে শ্রীলঙ্কা ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী।

(৪) **কেনিয়া**—পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়া চা উৎপাদনে বেশ উন্নত। এখানে হেক্টর পিছু চায়ের উৎপাদন অনেক বেশি। হেক্টরে ১৯৩০ কেজি। দেশের কিলিমাঞ্জারো পর্বতের পূর্ব ঢালে চা বাগিচাগুলি অবস্থিত। এরা বিদেশে প্রচুর চা রপ্তানি করে।

ইন্দোনেশিয়া—জাভা দ্বীপের পার্বত্য অঞ্চলে ; **তুরস্কের** টরাস পর্বতের দক্ষিণ ঢালে ; **জাপানের** হুনসু দ্বীপের পার্বত্য অঞ্চলে ; **বাংলাদেশের** সিলেট, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে চা চাষ হয়।

৪ (গ). ৮ কফি

বিশ্বের দ্বিতীয় প্রধান পানীয় শস্য হল কফি। কফি গাছের ফলের বীজ গুঁড়ো করে কফি উৎপন্ন হয়। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রধানত কফির চাষ হয়।

৪ (গ). ৮.১ কফি চাষের অনুকূল অবস্থা

প্রচুর বৃষ্টিপাত (১৫০ থেকে ২৫০ সেমি.), মাঝারি থেকে একটু বেশি তাপমাত্রা (২০° থেকে ৩০° সেলসিয়াস), উজ্জ্বল সূর্যকিরণ, অম্লধর্মী লাল দোঁয়াশ মাটি এবং ঢালু উঁচু জমি কফি চাষের উপযোগী।

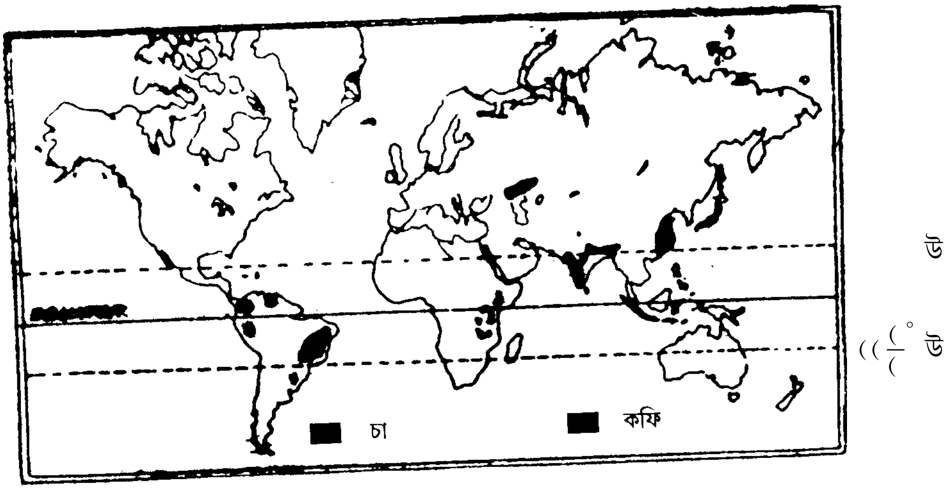

বিশ্বের চা ও কফি উৎপাদক অঞ্চল

৪ (গ). ৮.২ বিশ্বের প্রধান কফি উৎপাদক অঞ্চল

(১) **ব্রাজিল**—কফি উৎপাদনে ব্রাজিল অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে। ১৯৯৯ খ্রিঃ ১৬.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন কফি উৎপাদন করে ব্রাজিল বিশ্বে **প্রথম** স্থান অধিকার করেছে। এ দেশের সাওপলে অঞ্চলে অধিকাংশ কফি চাষ হয়। বাহিয়া, মিনাস গেরাইস কফি চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। ব্রাজিলে কফি বাগিচাকে বলা হয় 'ফাজেন্দা' (Fazchda)। অনুকূল জলবায়ু ও মৃত্তিকার জন্য এদেশে প্রাকৃতিক উপায়ে প্রচুর কফি জন্মায়। ব্রাজিলের অর্থনীতি কফি রপ্তানির ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কোনো কোনো বছর এত বেশি কফি উৎপন্ন হয় যে ভ্যালোরাইজেশন (Valorization) পদ্ধতিতে কফি পুড়িয়ে নষ্ট করে আন্তর্জাতিক বাজারে কফির দাম স্থিতিশীল রাখা হয়।

(২) **কলম্বিয়া**—কফি উৎপাদনে **দ্বিতীয়** স্থান অধিকার করে কলম্বিয়া। এদেশে কফি বাগিচাগুলি আন্দিজ পর্বতমালার ঢালে অবস্থিত। মেডিলিন, টোলিমা ও ম্যানিজালেস প্রধান কফি উৎপাদক অঞ্চল। কলম্বিয়া **দ্বিতীয়** প্রধান কফি রপ্তানিকারী দেশ। এদেশে উন্নতমানের সুগন্ধী কফি উৎপাদিত হয়।

(৩) **ভিয়েৎনাম** ও (৪) **ইন্দোনেশিয়া** যথাক্রমে **তৃতীয়** ও **চতুর্থ** স্থান অধিকার করে। কোট ডি ভয়রে ও **মেক্সিকো** কফি উৎপাদন ও রপ্তানিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

(৫) **ভারত**—কফি উৎপাদনে ভারতের স্থান **সপ্তম**। এদেশের প্রায় ৬০ শতাংশ কফি উৎপন্ন হয় কর্ণাটকের চিকমাগালুর, শিমোগা ও অন্যান্য অঞ্চলে। কেরালার কার্ডামম্ ও আনাইমালাই অঞ্চলে ভারতের মোট উৎপাদনের ২৫ শতাংশ উৎপন্ন হয়। অবশিষ্ট কফি উৎপন্ন হয় তামিলনাড়ুর নীলগিরি, পালনি পার্বত্য অঞ্চলে। দেশের চাহিদা কম থাকায় উৎপন্ন কফির অধিকাংশ বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

সারণি : কফি উৎপাদন : ১৯৯৯

দেশ	মোট উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	দেশ	হেক্টরপ্রতি উৎপাদন (কেজি)
ব্রাজিল	১৬.৩০	ভিয়েতনাম	২০০৫
কলম্বিয়া	৬.৪৮	কোস্টারিকা	২৫০০
ভিয়েতনাম৪.৮৭	গুয়াতেমালা	১৫৩৩	
ইন্দোনেশিয়া	৪.৫৫	ভারত	৯৪৬
কোটডিভোয়ার	৩.৬৫	কলম্বিয়া	৯৪৬
মেক্সিকো	৩.০৩	ব্রাজিল	৭৩৮
ভারত	২.৬৫	ইন্দোনেশিয়া	৫৩৯
পৃথিবী	৬৪.৭৬	পৃথিবী	৫৮২

উৎস : FAO Production Year Book—1999, Published in 2001.

৪ (খ).৯ কার্পাস

বিশ্বের তন্তুশস্যের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে কার্পাস চাষের অনুকূল পরিবেশ ও উপযুক্ত বস্ত্রশিল্প, পাটশিল্প তন্তু কার্পাসের মধ্যে তুলা ও পাট প্রধান। তুলা ও পাট থেকে উৎপন্ন তন্তু কার্পাস প্রকৃতিজাত শন।

৪ (খ).৯.১ কার্পাস চাষের অনুকূল অবস্থা

বিশ্বের প্রধান তন্তুশস্য হল কার্পাস বা তুলা। ২০° থেকে ২৫° সেলসিয়াস উষ্ণতা, ৫০ থেকে ২০০ সেমি. বৃষ্টিপাত, দীর্ঘ ও ভাল দোআঁশ মাটি ও হাল্কা জমি তুলা উৎপাদনের জন্য উপযোগী।

৪ (খ).৯.২ বিশ্বের প্রধান কার্পাস উৎপাদক অঞ্চল

(১) **চীন**—কার্পাস বা তুলা উৎপাদনে বিশ্বে **প্রথম** স্থান অধিকার করে চীন। চীনের প্রধান কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলগুলি হল হোয়াংহো ও ইয়াংসি নদী অববাহিকা। সিকিয়াং অববাহিকাতেও তুলা চাষ হয়। সেচুয়ান বা শানটুং, হুনান, হোপেই ও কিয়াংসু কার্পাস উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। জলসেচ ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে চীনের অঞ্চলে কেটন ও হেই অঞ্চলেও কার্পাস চাষ কিছু হয়।

বিশ্বে কার্পাস উৎপাদন : ১৯৯৯

দেশ	উৎপাদনের পরিমাণ (কোটি মেট্রিক টন)	দেশ	হেক্টরপিছু উৎপাদন (কেজি)
চীন	৩৮.৩০	উজবেকিস্থান	১১.০০
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	৩৬.৯১	তুরস্ক	৮.০২
ভারত	২০.৭৪	অস্ট্রেলিয়া	৭.১৬
পাকিস্তান	১৪.৯৫	ব্রাজিল	৪.৯৫
		পৃথিবী	১৮২.৪০

উৎস : FAO Production Year Book—1999, Published in 2001.

(২) **আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র**—পৃথিবীর **দ্বিতীয়** বৃহত্তম কার্পাস উৎপাদক দেশ হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। এ দেশের কার্পাস বলয় (Cotton Belt) মিসিসিপি অববাহিকায় টেক্সাস থেকে শুরু করে উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলিনা পর্যন্ত বিস্তৃত। কার্পাস উৎপাদনে প্রসিদ্ধ রাজ্যগুলি হল ক্যারোলিনা, মিসিসিপি, আলবামা, জর্জিয়া, টেক্সাস, আরাকানসাস, টেনেসি প্রভৃতি। বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিমে দুটি রাজ্য ক্যালিফোর্নিয়া ও অ্যারিজোনাতে কার্পাসের চাষ প্রসারলাভ করেছে। উন্নত কৃষিপদ্ধতি, উপযুক্ত জলসেচ ব্যবস্থা এদেশের কার্পাস উৎপাদনে সহায়তা করেছে।

(৩) **ভারত**—কার্পাস উৎপাদনে বিশ্বে ভারতের স্থান **তৃতীয়**। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলিতে কৃষ্ণমৃত্তিকা থাকায় মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণাংশে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণ মৃত্তিকা কার্পাসের চাষ ভাল হয় বলে একে **কৃষ্ণ কার্পাস মৃত্তিকা** (Black cotton soil) বলা হয়। বর্তমানে কার্পাস চাষ ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রসারলাভ করেছে। ভাকরানাঙ্গাল খালের জলসেচের সাহায্যে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানের উত্তরাংশে কার্পাস চাষ করা হচ্ছে। এই অঞ্চলে জলসেচসেবিত জমিতে উন্নতমানের কার্পাস জন্মায়। ভারতে অধিকাংশ কার্পাস ক্ষুদ্র ও মাঝারি আঁশযুক্ত।

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বস্ত্র উৎপাদনের জন্য ভারতকে বিদেশ থেকে দীর্ঘ আঁশযুক্ত কার্পাস আমদানি করতে হয়। কার্পাস ও কার্পাস বস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানিতে ভারত বিশ্বে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে।

পাকিস্তানের সিন্ধু উপত্যকা ও পশ্চিম পাঞ্জাব; উজবেকিস্তানের কাস্পিয়ান সাগর, আরল সাগর ও বলখাশ হ্রদের উপকূল অঞ্চল; তুরস্কের ইজিয়ান সাগর ও ভূমধ্যসাগরের উপকূলভাগ ; ব্রাজিলের সাওপলো ; মিশরের নীলনদী অববাহিকায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কার্পাস চাষ হয়। মিশরে দীর্ঘ আঁশযুক্ত সাগরদ্বীপীয় কার্পাসের চাষ হয়। তাই সারা বিশ্বে মিশরীয় কার্পাস (Egyptian cotton) সমাদৃত।

৪ (গ). ১০ পাট

বিশ্বের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ তন্তু ফসল হল পাট। পাটের আঁশ দীর্ঘ ও টেকসই। পাটের বিকল্প দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে পাটশিল্প প্রকট সমস্যার সম্মুখীন। বর্তমানে পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর ওই বিকল্প

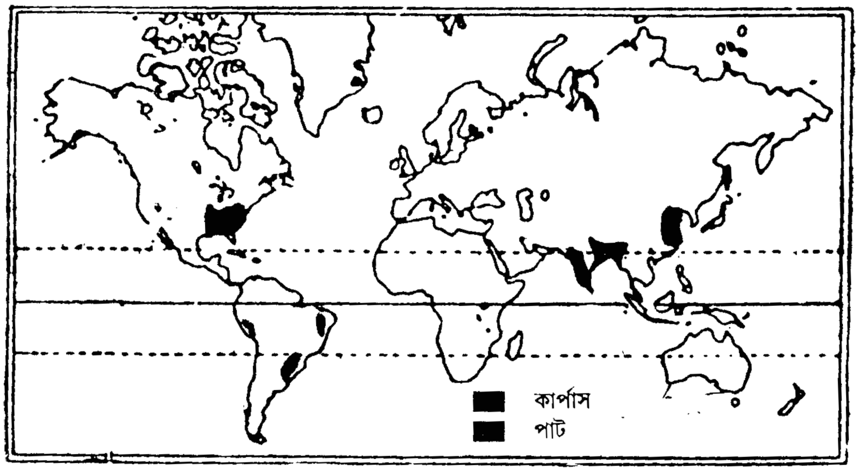

বিশ্বের কার্পাস ও পাট উৎপাদক অঞ্চল

দ্রব্যগুলির ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে এবং পরিবেশের পক্ষে তেমন ক্ষতিকর নয় বলে পাটের প্রতি মানুষের আস্থা ফিরে আসছে।

৪ (গ). ১০.১ পাট চাষের অনুকূল অবস্থা

পাট ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল। অধিক বৃষ্টিপাত (১৫০ থেকে ২০০ সেমি.) ও অধিক তাপমাত্রা (২৫° থেকে ৩৭° সে.) নবীন পলিমাটি এবং সমতল ভূমি পাটচাষের পক্ষে আদর্শ।

৪ (গ). ১০.২ বিশ্বে প্রধান পাট উৎপাদক অঞ্চল

(১) **ভারত**—পাট উৎপাদনে ভারতের স্থান **প্রথম**। পাট উৎপাদনের আদর্শ মৌসুমী জলবায়ু ও গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের নবীন পলিগঠিত সমভূমি থাকায় পশ্চিমবঙ্গ ও অসম-এ প্রচুর পাটচাষ হয়। ভারতের মোট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক পাট জন্মায় পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলায়। বিহারের গাঙ্গেয় সমভূমিতে পাটচাষ হয়। ওড়িশা ও ত্রিপুরায় কিছু কিছু পাটচাষ করা হয়। ভারত পূর্বে পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা অর্জন করেছে। এই রপ্তানির পরিমাণ ক্রমশ কমে আসায় পাটশিল্পের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়েছে।

(২) **বাংলাদেশ**—পাট উৎপাদনে বাংলাদেশের স্থান দ্বিতীয়। নদীবিধৌত বাংলাদেশের প্লাবন জমি পাট চাষের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা উপকূলের উর্বর পলিমাটিসমৃদ্ধ ময়মনসিং, ঢাকা, ফরিদপুর, পাবনা, রাজসাহী, বগুড়া, রং-পুর জেলা পাট উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। বাংলাদেশ একটি প্রধান পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানিকারী দেশ।

বিশ্বে পাট উৎপাদন : ১৯৯৯

দেশ	পাট উৎপাদন (কোটি মেট্রিক টন)	দেশ	হেক্টরপিছু উৎপাদন (কেজি)
ভারত	২০.৯০	চীন	২৬৭৫
বাংলাদেশ	৮.১৩	ভারত	১৭৪২
চীন	১.৭৬	বাংলাদেশ	১৬২৩
থাইল্যান্ড	০.৫৬	থাইল্যান্ড	১৫১৫
পৃথিবী	৩৩.২৭	পৃথিবী	১৭০৮

উৎস : FAO Production Year Book—1999, Published in 2001.

(২) **চীন**—চীন হেক্টরপিছু পাট উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। কিন্তু মোট পাট উৎপাদনে চীনের স্থান **তৃতীয়**। চীন দক্ষিণ-পূর্বে সিকিয়াং ও ইয়াং-সিকিয়াং নদীর নিম্ন অববাহিকায় পাটচাষের জন্য প্রসিদ্ধ। উৎপাদন কম ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা বেশি হওয়ায় চীন পাট বা পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে না।

থাইল্যান্ডের মেনাম ব-দ্বীপ ; মায়ানমারের ইরাবতী নিম্ন অববাহিকা ; ভিয়েৎনাম, ব্রাজিল ও নেপালে কিছু কিছু পাটচাষ করা হয়।

৪ (গ). ১১ সারাংশ

এই এককে আলোচনা করা হয়েছে কৃষিজ শস্যকে প্রধান ক'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রধান দুটি খাদ্যশস্য গম ও ধানের উৎপাদক অঞ্চল দেখান হয়েছে। গম ও ধান উভয় খাদ্যশস্য উৎপাদনে চীন পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। ইক্ষু উৎপাদনে ব্রাজিল, চা উৎপাদনে ভারত, কফি উৎপাদনে ব্রাজিল, তুলা উৎপাদনে চীন ও পাট উৎপাদনে ভারত বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে। উৎপাদক দেশের সঙ্গে হেক্টরপিছু উৎপাদনে কোন দেশ প্রধান তাও দেখান হয়েছে।

৪ (গ). ১১ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী :

১। শস্যের শ্রেণীবিভাগ করুন। প্রত্যেক রকম শস্যের উদাহরণ দিন। বিশ্বের গম উৎপাদক অঞ্চলসমূহের নাম উল্লেখ করুন।

২। ধান উৎপাদনে কোন কোন অঞ্চল উল্লেখযোগ্য?

৩। বিশ্বের কোন কোন অঞ্চলে আখ উৎপন্ন হয়?

৪। বিশ্বের চা উৎপাদক অঞ্চলগুলি কোথায় অবস্থিত?

৫। কফি উৎপাদনে বিশ্বে কোন কোন অঞ্চল অগ্রগতি লাভ করেছে?

৬। কোন কোন দেশে বেশি তুলা উৎপন্ন হয়?

৭। বিশ্বের পাট উৎপাদক অঞ্চলগুলি কোথায় অবস্থিত?

বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী :

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর—

(ক) গম উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে ————।

(খ) ———— ও ———— উৎপাদনে বিশ্বে ভারতের স্থান প্রথম।

(গ) হেক্টরপিছু গম উৎপাদনে ———— প্রথম স্থানে আছে।

(ঘ) দুটি বাগিচা ফসল হল ———— ও ————।

(ঙ) কফিগাছের ———— থেকে কফি উৎপন্ন করা হয়।

৪ (গ). ১৩ উত্তর সংকেত

৮। (ক) চীন

(খ) চা, পাট

(গ) আয়ারল্যান্ড

(ঘ) চা, কফি

(ঙ) ফসলের বীজ

একক ৪ (ঘ). ❑ খাদ্য সম্ভাবনা (Food Prospects)

গঠন

৪ (ঘ).১	**উদ্দেশ্য**
৪ (ঘ).২	**প্রস্তাবনা**
৪ (ঘ).৩	**খাদ্য সম্ভাবনার প্রেক্ষাপট**
৪ (ঘ).৪	**মাথাপিছু খাদ্যশস্য**
৪ (ঘ).৫	**বর্তমান ও ভাবী জনসংখ্যার চাহিদা পূরণে খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ততা**
৪ (ঘ).৬	**সারাংশ**
৪ (ঘ).৭	**অনুশীলনী**

৪ (ঘ). ১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- বিশ্বে উৎপাদিত মোট খাদ্যশস্যের পরিমাণ ;
- মাথাপিছু খাদ্যশস্য ;
- রপ্তানিকারক ও আমদানিকারক দেশসমূহ ;
- জনসংখ্যার চাহিদাপূরণে খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ততা।

৪ (ঘ). ২ প্রস্তাবনা

মানুষের জীবনধারণের অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ হল খাদ্যশস্য। খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রধানত নির্ভর করে কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ, প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর যা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন। অবশ্য, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেশি হলেই খাদ্য সমস্যা থাকবে না এ-কথা বলা যায় না। কোন দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন আশানুরূপ হলেও যদি সে দেশের জনসংখ্যা বেশি হয় তবে মাথাপিছু খাদ্যোৎপাদন পর্যাপ্ত হবে না এবং দেশে খাদ্য সমস্যার সৃষ্টি হবে। দেশের বর্তমান ও ভাবী জনসংখ্যার চাহিদাপূরণে খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ততা সম্পর্কে আলোচনা বর্তমান ও আগামী দিনে খাদ্য সমস্যার সৃষ্টি করবে কিনা তা জানার পক্ষে সহায়ক হবে।

৪ (ঘ). ৩ খাদ্য সম্ভাবনার প্রেক্ষাপট

আয়তন, জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের দিক থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। কোন দেশে জনবসতি ঘনত্ব খুব বেশি আবার কোন দেশে তা খুব কম। যেমন জাপানে বসতিঘনত্ব বর্গ

কিমিতে ৩৩৪ জন কিন্তু কানাডোতে তা মাত্র ৩ জন। সে রকম বিভিন্ন দেশে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ বিভিন্ন। রাশিয়ার আয়তন বিশ্বে সর্ববৃহৎ হলেও কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ অনেক কম। রাশিয়ার মোট আয়তন ১৬৮.৮৯ কোটি হেক্টর, কিন্তু কৃষিযোগ্য ভূমি মাত্র ১৩.২৩ কোটি হেক্টর। এ দেশের আয়তনের মাত্র ৮ শতাংশ কৃষিজমি। আবার ভারতে কৃষিযোগ্য জমি রাশিয়ার তুলনায় বেশি (১৬.৯৭ কোটি হেক্টর) হলেও মাথাপিছু কৃষিযোগ্য জমি রাশিয়ার (০.৮৯ হেক্টর) থেকে অনেক কম (মাত্র ০.১৯ হেক্টর)। অবশ্য কৃষিযোগ্য জমি বেশি থাকলে যে খাদ্য উৎপাদন বেশি হবে তা বলা যায় না। খাদ্য উৎপাদন নির্ভর করে কতকগুলি প্রাকৃতিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক অবস্থার ওপর। প্রাকৃতিক অবস্থাগুলি হল প্রধানত তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, ভূমিরূপ ও মৃত্তিকা এবং অর্থনৈতিক অবস্থাগুলি হল—অত্যাধুনিক কৃষিপদ্ধতি, উচ্চফলনশীল ও দ্রুতফলনশীল বীজ, সার ও কীটনাশক প্রয়োগ, কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার প্রভৃতি। আধুনিক কৃষিব্যবস্থা অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক অবস্থার ওপর অধিক নির্ভরশীল। যেসব দেশ এখনও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে এবং জৈবশক্তি ব্যবহার করে আদিম পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করে তাদের খাদ্য উৎপাদন অনেক কম। আর যেসব দেশ অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করে তাদের খাদ্য উৎপাদন অনেক বেশি। কৃষিযোগ্য জমি ভারতে ১৬.৯৭ কোটি হেক্টর হলেও খাদ্য উৎপাদন হয় মাত্র বছরে ২১.৩৩ কোটি মেট্রিক টন। চীনে কৃষিযোগ্য জমি মাত্র ৯.৫৮ কোটি হেক্টর কিন্তু খাদ্য উৎপাদন হয় বছরে প্রায় ৪১.৬৯ কোটি মেট্রিক টন।

সারণি—১

	কয়েকটি দেশে মোট জমি, কৃষিজমি ও মাথাপিছু কৃষিজমি			
দেশ	**মোট জমি (কোটি হেক্টর)**	**কৃষিযোগ্য-১৯৯৪**		**মাথাপিছু কৃষিযোগ্য জমি (হেক্টর)**
		আয়তন (কোটি হেক্টর)	**মোট জমির কত শতাংশ**	
রাশিয়া	১৬৮.৮৯	১৩.২৩	৮	০.৮৯
চীন	৯২.৯১	৯.৫৮	১০	০.০৮
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	৯১.৫৯	১৮.৭৮	২১	০.৭১
অস্ট্রেলিয়া	৭৬.৮২	৪.৭২	৬	২.৬৭
ভারত	২৯.৭৩	১৬.৯৭	৫৭	০.১৯
জাপান	৩.৭৭	০.৪৪	১২	০.০৪
ব্রি. যুক্তরাষ্ট্র	২.৪২	০.৫৯	২৫	০.১০
বাংলাদেশ	১.৩০	০.৮৭	৬৭	০.০৭
ইথিওপিয়া	১১.০০	১.১০	১০	০.২০
পৃথিবী	১৩৫৬.৪১	১২৩.৮৮	৯	০.২২

উৎস : World Resource : 1998-1999.

৪ (ঘ). ৪ মাথাপিছু খাদ্যশস্য

উন্নত দেশে উন্নত প্রথায় কৃষিকাজ করা হয়। তাদের জমিপিছু উৎপাদন অনেক বেশি। মোট উৎপাদনও বেশি। সেই সঙ্গে জনসংখ্যা কম থাকায় তাদের খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হয়। এসব দেশে মাথাপিছু খাদ্যশস্য উৎপাদন এবং মাথাপিছু খাদ্যশস্য ভোগের পরিমাণ অধিক। কানাডাতে মাথাপিছু খাদ্যশস্য উৎপাদন হয় ১৭১৫ কিলোগ্রাম। অস্ট্রেলিয়াতে ১৪১৫ কিলোগ্রাম। ভারতে মাথাপিছু খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন মাত্র ২৩০ কিলোগ্রাম, বাংলাদেশে ২৫১ কিলোগ্রাম এবং পাকিস্তানে ১৬২ কিলোগ্রাম। অনুন্নত ও উন্নতশীল দেশে কৃষিতে আধুনিকতার অভাবে ফলন কম হয়। সেইসঙ্গে লোকসংখ্যা অধিক হওয়ায় খাদ্যশস্যে ঘাটতি থাকে। মাথাপিছু খাদ্যশস্য ভোগের পরিমাণও অল্প।

সারণি—২

কয়েকটি দেশে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ও মাথাপিছু উৎপাদন—১৯৯৯

দেশ	জনসংখ্যা (কোটি)	মোট উৎপাদন (কোটি মেঃ টন)	মাথাপিছু উৎপাদন (কেজি)
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	২৭.৬২	৩৩.৬০	১২১৭
অস্ট্রেলিয়া	১.৮৭	৩.১১	১৬৬৩
ব্রি. যুক্তরাজ্য	৫.৯০	২.২০	৩৭২
চীন	১২৬.৬৮	৪৫.৭০	৩৬০
জাপান	১২.৬৫	১.২৩	৯৭
বাংলাদেশ	১২.৬৯	৩.১৮	২৫১
ইথিওপিয়া৬.১১	০.৮৪	১৩৭	
সোমলিয়া	০.৯৭	০.০২	২১
ভারত	৯৯.৮১	২৩.০০	২৩০

উৎস : FAO Production Year Book—1999, Published in 2001.

৪ (ঘ). ৫ বর্তমান ও ভাবী জনসংখ্যার চাহিদাপূরণে খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ততা

ম্যালথাস তাঁর জনসংখ্যা তত্ত্বে (১৭৯৮) বলেছিলেন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় গুণোত্তর প্রগতিতে (Geometrical Progression বা G.P.) এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় সমান্তর প্রগতিতে (Arithmetical Progression বা A.P.)। সুতরাং পৃথিবীতে খাদ্য সংকট অবশ্যম্ভাবী। ম্যালথাস তত্ত্বের পর দুশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। খাদ্য উৎপাদনের অভাবে বিশ্বে খাদ্য সংকট ঘটেছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে উৎপাদনও ঠিক সেই হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৯৭২ খ্রিঃ মিডো (Meadow) তাঁর **'দি লিমিটস্ টু গ্রোথ'** রিপোর্টে বলেছেন, জনসংখ্যার ভয়াবহ বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রযুক্তি বিদ্যার প্রসার ঘটানো সম্ভব নয় এবং এই বিপুল জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে না। বিশ্বে খাদ্যাভাব দেখা দেবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বিগত একান্ন বছরে জনসংখ্যা প্রায় আড়াইগুণ বৃদ্ধি পেলেও বিশ্বে খাদ্যাভাব দেখা যায়নি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উন্নত হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা। দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছে জমির উৎপাদন ক্ষমতা। বাড়ছে খদ্যশস্য উৎপাদন।

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বলেছেন বিশ্বে খাদ্যাভাব নেই। অভাব আছে শুধু সুষ্ঠু বণ্টনের। বিশ্বের কোনো কোনো দেশে খাদ্য উৎপাদন চাহিদার তুলনায় কম হলেও কোনো কোনো দেশে তা উদ্বৃত্ত হয়। পৃথিবীব্যাপী খাদ্যের বণ্টন ঠিকমতো হলে কোথাও খাদ্যভাব থাকে না।* কানাডা, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র চাহিদার তুলনায় বেশি খাদ্যশস্য উৎপন্ন করে এবং বিদেশে রপ্তানি করে। জাপান উন্নত প্রযুক্তি ও কৃষিপদ্ধতিতে প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপাদন করলেও অভ্যন্তরীণ চাহিদা বেশি হওয়ায় খাদ্যশস্য আমদানি করে। বাংলাদেশে, পাকিস্তান, ইরান, সোমালিয়া, ইথিওপিয়াতে অনুন্নত পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করা হয় বলে উৎপাদন অত্যন্ত কম। এরা বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করে ঘাটতি পূরণ করে। ভারত খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বাবলম্বী। বড় রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে ভারতকে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে হয় না। আধুনিক কৃষিপদ্ধতি কাজে লাগিয়ে ভারতে নিজস্ব খাদ্যশস্য উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি করার সুযোগ আছে।

পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি বর্তমান হারে বজায় থাকলে অদূর ভবিষ্যতে খাদ্য-সংকট হওয়ার সম্ভাবনা কম। কৃষি বিজ্ঞানীদের মতে বর্তমানে প্রাপ্ত কৃষিযোগ্য জমির উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করে ফসল উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি করা যায়। FAO-র এক রিপোর্টে বলা হয়েছে ২০১০ খ্রিঃ মধ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদন ৬৬ শতাংশ বাড়ানো সম্ভব। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে কৃষিজমির উৎপাদনক্ষমতা উন্নত দেশের অর্ধেক, কোথাও এক-তৃতীয়াংশ বা তারও কম। আয়ারল্যান্ডে হেক্টরপিছু গমের উৎপাদন ৮১৪৭ কেজি, ভারতে মাত্র ২৫৮৩ কেজি। অস্ট্রেলিয়াতে হেক্টরপিছু ধানের উৎপাদন ১০,০৭১ কেজি, ভারতে মাত্র ২৯২৯ কেজি। কৃষিবিজ্ঞানীদের মতে বর্তমানে আবিষ্কৃত জৈব-প্রযুক্তি (Bio-technology) কৃষিশস্য উৎপাদনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে।

৪ (ঘ). ৬ সারাংশ

আমরা জানি পৃথিবীর জনসংখ্যা বিপুল আকার ধারণ করেছে। এই অকল্পনীয় জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটাতে কোন দেশে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হচ্ছে তার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। জাপানে মাথাপিছু কৃষিজমি খুব অল্প হওয়ায় দেশে অতি উন্নত প্রথায় চাষ করেও অভ্যন্তরীণ খাদ্যের চাহিদা মেটানো যায় না। ফলে জাপান বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করে। ধনী দেশ হওয়ায় খাদ্য সমস্যা দেখা যায় না।

* সোমালিয়া, মালাউই, ইথিওপিয়াতে খাদ্যসংকট নিত্য ঘটনা। এদের আর্থিক অবস্থা এতই খারাপ যে খাদ্য সংগ্রহের মতো অর্থ এদের নেই। অমর্ত্য সেনের মতে বিশ্বে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের ওপর এদের স্বত্বাধিকার (Entitlement) নেই।

ইথিওপিয়াতে কৃষিযোগ্য জমি বেশি থাকলেও কৃষিতে আদিম পদ্ধতি চালু থাকায় প্রতি বছর খাদ্যসংকট দেখা যায়। সারা পৃথিবীর খাদ্য উৎপাদন বিবেচনা করলে দেখা যাবে খাদ্য সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আশা করা যায়, অদুর ভবিষ্যতে বর্দ্ধিত জনসংখ্যার চাহিদাপূরণেও খাদ্যশস্যের উৎপাদন সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে।

৪(ঘ).৭ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী :

১। বিভিন্ন দেশে মাথাপিছু কৃষিযোগ্য জমির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের খাদ্য সম্ভাবনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।

২। ভবিষ্যতের বিপুল জনসংখ্যার চাহিদাপূরণে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কেমন হওয়া প্রয়োজন? বিশ্বে খাদ্যশস্য সংকটের সম্ভাবনা আছে কী? আপনার মতামত দিন।

একক ৪ ❑ (ঙ). ভূমি ও বনভূমি

গঠন

৪ (ঙ).১ উদ্দেশ্য

৪ (ঙ).২ প্রস্তাবনা

৪ (ঙ).৩ বনভূমির ভূমিকা ও গুরুত্ব

৪ (ঙ).৪ বিশ্বের বনভূমির আয়তন

৪ (ঙ).৫ বিশ্বের কয়েকটি বনভূমির আয়তনও মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ

৪ (ঙ).৬ বনভূমির ক্ষয় ও বৃদ্ধি

৪ (ঙ).৭ উৎপাদনশীল বনভূমি

৪ (ঙ).৮ অনুৎপাদনশীল বনভূমি

৪ (ঙ).৯ চিরহরিৎ শক্তকাঠের বৃষ্টি অরণ্য

 ৪ (ঙ).৯.১ অবস্থান ও জলবায়ু

 ৪ (ঙ).৯.২ গুরুত্ব ও উপযোগিতা

৪ (ঙ).১০ চির সবুজ নরমকাঠের সরলবর্গীয় অরণ্য

 ৪ (ঙ).১০.১ অবস্থান ও জলবায়ু

 ৪ (ঙ).১০.১ গুরুত্ব ও উপযোগিতা

৪ (ঙ).১ ১ অরণ্যের উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা

৪ (ঙ).১২ অরণ্য সংরক্ষণ ও অরণ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি

৪ (ঙ).১৩ কৃষি বনসৃজন

৪ (ঙ).১৪ সামাজিক বনসৃজন

৪ (ঙ).১৫ সারাংশ

৪ (ঙ).১৬ অনুশীলনী

৪ (ঘ). ১ উদ্দেশ্য

বনভূমি এক অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই বনভূমি সম্পর্কে আমাদের সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই একককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- বিশ্বে বনভূমির বণ্টন;
- বনভূমির ব্যবহার ও গুরুত্ব;
- বিভিন্ন ধরনের বনভূমি ও এদের উপযোগিতা;
- বনভূমি সংরক্ষণের বিভিন্ন উপায়।

৪ (ঙ). ২ প্রস্তাবনা

মানুষের জীবনে বনভূমির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আদিম মানুষ তাদের খাদ্য, পরিধেয়, বাসগৃহ ইত্যাদির জন্য অরণ্যের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল ছিল। আজও সভ্য মানুষের জীবনকে অরণ্য নানাভাবে প্রভাবিত করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বনভূমির বৈচিত্র্য দেখা যায় এবং এই বৈচিত্র্যের কারণে সমভূমি থেকে আহরিত সামগ্রীর বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। বনভূমি শুধু নানাবিধ সামগ্রীর যোগান দেয় না, বনভূমি পরিবেশ দূষণের হাত থেকে মানবজীবন ও প্রাণীজীবনকে রক্ষা করে। এ-কারণে সাম্প্রতিক কালে নির্বিচারে বননিধন নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪ (ঙ). ৩ বনভূমির ভূমিকা ও গুরুত্ব

বিশ্বের অন্যতম প্রধান সম্পদ হল অরণ্যসম্পদ বা বনভূমি। মানুষ ও প্রাণীজীবনে বনভূমির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রাণীর জীবনবায়ু অক্সিজেন আসে উদ্ভিদ থেকে। উদ্ভিদ শুধু অক্সিজেন যোগান দিয়ে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীকুলকে বাঁচিয়ে রাখেনি সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ গ্রহণ করে বিষবাষ্প কার্বন ডাই-অক্সাইড। উদ্ভিদ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ না করলে পৃথিবীতে অধিক কার্বন ডাই-অক্সাইড জমে যেত। প্রাণীদের জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ত। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মত অনুযায়ী মানুষের সুষ্ঠু জীবনযাপনের জন্য বিশ্বের মোট স্থলভাগের ৩৩ শতাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ বনভূমি দ্বারা আবৃত থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বে বনভূমির পরিমাণ মোট স্থলভাগের মাত্র ২৬.৪৭ শতাংশ।

মানুষের অর্থনৈতিক কার্য সম্পাদনে বনভূমি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বনভূমির অর্থনৈতিক গুরুত্বকে দু শ্রেণীতে ভাগ করে দেখানো যায়। যথা—বনভূমির প্রত্যক্ষ সুবিধা ও পরোক্ষ সুবিধা।

বনভূমির প্রত্যক্ষ সুবিধাগুলি হল বনভূমি থেকে বাড়িঘর ও আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য কাঠ, তক্তা, প্লাইউড পাওয়া যায়। কাগজ তৈরির জন্য নরম কাঠ পাওয়া যায়। জ্বালানি কাঠ, পাতা, ফল, মূল, মশলা, খাদ্যদ্রব্য ও রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যায়। এইসব কাঁচামালের ওপর নির্ভর করে কাগজশিল্প, দেশলাই শিল্প, চর্মশিল্প, রংশিল্প, কৃত্রিম তন্তুশিল্প প্রভৃতি বহুশিল্প গড়ে উঠেছে।

বনভূমির পরোক্ষ সুবিধা হিসাবে ভূমিক্ষয় নিবারণ, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি, ঝড়ের গতিরোধ, মরুভূমির প্রসাররোধ, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা প্রভৃতি সুবিধা পাওয়া যায়।

৪(ঙ).৪ বিশ্বে বনভূমির আয়তন

পরিবেশবিজ্ঞানীদের মতে বিশ্বে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি দেশের মোট স্থলভাগের এক-তৃতীয়াংশ বা ৩৩ শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ দেশে বনভূমির পরিমাণ এই আকাঙ্ক্ষিত মাত্রার তুলনায় অনেক কম। মাত্র কয়েকটি দেশে বনভূমির পরিমাণ মোট ভূমিভাগের ৩৩ শতাংশের বেশি। পৃথিবীর সমগ্র স্থলভাগের আয়তন ১৩০৪.৮৩ মোট হেক্টর এবং মোট বনভূমির আয়তন ৩৪৫.৪৪ কোটি হেক্টর (World Resource '98-99)। অর্থাৎ বিশ্বের স্থলভাগের ২৬.৪৭ শতাংশ স্থান বনভূমি দ্বারা আবৃত।

৪(ঙ).৫ বিশ্বের কয়েকটি দেশে বনভূমির আয়তন ও মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ

বিষুবরেখার ওপর অবস্থিত কয়েকটি দেশে নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বৃষ্টিঅরণ্য ঘনসন্নিবেশিত হয়ে আছে। এসব দেশে স্থলভাগের অর্ধেকের বেশি অংশ অরণ্যাবৃত। আবার শীতল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ৫০° উত্তর থেকে ৭০° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে কোন কোন দেশের অর্ধেকের বেশি স্থলভাগ অরণ্যাবৃত। নিরক্ষীয় অঞ্চল ও শীতল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের দেশগুলি একসময় সম্পূর্ণ বনাবৃত ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বনভূমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে অবস্থিত বনভূমির আয়তন অনুযায়ী রাশিয়া **প্রথম** স্থান অধিকার করে। মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণের দিক থেকে **প্রথম** স্থানে আছে কানাডা এবং মোট স্থলভাগের শতাংশ হিসাবে বনভূমিতে **প্রথম** স্থান অধিকার করে জাপান। রাশিয়াতে মোট বনভূমির আয়তন ৭৬.৩৫ কোটি হেক্টর। জাপানের মোট ভূমিভাগের ৬৬.৫৮ শতাংশ অরণ্যে ঢাকা এবং কানাডাতে মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ ৮.১০ হেক্টর।

সারণি ১

কয়েকটি দেশে বনভূমি ও মাথাপিছু বনভূমি

দেশ	**বনভূমির আয়তন (কোটি হেক্টর)**	**বনভূমি মোট আয়তনের কত শতাংশ**	**মাথাপিছু বনভূমি (হেক্টর)**
রাশিয়া	৭৬.৩৫	৪৫.২১	৫.১৯
ব্রাজিল	৫৫.১১	৬৫.১৬	৩.৩৪
কানাডা	২৪.৪৬	২৬.৫৩	৮.১০
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	২১.২৫	২৩.২০	০.৭৮
চীন	১৩.৩৩	১৪.৩৪	০.১১
ইন্দোনেশিয়া	১০.৯৮	৬০.৬০	০.৫৩
কঙ্গো	১০.৯২	৪৮.১৭	২.২২
ভারত	৬.৫০	২১.৮৬	০.০৭
জাপান	২.৫১	৬৬.৫৮	০.২০
পৃথিবী	৩৪৫.৪৪	২৫.৪৭	০.৬০

উৎস : World Resource 1998-99.

৪(ঙ).৬ বনভূমির ক্ষয় ও বৃদ্ধি

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, নগরায়ণ, কৃষিক্ষেত্রের প্রসার, শিল্পাঞ্চলের প্রসারণ, পরিবহন পথনির্মাণ প্রভৃতি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য বনভূমি বিনষ্ট করা হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিশ্বের অর্ধেক বনভূমি ধ্বংস করা হয়েছে। বর্তমানে মানুষের সচেতনতার ফলে এবং বিভিন্ন দেশে বনভূমি সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য ক্ষয় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এখনও এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার দেশগুলিতে বছরে গড়ে প্রায় ০.৮ শতাংশ বনভূমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। কোনো কোনো দেশে অবশ্য বনভূমির আয়তন একটু একটু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারণি ২
বিশ্বে বনভূমির ক্ষয় ও বৃদ্ধি

দেশ	বনভূমির ক্ষয় (শতাংশ)	দেশ	বনভূমির বৃদ্ধি (শতাংশ)
মেক্সিকো	০.৯	ভারত	১.১
ইন্দোনেশিয়া	০.৮	ব্রাজিল	০.৫
পেরু	০.৩	আঃ যুক্তরাষ্ট্র	০.৩
কঙ্গো	০.২	কানাডা	০.১
চীন	০.১	রাশিয়া	০.০

উৎস : Human Development Report, 2000.

৪(ঙ).৭ উৎপাদনশীল বনভূমি

বিশ্বের সমস্ত বনভূমি মানুষের প্রত্যক্ষ ব্যবহারে লাগে না। কোনো অঞ্চলের বনভূমি বেশি ব্যবহৃত হয়। কোনো অংশের বনভূমি স্বল্প ব্যবহৃত হয়। মানুষের অর্থনৈতিক কাজে বেশি ব্যবহৃত হয় সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি। বিশ্বের মোট বনভূমির প্রায় ৩৫ শতাংশ জুড়ে আছে সরলবর্গীয় বনভূমি। উত্তর গোলার্ধে ৫০° থেকে ৭০° অক্ষাংশের মধ্যে এই বনভূমি অবস্থিত। এই বনভূমির গাছের কাঠ নরম। এই কাঠ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। বিশ্বের উৎপাদিত কাঠের প্রায় ৭০ শতাংশ পাওয়া যায় সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য থেকে। এই কাঠ থেকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাগজ উৎপাদন করা হয়। বিশ্বের মোট কাগজ উৎপাদনের ৯০ শতাংশ নরম কাঠ থেকে উৎপাদিত হয়। এছাড়া কৃত্রিম তন্তু, প্লাইউড, তক্তা, দিয়াশলাই, প্যাকিং বাক্স প্রভৃতি এই বনভূমির কাঠ থেকে উৎপন্ন হয়।

ক্রান্তীয় পর্ণমোচী অরণ্যও উৎপাদনশীল অরণ্য। এই অরণ্যের শক্ত কাঠের সাহায্যে বাসগৃহ নির্মাণ, আসবাবপত্র, যানবাহনের কাঠামো, নৌকা নির্মাণ করা হয়। জ্বালানিকাঠ পাওয়া যায়। বনভূমি থেকে মধু, মোম, লাক্ষা, ধুনো, গঁদ প্রভৃতি উপজাত দ্রব্য সংগ্রহ করা হয়।

৪(ঙ).৮ অনুৎপাদনশীল বনভূমি

ক্রান্তীয় ও নিরক্ষীয় বৃষ্টি অরণ্য বনজসম্পদ উৎপাদনে অত্যন্ত অনগ্রসর। আয়তনের দিক থেকে এই বনভূমি দ্বিতীয় স্থানে থাকলেও এই অরণ্য থেকে অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণে বনজসম্পদ আহরিত হয়। লতাপাতায় আচ্ছন্ন

নিবিড় এই বনভূমির অপ্রবেশ্যতা, উষ্ণ, আর্দ্র অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পোকামাকড়, বিষাক্ত সাপ ও হিংস্র জন্তু; পরিবহনের অসুবিধা ও একই প্রজাতির গাছ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে বলে একই রকম কাঠ সংগ্রহের অসুবিধা প্রভৃতি কারণে নিরক্ষীয় চিরসবুজ অরণ্য ততটা উৎপাদনশীল নয়। এই অরণ্যে বহু মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়। যেমন—মেহগনি, সেগুন, আয়রণ উড। এছাড়া কিছু গৌণ বনজ সম্পদ যেমন—পাম তেল, চুইংগাম, ব্রেজিলনাট, পাতা, ফল, মূল প্রভৃতি। এই কাঠ ও অন্যান্য সম্পদ কিছু কিছু আহরণ করা হয়।

৪(ঙ).৯ চিরহরিৎ শক্তকাঠের বৃষ্টিঅরণ্য

পৃথিবীর যে সব অঞ্চলে বছরে সবসময় বৃষ্টি হয় সে অঞ্চলের উদ্ভিদ সারাবছর সবুজ পাতায় ঢাকা থাকে এবং অরণ্য খুব ঘন হয়। এই অরণ্যের কাঠ বেশ শক্ত। একে চিরহরিৎ শক্তকাঠের বৃষ্টি অরণ্য বলা হয়।

৪ (ঙ). ৯.১ অবস্থান ও জলবায়ু

নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে ১০° উত্তর ও ১০° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত চিরহরিৎ শক্তকাঠের বৃষ্টি অরণ্য পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলের আমাজন অববাহিকা, পেরু, বলিভিয়া, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া ; আফ্রিকা মহাদেশের কঙ্গো অববাহিকায় কঙ্গো, ক্যামারুন, জাইরে, কাতাঙ্গা, উগাণ্ডা, বুরুশি ; এশিয়ার শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন্স ; নিরক্ষীয় অঞ্চলের বাইরে মধ্য আমেরিকার পানামা, নিকারাগুয়া, অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড ও নর্দান টেরিটরির উত্তর অংশে নিরক্ষীয় বৃষ্টি অরণ্য পরিলক্ষিত হয়।

নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারাবছর সূর্যকিরণ লম্বভাবে পড়ে বলে উষ্ণতা বেশি থাকে। এ অঞ্চলের বার্ষিক গড় উষ্ণতা প্রায় ২৭° সেলসিয়াস। নিরক্ষীয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যাধিক। এ অঞ্চলে প্রতিদিন বিকেলে পরিচলন বৃষ্টিপাত ঘটে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ সেমি.। কোনো কোনো অঞ্চলে ৩০০ সেমির বেশি বৃষ্টিপাত হয়। এই অরণ্যে সারাবছর বৃষ্টি হয় বলে একে নিরক্ষীয় বৃষ্টি অরণ্য বলা হয়। প্রতিদিন বৃষ্টি হওয়ার জন্য উদ্ভিদগুলিতে সারাবছর ধরে নতুন পাতা জন্মায় এবং গাছগুলি চিরসবুজ থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিকার চিরহরিৎ অরণ্যকে বলা হয় 'সেলভা' (Selva)।

৪ (ঙ). ৯.২ গুরুত্ব ও উপযোগিতা

নিরক্ষীয় অরণ্য পৃথিবীর একটি প্রধান অরণ্যভূমি। এই অরণ্য অত্যন্ত নিবিড়। বৃক্ষের বড় চওড়া পাতা ও গুল্ম অরণ্যের মাথার ওপর এমন নিশ্ছিদ্র আচ্ছাদন তৈরি করে যে দুপুরবেলাও সূর্যালোক মাটি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। অরণ্যের মধ্যে সবসময় এক অন্ধকারাচ্ছন্ন, স্যাঁতসেঁতে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করে। এজন্য এ অঞ্চলকে চির গোধুলি অঞ্চল (Land of eternal twilight) বলা হয়। সূর্যালোক পাওয়ার জন্য গাছগুলি বেশ লম্বা হয়। এই অরণ্যে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ পাশাপাশি জন্মায়। একসঙ্গে এক প্রজাতির উদ্ভিদ দেখা যায় না। প্রতি হেক্টরে প্রায় ২০ থেকে ৪০ প্রজাতির গাছের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়।

নিরক্ষীয় অরণ্যের বনজসম্পদ খুবই উপযোগী। এই বনের কাঠ খুব শক্ত ও মূল্যবান। এগুলি মানুষের বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। রোজ উড, আয়রণ উড, মেহগনি, রাবার, আবলুস প্রভৃতি কাঠ গৃহনির্মাণ ও আসবাবপত্র নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়। মেহগনি কাঠের আসবাবপত্র অত্যন্ত উন্নতমানের। এই অরণ্যের প্রায় সমস্ত কাঠ ভারী হলেও বালসা কাঠ বেশ হালকা, মজবুত এবং শব্দ প্রতিরোধক। বিমানের কামরা নির্মাণ করতে, হিমায়ন

যন্ত্র নির্মাণে এই কাঠ বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। এবনি ও রাবার গাছের কাঠ থেকে আসবাবপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উৎপন্ন করা হয়।

কাঠ ছাড়াও নিরক্ষীয় বনভূমি থেকে প্রচুর পরিমাণে গৌণ বনজসম্পদ সংগৃহীত হয়। রাবার হল এই অঞ্চলের অতি মূল্যবান বনজ সম্পদ। 'হেভিয়া ব্রাসিলিয়েনসিস' গাছের রস (Latex) থেকে রবার উৎপন্ন হয়। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও অন্যান্য নিরক্ষীয় দেশগুলিতে বাগিচা ফসল হিসাবে রাবারের চাষ করা হয়। ব্রাজিল নাট নামে এক ধরনের বাদাম পাওয়া যায় যা একটি উৎকৃষ্ট প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য। জাপোটা গাছের দুধের মতো সাদা রস থেকে চুইং গাম তৈরি হয়। তৈলপাম গাছের বীজ থেকে পাম তেল পাওয়া যায়। সাবান ও মার্জারিন তৈরির জন্য বারাসু গাছের ফল ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন গাছের শিকড়, আঠা, ফল, বীজ, পাতা ছাল থেকে জীবনদায়ী ঔষধ উৎপন্ন হয়। টাগুয়া নাট থেকে বোতাম তৈরি হয়।

নিরক্ষীয় অরণ্যের কাঠ জ্বালানি হিসাবে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

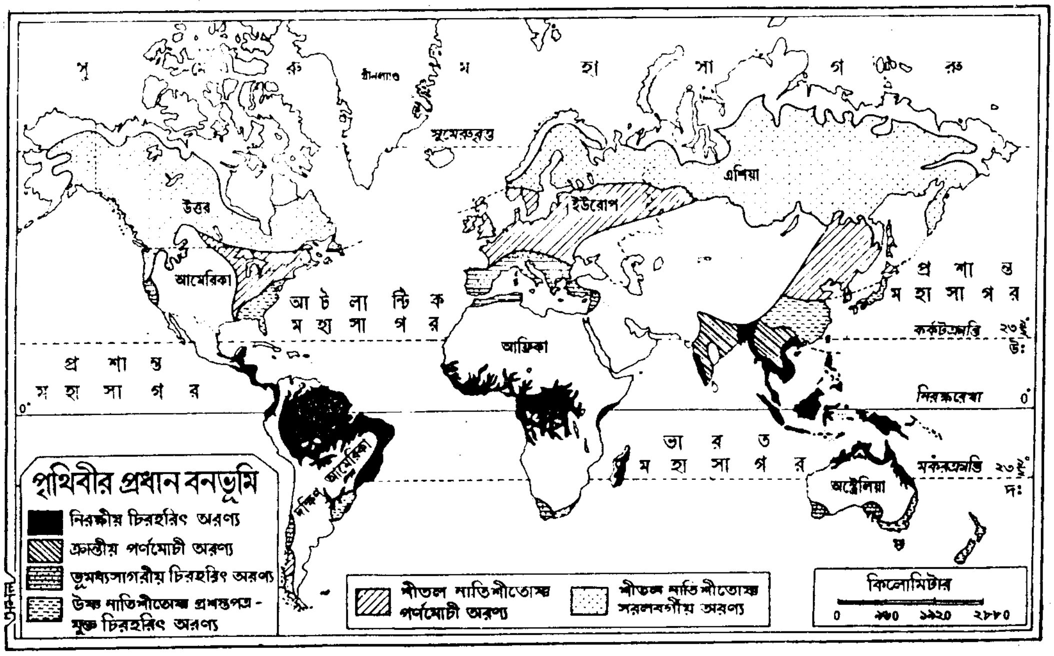

৪(ঙ).১০ চিরসবুজ নরমকাঠের সরলবর্গীয় অরণ্য

উত্তর গোলার্ধের স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত শীতল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে একপ্রকার চিরসবুজ উদ্ভিদ দেখা যায় যেগুলোর আকৃতির মোচার মতো। গাছগুলো গোড়ার দিক থেকে পরপর সরু হয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে। গাছের আকৃতি সরল ও লম্বা। পাতা সরু ও ছুঁচালো। এই অরণ্যকে চিরসবুজ নরমকাঠের সরলবর্গীয় অরণ্য বলা হয়।

৪ (ঙ). ১০.১ অবস্থান ও জলবায়ু

উত্তর গোলার্ধের ৫০° থেকে ৭০° উত্তর অক্ষাংশে সরলবর্গীয় অরণ্য পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য অধিকাংশ সরলবর্গীয় অরণ্য ৫৫° উত্তর থেকে ৬৫° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে ঘনীভূত। উত্তর আমেরিকা মহাদেশের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাংশে, রকি পার্বত্য অঞ্চল, আলাস্কা, কানাডা, ইউরোপের নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়ার পশ্চিমাংশ ; এশিয়া মহাদেশের রাশিয়ার সাইবেরিয়া, জাপানের হোক্কাইডো দ্বীপে ঘন সরলবর্গীয় অরণ্য দেখা যায়।

সরলবর্গীয় অরণ্যের গৌণ অঞ্চলগুলি হল চীনের উত্তরাংশ, ভারতের হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, চিলি আর্জেন্টিনার আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চল, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণের পার্বত্য এলাকা। দক্ষিণ গোলার্ধের ৫০° থেকে ৭০° দক্ষিণ অক্ষাংশে স্থলভাগ কম থাকায় সরলবর্গীয় নরমকাঠের অরণ্য তেমন গড়ে উঠতে পারেনি।

সরলবর্গীয় অরণ্য অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন উষ্ণতা ১০° সেলসিয়াস-এর বেশি হয় না। শীতকালে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে যায় এবং প্রচণ্ড তুষারপাত হয়। এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত খুব অল্প। বছরে গড় বৃষ্টিপাত ২৫ সেমি বা তার কম। বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় এবং পুরু বরফে মাটি ঢাকা থাকায় গাছ খুম কম জল সংগ্রহ করতে পারে। সংগৃহীত জল যাতে বাষ্পমোচনের মাধ্যমে বেরিয়ে না যায় সেজন্য গাছের পাতা সরু ও ছুঁচালো হয়। এরকম পাতায় আর একটি সুবিধা হল বরফপাতের সময় পাতায় বরফ জমে থাকতে পারে না। শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় মাটি ৮-৯ মাস বরফে ঢাকা থাকে, তাই বনের মাটিতে, লতা-গুল্ম জন্মাতে পারে না। ফলে অরণ্যভূমিতে পরিষ্কার থাকে। বনের ভিতর দিয়ে সহজে যাতায়াত করা যায়।

৪ (ঙ). ১০.২ গুরুত্ব ও উপযোগিতা

বিশ্বের অরণ্যগুলির মধ্যে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্যের বাণিজ্যিক গুরুত্ব সর্বাধিক। বিশ্বের মোট বনজ সম্পদের ৮০ শতাংশ আসে সরলবর্গীয় বনভূমি থেকে। এই অরণ্যে পাইন, ফার, ডগলাস, ফার, বার্চ, উইলো, অলডার, অ্যাসপেন প্রভৃতি মূল্যবান উদ্ভিদ দেখা যায়। সরলবর্গীয় অরণ্যের সমস্ত কাঠ নরম ও হাল্কা। এই অরণ্যের প্রত্যক্ষ উপযোগিতা হল :

(১) **নির্মাণ কাজে** : গৃহনির্মাণ, আসবাবপত্র তৈরিতে, জাহাজ ও নৌকা তৈরির জন্য, যানবাহনের প্রকোষ্ঠ নির্মাণে সরলবর্গীয় অরণ্যের নরম হাল্কা কাঠ বিশেষ উপযোগী।

(২) **কাগজ উৎপাদনে** : কাগজ উৎপাদনের একটি প্রধান কাঁচামাল হল সরলবর্গীয় অরণ্যের নরম কাঠের কাষ্ঠমণ্ড। পৃথিবীর প্রায় ৯০ শতাংশ কাগজ নরম কাঠের কাষ্ঠমণ্ড থেকে উৎপাদন করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সবচেয়ে বেশি কাষ্ঠমণ্ড উৎপাদন ও রপ্তানি করে।

(৩) **কৃত্রিম তন্তু** : এই অরণ্যের নরম কাঠ থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেলুলোজ উৎপাদন করা হয় যার থেকে পাওয়া যায় রেয়ন ও সিন্থেটিক তন্তু। স্প্রুস গাছের কাঠ থেকে উৎকৃষ্ট মানের রেয়ন প্রস্তুত করা হয়।

(৪) **প্লাইউড** : বাড়িতে ব্যবহৃত আসবাবপত্র ও অন্যান্য বহু কাজে যে প্লাইউড ব্যবহৃত হয় তার সবই আসে সরলবর্গীয় অরণ্য থেকে।

(৫) **অন্যান্য সামগ্রী** : দিয়াশলাই, প্যাকিং বাক্স, খেলনা ও অন্যান্য বহু জিনিস নরমকাঠ থেকে উৎপন্ন করা হয়।

(৬) **উপজাত দ্রব্য** : সরলবর্গীয় অরণ্যের পাইনগাছ থেকে তার্পিন তেল পাওয়া যায়। রংয়ের কাজেও এই তেল ব্যবহৃত হয়।

৪(ঙ).১১ অরণ্যের উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা

অরণ্য একটি পুনর্ভব সম্পদ। প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদনের তুলনায় ব্যবহার বেশি হওয়ায় এই সম্পদ দ্রুত ক্ষয় পেতে চলেছে। অরণ্য সংরক্ষণ তাই একান্তভাবে প্রয়োজন। কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নতি নির্ভর করে অরণ্যের ওপর। বনভূমির প্রত্যক্ষ উপযোগিতা হিসাবে যেমন কাঠ, ফল, ফুল, পাতা, ছাল, মূল ও অন্যান্য উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। তেমনি পরোক্ষ উপযোগিতা হিসাবে অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্য রক্ষা, মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ পরিবেশকে রক্ষা করা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রাষ্ট্রসংঘের বিধান অনুযায়ী পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্রতিটি দেশে তার ভৌগোলিক আয়তনের কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ বনভূমি আচ্ছাদিত থাকা প্রয়োজন।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে জনগণের একটি বড় অংশ অরণ্যের ওপর নির্ভর করে জীবনযাপন করে। এই দেশগুলিতে অরণ্যের উৎপাদনশীলতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

প্রতিবছর প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক নানা কারণে বনভূমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তবে মানুষের দ্বারাই বনভূমি অধিকাংশ সময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি, বনভূমিকে রূপান্তরিত করা, অতিমাত্রায় কাষ্ঠসংগ্রহ, কারখানা-রাস্তাঘাট নির্মাণ, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, স্থানান্তর কৃষি, অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণ প্রভৃতির জন্য অরণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

৪(ঙ).১২ অরণ্য সংরক্ষণ ও অরণ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি

সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নানারকম পদ্ধতি গ্রহণ করে অরণ্য সংরক্ষণ করা যায়। নিম্নে কয়েকটি প্রধান প্রধান উপায় দেওয়া হল :

(১) **অরণ্যকে অন্য কাজে ব্যবহার বন্ধ করা** : জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রয়োজন হচ্ছে আরও বেশি কৃষিজমির। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় বনভূমি বিনষ্ট করে কৃষিজমির সম্প্রসারণ ঘটানো হয়। শিল্পাঞ্চল, রাস্তাঘাট তৈরির জন্য বনভূমি কেটে ফেলা হয়। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জলাশয় নির্মাণের জন্য বিস্তীর্ণ এলাকার বনভূমি ধ্বংস করা হয়। এসব কাজে যাতে বনভূমি বিনষ্ট না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। কৃষিজমি, শিল্পাঞ্চল সম্প্রসারণের জন্য পতিত জমি ব্যবহার করা যেতে পারে।

(২) **অরণ্যসৃজন** : পতিতজমি এবং অনাবাদী জমিতে নতুন বনভূমি সৃষ্টি করতে হবে। যেসব অঞ্চলে পূর্বে অরণ্য ছিল, প্রাকৃতিক ও মানবিক কারণে অরণ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে সেসব অঞ্চলে পুনরায় অরণ্য সৃষ্টি করার প্রয়াস চলছে।

(৩) **যথেচ্ছ বৃক্ষচ্ছেদন নিয়ন্ত্রণ** : অরণ্যের দরিদ্র অধিবাসী এবং বিশেষত চোরাশিকারীরা যথেচ্ছ গাছ কেটে শহরে চালান দেয়। পরিণত গাছ ফুরিয়ে গেলে তারা অপরিণত গাছ কাটতে থাকে। এভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বনভূমি ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষের সীমাহীন চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে অবিবেচকের ন্যায় বৃক্ষনিধন না করে নিয়ন্ত্রিতভাবে বৃক্ষচ্ছেদন করতে হবে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কেবল পরিণত বৃক্ষ কাটতে হবে, যাতে পাশাপাশি চারাগাছ ক্ষতিগ্রস্ত

না হয় তা দেখতে হবে। একটি গাছ কাটা হলে তার পরিপূরক একাধিক গাছ বসাতে হবে। তবেই বনাঞ্চলের স্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব হবে। বনাঞ্চলে চোরাশিকারীদের প্রবেশ কঠোর হাতে নিষিদ্ধ করতে হবে।

(৪) **পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ** : যথেচ্ছ পশুচারণের ফলে অরণ্যের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়। নরম চারাগাছ খেয়ে ফেলে পশুরা গাছের বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটায়। পশুচারণের জন্য নির্দিষ্ট তৃণভূমিকে পশুচারণক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।

(৫) কীট-পতঙ্গের কবল থেকে গাছকে রক্ষা করার জন্য কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহার।

(৬) **দাবানলের (Forest Fire) সম্ভাবনা রোধ** : পৃথিবীর বহু দেশে দাবানলের কারণে বহু গাছ বিনষ্ট হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কোনো কোনো বছর ১ লক্ষ দাবানল সৃষ্টি হয় এর ফলে বহুকোটি ডলার মূল্যের বৃক্ষ বিনষ্ট হয়। (৭) অনেক ক্ষেত্রে কলকারখানা থেকে নির্গত দূষিত পদার্থ ও ধোঁয়া বৃষ্টিপাতের সঙ্গে মিশে অম্ল-বৃষ্টি (acid rain) সৃষ্টি করে এবং তা অরণ্যের ওপর পড়ে অরণ্য বিনাশ করে। এ-ধরনের দূষণ রোধ করে অরণ্য সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৮) **কাঠের বিকল্প** : মাত্রাতিরিক্ত কাঠ সংগ্রহের জন্য অরণ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আসবাবপত্র ও ঘরের দরজা জানলা নির্মাণের জন্য কাঠ ছাড়া অন্য উপকরণ ব্যবহার করলে অরণ্য ধ্বংস রোধ করা যেতে পারে। জ্বালানি কাঠের বিকল্প হিসাবে অন্য জ্বালানি ব্যবহার করলে বনের গাছ কাটা কমবে।

(৯) **জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি** : অরণ্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন দেশের জনগণের সচেতনা বৃদ্ধি করা। বনভূমির উপকারিতা ও বনভূমির ধ্বংসের ভয়াবহতা সম্বন্ধে মানুষকে অবহিত করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের উদ্যোগে বনাঞ্চলের আশপাশের মানুষদেরকে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মানুষকে বুঝাতে হবে কীভাবে বন থেকে আমরা উপকৃত হই।

(১০) **সরকারি নীতি** : বনআইন প্রণয়ন করে এবং বিভিন্ন অরণ্যসৃজন প্রকল্প গ্রহণ করে বনভূমি সম্প্রসারণ ও বনভূমি রক্ষা বিষয়ে সচেষ্ট হয়েছে। তার মধ্যে সমাজভিত্তিক বনসৃজন, নগর বনায়ন, যৌথ বন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। বন মহোৎসব, অরণ্যসপ্তাহ পালন প্রভৃতি ব্যবস্থার মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ ও বনসৃজনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কিছু বনাঞ্চলকে সংরক্ষিত অরণ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে সরকারি অনুমতি ব্যতীত গাছ কাটা নিষেধ।

(১১) **আন্তর্জাতিক উদ্যোগ** : বনভূমি রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য বিশ্বের প্রতিটি দেশ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলিতে অরণ্য ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত 'বসুন্ধরা শীর্ষ বৈঠক' (Earth Summit)-এ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য উন্নত দেশের প্রতিনিধিরা অরণ্য বৃদ্ধির জন্য যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

৪(ঙ).১৩ কৃষি বনসৃজন (Agro-forestry)

কৃষিকার্যের সঙ্গে কৃষিজমির চারপাশে, অনাবাদী পতিত জমিতে, বাড়ির লাগোয়া ফাঁকা জমিতে পরিকল্পিতভাবে যে বনসৃজন করা হয় তাকে বলা হয় কৃষি বনসৃজন। পুকুর, ডোবা এবং নালার পাড়েও কৃষি বনসৃজন করা হয়। কৃষক যেমন কৃষিজমি থেকে শস্য উৎপাদন করে তেমনি এইরকম বন থেকে কাঠ, ফল, ফুল, পাতা ও অন্যান্য বনজদ্রব্য সংগ্রহ করে। কৃষক তার গৃহ নির্মাণের সামগ্রী যথা কাঠ, তক্তা, খুঁটি ও অন্যান্য দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্য এসব উদ্ভিদ থেকে পেতে পারে।

কৃষি বনসৃজনে সাধারণত কৃষকেরা ব্যবহারের উপযোগী ও বাজারে বিক্রিয় উপযোগী উদ্ভিদ লাগানো হয়। পতিত জমি বা বাড়ি লাগোয়া ফাঁকা জমিতে কাঠের জন্য নিম, শাল, সেগুন, শিরিষ, ইউক্যালিপটাস লাগানো হয়। ফলের জন্য লাগানো হয় আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, কুল, জাম, জামরুল প্রভৃতি গাছ। পুকুরপাড়ে কলা, নারকেল, সুপারি, তাল, খেজুর ; জমির চারপাশে নারকেল, সুপারি, বাবলা প্রভৃতি গাছ লাগানো হয়।

কৃষি বনসৃজনের উপকারিতা : (১) কৃষি বনসৃজন কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটায়। কাঠ ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ দ্রব্য বিক্রি করে তার আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। (২) কৃষিজমির চারপাশে, পুকুরপাড়ে এবং বাস্তুভিটার ভূমিক্ষয় নিবারণ করা যায়। (৩) পুষ্টিকর প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য যথা ফল, বীজ পাওয়া যায়। (৪) জ্বালানি কাঠের সাশ্রয় হয়। (৫) জমিতে জৈবসারের পরিমাণ বাড়ানো যায়। (৬) পরিবেশ দূষণ রোধ করা যায়, বাড়ির চারপাশ শীতল থাকে। (৭) পশুখাদ্য পাওয়া যায়। (৮) নিম, বাসক, অর্জুন প্রভৃতি গাছ থেকে ভেষজ, ঔষধ পাওয়া যায়।

কৃষি বনসৃজনের অসুবিধা : কৃষি বনসৃজনের তেমন কোনো অপকারিতা নেই। অনেকসময় দ্রুত লাভ পাওয়ার আশায় ইউক্যালিপটাস জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করা হয় যা কৃষিজমির ক্ষতি করতে পারে। কারণ এই গাছ নাকি মাটি থেকে প্রচুর জল শোষণ করে ফলে অন্যান্য উদ্ভিদ জলাভাবে বাড়তে পারে না।

৪(ঙ).১৪ সামাজিক বনসৃজন (Social Forestry)

সম্প্রতি ভারত এবং কয়েকটি উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে নূতন এক ধরনের বনসৃজনের চেষ্টা চলছে যাকে বলা হয় সামাজিক বনসৃজন। এ-সব দেশে জনসংখ্যার প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ গ্রামে বাস করে। গ্রামবাসীরা বনভূমির প্রায় ৫০ শতাংশ কাঠ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে অরণ্যের মূল্যবান বৃক্ষের বিনাশ ঘটে।

বনভূমির এই অপচয় রোধের জন্য সুলভে জ্বালানীর ব্যবস্থা করা এবং গ্রামবাসীদের চাহিদা অনুযায়ী বনভূমিকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে বনসৃজন করাই হল সামাজিক বনসৃজনের মূল উদ্দেশ্য। এক কথায় বলা যায়, বনভূমিকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করে সমাজের উন্নতি বিধান করাই হল সামাজিক বনসৃজনের মূল উদ্দেশ্য।

সামাজিক বনসৃজনের ঘোষিত কর্মসূচীর প্রধান অঙ্গ হল : (১) অব্যবহৃত ও পতিত জমিতে বৃক্ষরোপণ, (২) রেলপথ, সড়ক, খাল ও পুষ্করিণীর ধারে বৃক্ষরোপণ, (৩) গ্রামবাসীদের ইন্ধন বা জ্বালানীর চাহিদাপূরণের জন্য ইন্ধন বা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত কাঠ সরবরাহকারী বৃক্ষরোপণ। সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প থেকে জ্বালানী কাঠ ছাড়া নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত কাঠ, তক্তা, ফলমূল, পশুখাদ্য ও অন্যান্য বনজ দ্রব্য পাওয়া যায়।

সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পে বিভিন্নরকম গাছ লাগানো হয় যেমন ইউক্যালিপটাস, বাবলা, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, নিম, মেহগনি, কুসুম, বকুল, দেবদারু, আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বাঁশ, আকাশমনি প্রভৃতি। মালভূমি অঞ্চলে শাল, সেগুন, কেঁদ, অর্জুন, মহুয়া প্রভৃতি রোপণ করা হয়।

সামাজিক বনসৃজনের উপকারিতা : (১) এ-ধরনের বনসৃজনের মাধ্যমে সমাজের দুঃস্থ জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি ঘটানো যায়, (২) স্থানীয়ভাবে জ্বালানী গৃহনির্মাণের কাঠ, তক্তা, পশুখাদ্য পাওয়া যায়। (৩) পতিত, অনাবাদী,

ফাঁকা জমির উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হয়। (৪) কর্মসংস্থান হয়। (৫) সমাজকে পরিবেশদূষণের হাত থেকে বাঁচানো যায়। (৬) ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়। (৭) মানুষ বোঝাপড়া করে চলে বলে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায়।

সামাজিক বনসৃজন কার্যকরী করার জন্য ভারতে সরকারি উদ্যোগে সর্বপ্রথম ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে এক পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয় যার প্রধান উদ্দেশ্য ভারতের ১৫৭টি জেলাতে যেখানে ইন্ধন বা জ্বালানী সরবরাহকারী বৃক্ষের তীব্র অভাব রয়েছে সেসব জেলাতে দ্রুত-বর্ধনশীল ইন্ধন সরবরাহকারী বৃক্ষরোপণ।

সামাজিক বনসৃজনের অসুবিধা : সামাজিক বনসৃজনের সর্বাপেক্ষা বড় অসুবিধা হল সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয় বলে এর ধারাবাহিকতা থাকে না। ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেউ গাছ রক্ষা করতে এগিয়ে আসে না। একবার ফসল তোলার পর অর্থাৎ গাছ কেটে নেওয়ার পর আর গাছ লাগানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আশির দশক থেকে নব্বই-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতে সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প ভালোভাবে চললেও বর্তমানে এর অবস্থা আশাব্যঞ্জক নয়।

৪(ঙ).১৫ সারাংশ

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকে পৃথিবীতে জীবনধারণ করতে হলে অরণ্য প্রয়োজন। অরণ্যের গুরুত্ব কী? কোনো কোনো দেশে বেশি এবং কোনো কোনো দেশে প্রয়োজনের তুলনায় কম বনভূমি আছে এই এককে তা আলোচিত হয়েছে। ক্রান্তীয় বৃষ্টিঅরণ্যে শক্তকাঠ পাওয়া যায়। এই অরণ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য তাই বনজসম্পদ সংগ্রহ করা কঠিন। সরলবর্গীয় বনভূমির কাঠ নরম। এই নরম কাঠ কাগজ উৎপাদনের উৎকৃষ্ট কাঁচামাল। বনভূমি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এর সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া যায়। সামাজিক বনসৃজন ও কৃষি বনসৃজন বনভূমি সম্প্রসারণে যথেষ্ট সাহায্য করে।

৪(ঙ).১৬ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী :

১। সংক্ষেপে বনভূমির গুরুত্ব আলোচনা করুন। বিশ্বে বনভূমির আয়তন সম্বন্ধে কী ধারণা লাভ করেছেন?

২। বিশ্বের কোনো অঞ্চলের বনভূমি বেশি উৎপাদনশীল? এই বনভূমি থেকে কী প্রকার উপযোগিতা লাভ করা যায়?

৩। নিরক্ষীয় বনভূমি সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও ততটা উৎপাদনশীল নয় কেন? বর্তমানে কোন বনসম্পদ এই অরণ্য থেকে পাওয়া যায়?

৪। বনভূমি সংরক্ষণের জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থাগুলি আলোচনা করুন। আপনার মতে আর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

৫। টীকা লিখুন—সামাজিক বনসৃজন ; কৃষি বনসৃজন।

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

(ক) বিশ্বে স্থলভাগের কত শতাংশ বনাবৃত?

(খ) জাপানে বনভূমি আয়তনের তুলনায় বেশি কিন্তু মাথাপিছু বনভূমি কম কেন?

(গ) নিরক্ষীয় বৃষ্টিঅরণ্যে মাটি সবসময় স্যাঁতস্যাঁতে কেন?

(ঘ) চিরহরিৎ শক্তকাঠের বনে কী কী উদ্ভিদ জন্মায়?

(ঙ) সরলবর্গীয় অরণ্যে কোন কোন বৃক্ষ দেখা যায়?

(চ) ভারতের অধিকাংশ বনভূমি কোন্ শ্রেণীর?

একক ৪ ❑ (চ). ভূমি ও পশুপালন

গঠন

৪ (চ).১ উদ্দেশ্য
৪ (চ).২ প্রস্তাবনা
৪ (চ).৩ পশুপালন
৪ (চ).৪ প্রধান প্রধান গবাদি পশুপালন অঞ্চল
৪ (চ).৫ দুগ্ধশিল্প
৪ (চ).৫.১ দুগ্ধশিল্পের অনুকূল অবস্থা
৪ (চ).৫.১ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দুগ্ধশিল্পের অঞ্চল
৪ (চ).৬ মেষপালন ও পশম উৎপাদন
৪ (চ).৬.১ মেষপালন অঞ্চল
৪ (চ).৬.২ মেষপালন ও পশম উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা
৪ (চ).৬.৩ পশম উৎপাদনকারী অঞ্চল
৪ (চ).৭ সারাংশ
৪ (চ).৮ অনুশীলনী
৪ (চ).৯ উত্তর সংকেত

৪ (চ). ১ উদ্দেশ্য

বিভিন্ন জীবিকার মধ্যে পশুপালন মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা। এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন—

- প্রধান প্রধান গবাদি পশুপালন অঞ্চলসমূহ,
- দুগ্ধশিল্প ও পশমশিল্পের অনুকূল পরিবেশ।

৪ (চ). ২ প্রস্তাবনা

পশুপালন মানুষের প্রাচীনতম জীবিকার অন্যতম। আধুনিক যুগে মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পশুপালন একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ হিসাবে পরিচিত। পশুপালনকে কেন্দ্র করে কোনো কোনো দেশে এক বিশেষ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে। যেসব দেশে পশুপালন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চলে সেসব দেশের অর্থনীতি পশুপালনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত।

৪ (চ). ৩ পশুপালন

আদিমকাল থেকে মানুষের একটি প্রধান জীবিকা হল পশুপালন। যাযাবর মানুষ পশুপালন করে পশুজাত পদার্থ খাদ্য, বস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত। পশুর দুধ, মাংস খাদ্য হিসাবে, চামড়া, পশম পোষাক ও বাসস্থান নির্মাণে, পশুর শিং, হাড় গৃহস্থালীর জিনিস নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা হয়।

পশুকে বশ করে মানুষ কৃষিকাজ ও পরিবহনের কাজে ব্যবহার করছে। বলদ, মহিষ প্রভৃতি গবাদি পশু লাঙ্গল টানার কাজে, জলসেচের কাজে, পণ্য পরিবহনের কাজে, ঘোড়া গাধা মাল পরিবহনের কাজে ; বলদ মহিষ ও ঘোড়া যাত্রী পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

পশুপালন নির্ভর করে তৃণভূমির ওপর। তৃণভূমি দু-প্রকারের, যথা : (১) ক্রান্তীয় অঞ্চলের তৃণভূমি বা ক্রান্তীয় তৃণভূমি ও (২) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমি বা নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি। তৃণভূমির অবস্থান আবার জলবায়ুর ওপর নির্ভরশীল। বিশ্বের সর্বত্র তৃণভূমি গড়ে উঠে না। যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশ কম, উষ্ণতা কম বা মাঝারি সেসব অঞ্চলে বড় গাছের পরিবর্তে তৃণ জন্মায়।

রাশিয়া, উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে দিগন্ত বিস্তৃত নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি দেখা যায়। এ সব দেশের নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি বিভিন্ন নামে পরিচিত। রাশিয়ার তৃণভূমি **স্টেপস্** আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সীমান্তে তৃণভূমি **প্রেইরী**, আর্জেন্টিনার তৃণভূমি **পম্পাস**, দক্ষিণ আফ্রিকার তৃণভূমি **ভেল্ড্** ও অস্ট্রেলিয়ার তৃণভূমি **ডাউনস্** নামে পরিচিত।

ক্রান্তীয় তৃণভূমির মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল-এর **'ক্যাম্পোস'** (Campos) ও ওরিনোকো নদীর অববাহিকার **'ল্যানোস'** (Lanos) এবং আফ্রিকার **'সাভানা'** (Savanna) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪ (চ). ৪ প্রধান প্রধান গবাদি পশুপালন অঞ্চল

বিভিন্ন ধরনের গরু জাতীয় পশু যেমন বলদ গরু, গাই গরু, মহিষ, ইয়াক, চমরী গাই প্রভৃতিকে একসঙ্গে বলা হয় গবাদি পশু। গবাদি পশু থেকে প্রধানত দুরকম খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। একটি দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং অপরটি হল মাংস। ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ উভয়প্রকার তৃণভূমি অঞ্চলে গবাদি পশু প্রতিপালন করা হয়। গবাদি পশুপালনে উল্লেখযোগ্য দেশগুলি হল—

(১) **ভারত** : সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে পৃথিবীর সর্বাধিক গবাদি পশু আছে ভারতে। বিশ্বের প্রায় ১৬ শতাংশ গবাদি পশু ভারতে প্রতিপালিত হয়। ভারতের গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু ও রাজস্থানের ক্রান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চলে প্রচুর গবাদি পশুর চাষ করা হয়। সংখ্যায় বেশি হলেও ভারতের পশুগুলি গুণমানে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক নিম্নমানের। ভারতে গরু পিছু দুগ্ধ উৎপাদন অত্যন্ত কম। আবার ধর্মীয় কারণে ভারতে গোমাংসের ব্যবহার অত্যন্ত কম। গোমাংস রপ্তানিও নিষিদ্ধ। এ দেশে কৃষিকাজ, পরিবহন ও দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য গবাদি পশুপালন করা হয়। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী ভারতে গবাদি পশুর সংখ্যা ছিল ২১.৪৯ কোটি, যা বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক।

বিশ্বে গবাদি পশুর সংখ্যা : ১৯৯৯

দেশ	গবাদি পশু (কোটি)
ভারত	২১.৪৯
ব্রাজিল	১৬.৩৫
চীন	১০.৭৬
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৯.৮৫
আর্জেন্টিনা	৫.৫০
অস্ট্রেলিয়া	২.৬৭
কলম্বিয়া	২.৫৬
বাংলাদেশ	২.৩৪
পৃথিবী	**১৩৩.৮২**

উৎস : FAO Production Year Book, 1999, Published in 2001.

(২) **ব্রাজিল** : প্রায় ১৬.৩৫ কোটি গবাদি পশু ব্রাজিলে প্রতিপালিত হয়। গবাদি পশুর সংখ্যার দিক থেকে ব্রাজিল **দ্বিতীয়** স্থান অধিকার করে। ব্রাজিলের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে তৃণভূমি ক্যাম্পোসে অধিকাংশ গবাদি পশু পালন করা হয়। সারাবছর মাঝারি উষ্ণতা ও অল্প বৃষ্টিপাত এ অঞ্চলে তৃণভূমি বৃদ্ধির সহায়ক। মাংস উৎপাদনের জন্যই ব্রাজিলে অধিকাংশ গোপালন করা হয়।

(৩) **চীন** : চীনের নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলে গবাদি পশুর চাষ করা হয়। গবাদি পশুর সংখ্যার দিক থেকে চীন **তৃতীয়** স্থান অধিকার করে। এ দেশে গবাদি পশু প্রধানত মাংস উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

(৪) **আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র** : গবাদি পশুর সংখ্যার বিচারে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র চতুর্থ স্থান অধিকার করলেও দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনে এদেশ বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে। দেশের মধ্যভাগ থেকে উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত প্রেইরী তৃণভূমি ও বৃহৎ হ্রদ অঞ্চলের দক্ষিণে ভুট্টাবলয়ে গবাদি পশুপালন করা হয়। মাংসের জন্য বহু সংখ্যক গরু হত্যার কারণে চিকাগোকে **'বিশ্বের কসাইখানা'** (Slaughter-house of the world) বলে।

(৫) **আর্জেন্টিনা** : দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের আর্জেন্টিনা বিশ্বের একটি প্রধান গোমাংস উৎপাদক দেশ। এ দেশের পম্পাস তৃণভূমিতে গবাদি পশুপালন করা হয়। মৃদু শীতকাল ও অল্প বৃষ্টিপাত তৃণভূমির বিস্তার গবাদি পশুপালনের সহায়ক। আর্জেন্টিনা গোমাংস রপ্তানিতে পৃথিবীতে **প্রথম** স্থান অধিকার করে।

উপরিউক্ত দেশগুলি ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার কলম্বিয়া, বাংলাদেশ, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচুর সংখ্যক গবাদি পশুপালন করা হয়।

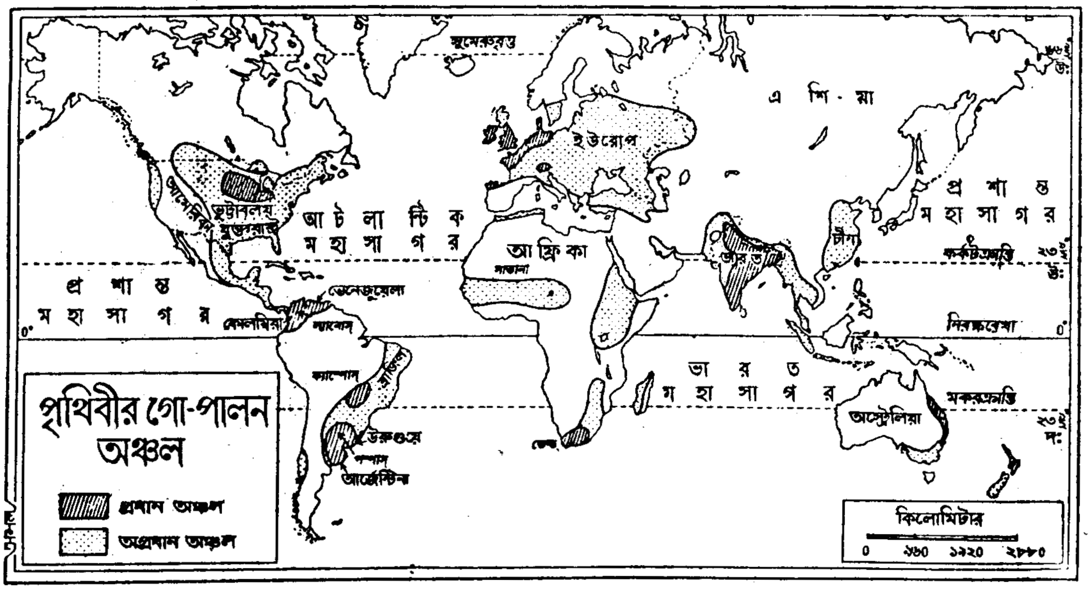

৪(চ).৫ দুগ্ধশিল্প (Dairing)

দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, যেমন ঘি, মাখন, পনীর, চীজ, গুঁড়ো দুধ প্রভৃতি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত শিল্পকে বলা হয় দুগ্ধশিল্প বা ডেয়ারি শিল্প। গবাদি পশুর সংখ্যার দিক থেকে ভারত প্রথম স্থান অধিকার করে কিন্তু গরুপ্রতি দুগ্ধ উৎপাদন খুবই কম এবং এ-দেশ দুগ্ধশিল্পে বিশেষ উন্নত নয়।

দুগ্ধশিল্প উন্নতমানের দুগ্ধপ্রদায়ী গবাদি পশুপালনের ওপর নির্ভরশীল। উন্নতমানের গবাদি পশুপালনের জন্য বিশেষ অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন।

৪(চ).৫.১ দুগ্ধশিল্পের অনুকূল অবস্থা

দুগ্ধ-প্রদায়ী গবাদি পশুপালনের জন্য কয়েকটি বিশেষ অনুকূল প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রয়োজন।

- **প্রাকৃতিক অবস্থাসমূহ বা ভৌগোলিক পরিবেশ**

(১) বড় ও মাঝারি ঘাসের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি—দুগ্ধপ্রদায়ী উন্নতমানের গবাদি পশু প্রতিপালনের জন্য সাধারণত দীর্ঘ তৃণযুক্ত সমৃদ্ধ চারণভূমি প্রয়োজন। পৃথিবীর ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমি যেমন রাশিয়ার স্টেপস্, উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের তৃণভূমি, উত্তর আমেরিকার প্রেইরী ও দক্ষিণ আমেরিকার পম্পাস ও পশ্চিম ভারতের ক্রান্তীয় তৃণভূমি দীর্ঘ তৃণযুক্ত চারণক্ষেত্র আছে বলে প্রচুর সংখ্যায় গবাদি পশুপালন করা হয়। তবে ভুট্টা, তৈলবীজ, বীট, ওট প্রভৃতি শর্করাযুক্ত পশুখাদ্যের ব্যবস্থা করলে গরুর দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(২) জলবায়ু—মাঝারি ধরনের তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত তৃণভূমি গড়ে ওঠার পক্ষে এবং দুগ্ধপ্রদায়ী গো-পালনের পক্ষে উপযোগী। বার্ষিক তাপমাত্রা ১৭° সে থেকে ২৩° সে হলে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। শীতকালে মৃদু শীতলতা ও গ্রীষ্মকালে মৃদু উষ্ণতা বাঞ্ছনীয়। সমৃদ্ধ তৃণভূমি গড়ে উঠতে হলে বৃষ্টিপাত স্বল্প বা মাঝারি হওয়া প্রয়োজন। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫০ সেমি. থেকে ৭৫ সেমির মধ্যে থাকলে ভাল হয়।

(৩) মৃত্তিকা—গভীর ও আর্দ্র দোঁয়াশ মাটিতে সহজ দীর্ঘ ও পুষ্টিকর তৃণ জন্মাতে পারে। দোঁয়াশ মাটিযুক্ত তৃণভূমি উন্নত দুগ্ধপ্রদায়ী গবাদি পশুপালনের উপযোগী।

(৪) ভূ-প্রকৃতি—ঢালু পার্বত্য অঞ্চলে তৃণভূমি সহজে গড়ে উঠে। বন্ধুর ভূপ্রকৃতির জন্য এসব অঞ্চলে কৃষিকাজ করা যায় না। অধিবাসীরা তাই পশুপালনের ওপর বেশি জোর দেয়।

● **অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ**

(১) মূলধন—আধুনিক দুগ্ধশিল্প উন্নত প্রযুক্তি-নির্ভর। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যন্ত্রের সাহায্যে দুগ্ধ দোহন থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য কাজ করা হয়। এর জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত মূলধন। গবাদি পশুর জন্য উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থা, বাসস্থান নির্মাণ, দুগ্ধ সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য প্রচুর মূলধন প্রয়োজন।

(২) নিপুণ শ্রমিক—দুগ্ধপ্রদায়ী গবাদি পশুপালনের জন্য বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যার প্রয়োজন। দুগ্ধদোহন, প্রজনন ও অন্যান্য কাজে দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন।

(৩) উন্নত দ্রুত পরিবহন—দোহশিল্প একটি বাজারমুখী শিল্প এবং দুগ্ধ একটি দ্রুত পচনশীল দ্রব্য। দুগ্ধ উৎপাদনের পর একে দ্রুত বাজারে বা চাহিদা কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া এবং হিমাগারে বা শিল্পকেন্দ্রে পাঠানোর জন্য প্রয়োজন অতি দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থার।

(৪) উন্নত প্রজাতির গরু—হলস্টীন, ফ্রিজিয়ান, জার্সি, গুয়েরনসী, ব্রাউন-সুইস, আয়ারসায়ার প্রভৃতি উন্নত প্রজাতির গো-পালন করলে বেশি দুধ পাওয়া যায়।

৪(চ).৫.২ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দুগ্ধশিল্পের অঞ্চল

(১) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র—দুগ্ধ উৎপাদনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে **প্রথম** স্থান অধিকার করে। দেশের উত্তর-পূর্বাংশের রাজ্যগুলি দুগ্ধশিল্পে উন্নত। পঞ্চহ্রদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে, প্রেইরী তৃণভূমি অঞ্চলে উন্নতমানের গো-পালন করা হয়। মিনেসোটা, উইসকনসিন, মিচিগান, নিউ ইংল্যান্ড প্রভৃতি রাজ্য দুগ্ধ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। মাথাপিছু দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবহারের দিক থেকেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে। গাভীপিছু দুগ্ধ উৎপাদন এদেশ সবার থেকে এগিয়ে। ১৯৯৯ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মোট দুগ্ধ উৎপাদন হয়েছিল ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন। গাভীপিছু দুগ্ধ উৎপাদন ছিল বছরে ৮০৪৩ কেজি।

(২) ভারত—দুগ্ধপ্রদায়ী গাভীর সংখ্যার দিক থেকে ভারত **প্রথম** স্থান অধিকার করলেও গাভীপিছু উৎপাদন অল্প হওয়ায় ভারত দুগ্ধ উৎপাদনে বিশ্বে **দ্বিতীয়** স্থান অধিকার করে। ভারতে গাভীপিছু বার্ষিক দুগ্ধ উৎপাদন হয় মাত্র ১০১৪ কেজি। ১৯৯৯ সালে ভারতে দুগ্ধ উৎপাদনের পরিমাণ ৩.৬০ মেট্রিক টন। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে দুগ্ধপ্রদায়ী গরু প্রতিপালন করা হয়। এসব প্রদেশে অনুচ্চ পাহাড় ও মালভূমি

বিশ্বে দুগ্ধ উৎপাদন ঃ ১৯৯৯

দেশ	(১) দুগ্ধপ্রদায়ী পশু (লক্ষ)	(২) মোট দুগ্ধ উৎপাদন (মে. টন)	(৩) গাভীপিছু উৎপাদন (কেজি)
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৯১.৩৬	৭.৩৫	৮০৪৩
ভারত	৩৫৫.০০	৩.৬০	১০১৪
রাশিয়ান ফেডারেশন	১৩৫.০০	৩.১৮	২৩৫৬
জার্মানি	৫০.২৪	২.৮৩	৫৭৪৬
ফ্রান্স	৪৩.৭৪	২.৪৬	৫৬২৭
ব্রাজিল	২৭৮.০০	২.২৫	৮০৯
পৃথিবী	**২৩২০.৬৫**	**৪৮.০৭**	**২০৭১**

উৎস : FAO Production Year Book, 1999, Published in 2001.

অঞ্চল উৎকৃষ্ট তৃণভূমি গো-পালনের সহায়ক। এছাড়া পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাডু ও কর্ণাটকে দুগ্ধশিল্প বিশেষ উন্নত। ভারতে গির, সাহিওয়াল, লালসিন্ধি, দেওনী প্রভৃতি জাতের গো-পালন করা হয়।

(৩) রাশিয়া—রাশিয়া দুগ্ধ উৎপাদনে বিশ্বে **তৃতীয়** স্থান অধিকার করে। রাশিয়ার বিস্তীর্ণ স্টেপ তৃণভূমি অঞ্চল ও শীতল জলবায়ু, পশুপালনের উপযোগী, এ দেশের ইউরোপীয় অংশে দুগ্ধশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করেছে। সাইবেরিয়া অঞ্চলেও গো-পালন করা হয়। ১৯৯৯ সালে রাশিয়ার মোট দুগ্ধ উৎপাদন ৩.১৮ মেট্রিক টন।

(৪) জার্মানি—উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এই অঞ্চলে জার্মানি দুগ্ধ উৎপাদনে পৃথিবীতে **চতুর্থ** স্থান অধিকার করে। গাভীপিছু দুগ্ধ উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৫৭৪৬ কেজি। জার্মানির উত্তর অংশে দুগ্ধশিল্প অপেক্ষাকৃত অধিক উন্নত।

(৫) ফ্রান্স—ফ্রান্সের নর্ম্যান্ডি, ফ্ল্যাণ্ডার্স, ব্রিটানি অঞ্চলে উন্নত দুগ্ধপ্রদায়ী গো-পালন করা হয়। গাভীপিছু দুগ্ধ উৎপাদনে ফান্স যথেষ্ট উন্নত। এদেশে গাভীপিছু দুগ্ধ উৎপাদনের হার বছরে ৫৬২৭ কেজি।

(৬) ব্রাজিল—উষ্ণ ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত ব্রাজিল দুগ্ধ উৎপাদনে **ষষ্ঠ** স্থান অধিকার করে। বৃহৎ তৃণযুক্ত তৃণভূমি 'ক্যাম্পোস' গবাদি পশুপালনের সহায়ক। প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অনগ্রসর হওয়ায় এবং উষ্ণ আবহাওয়ার জন্য ব্রাজিলে গাভীপিছু দুগ্ধ উৎপাদন অত্যন্ত কম। বছরে মাত্র ৮০৯ কেজি।

উপরিউক্ত দেশগুলি ছাড়া উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক, যুক্তরাজ্য, উত্তর আমেরিকার কানাডা, দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা, আফ্রিকার দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডে দুগ্ধশিল্প বিশেষ উন্নত।

৪(চ).৬ মেষপালন ও পশম উৎপাদন

নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলের অধিবাসীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা হল মেষপালন বা ভেড়াপালন। মেষ থেকে দুটি প্রধান উৎপাদিত দ্রব্য হল মাংস ও পশম। দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য মেষপালন তেমন দেখা যায় না।

উপযোগিতা অনুসারে বিশ্বে প্রধানত দুধরনের মেষপালন দেখা যায়, যথা—(১) **পশমপ্রদায়ী মেষ** ও (২) **মাংসপ্রদায়ী মেষ**। সংখ্যার দিক থেকে পশমপ্রদায়ী মেষের সংখ্যা সর্বাধিক। 'মেরিনো, (Merino) জাতের মেষ পশম উৎপাদনে সর্বোৎকৃষ্ট। রামবুলে, ডরসেট, সাউথ ডাউনস্ প্রভৃতি জাতের মেষ থেকেও পশম উৎপাদিত হয়। মাংসপ্রদায়ী মেষের মধ্যে স্রফশায়ার, হ্যাম্পশায়ার, সাফল্ক্ প্রভৃতি জাতের মেষ উল্লেখযোগ্য।

৪(চ).৬.১ মেষপালন অঞ্চল

দক্ষিণ ও উত্তর গোলার্ধের বিস্তীর্ণ নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমিসমূহ মেষপালনের আদর্শ স্থান। অস্ট্রেলিয়ার **ডাউনস্**, দক্ষিণ আফ্রিকার **ভেল্ড্**, আর্জেন্টিনার **পম্পাস**, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের **প্রেইরী**, রাশিয়ার **স্টেপস্** প্রভৃতি নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চল; চীন, ভারত, পাকিস্তান, তুরস্ক ও ইরানের ক্রান্তীয় ও উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলে বাণিজ্যিক উপায়ে মেষপালন করা হয়।

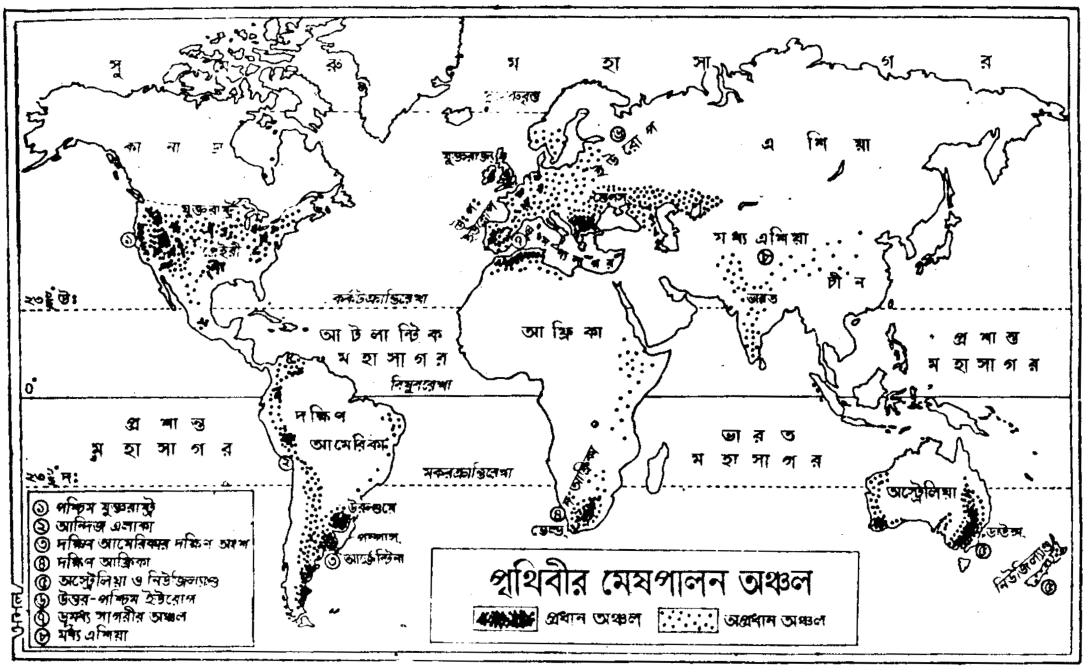

পৃথিবীর মেষের সংখ্যা ঃ ১৯৯৯

দেশ	মেষের সংখ্যা (কোটি)	দেশ	মেষের সংখ্যা (কোটি)
চীন	১২.৭২	ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য	৪.৪৭
অস্ট্রেলিয়া	১১.৯৬	পাকিস্তান	৩.১৩
ভারত	৫.৭৬	তুরস্ক	৩.০২
ইরান	৫.৩৯	স্পেন	২.৭৫
নিউজিল্যান্ড	৪.৬১	রাশিয়া	১.৩৭
		পৃথিবী	**১০৬.৮৭**

উৎস : FAO Year Book, 1999, Published in 2001.

পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় সংখ্যার দিক থেকে চীন মেষ প্রতিপালনে বিশ্বে **প্রথম** স্থান অধিকার করে। তবে চীনে প্রধানত মাংসপ্রদায়ী মেষপালন করা হয়। মেষের সংখ্যায় অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় হলেও **পশম** উৎপাদনে এই দেশ বিশ্বে **প্রথম স্থান** অধিকার করে। অস্ট্রেলিয়ার প্রায় ১২ কোটি মেষের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ উৎকৃষ্ট মেরিনো মেষ, যে প্রজাতির মেষ পশম উৎপাদনে বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ। এ দেশে মেষ প্রতিপালনের অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থা থাকায় এ দেশ পশম উৎপাদন ও রপ্তানিতে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে। মেষ-মাংস উৎপাদনে অস্ট্রেলিয়া বিশ্বে তৃতীয়। ভারত, ইরান, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে মাংস উৎপাদন ও পশম উৎপাদন উভয় উদ্দেশ্যে মেষপালন করা হয়। নিউজিল্যান্ডে প্রধানত পশম প্রদায়ী মেষপালন করা হয়।

পৃথিবীর পশম উৎপাদন ঃ ১৯৯৯ (লক্ষ মেট্রিক টন)

দেশ	পশম উৎপাদন	দেশ	পশম উৎপাদন
অস্ট্রেলিয়া	৭.০৭	উরুগুয়ে	০.৬০
চীন	২.৮০	ইরান	০.৫৭
নিউজিল্যান্ড	২.২৪	দক্ষিণ আফ্রিকা	০.৫৬
ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য	০.৬৬	পাকিস্তান	০.৫৬
আর্জেন্টিনা	০.৬৫	ভারত	০.৪৪
		পৃথিবী	**২৩.৬৩**

উৎস : FAO Year Book, 1999, Published in 2001.

৪(চ).৬.২ মেষপালন ও পশম উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা

মেষপালন ও পশম উৎপাদন কতকগুলি ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে, সেগুলি হল :

(১) ভূপ্রকৃতি—পাহাড়ী ঢালু তৃণভূমি ও তরঙ্গায়িত মালভূমি মেষপালনের উপযুক্ত। অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের ঢালুজমি, ভারতের কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশে হিমালয়ের ঢালু পার্বত্য অঞ্চল মেষপালনের উপযুক্ত স্থান।

(২) জলবায়ু—শীতল শুষ্ক নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু মেষপালন ও পশম উৎপাদনের উপযোগী। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৫ থেকে ৫০ সেমি. হলে তা কৃষিকাজের উপযুক্ত নয় কিন্তু তৃণভূমি গড়ে ওঠার উপযুক্ত। তাই নাতিশীতোষ্ণ শুষ্কপ্রায় অঞ্চলে মেষপালন ভাল হয়। শীতপ্রধান অঞ্চলে যেখানে বার্ষিক গড় উষ্ণতা ১০° থেকে ১৫° সেলসিয়াস সেসব অঞ্চল পশম প্রদায়ী মেষপালনে উপযোগী। শীতল আবহাওয়ার জন্য মেষের গায়ে উৎকৃষ্ট পশম জন্মায়। উষ্ণতা বেশি হলে বা আবহাওয়া স্যাঁতসেঁতে হলে পশম উৎপাদন ভালো হয় না।

(৩) তৃণের প্রকৃতি—মেষপালনের জন্য প্রয়োজন ক্ষুদ্র আকৃতির তৃণ। লম্বা ঘাসযুক্ত তৃণভূমি মেষচারণের উপযোগী নয়। শুষ্কপ্রায় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ক্ষুদ্রতৃণযুক্ত বিস্তীর্ণ তৃণভূমি দেখা যায়। উত্তর গোলার্ধে **স্টেপস্, প্রেইরী**; দক্ষিণ গোলার্ধে **পম্পাস, ভেল্ড্, ডাউনস্** মেষপালনের আদর্শ ক্ষেত্র।

(৪) চাহিদা—শীতলপ্রধান অঞ্চলে শীতল আবহাওয়া থেকে রক্ষা পেতে পশমের বস্ত্রব্যবহার আবশ্যিক। তাই এই অঞ্চলে পশমের চাহিদা খুব বেশি। পৃথিবীর সর্বত্র পশম উৎপাদন না হলেও নিরক্ষীয় অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র পশমের বাজার ভালো।

(৫) পশম ওজন হ্রাসশীল কাঁচামাল নয়—পশম একটি বিশুদ্ধ কাঁচামাল। উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বহুদূরে নিয়ে গিয়ে শিল্পে ব্যবহার করলেও উৎপাদন ব্যয়ে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। এটি পচনশীল দ্রব্য নয়, তাই এটিকে বহুদিন পর্যন্ত সহজে সংরক্ষণ করা যায়। হাল্কা বলে পরিবহনেও সুবিধা পাওয়া যায়। এসব কারণে পশম উৎপাদকেরা উপযুক্ত দাম পায় বলে উৎপাদনে উৎসাহ পায়।

(৬) অন্যান্য—পশম আহরণের জন্য উন্নত প্রযুক্তি, নিপুণ শ্রমিক ও যথেষ্ট মূলধনের প্রয়োজন। অধিকাংশ উন্নত দেশ পশম উৎপাদন করে। এদেশে এসব পরিবেশের অভাব পরিলক্ষিত হয় না।

৪(চ).৬.৩ পশম উৎপাদনকারী অঞ্চল

সাধারণত দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলি পশম উৎপাদনে উন্নতিলাভ করেছে। দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলিতে পশম উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

(১) অস্ট্রেলিয়া—মেষের সংখ্যার দিক থেকে চীন **প্রথম** হলেও পশমপ্রদায়ী মেষের সংখ্যার দিক থেকে অস্ট্রেলিয়া **প্রথম** স্থান অধিকার করে। পশম উৎপাদনের ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া সবার থেকে অনেক এগিয়ে। ১৯৯৯-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়ায় ঐ বছরে ৭.০৭ লক্ষ মেট্রিক টন পশম উৎপাদন করেছে। ক্ষুদ্র তৃণযুক্ত বিস্তীর্ণ ডাউনস্ তৃণভূমি, শীতল ও শুষ্ক জলবায়ু, উন্নত প্রযুক্তির সুবিধা প্রভৃতি কারণে অস্ট্রেলিয়া পশম উৎপাদনে পৃথিবীতে **প্রথম** স্থান অধিকার করেছে। এ দেশের নিউ সাউথ ওয়েলস, কুইন্সল্যান্ড, ভিক্টোরিয়া পশম উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ।

(২) চীন—পশম উৎপাদনে দক্ষিণ গোলার্ধের আধিপত্য থাকলেও উত্তর গোলার্ধের দেশগুলিও আর পিছিয়ে নেই। চীন বর্তমানে পশম উৎপাদনে **দ্বিতীয়** স্থান অধিকার করেছে। ১৯৯৯-এর FAO পরিসংখ্যান অনুযায়ী এদেশের পশম উৎপাদনের পরিমাণ ২.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন। এদেশের পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর মেষপালন করা হয়।

(৩) নিউজিল্যান্ড—মৃদু শীতল জলবায়ু, বিস্তীর্ণ ঢালু চারণক্ষেত্র ও উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার সুবিধা থাকায় নিউজিল্যান্ড পশম উৎপাদনে পৃথিবীতে **তৃতীয়** স্থান অধিকার করেছে। এখানে দক্ষিণ দ্বীপভূমিতে ভাল পশমপ্রদায়ী মেরিনো মেষ ও অন্যান্য সংকর প্রজাতির মেষপালন করা হয়।

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ও আর্জেন্টিনা পশম উৎপাদন করে যথাক্রমে **তৃতীয়** ও **চতুর্থ** স্থান অধিকার করে। ভারতের রাজস্থান, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশে মেষপালন করা হয়। ১৯৯৯-এ ০.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন পশম উৎপাদন করে। ভারত পশম উৎপাদনে বিশ্বে **দশম** স্থান অধিকার করেছে। ভারতে পশমপ্রদায়ী মেষের প্রতিপালন কম হয়।

৪(চ).৭ সারাংশ

আদিম যুগে অধিকাংশ মানুষ পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করত। পশুপালনকে প্রধান জীবিকা হিসাবে এখনও ধরে রেখেছে পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলের অধিবাসী। বিশেষত যেখানে তৃণভূমি আছে সেই অঞ্চলের লোকেরা আধুনিক পদ্ধতিতে মাংস, দুগ্ধ ও পশম উৎপাদন করে নিজেদের চাহিদা মেটায় ও বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে। গবাদি পশুপালনে সংখ্যার দিক দিয়ে ভারত **প্রথম** স্থান অধিকার করলেও মাংস ও দুগ্ধ উৎপাদনে ভারত পিছিয়ে। দুগ্ধ উৎপাদনে **প্রথম** আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। মেষপালনের সংখ্যার দিক থেকে চীন পৃথিবীতে **প্রথম** স্থান অধিকার করলেও পশম উৎপাদনে অস্ট্রেলিয়া চীনের থেকে অনেক এগিয়ে থেকে **প্রথম** স্থান অধিকার করে।

৪(চ).৮ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী ঃ

১। গবাদি পশুপালনে বিশ্বে কোন কোন দেশ উন্নতিলাভ করেছে? তাদের উন্নতির কারণ কী?

২। ভারতে গরুর সংখ্যা সর্বাধিক হলেও দুগ্ধ উৎপাদনে তেমন উন্নতিলাভ করতে পারেনি কেন?

৩। দুগ্ধশিল্পে উত্তর পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি উন্নত কেন? পৃথিবীর অন্য কোন কোন অঞ্চলে দুগ্ধশিল্পের প্রসার ঘটেছে?

৪। মেষপালনে চীন প্রথম হলেও পশম উৎপাদনে অস্ট্রেলিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেছে কেন? পশম উৎপাদনের উপযোগী অবস্থা আলোচনা করুন।

৫। বিশ্বে প্রধান পশম উৎপাদক অঞ্চলের বর্ণনা দিন।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

৬। **ঠিক কি ভুল বলুন ঃ**

(ক) মেরিনো মেষপালন উৎপাদনের জন্য উৎকৃষ্ট।

(খ) মেষ বড় বড় ঘাস খেতে পছন্দ করে।

(গ) ব্রাউন সুইস একটি উন্নত জাতের মেষ।

(ঘ) সংকর হল ভারতের একটি উন্নত জাতের গরু।

(ঙ) গাভীপ্রতি দুগ্ধ উৎপাদন বিশ্বে ভারত প্রথম।

৪(চ).৯ উত্তর সংকেত

৬। (ক) ঠিক

(খ) ভুল

(গ) ভুল

(ঘ) ঠিক

(ঙ) ভুল

একক ৪(ছ) ❑ ভূমি ও খনিজ উত্তোলন

গঠন

৪(ছ).১উদ্দেশ্য

৪(ছ).২প্রস্তাবনা

৪(ছ).৩খনিজ উত্তোলনের গুরুত্ব

৪(ছ).৪ভুত্বকে বিভিন্ন পদার্থের পরিমাণ

৪(ছ).৫খনিজদ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ

৪(ছ).৬খনিজ আকরিক-এ ধাতুর পরিমাণ

৪(ছ).৭প্রধান প্রধান মৌলিক ও সঙ্কর ধাতু

৪(ছ).৮লৌহ-আকরিক ও লৌহ

৪(ছ).৮.১ লৌহের গুরুত্ব

৪(ছ).৮.২ লৌহের ব্যবহার

৪(ছ).৮.৩ প্রধান প্রধান লৌহ-আকরিক উৎপাদক দেশ ও অঞ্চল

৪(ছ).৯তাম্র

৪(ছ).৯.১ তাম্রের ব্যবহার

৪(ছ).৯.২ প্রধান প্রধান তাম্র উৎপাদক দেশ ও অঞ্চল

৪(ছ).১০ বক্সাইট

৪(ছ).১০.১ অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার

৪(ছ).১০.২ প্রধান প্রধান বক্সইট উৎপাদক দেশ ও অঞ্চল

৪(ছ).১০.৩ অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনকারী দেশ

৪(ছ).১১ সারাংশ

৪(ছ).১২ অনুশীলনী

৪(ছ).১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন—

- ভূত্বকে বিভিন্ন পদার্থের পরিমাণ
- বিভিন্ন খনিজ পদার্থ ও এদের ব্যবহার
- খনিজ পদার্থের উৎপাদক অঞ্চল ও বিশ্বে এদের স্থান

৪(ছ).২ প্রস্তাবনা

খনিজ সম্পদ বর্তমান যুগের এক অপরিহার্য সম্পদ। বলা বাহুল্য, খনিজ সম্পদের বণ্টনে প্রকৃতি সব দেশের ক্ষেত্রে উদার নয়। বিশ্বের কোনো কোনো দেশে নানাপ্রকার খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়, আবার কোনো কোনো দেশে খনিজ সম্পদ অপ্রতুল। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ শিল্পবিকাশের ফলে উন্নতির চরম শিখরে উপনীত। বিশ্বের অনেক দেশ আবার খনিজ সম্পদের অভাবের কারণে শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অনগ্রসর এবং এ-সব দেশে মানুষের জীবনযাত্রার মান নীচু।

৪(ছ).৩ খনিজ উত্তোলনের গুরুত্ব

মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশে খনিজ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুতপক্ষে খনিজ সম্পদ ছাড়া মানুষ বর্তমান উন্নত পর্যায়ে উপনীত হতে পারত না। খনিজ পদার্থ আজ মানুষের নিকট এক অপরিহার্য দ্রব্য। শিল্পের হাত ধরে মানুষ আজ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁচেছে। শিল্পের অন্যতম কাঁচামাল আসে খনি থেকে। মানবসভ্যতা তাম্রযুগ, ব্রোঞ্জযুগ পেরিয়ে লৌহযুগে উন্নীত হয়েছে। তাম্র, টিন, অ্যালুমিনিয়াম, লৌহ-আকরিক প্রভৃতি খনিজের ব্যবহার যদি না হত তবে মানুষ সেই প্রস্তর যুগেই পড়ে থাকত। জড়শক্তি মানুষের উন্নতির প্রধান হাতিয়ার। এই জড়শক্তির অধিকাংশ আসে খনি থেকে। পেট্রোলিয়াম, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস ছাড়া শিল্প ও পরিবহন অচল। এমনকি বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী শক্তির উৎস ইউরেনিয়াম আসে খনি থেকে।

স্থায়িত্বের কারণে ধাতব খনিজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাম্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ নির্মিত দ্রব্য বছরের পর বছর টিকে থাকে। ধাতব জিনিসপত্র ভেঙে গেলে তাকে পুনর্ব্যবহার করা যায়। এদিক থেকেও খনিজের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পেট্রোলিয়াম, কয়লা প্রভৃতি খনিজ থেকে আবার বহুবিধ ব্যবহার যোগ্য উপজাত দ্রব্য উৎপাদন করা হয়। **কৃষিক্ষেত্রে** ব্যবহারের জন্য রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধ প্রধানত খনিজ পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয়।

খনিজ পদার্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এটি ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ বা গচ্ছিত সম্পদ। ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে খনিজ সম্পদ ফুরিয়ে যেতে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মানুষের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে খনিজ সম্পদ দ্রুত উত্তোলন করা হচ্ছে এবং দ্রুত ক্ষয় হচ্ছে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদগুলি যেমন খনিজ তেল, লৌহ-আকরিক, তাম্র, অ্যালুমিনিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসের আয়ুষ্কাল আর বেশি দিন নেই।

৪(ছ).৪ ভূ-ত্বকে বিভিন্ন পদার্থের পরিমাণ

ভূত্বকের শিলা কী কী পদার্থ দ্বারা গঠিত তার একটি ধারণা থাকা প্রয়োজন। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ভূ-ত্বকে বিভিন্ন পদার্থ যৌগ আকারে উপস্থিত। এই পদার্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি আছে সিলিকন।

ভূ-ত্বকের শিলা ২৭.৭১ শতাংশ সিলিকন দ্বারা গঠিত। এর পরই অ্যালুমিনিয়ামের স্থান। নীচের সারণিতে ২৫টি মৌলিক পদার্থের তালিকা দেওয়া হল। ভূ-পৃষ্ঠীয় শিলার প্রায় ৫০ শতাংশ এই ২৫টি মৌল দ্বারা গঠিত।

সারণি

একশো টন ভূ-পৃষ্ঠীয় শিলার বিভিন্ন পদার্থের পরিমাণ

পদার্থ	সংকেত	পরিমাণ (টন)	পদার্থ	সংকেত	পরিমাণ (টন)
১. সিলিকন	Si	২৭.৭২	১৪. তাম্র	Cu	০.০১০
২. অ্যালুমিনিয়াম	Al	৮.১৩	১৫. টাংস্টেন	W	০.০০৫
৩. লৌহ	Fe	৫.০১	১৬. দস্তা	Zn	০.০০৪
৪. ক্যালসিয়াম	Ca	৩.৬৩	১৭. সীসা	Pb	০.০০২
৫. সোডিয়াম	Na	২.৮৫	১৮. কোবাল্ট	Co	০.০০১
৬. পটাসিয়াম	K	২.৬০	১৯. বোরোন	B	০.০০১
৭. ম্যাগনেসিয়াম	Mg	২.০৯	২০. মলিবডিনাম	Mo	০.০০০১
৮. টাইটেনিয়াম	Ti	০.৬৩	২১. আর্সেনিক	As	০.০০০১
৯. ম্যাঙ্গানীজ	Mn	০.১০	২২. টিন	Sn	০.০০০১
১০. বেরিয়াম	Ba	০.০৫	২৩. পারদ	Hg	০.০০০০১
১১. ক্রোমিয়াম	Cr	০.০৩৭	২৪. রূপা	Ag	০.০০০০০১
১২. নিকেল	Ni	০.০২	২৫. স্বর্ণ	Au	০.০০০০০০১
১৩. ভ্যানাডিয়াম	V	০.০১৭			

উৎস : World Resource and Industries, E. W. Zimmermann, 1951.

উপরিউক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভূ-পৃষ্ঠীয় মৃত্তিকা বা শিলাতে সিলিকন আছে সোনার তুলনায় ৭২,৭২,০০,০০০ গুণ বেশি। ম্যাগনেসিয়াম আছে টিনের তুলনায় ২০,৯০০ গুণ বেশি। অ্যালুমিনিয়াম আছে তামার তুলনায় ৮১৩ গুণ বেশি।

উপরিউক্ত পদার্থগুলি কোনটাই স্বতন্ত্র মৌল হিসাবে মৃত্তিকা বা শিলাতে থাকে না। এগুলি সাধারণত বিভিন্ন প্রকার অক্সাইড যৌগরূপে বিরাজ করে। এই সমস্ত পদার্থের সঙ্গে অক্সাইড যৌগ হিসাবে থাকা ভূ-ত্বকে অক্সিজেনের পরিমাণ প্রায় ৪৬.৫৯ শাতংশ।

৪(ছ).৫ খনিজ দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ

খনিজের প্রকৃতি ব্যবহারের বিচারে খনিজ পদার্থকে প্রধান তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—১। ধাতব খনিজ (Metallic Minerals), ২। অধাতব খনিজ (Non-metallic Minerals), ৩। জ্বালানী খনিজ (Fuel Minerals)।

ধাতব খনিজ চার শ্রেণীর, যথা—(১) লৌহবর্গীয় (Ferrous), যেমন— লৌহ আকরিক, (২) লৌহসংকর (Ferro-alloys), যেমন—ম্যাঙ্গানীজ, নিকেল, টাংস্টেন, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি; (৩) অ-লৌহবর্গীয় (Non-ferrous), যেমন—তামা, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, সীসা, টিন প্রভৃতি; (৪) অন্যান্য ধাতব খনিজ (Other minerals), যেমন— সোনা, রূপা, প্লাটিনাম প্রভৃতি।

অধাতব খনিজ তিন শ্রেণীর। যথা—(১) নির্মাণসংক্রান্ত খনিজ (Construction minerals), যেমন—চুনাপাথর, জিপসাম, মার্বেল প্রভৃতি; (২) রাসায়নিক দ্রব্য (Chemical minerals), যেমন—গন্ধক, পটাশ, লবণ, ফসফরাস প্রভৃতি; (৩) অন্যান্য অধাতব খনিজ (Other non-metallic minerals), যেমন—অভ্র, গ্রাফাইট প্রভৃতি।

জ্বালানী খনিজ বিভিন্ন প্রকারের। যেমন—কঠিন জ্বালানী কয়লা, তরল জ্বালানী পেট্রোলিয়াম, গ্যাসীয় জ্বালানী প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেজস্ক্রিয় জ্বালানী ইউরেনিয়াম।

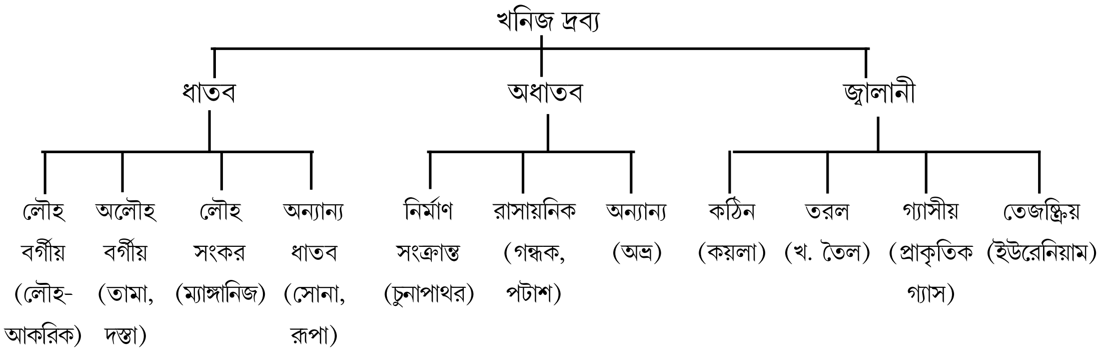

৪(ছ).৬ খনিজ আকরিকে ধাতুর পরিমাণ

যে পরিমাণ খনিজ পদার্থ খনি থেকে উত্তোলন করা হয় তার থেকে খুব কম পরিমাণ বিশুদ্ধ ধাতু পাওয়া যায়। এক মিলিয়ন টন লৌহ আকরিক থেকে প্রায় ০.৬৫ থেকে ০.৭৫ মিলিয়ন টন বিশুদ্ধ লৌহ পাওয়া যায়। এক মিলিয়ন টন তাম্র আকরিক পরিশোধন করলে মাত্র ০.০২ থেকে ০.০৩ মিলিয়ন টন বিশুদ্ধ তাম্র পাওয়া যায়। এক মিলিয়ন টন বক্সাইট থেকে ০.২ থেকে ০.৩ মিলিয়ান টন অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়। এক মিলিয়ন টন ম্যাঙ্গানীজ আকরিক থেকে প্রায় ০.৬ মিলিয়ন টন বিশুদ্ধ ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়।

আকরিকগুলি ওজন হ্রাসশীল বা অবিশুদ্ধ কাঁচামাল হওয়ায় ধাতু নিষ্কাশন শিল্প সর্বক্ষেত্রে খনির নিকটে গড়ে তোলা হয়।

৪(ছ).৭ প্রধান প্রধান মৌলিক ও সংকর ধাতু

পৃথিবীতে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত প্রধান মৌল ধাতুগুলির প্রধান হল লৌহ আকরিক, তাম্র ও অ্যালুমিনিয়াম। এই ধাতুগুলির সঙ্গে অন্যান্য ধাতু মিশিয়ে বিভিন্ন সংকর ধাতু তৈরি করা হয়। যেমন লোহার সঙ্গে ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোমিয়াম, নিকেল মিশিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর স্টীল তৈরি করা হয়। তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে অন্যান্য ধাতু মিশিয়ে বিভিন্ন সংকর ধাতু পাওয়া যায়। পরে সেগুলি আলোচনা করা হচ্ছে।

৪(ছ).৮ লৌহ আকরিক ও লৌহ

খনি থেকে যে সমস্ত লৌহ-আকরিক (Iron-ore) পাওয়া যায়, সেগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) ম্যাগনেটাইট (Magnetite)—ম্যাগনেটাইট সর্বোৎকৃষ্ট লৌহ আকরিক। এতে ৭২ শতাংশের বেশি লোহা থাকে। এবং রং কালো বা কালচে লাল।

(২) হেমাটাইট (Haematite)—পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় হেমাটাইট আকরিক এবং এর থেকে সর্বাধিক পরিমাণ লৌহ নিষ্কাশিত হয়। এই আকরিকে লোহার পরিমাণ প্রায় ৭০ শতাংশ। এটিও উন্নতমানের আকরিক। এর রং লাল এবং গাঢ় বাদামী।

(৩) লিমোনাইট (Limonite)—এটি মাঝারি জাতের আকরিক। এত প্রায় ৬০ শতাংশ লৌহ থাকে। এটির রং হলদে বাদামী।

(৪) সিডেরাইট (Siderite)—এটি অনুন্নত মানের আকরিক। এতে ধাতব লৌহের পরিমাণ প্রায় ৪৮ শতাংশ এবং রং ধূসর। এর বাণিজ্যিক ব্যবহার কম।

(৪) (ছ).৮.১ লৌহের গুরুত্ব

পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে প্রধানত হেমাটাইট আকরিক থেকে লৌহ নিষ্কাশন করা হয়। আকরিক থেকে কাঁচা লোহা তারপর ঢালাই লোহা ও পরে ঢালাই লোহার সঙ্গে ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোমিয়াম, নিকেল প্রভৃতি লৌহ সংকর ধাতু মিশিয়ে ইস্পাত (Steel) তৈরি করা হয়। ঢালাই লোহা ও ইস্পাত (Steel) বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

লোহা অত্যন্ত কঠিন অথচ নমনীয় ধাতু। লোহাকে গালিয়ে যে কোনো জিনিস তৈরি করা যায়। শিল্প সভ্যতায় লোহার বহুবিধ ব্যবহারের জন্য এই যুগকে বলা হয় লৌহযুগ।

৪(ছ).৮.২ লৌহের ব্যবহার

লোহার প্রধান ব্যবহারগুলি হল ঃ

(১) শিল্পে ঃ বিশ্বের সব শিল্প কোনো না কোনোভাবে লোহা ব্যবহার করে। কারখানার যন্ত্রপাতি লৌহনির্মিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ থেকে বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্র সবই লোহা দিয়ে তৈরি। কারখানার ঘরবাড়ি ও শেড লোহার বীম, পাত ও রড দিয়ে তৈরি করা হয়।

(২) পরিবহনে ঃ রেল পরিবহন, সড়ক পরিবহন, জল পরিবহন সবই লোহার ওপর নির্ভরশীল। রেললাইনের পাত, রেলগাড়ির বগি, রেল ইঞ্জিন লোহার তৈরি। সড়কপথের যানবাহন তৈরিতে, জলপথের জাহাজ তৈরিতে লৌহ অপরিহার্য। বহু ব্যবহৃত সাইকেলও লোহা দ্বারা তৈরি।

(৩) কৃষিতে ঃ কৃষিকাজে ব্যবহৃত কোদাল, কাস্তে, লাঙ্গল, ট্রাক্টর, হারভেস্টর সবই লোহার তৈরি।

(৪) গৃহস্থালিতে ঃ বাড়িতে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত বহু জিনিসপত্র লোহার তৈরি। ছুরি, কাঁচি, কড়া, খুন্তি, উনুন, সাঁড়াশি, সূঁচ প্রভৃতি নানা ছোট ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস লৌহনির্মিত।

(৫) গৃহনির্মাণে ঃ বাড়ি তৈরির রড, বীম, গ্রীল, পেরেক, তার লোহার তৈরি।

(৬) প্রতিরক্ষায় ঃ দেশরক্ষার জন্য বা দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যেসব আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম সবই লোহার তৈরি।

(৭) শক্তি উৎপাদন ঃ কারখানায় তাপবিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ বা পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে টারবাইন ব্যবহৃত হয় তা লোহার তৈরি। বিদ্যুৎ পরিবহনের খুঁটি ও স্তম্ভ নির্মাণে লৌহ ব্যবহৃত হয়।

উপরিউক্ত প্রধান ব্যবহার ছাড়াও লোহা অন্যান্য অনেক কাজেই ব্যবহার করা হয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে লোহাকে আধুনিক শিল্প সভ্যতার মেরুদণ্ড (Backbone of modern industrial civilisation) বলা যুক্তিযুক্ত।

৪(ছ).৮.৩ প্রধান প্রধান লৌহ-আকরিক উৎপাদক দেশ ও অঞ্চল

(১) চীন—১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে চীন লৌহ-আকরিক ও লৌহ উৎপাদনে **প্রথম** স্থান অধিকার করে আসছে। বিশেষজ্ঞদের মতে চীনে প্রচুর পরিমাণে লৌহ-আকরিক সঞ্চিত আছে। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে চীন ২০.৫৫ কোটি টন লৌহ-আকরিক উৎপাদন করেছে। এদেশে উন্নতমানের ম্যাগনেটাইট ও হেমাটাইট লৌহ-আকরিক উত্তোলিত হয়। মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলের আনসান, মুকডেন, ফুশুন; তায় অঞ্চলের টুংলিং; সেচুয়ান বা জেকোয়ান অঞ্চলের চুংকিং প্রভৃতি স্থানে চীনের প্রধান লৌহখনিগুলি অবস্থিত।

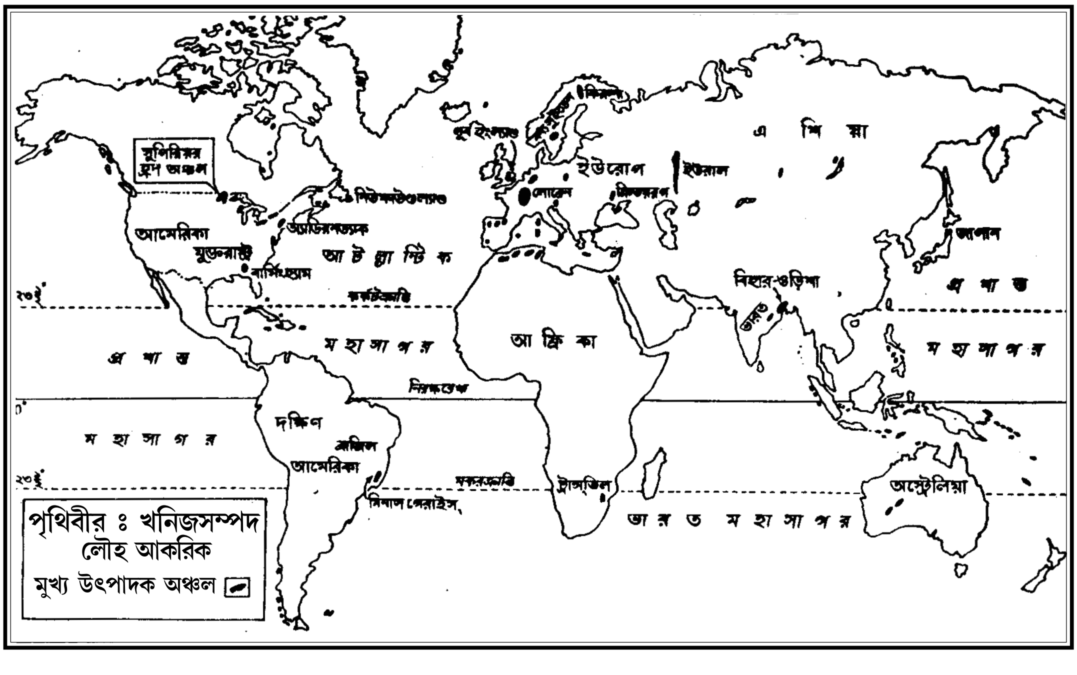

বিশ্বের লৌহ আকরিক উৎপাদক অঞ্চল

(২) **ব্রাজিল**—লৌহ উৎপাদনে ব্রাজিল পৃথিবীতে **দ্বিতীয়** স্থান অধিকার করে। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে এদেশে ১৯.৫৩ কোটি টন লৌহ-আকরিক উত্তোলিত হয়। আকরিক লৌহ সঞ্চয়ের দিক থেকেও ব্রাজিল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ব্রাজিলে বিশ্বের বর্তমান সঞ্চয়ের প্রায় ১৬ শতাংশ আকরিক লৌহ সঞ্চিত আছে এখানকার **কারাজাম, মিনাস গেরাইস, ম্যাটো গ্রাসো, সাওপাওলো** অঞ্চলে প্রচুর উচ্চশ্রেণীর লৌহ-আকরিক পাওয়া যায়।

(৩) **অস্ট্রেলিয়া**—লৌহ-আকরিক উৎপাদনে অস্ট্রেলিয়ার স্থান **তৃতীয়**। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ১৫.৩৫ কোটি টন লৌহ-আকরিক এদেশে উৎপাদিত হয়েছিল। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার **আয়রন নব**, নিউ সাউথ ওয়েলসের **আয়রন মনার্ক**, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার **পলিবারা, নিউম্যান, ইয়াম্পি-সাউন্ড, মাউন্ট গোল্ডসওয়ার্দি, টমপ্রাইস** প্রভৃতি অঞ্চলে উন্নতমানের লৌহ-আকরিক উত্তোলন করা হয়।

(৪) **রাশিয়া**—আকরিক লৌহ উত্তোলনে রাশিয়া **চতুর্থ** স্থান অধিকার করে। ইউরাল অঞ্চলের **ম্যাগনিটোগর্স্ক** রাশিয়ার প্রধান লৌহ-আকরিক কেন্দ্র। এখানে উন্নত শ্রেণীর লৌহ পাওয়া যায়। এছাড়া **নিজনি তাগিল, কার্স্ক, ভলগোগ্রাদ, তেলবিস** অঞ্চলে লৌহ-আকরিক উত্তোলন করা হয়।

পৃথিবীর লৌহ-আকরিক উৎপাদন (কোটি মে. টন)

দেশ	পরিমাণ	দেশ	পরিমাণ
চীন (১৯৯৮)	২০.৫৫	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (১৯৯৮)	৬.২৯
ব্রাজিল (১৯৯৮)	১৯.৫৩	ইউক্রেন (১৯৯৯)	৪.৭৮
অস্ট্রেলিয়া (১৯৯৯)	১৫.৩৫	কানাডা (১৯৯৯)	৩.৩২
রাশিয়া (১৯৯৯)	৭.২৩	দক্ষিণ আফ্রিকা (১৯৯৮)	৩.৩০
ভারত (১৯৯৯)	৭.০২	ভেনেজুয়েলা (১৯৯৮)	১.৯৯
		পৃথিবী (১৯৯৯)	**১০২.৬২**

উৎস : UN Monthly Bulletin of Statistics, April 2001

(৫) **ভারত**—লৌহ আকরিক উৎপাদনে ভারত বিশ্বে **পঞ্চম** স্থান অধিকার করে। ভারতে হেমাটাইট শ্রেণীর আকরিক লোহা বেশি পাওয়া যায়। ছত্তিশগড় রাজ্যের **বাস্তার, দ্রুগ, ডাল্লী রাজহারা, বাইলাডিলা**; গোয়ার **সিরিগাও-বিচোলেম, গোগটে, তোলাসিয়া, নেতারলিম**; কর্নাটকের **হসপেট, বাবাবুদান, কেমানগুন্ডি**; ওড়িশার **গুরুমহিষানী, বাদাম পাহাড়, সুলাইপাত**; অন্ধ্রপ্রদেশের **নেল্লোর, কুডাপ্পা, কুর্নুল** অঞ্চলে উন্নত লৌহ-আকরিক পাওয়া যায়। এছাড়া মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, তামিলনাডুতে লৌহ-আকরিক উত্তোলিত হয়।

৪(ছ).৯ তাম্র

তাম্র বা তামা একটি অ-লৌহবর্গীয় ধাতু। এটি তাপ ও বিদ্যুতের সুপরিবাহী। এতে মরচে ধরে না।

তামার অনেক রকম আকরিক পাওয়া যায়। প্রত্যেক আকরিকে খুব কম পরিমাণ তামা থাকে। ১০০ টন তামার আকরিক পরিশোধন করলে মাত্র ১ থেকে ৩ টন খাঁটি তামা পাওয়া যায়। তামার আকরিকগুলির নাম হল—চ্যালকোসাইট, কোভেলাইট, ম্যালাকাইট, চ্যালকোপাইরাইট ইত্যাদি।

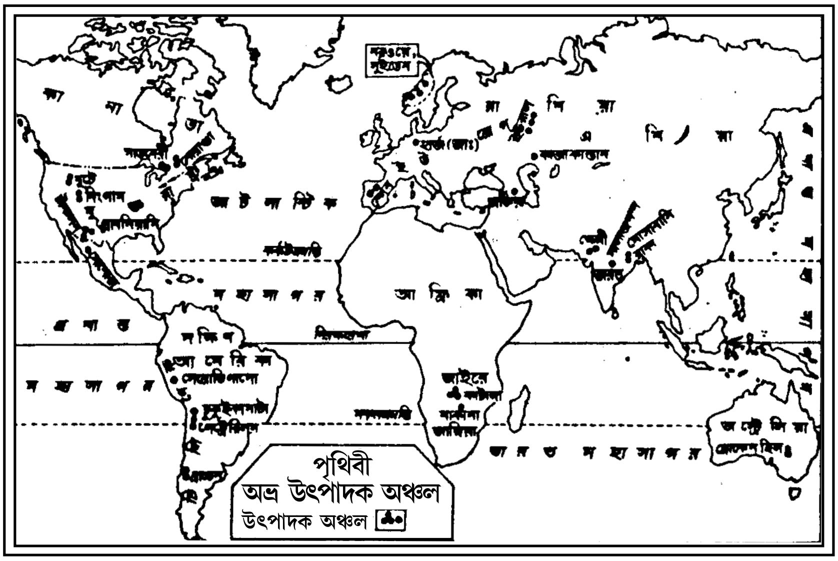

বিশ্বের তাম্র উৎপাদক অঞ্চল

৪(ছ).৯.১ তামার ব্যবহার

(১) বৈদ্যুতিক শিল্পে ঃ বিদ্যুতের সুপরিবাহী বলে তামা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎশিল্পে। বিদ্যুৎ পরিবাহী তার, পাখা, জেনারেটর, ট্রান্সফরমার, রেডিও, টিভি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে তামা ব্যবহার করা হয়।

(২) যানবাহন নির্মাণে ঃ জাহাজের খোল, উড়োজাহাজের কাঠামো, মোটরগাড়ি নির্মাণে তামা ও তামার সংকরের প্রয়োজন হয়।

(৩) যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি ঃ মরচে পড়ে না বলে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ও যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে তামা ব্যবহৃত হয়।

(৪) সংকর বা মিশ্র ধাতু ঃ তামার সঙ্গে অন্যান্য ধাতু মিশিয়ে বহু সংকর ধাতু উৎপাদন করা হয়। যথা—

তামা + টিন	= ব্রোঞ্জ
তামা + দস্তা	= পিতল
তামা + পিতল	= জার্মান সিলভার
তামা + অ্যালুমিনিয়াম	= ডুরালুমিন
তামা + সোনা	= গিনি সোনা

(৫) রং ও কীটনাশক প্রস্তুত ঃ বিভিন্ন রকম রং তৈরিতে ও শস্যরক্ষার জন্য কীটনাশক ঔষধ উৎপাদনে তামা ব্যবহার করা হয়।

(৬) গৃহস্থালীর কাজে ঃ গৃহে ব্যবহৃত বাসনপত্র, রান্নার সরঞ্জাম ও পুজোর বাসন তৈরিতে তামা ও পিতল ব্যবহার করা হয়।

৪(ছ).৯.২ প্রধান তাম্র উৎপাদক দেশ ও অঞ্চল

(১) **চিলি** ঃ দক্ষিণ আমেরিকার ছোট দেশ চিলি তামা উৎপাদনে পৃথিবীতে **প্রথম** স্থান অধিকার করে। এদেশের **চুকুইকামাটা** বিশ্বের বৃহত্তম তাম্রখনি। এছাড়া **ব্রাডেন, পেট্রোরিলোস** ও **এল টেনিয়েন্টিতে** তামার খনি আছে।

পৃথিবীর আকরিক তাম্র উত্তোলন ঃ ১৯৯৯

দেশ	পরিমাণ (লক্ষ মে. টন)	দেশ	পরিমাণ (লক্ষ মে. টন)
চিলি	৪৪.৩৪	পেরু	৫.৩৪
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	১৬.০০	পোল্যান্ড	৪.৫২ *
ইন্দোনেশিয়া	৮.৬৪	মেক্সিকো	৩.৮৫ *
অস্ট্রেলিয়া	৬.৮৯	দক্ষিণ আফ্রিকা	১.৮৮ *
কানাডা	৬.১৪	জাম্বিয়া	১.৬৫ *
		পৃথিবী	**১০৭.৭০**

উৎস : Un Monthly Bulletin of Statistics, April 2001.

* ১৯৯৮ সালের উৎপাদন

(২) **আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র** ঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের **আরিজোনা, মন্টানা ও ইউটা রাজ্যে অধিকাংশ তাম্র আকরিক** পাওয়া যায়। আরিজোনা রাষ্ট্রের **মোরেনসি, বিসবি, জেরোম,** মন্টানা রাষ্ট্রের **বুটে** এবং উটা রাষ্ট্রের **বিংগাম** দেশের বৃহৎ তাম্রখনি। এছাড়া নিউ মেক্সিকো, নেভাদা, মিচিগান ও কলোরাডোতে তাম্র উত্তোলিত হয়। এটি তাম্র উৎপাদনে বিশ্বের **দ্বিতীয়** বৃহত্তম দেশ।

(৩) **ইন্দোনেশিয়া** ঃ বর্তমানে তাম্র আকরিক উৎপাদনে ইন্দোনেশিয়া **তৃতীয়** স্থানাধিকারী। এদেশের **বেলিতুং, সিংকেপ** প্রভৃতি অঞ্চলে তাম্র উত্তোলিত হয়।

(৪) **কানাডা** ঃ কানাডার অন্টারিও রাজ্যের **সাডবেরি** ও **টিম্মিনস্** অঞ্চলে অধিকাংশ তাম্র উত্তোলিত হয়। এদেশে কুইবেক ও ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে অন্যান্য তাম্রখনি অবস্থিত। তাম্র উত্তোলনে কানাডা বিশ্বে **চতুর্থ**।

(৫) **অস্ট্রেলিয়া** ঃ অস্ট্রেলিয়ার **ব্রেকেন হিল, কার্পেন্টারিয়া** ও **মরগ্যান** অঞ্চলে তাম্র উত্তোলিত হয়।

পেরু, পোলান্ড, মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা ও জাম্বিয়াতে প্রচুর তামা পাওয়া যায়। ভারতের রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটক, মধ্যপ্রদেশ ও সিকিমে তাম্র উত্তোলিত হয়।

৪(ছ).১০ বক্সাইট

বক্সাইট অ্যালুমিনিয়ামের প্রধান আকর। বিশ্বের অ্যালুমিনিয়ামের সমগ্র অংশই বক্সাইট আকর থেকে উৎপাদিত হয়। বক্সাইট একটি লৌহ-বর্জিত ধাতু (non-ferrous metal)।

বক্সাইড আকর থেকে প্রথম পর্যায়ে অ্যালুমিনা (Alumina) উৎপাদিত হয়। অ্যালুমিনা থেকে **দ্বিতীয় পর্যায়ে** ইলেকট্রোলাইসিস (Electrolysis) পদ্ধতিতে অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium) উৎপাদিত হয়। অ্যালুমিনা থেকে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনে ক্রায়োলাইট (Cryolite) একটি দ্রাবক (Solvent) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ক্রায়োলাইট বিশ্বের একটিমাত্র দেশ গ্রীনল্যান্ডের আইভিগ্‌টাট (Ivigtat)-এ পাওয়া যায়।

অ্যালুমিনিয়াম হালকা অথচ মজবুত ধাতু। এটি তাপ ও বিদ্যুতের সুপরিবাহী। এতে মরিচা ধরে না। এটি নমনীয়।

৪(ছ).১০.১ অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার

অ্যালুমিনিয়ামের প্রধান ব্যবহারগুলি হল ঃ

(১) **বিদ্যুৎ শিল্পে**–বিদ্যুতের সুপরিবাহী বলে বিদ্যুতের তার ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরিতে প্রচুর অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়। তামার চেয়ে সস্তা হওয়ায় তামার বিকল্প হিসাবে বিদ্যুৎশিল্পে এটির ব্যবহার ব্যাপক।

(২) **যানবাহন নির্মাণে**–হাল্‌কা অথচ মজবুত হওয়ার জন্য অ্যালুমিনিয়াম মোটর, বাস, জাহাজ ও উড়োজাহাজ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বিমানপোত নির্মাণে ডুরালুমিন (তামা+অ্যালুমিনিয়াম) প্রয়োজন হয়।

(৩) **গৃহনির্মাণ ও আসবাবপত্র**–ঘরের ছাদ নির্মাণে অ্যালুমিনিয়াম সীট ব্যবহার করা হয়। হালকা আসবাবপত্র চেয়ার-টেবিল তৈরির জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

(৪) **গৃহস্থালীর দ্রব্য**–বাসনপত্র, রান্নার সরঞ্জাম তৈরিতে অ্যালুমিনিয়াম জনপ্রিয়।

(৫) **অন্যান্য**–সংকর ধাতু, রঙ, আতসবাজি তৈরিতে খাদ্যের মোড়ক তৈরিতে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল প্রয়োজন হয়।

৪(ছ).১০.২ প্রধান বক্সাইট উৎপাদক দেশ ও অঞ্চল

পৃথিবীর যে সমস্ত দেশ বক্সাইট উৎপাদনে এগিয়ে তারা কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনে ততটা উন্নতি লাভ করেনি। বক্সাইট থেকে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করতে প্রয়োজন হয় প্রচুর জলবিদ্যুতের। তাপবিদ্যুৎ ব্যবহার করলে অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

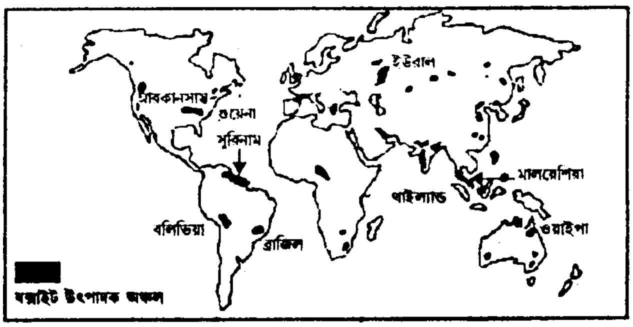

বিশ্বের বক্সাইট উৎপাদক অঞ্চল

পৃথিবীর প্রধান প্রধান বক্সাইট উৎপাদনকারী দেশগুলি হল : (১) অস্ট্রেলিয়া–বিশ্বের **বৃহত্তম** বক্সাইট উৎপাদনকারী দেশ হল অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বের প্রায় ৪২ শতাংশ বক্সাইট এদেশে সঞ্চিত আছে। **উইপার, নিউ সাউথ ওয়েলস** ও **পার্থ** অঞ্চলে অ্যালুমিনিয়াম খনিগুলি অবস্থিত। জাপান, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ অস্ট্রেলিয়া থেকে বক্সাইট আমদানি করে।

বিশ্বের বক্সাইট উৎপাদন : ১৯৯৯

দেশ	পরিমাণ (কোটি মে. টন)	দেশ	পরিমাণ (কোটি মে. টন)
অস্ট্রেলিয়া	৪.৬৪	ভেনেজুয়েলা	০.৫১
গিনি	১.৭০	সুরিনাম	০.৩৯
জামাইকা	১.২৭	কাজাকাস্তান	০.৩৪
ব্রাজিল	১.২০	গিয়ানা	০.২৩
ভারত	০.৬৭	চীন	০.২২*
		পৃথিবী	**১৩.৩৯**

উৎস : UN Monthly Bulletin, April 2001.

* ১৯৯৮ খ্রি. উৎপাদন

(২) **গিনি**–আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের একটি ছোট্ট দেশ গিনি বক্সাইট উৎপাদনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এদেশের **কাউরাউসা, কিন্দিয়া ও ল্যাবে** অঞ্চলে বক্সাইট উত্তোলিত হয়। এদেশ থেকে প্রচুর বক্সাইট উন্নত দেশগুলোতে পাঠানো হয়।

(৩) **জামাইকা**–ক্যারিবিয়ান সাগরের দ্বীপরাষ্ট্র জামাইকা বক্সাইট উৎপাদনে বিশ্বে **তৃতীয়** স্থান অধিকার করে। এদেশের **সেন্ট অ্যান, সেন্ট এলিজাবেথ ও ম্যান্ডেলীন** অঞ্চলে বক্সাইট পাওয়া যায়।

(৪) **ব্রাজিল**–ব্রাজিলের **মিনাস গেরাইস, সাওপাওলো** অঞ্চলে বক্সাইট উত্তোলিত হয়। বক্সাইট উৎপাদনে ব্রাজিল চতুর্থ।

(৫) বক্সাইট উৎপাদনে ভারতের স্থান **পঞ্চম**।

১৯৯৯ খ্রিঃ ভারত ৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন বক্সাইট উৎপাদন করে। ওড়িশার সম্বলপুর, কোরাপুট; ঝাড়খণ্ডের লোহারডগা; মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি; গুজরাটের ভবনগর; মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট, মণ্ডলা, সিওনি বক্সাইট উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত।

দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা, সুরিনাম, এশিয়ার কাজাখস্তান প্রভৃতি দেশেও বক্সাইট পাওয়া যায়।

৪(ছ).১০.৩ অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদনকারী দেশ

বক্সাইট উৎপাদন করলেই যে-কোনো দেশ অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন করতে পারবে তা ঠিক নয়। বক্সাইট থেকে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন করতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ প্রয়োজন । ১ টন অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত করতে প্রায় ২০,০০০

কিলোওয়াট আওয়ার (kwh) বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়। জলবিদ্যুতের সাহায্যে এত বিপুল পরিমাণ বিদ্যুতের জোগান দেওয়া হয়। তাই জলবিদ্যুৎ উৎপাদক দেশগুলিকে বেশি পরিমাণে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন করা হয়। যেমন **আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে** বক্সাইট খুব কম পরিমাণে পাওয়া গেলেও অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনে এই দেশ **প্রথম** স্থান অধিকার করে। **কানাডা** সুলভ জলবিদ্যুতের সাহায্যে আমদানীকৃত বক্সাইট থেকে প্রচুর অ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন করে বিশ্বে **দ্বিতীয়** স্থান লাভ করেছে। আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা বক্সাইট উৎপাদক দেশ গিনি, জামাইকা, সুরিনাম, গিয়ানা প্রচুর পরিমাণ বক্সাইট বিদেশে রপ্তানি করে। অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, জার্মানি, নরওয়ে প্রভৃতি দেশসমূহ অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ।

৪(ছ).১১ সারাংশ

আধুনিক শিল্প সভ্যতায় লৌহ-আকরিক, তাম্র, অ্যালুমিনিয়াম ও অন্যান্য খনিজের গুরুত্ব অপরিসীম। এই এককে তিনটি প্রধান ধাতু যথা লোহা, তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার, কোথায় কোথায় এই খনিজ পাওয়া যায় তা আলোচিত হয়েছে। বক্সাইট উৎপাদনকারী দেশগুলি কেন অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনে অনুন্নত তাও আলোচনা করা হয়েছে।

৪(ছ).১২ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলি ঃ

১। লৌহের গুরুত্ব আলোচনা করুন। পৃথিবীর কোথায় কোথায় লৌহ-আকরিক পাওয়া যায়?

২। তামার ব্যবহার উল্লেখ করুন। বিশ্বের প্রধান তাম্র উৎপাদক অঞ্চলগুলির ধারণা দিন।

৩। বক্সাইটের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করুন। কোন্ কোন্ অঞ্চলে বক্সাইট খনিজগুলি অবস্থিত?

৪। 'বক্সাইট উৎপাদক দেশগুলি সাধারণত অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনে উন্নত নয়'—কারণ কী? কোন্ কোন্ দেশ অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন করে?

একক ৪(জ) ❑ জীবাশ্ম জ্বালানি (Fossil Fuel)

গঠন

৪(জ).১ উদ্দেশ্য
৪(জ).২ প্রস্তাবনা
৪(জ).৩ কয়লা
৪(জ).৩.১ কয়লার শ্রেণীবিভাগ
৪(জ).৩.২ কয়লার গুরুত্ব ও ব্যবহার
৪(জ).৩.৩ প্রধান কয়লা উৎপাদক দেশ ও অঞ্চল
৪(জ).৩.৪ কয়লা আমদানি ও রপ্তানিকারক দেশসমূহ
৪(জ).৩.৫ কয়লা সংরক্ষণ
৪(জ).৪ খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম
৪(জ).৪.১ খনিজ তেলের গুরুত্ব ও ব্যবহার
৪(জ).৪.২ খনিজ তেলের প্রকারভেদ
৪(জ).৪.৩ খনিজ তেল উৎপাদক দেশ ও অঞ্চল
৪(জ).৪.৪ খনিজ তেলের আমদানি ও রপ্তানিকারী দেশ
৪(জ).৪.৫ খনিজ তেল সম্পদের ক্ষয়
৪(জ).৪.৬ পেট্রোলিয়াম যুগের অবসান
৪(জ).৪.৭ খনিজ তৈল সংরক্ষণ
৪(জ).৫ সারাংশ
৪(জ).৬ অনুশীলনী
৪(জ).৭ গ্রন্থপঞ্জী
৪(জ).৮ উত্তর সংকেত

৪(জ).১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন–

- 'জীবাশ্ম জ্বালানীর প্রকারভেদ ও এদের ব্যবহার
- জীবাশ্ম জ্বালানীর উৎপাদক দেশসমূহ
- এগুলি সংরক্ষণের উপায়।

৪(জ).২ প্রস্তাবনা

কোটি কোটি বছর মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ ওপরের চাপে ও ভূগর্ভের চাপে ধীরে ধীরে জীবাশ্মে পরিণত হয়। উদ্ভিদদেহের জীবাশ্মকে বলা হয় **কয়লা**। স্থল ও জলের প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহনিসৃত জৈবরস থেকে উৎপন্ন হয় **খনিজ তেল** ও **প্রাকৃতিক গ্যাস**। এভাবে সৃষ্টি হওয়ার জন্য কয়লা, খনিজতেল, প্রাকৃতিক গ্যাসকে বলা হয় জীবাশ্ম জ্বালানী। এগুলি সবই গচ্ছিত সম্পদ (Fund Resource)। কেবল **পাললিক** শিলাকে জীবাশ্ম জ্বালানী দেখা যায়।

৪(জ).৩ কয়লা

কয়লা একটি শ্রেষ্ঠ জীবাশ্ম জ্বালানী। বহুবছর ধরে উদ্ভিদদেহ মাটির নীচে চাপা পড়ে সৃষ্টি হয়েছে কয়লা। অধিকাংশ কয়লা সৃষ্টি হয়েছে কার্বনিফেরাস যুগে অর্থাৎ ৩৪ কোটি বছর পূর্বে।

৪(জ).৩.১ কয়লার শ্রেণীবিভাগ

কয়লাতে উপস্থিত কার্বনের পরিমাণ অনুসারে একে চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা–(১) অ্যানথ্রাসাইট, (২) বিটুমিনাস, (৩) লিগনাইট ও (৪) পিট।

অ্যানথ্রাসাইট উন্নতমানের কয়লা, এতে ৮৫% থেকে ৯৫% কার্বন থাকে। উদ্বায়ী পদার্থ কম থাকায় বেশি ধোঁয়া হয় না। এর তাপ উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। পৃথিবীতে খুব কম পরিমাণ (৫%) অ্যানথ্রাসাইট পাওয়া যায়।

বিটুমিনাস উন্নতমানের কয়লা। এতে ৫৫% থেকে ৮৫% কার্বন থাকে। এটি পোড়ালে ধোঁয়া হয়। এর তাপ উৎপাদন ক্ষমতা বেশি। পৃথিবীতে **সবচেয়ে বেশি** (৭৫%) পাওয়া যায় **বিটুমিনাস কয়লা**। এর ব্যবহারও সর্বাধিক।

লিগনাইট অনুন্নত মানের কয়লা। এতে কার্বনের পরিমাণ ৩০% থেকে ৫০%। এটি পোড়ালে প্রচুর ধোঁয়া হয়। এর উৎপাদন ক্ষমতা কম। লিগনাইটের পরিমাণ কম (১৫%)।

পিট আসলে পুরোপুরি কয়লায় পরিণত হয়নি। এতে কার্বনের পরিমাণ ৩০% এর কম। তাপ উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত কম। এর ব্যবহার স্বল্প। পৃথিবীতে খুব অল্প পরিমাণ (৫%) পিট পাওয়া যায়।

৪(জ).৩.২ কয়লার গুরুত্ব ও ব্যবহার

কয়লাকে বলা হয় শিল্প সভ্যতার ভিত্তি। কয়লার ওপর নির্ভর করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছিল। শিল্পে কয়লা ছাড়া অন্য কোনো জ্বালানী তখন ছিল না। যে স্থানে কয়লা পাওয়া যেত তার আশপাশের অঞ্চলে শিল্প গড়ে তোলা হত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চল, জার্মানির রূঢ় অঞ্চল, ভারতের ছোটনাগপুর অঞ্চলে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শিল্প সভ্যতার মেরুদণ্ড হল লৌহ। আকরিক লোহা থেকে বিশুদ্ধ লোহা প্রস্তুত করার জন্য কয়লা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এদিক থেকেও কয়লার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

কয়লার প্রধান ব্যবহার হল ঃ

(১) **শিল্পের জ্বালানী**—শিল্প সভ্যতার উষাকাল থেকে এখনও পর্যন্ত কয়লা বিভিন্ন শিল্পে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পূর্বে কয়লাই ছিল শিল্পের একমাত্র জ্বালানী। বর্তমানে খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় কয়লার অধিপত্য কিছু কমেছে। তবে সস্তা জ্বালানী হিসাবে কয়লা এখনও গুরুত্বপূর্ণ।

(২) **লৌহ-ইস্পাত শিল্পে**—লৌহ-আকরিক থেকে বিশুদ্ধ লৌহ উৎপাদনের সময় কয়লার ব্যবহার অপরিহার্য। ১টন লৌহপিণ্ড (pig iron) উৎপাদন করতে প্রয়োজন হয় ১.৮৯ টন লৌহ-আকরিক ও ১.৩৬ টন কোক কয়লা। কোক তৈরি হয় উচ্চশ্রেণীর বিটুমিনাস কয়লা থেকে। প্রচুর লৌহ-আকরিক ও কয়লার ব্যবহার করা হয় বলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পগুলি প্রায় সবই কয়লাখনির নিকট অথবা লৌহখনির নিকটে অবস্থিত। ভারতের দুর্গাপুর, জামসেদপুর, ভিলাই ; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পিটসবার্গ ; জার্মানির রূঢ় ; যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ ওয়েলস লৌহ ইস্পাত শিল্প কয়লাখনি অঞ্চলে বা লৌহখনির নিকটে অবস্থিত।

(৩) **বিদ্যুৎ উৎপাদনে**—এখনও বিশ্বের অধিকাংশ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় কয়লা থেকে। কয়লা থেকে উৎপন্ন তাপবিদ্যুৎ অন্যান্য উৎস থেকে উৎপন্ন তাপবিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম। ভারতের প্রায় ৭২% বিদ্যুৎ আসে কয়লা ব্যবহৃত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে।

(৪) **পরিবহনে**—কয়লা পুড়িয়ে বাষ্পশক্তি আবিষ্কার এবং তার সাহায্যে রেল ইঞ্জিন চালানোর মধ্য দিয়ে বিশ্বে পরিবহন ব্যবস্থায় গতির সূচনা হয়। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত রেলগাড়ি এবং জাহাজ চলত কয়লার সাহায্যে। এখনও ভারত ও তৃতীয় বিশ্বে কোনো কোনো স্থানে কয়লা ইঞ্জিন চালিত রেলগাড়ি দেখা যায়। বর্তমানে অবশ্য ডিজেলের সাহায্যে রেলগাড়ি চালানো হয়।

(৫) **রাসায়নিক পদার্থ**—বিশ্বে ব্যবহৃত বহু রাসায়নিক পদার্থের প্রধান উৎস কয়লা। কয়লার অঙ্গারীকরণ পদ্ধতিতে আলকাতরা, পাইরিডিন, টল্যুইন, স্যাকারিন, বেনজল, হালকা তেল প্রভৃতি পদার্থ পাওয়া। আলকাতরা থেকে সুগন্ধিদ্রব্য ফেনল, ন্যাপথলিন, ক্রিয়োজোট প্রভৃতি পাওয়া যায়। কয়লা থেকে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পদার্থ উৎপন্ন হয়। বর্তমানে কয়লার হাইড্রোজেনেশন পদ্ধতিতে জ্বালানী তেল উৎপাদন করা হচ্ছে। কয়লার ওপর নির্ভর করে অনেক রাসায়নিক শিল্প গড়ে উঠেছে। কয়লা থেকে উৎপন্ন পিচ রাস্তা তৈরির এক উৎকৃষ্ট উপাদান।

(৬) গৃহস্থালীতে—গৃহস্থালীতে রান্নার কাজে, শীতের দেশে ঘর গরম করার কাজে কয়লা ব্যবহৃত হয়। কয়লার উপজাত কোল গ্যাসও রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়।

৪(জ).৩.৩ প্রধান কয়লা উৎপাদক দেশ ও অঞ্চল

(১) **আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র**—বিশ্বে সর্বাধিক কয়লা উত্তোলিত হয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। এ দেশের পূর্ব অংশে অ্যাপালেচিয়ান পার্বত্যভূমিতে সর্বাধিক কয়লা পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের কয়লাখনি **পেনসিলভেনিয়া** থেকে **আলবামা** বিস্তৃত। মধ্য-পূর্বাঞ্চলের **কেন্টাকি, ইলিনয় ও ইন্ডিয়ানা** ; মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের **মিসৌরি, কানসা** ও **ওকলাহামা**; রকি পার্বত্য অঞ্চলের **কলোরাডো, মন্টানো** অঞ্চলে কয়লা উত্তোজিত হয়। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে এদেশে ৯৯.২৪ কোটি মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলিত হয়।

বিশ্বের কয়লা উত্তোলন : ১৯৯৯

দেশ	**পরিমাণ** (কোটি মে. টন)	**দেশ**	**পরিমাণ** (কোটি মে. টন)
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৯৯.২৪	দক্ষিণ আফ্রিকা	২২.০৩
চীন	৯৬.২৪	রাশিয়ান ফেডারেশন	১৬.৫৬
ভারত	২৯.২২	পোল্যান্ড	১১.১৬
অস্ট্রেলিয়া	২২.৫০	ইউক্রেন	৮.১৬
		পৃথিবী	৪৪৬.০৪

উৎস : Un Monthly Bulletin of Statistics, April, 2001.

(২) **চীন**--কয়লা উৎপাদনে **দ্বিতীয়** বৃহত্তম দেশ হল চীন। এদেশের সবচেয়ে বেশি কয়লা পাওয়া যায় **হোয়াংহো** নদী অববাহিকায়। এই অঞ্চলের **সানসি, সেনসি, হোনান** ও **কানসু** কয়লা উত্তোলনের জন্য বিখ্যাত। নিংসিয়া, সেচুয়ান বা জেকোয়ান, ইউনান ও শানটুং অঞ্চলেও কয়লাখনি আছে।

(৩) **ভারত**--১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ২৯.২২ কোটি মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন করে ভারত কয়লা উৎপাদনে পৃথিবীতে **তৃতীয়** স্থান অধিকার করেছে। ঝাড়খণ্ডের **ঝরিয়া, করণপুরা, বোকারো**; পশ্চিমবঙ্গের **রানীগঞ্জ**; ওড়িশার **তালচের**; ছত্তিশগড় ও অন্ধ্রপ্রদেশের কয়লা উত্তোলিত হয়। তামিলনাড়ুর **নেভেলিতে** লিগনাইট কয়লা পাওয়া যায়।

(৪) **অস্ট্রেলিয়া**--বিশ্বে কয়লা উত্তোলনে অস্ট্রেলিয়ার স্থান **চতুর্থ**। উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লা এ দেশে পাওয়া যায়। কয়লা রপ্তানি করে অস্ট্রেলিয়া প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে। **নিউ সাউথ ওয়েলস্, কুইন্সল্যান্ড, ভিক্টোরিয়া, তাসমানিয়াতে** অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ কয়লা পাওয়া যায়।

(৫) **দক্ষিণ আফ্রিকা**--প্রাচীনকাল থেকে কয়লা উত্তোলন ও রপ্তানিতে অস্ট্রেলিয়া মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এ দেশের নাটাল, ট্রান্সভাল কয়লার জন্য প্রসিদ্ধ।

(৬) **রাশিয়া**--রাশিয়ার **কুজনেৎস্ক** কয়লাখনি এ দেশের বৃহত্তম কয়লাখনি। এছাড়া লেনা উপত্যকা, পেচোরা উপত্যকা, মস্কো টুলা অঞ্চলে কয়লা উত্তোলিত হয়।

পোল্যান্ডের **আপার সাইলেসিয়া, ডমব্রোভা, ক্যারাকাউ** অঞ্চলে; ইউক্রেনের **ডোনেৎস্**, জার্মানির **রূঢ়** উপত্যকায়; যুক্তরাজ্যের **পেনাইন** পার্বত্য অঞ্চলে কয়লা উত্তোলিত হয়।

৪(জ).৩.৪ কয়লা আমদানি ও রপ্তানিকারী দেশসমূহ

ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, জাপান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও অন্যান্য কয়লা অনুৎপাদক দেশ কয়লা আমদানি করে এবং অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, পোল্যান্ড কলম্বিয়া, কানাডা, ভারত কয়লা রপ্তানি করে। ভারত

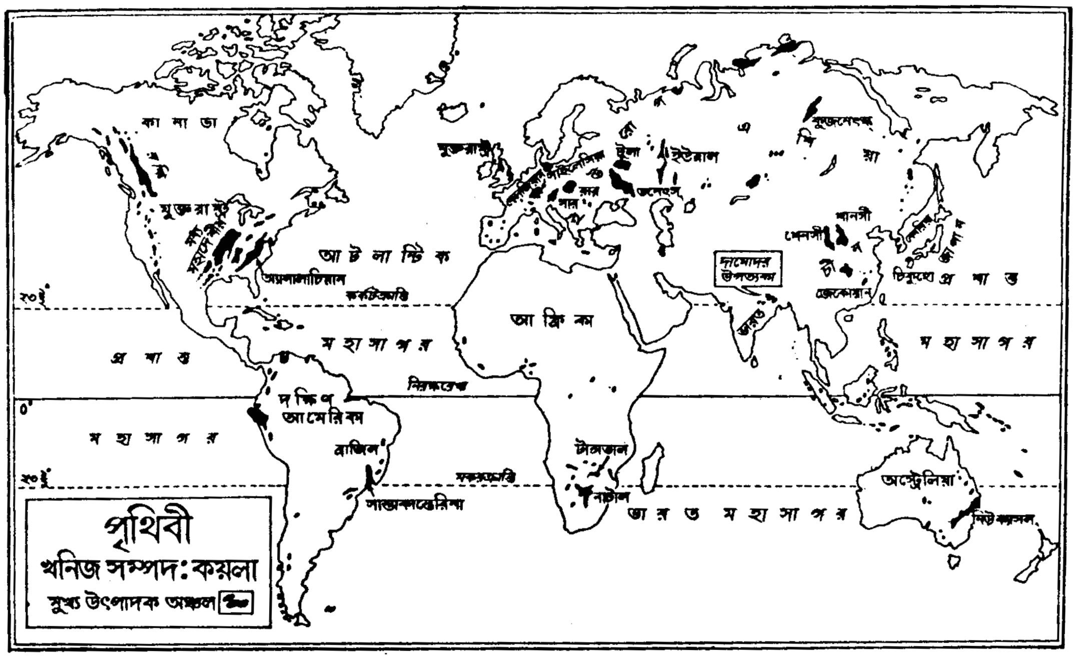

বিশ্বের কয়লা উৎপাদক অঞ্চল

কয়লা রপ্তানি করলেও লৌহ-ইস্পাত শিল্পের চাহিদা মেটাতে কিছু উচ্চশ্রেণীর কয়লা অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানি করে।

৪(জ).৩.৫ কয়লা সংরক্ষণ

কয়লা একটি গচ্ছিত সম্পদ (Fund resource)। এটি ক্রমহ্রাসমান ও অ-পুনর্ভব সম্পদ। ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে এর আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে আসছে। কয়লা থেকে আমরা বহুবিধ উপকার পাই। সুতরাং এর সংরক্ষণ অবশ্যই প্রয়োজন। কয়লার সীমিত ভাণ্ডার যাতে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে না যায় তার জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

যেমন—

(১) অপুনর্ভব সম্পদের পরিবর্তে যতটা সম্ভব পুনর্ভব সম্পদ ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ কয়লা, পেট্রোলিয়ামের জায়গায় জলবিদ্যুৎ সৌরশক্তি, জোয়ার-ভাটার শক্তি, বায়ুশক্তি, জৈবগ্যাস প্রভৃতি উৎসগুলির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

(২) যে সব জায়গায় কয়লার ব্যবহার **অপরিহার্য** সেখানে ছাড়া অন্যত্র কয়লা ব্যবহার করা অনুচিত। যেমন লৌহ-ইস্পাত শিল্পে কয়লা অপরিহার্য কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন অন্যভাবেও করা যায়।

(৩) কয়লা উত্তোলন, পরিবহন ও ব্যবহারের সময় **অপচয়** বন্ধ করতে হবে। উন্নত যন্ত্রপাতি ও দক্ষ শ্রমিকের অভাবে খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের সময় প্রচুর কয়লার অপচয় হয়।

(৪) উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করে কয়লার **শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা** বৃদ্ধি করতে হবে। পূর্বের তুলনায় কয়লার ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কম কয়লা ব্যবহার করে বর্তমানে বেশি তাপশক্তি উৎপন্ন করা হয়। এই ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করতে হবে এবং কয়লা থেকে প্রয়োজনীয় সমস্ত উপজাত পদার্থ সঠিকভাবে নিষ্কাশন করে নিতে হবে।

৪(জ).৪ খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম

ভূবিজ্ঞানীদের মতে কোটি কোটি বছর ধরে মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহনিসৃত রস থেকে উৎপন্ন হয়েছে পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তৈল। খনিজ তৈল পাওয়া যায় পাললিক শিলাস্তরে। বিশেষ করে বেলেপাথর ও চুনাপাথর স্তরের মাঝে থাকে পেট্রোলিয়াম। শিলার ভিরত থেকে পাওয়া যায় বলে একে শিলা তৈল (Rock oil) বলে। এটি একটি জৈব রাসায়নিক। এতে হাইড্রোজেন ও কার্বন থাকে বলে পেট্রোলিয়ামকে হাইড্রোকার্বন (Hydrocarbon) বলে।

৪(জ).৪.১ খনিজ তেলের গুরুত্ব ও ব্যবহার

আধুনিক শিল্প সভ্যতায় পেট্রোলিয়াম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এটি একটি বহু উদ্দেশ্যসাধক পদার্থ। কৃষিতে, শিল্পে, পরিবহনে, গৃহস্থালীর কাজে পেট্রোলিয়াম প্রায় অপরিহার্য। এর বহুমুখী ব্যবহারের জন্য একে তরল সোনা (Liquid Gold) আখ্যা দেওয়া হয়। পেট্রোলিয়াম খনির দল, তৈল উত্তোলন ও তৈল বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময় বিশ্ব রাজনীতি আলোড়িত হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বে উৎপাদিত মোট শক্তির প্রায় অর্ধেক আসে পেট্রোলিয়াম থেকে। এর ব্যবহার আলোচনা করলে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য খনি থেকে পেট্রোলিয়াম তুলে শোধনাগারে শোধন করলে জ্বালানী তেল ও নানা উপজাত পদার্থ পাওয়া যায়।

(১) **পরিবহনে**—বর্তমানে সড়ক, জল ও বিমান পরিবহন সম্পূর্ণভাবে পেট্রোলিয়ামের ওপর নির্ভরশীল। পেট্রোল, ডিজেল ছাড়া বাস, ট্রাক, মোটর গাড়ি চালানো যায় না। জলপরিবহনের জাহাজ চলে ডিজেলের সাহায্যে। বিমানের জ্বালানীর জন্য প্রয়োজন হয় গ্যাসোলিন (উচ্চ শ্রেণীর পেট্রোল)। রেল পরিবহনে বর্তমানে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন বেশি ব্যবহৃত হলেও এখনও বহু ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়।

(২) **শিল্পের জ্বালানী**—শিল্প সভ্যতার প্রথম যুগে শিল্পের জ্বালানী হিসাবে কেবলমাত্র কয়লা ব্যবহৃত হত। পেট্রোলিয়াম আবিষ্কারের পর থেকে কয়লার ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কয়লা ব্যবহারকারী শিল্পের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল এটির পরিবহন ব্যয় বেশি বলে শিল্পগুলিকে কয়লাখনির আশপাশে গড়ে তুলতে হত। পেট্রোলিয়ামের ক্ষেত্রে এই অসুবিধা নেই। পেট্রোলিয়াম সহজে ব্যবহার করা যায়। এবং সহজে পরিবহন করা যায়। তাই যেকোন স্থানে শিল্প গড়ে তোলা যায়।

(৩) **তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন**—কয়লা পুড়িয়ে যেমন তাপবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়, ডিজেল পুড়িয়েও তাপবিদ্যুৎ তৈরি করে। ভারতে কয়েকটি ডিজেলচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র আছে। গ্রামাঞ্চলে ও শহরে কেরোসিন ও ডিজেলের সাহায্যে জেনারেটর চালানো হয়।

(৪) **কৃষিকাজ**—কৃষিকাজে ক্রমশ পেট্রোলিয়াম জাত পদার্থের ব্যবহার বাড়ছে। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করলে কৃষিযন্ত্রপাতির জ্বালানী যেমন ট্র্যাক্টর, হারভেস্টর ও পাম্প সেটের জ্বালানী হিসাবে ডিজেল বা কেরোসিন ব্যবহৃত হয়। পেট্রোলিয়ামের উপজাত পদার্থ থেকে প্রস্তুত ন্যাপথা রাসায়নিক সার কৃষি জমিতে প্রয়োগ করে ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো হয়। কৃষিশস্য রক্ষার জন্য ব্যবহৃত কীটনাশক ও পেট্রোলিয়াম থেকে আসে।

(৫) **উপজাত দ্রব্য**–পেট্রোলিয়াম থেকে যেসব উপজাত পদার্থ পাওয়া যায় তা আমাদের দৈনন্দিন কাজে সদাসর্বদা ব্যবহৃত হয়। পেট্রোলিয়াম থেকে নানারকম রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়। এই রাসায়নিক পদার্থ থেকে কৃত্রিম তন্তু, কৃত্রিম রবার, প্লাস্টিক, সার ও কীটনাশক উৎপন্ন করা হয়। নাইলন, টেরিলিন, টেরিকট পেট্রোলিয়ামের উপাজাত থেকে তৈরি। দেশবিদেশে প্লাস্টিকের ব্যবহার এত বহুল যে বর্তমান যুগকে প্লাস্টিক যুগ বলতে অত্যুক্তি হয় না। উপজাত পদার্থ হিসাবে পিচ্ছিলকারক তেল, ভেসলিন, প্যারাফিন ও পিচ বা অ্যাসফাল্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৪(জ).৪.২ খনিজ তেলের প্রকারভেদ

খনি থেকে উত্তোলিত অ-শোধিত তেল (Crude oil) তিন প্রকারের হয়, যথা ঃ

(১) **প্যারাফিন-ভিত্তিক** (Paraffin Base) : এ ধরনের অশোধিত খনিজ তেল শোধন করলে সর্বোচ্চ পরিমাণ গ্যাসোলিন বা পেট্রোল পাওয়া যায়, যা উচ্চমানের। এ থেকে মোম পাওয়া যায়। এই তেল হালকা ও এর ব্যবহারিক গুরুত্ব বেশি, যেমন পেনসিলভ্যানিয়া খনির (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) তেল।

(২) **অ্যাসফাল্ট-ভিত্তিক (Asphalt Base)** : এ ধরনের অশোধিত তেল থেকে কম গ্যাসোলিন বা পেট্রোল পাওয়া যায়। এই তেলে অ্যাসফাল্ট বেশি থাকে বলে এ তেল ভারি, যেমন মেক্সিকো ও ক্যালিফোর্ণিয়া খনির তেল।

(৩) **ন্যাফ্থা-ভিত্তিক (Naptha Base)** : এ ধরনের তেল-এ গ্যাসোলিন-এর পরিমাণ মাঝারি ধরনের, যেমন, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অধিকাংশ তৈল খনির তেল।

৪(জ).৪.৩ খনিজ তেল উৎপাদক দেশ ও অঞ্চল

(১) **সৌদি আরব**—তৈল উৎপাদনে সৌদি আরব পৃথিবীতে **প্রথম** স্থান অধিকার করে। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে এ দেশে ৩৬.৭৭ কোটি মেট্রিক টন তৈল উৎপাদন হয়েছিল। বিশ্বে সঞ্চিত খনিজ তেলের পরিমাণের দিক থেকেও সৌদি আরব প্রথম স্থান অধিকার করে। **ঘারওয়ার** এদেশে বৃহত্তম তৈলখনি অঞ্চল। **বাহ্‌রান, আবাকিক, দাম্মান, খুরসানিয়া ও সাফনিয়া** অঞ্চলে তৈল উত্তোলিত হয়। পারস্য উপসাগরে অবস্থিত সাফানিয়া হল **বিশ্বের সর্ববৃহৎ সমুদ্র গর্ভের তৈলখনি।**

বিশ্বের খনিজ তৈল উত্তোলন : ১৯৯৯

দেশ	পরিমাণ (কোটি মে. টন)	দেশ	পরিমাণ (কোটি মে. টন)
সৌদি আরব	৩৬.৭৭	ভেনেজুয়েলা	১৫.৭৭
রাশিয়ান ফেডারেশন	৩০.৪৮	মেক্সিকো	১৫.১১
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	২৯.৬৬	যুক্তরাজ্য	১২.৮৩
ইরান	১৭.৬৬	ইরাক	১২.৪৪
চীন	১৬.০৪	কুয়েত	১০.৯৭
		ভারত	৩.২৬
		পৃথিবী	৩৩৭.১২

উৎস : UN Monthly Bulletin of Statistics, April, 2001.

(২) **রাশিয়ান ফেডারেশন**—রাশিয়া পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দেশ। এ দেশে ইউরোপীয় ও এশিয়া অংশে মোট ছটি তৈল অঞ্চল অবস্থিত। এগুলি হল--(ক) কাস্পিয়ান অঞ্চল ; (খ) ভল্গা অববাহিকার বাকশিব, কুইবিশেভ, পার্ম ; (গ) পেচোরা অববাহিকার **উখটা** ; (ঘ) ওব-অববাহিকা; (ঙ) উচ্চ লেনা অববাহিকা ও (চ) কামচাট্কা অঞ্চল। রাশিয়াতে তৈল খনির সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস খনিও আছে।

(৩) **ক্রিমিয়া**—ককেশাস অঞ্চলের (আজেরবাইজান) বাকু, গ্রজনী, মৈকাপ বিখ্যাত তৈলখনি।

(৪) **আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র**—১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের উৎপাদন অনুসারে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে **তৃতীয়** স্থান অধিকার করে। এ দেশে ছটি প্রসিদ্ধ তৈল উৎপাদক অঞ্চল আছে। এগুলি হল--

(ক) আলাস্কা অঞ্চলের **প্রুজহা** অঞ্চলে প্রচুর তৈল উত্তোলিত হয়। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নবীনতম তৈলখনি অঞ্চল;

(খ) উপসাগরীয় অঞ্চলের **টেক্সাস, লুইসিয়ানা ও মিসিসিপি;**

(গ) মধ্য মহাদেশীয় অঞ্চলের টেক্সাস, **কানসাস;**

(ঘ) ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলের **স্যান জোয়াকিন, লস এঞ্জেলস্;**

(ঙ) রকি পার্বত্য অঞ্চলের **মন্টানা, ওয়াইমেয়ামিং** এবং

(চ) অ্যাপালেশিয়ান অঞ্চলের **ওহিও,** ভার্জিনিয়াতে খনিজ তৈল উত্তোলিত হয়। এটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম তৈলখনি অঞ্চল।

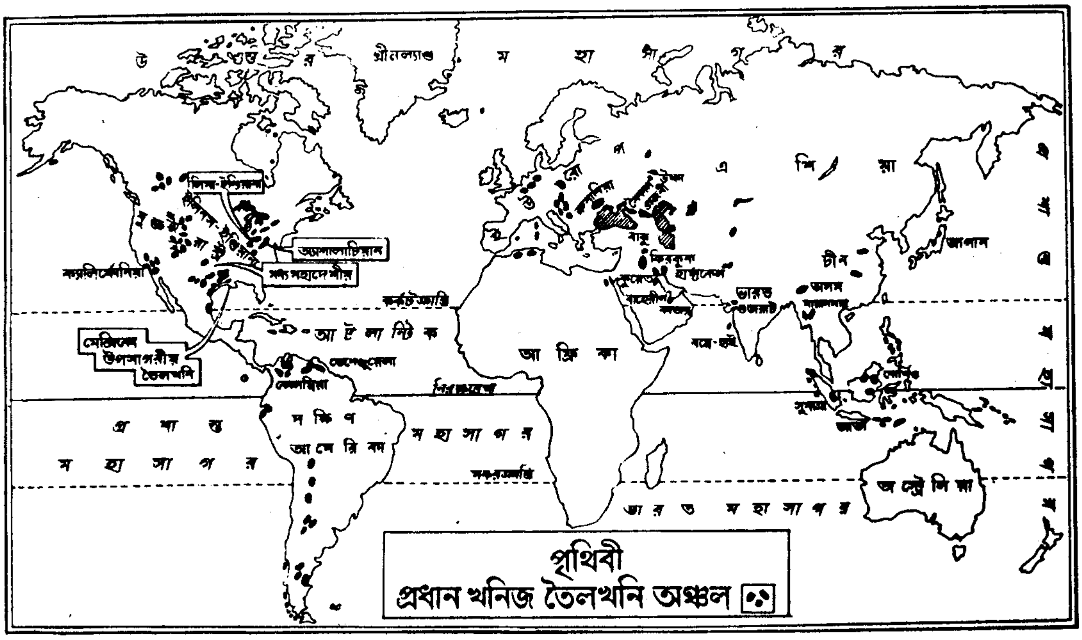

বিশ্বের খনিজ তেল উৎপাদক অঞ্চল

(৫) **ইরান**—পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের সমস্ত দেশ তৈল উত্তোলনের জন্য প্রসিদ্ধ। এই অঞ্চলের সৌদি আরবের মতো ইরানও প্রচুর পরিমাণে তৈল উৎপাদন করে বিশ্বে **চতুর্থ** স্থান অধিকার করেছে। এ দেশের তৈলখনি অঞ্চলগুলি হল **মসজিদ-ই-সুলেমান, আঘাজারি, গাছসারন, নাফৎ-ই-সাহিদ, লালি** প্রভৃতি। ইরানের বন্দর এলাকায় অনেক তৈল শোধনাগার গড়ে উঠেছে। আবাদান ইরানের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত বিশ্বের বৃহত্তম তৈল শোধনাগারের অন্যতম।

(৬) **চীন**—বর্তমানে চীন তৈল উত্তোলন বিশ্বে **প্রথম** স্থান অধিকার করে। এ দেশের **তাচিং, কারামাই, উরুমচি, সায়দম** ও সিকিয়াং অঞ্চল তৈল উত্তোলনের জন্য প্রসিদ্ধ। এক সময় চীন ছিল তৈল আমদানিকারী দেশ। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৪-এর মধ্যে বেশ কয়েকটি নতুন খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় এটি এখন তৈলি রপ্তানিকারী দেশে পরিণত হয়েছে।

দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা, উত্তর আমেরিকা মেক্সিকো, যুক্তরাজ্য ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের ইরাক, কুয়েত প্রভৃতি দেশ তৈল উত্তোলন ও রপ্তানি করে। ভারতে খুব বেশি তেল পাওয়া যায় না। ভারত তার প্রয়োজনের অধিকাংশ তৈল বিদেশ থেকে আমদানি করে। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ভারত মাত্র তিন কোটি ২৬ লক্ষ মেট্রিক টন তৈল উৎপাদন করেছিল। ভারতের মুম্বাই-এর অদূরে সমুদ্রগর্ভে **বোম্বে-হাই,** গুজরাটের **কাম্বো** অঞ্চল (আঙ্কালেশ্বর, লুনেজ) ও অসমের ঊর্ধ্ব ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় (নাহারকাটিয়া, রুদ্রসাগর) খনিজ তৈল উত্তোলিত হয়।

৪(জ).৪.৪ খনিজ তেলের আমদানি ও রপ্তানিকারী দেশ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন ছাড়া বিশ্বে অন্যান্য প্রধান পেট্রোলিয়াম উৎপাদক দেশগুলি শিল্পে অনুন্নত। এ সব দেশ পেট্রোলিয়াম রপ্তানি করে। তেল রপ্তানিকারী দেশগুলোর প্রধান আন্তর্জাতিক সংস্থার নাম OPEC বা ওপেক (Organisation of Petroleum Exporting Countries)। সৌদি আরব, ইরান, কুয়েত, ইরাক, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, আলজিরিয়া, লিবিয়া, নাইজেরিয়া, গ্যাবন, ভেনেজুয়েলা, ইন্দোনেশিয়া তেল রপ্তানি করে। এরা সকলে OPEC-এর সদস্য রাষ্ট্র। এছাড়া কলম্বিয়া বাহারিন ও চীন তেল রপ্তানি করে।

খনিজ তেল উৎপাদন করে না বা খুব কম উৎপাদন করে এমন সব দেশই তেল আমদানি করে। ইউরোপের দেশসমূহ যেমন ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানি, ইতালি; এশিয়ার জাপান, ভারত, মায়ানমার, থাইল্যান্ড; ওশিয়ানিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড তৈল আমদানিকারী দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর তৈল উৎপাদন করলেও চাহিদা বেশি হওয়ায় এরা বাইরে থেকে তেল আমদানি করে।

৪(জ).৪.৫ খনিজ তেল সম্পদের ক্ষয় (Depletion of petroleum)

খনিজ তৈল গচ্ছিত অপুনর্ভব (Fund & Non-renewable) সম্পদ। খনি থেকে যতই তৈল উত্তোলন করে নেওয়া হচ্ছে ততই এর পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। এর পরিমাণ ক্রমশ কমছে কিন্তু ব্যবহার দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পেট্রোলিয়াম আরও দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। বিগত পঞ্চাশ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১২৯%। এই পঞ্চাশ বছরে পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার বেড়েছে প্রায় ৫৫০%। এইভাবে দ্রুতহারে পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার বাড়তে থাকলে আগামী ২০ বছরের মধ্যে বিশ্বের সমস্ত পেট্রোলিয়াম নিঃশেষিত হবে। মিডো (Meadow)-এর 'দি লিমিটস টু গ্রোথ' রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বেশি ক্ষয়শীল সম্পদের জায়গায় কম ক্ষয়শীল সম্পদ ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ পেট্রোলিয়ামের জায়গায় প্রবহমান শক্তিসম্পদ যেমন সৌরশক্তি, জলবিদ্যুৎ, বায়ুশক্তি ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে

পারে। নিদেনপক্ষে কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। কয়লার তুলনায় পেট্রোলিয়ামের শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ও ব্যবহারের সুবিধা অনেক বেশি তাই কয়লার ব্যবহার তেমনভাবে হচ্ছে না। ভবিষ্যতে পেট্রোলিয়াম পুরোপুরি ফুরিয়ে গেলে হয়তো কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। কারণ ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা কয়লা থেকে তৈল উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন।

৪(জ).৪.৬ পেট্রোলিয়াম যুগের অবসান

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে পেট্রোলিয়াম খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। নিকট ভবিষ্যতে আর এটি পাওয়া যাবে না। তখন এই পেট্রোলিয়াম-নির্ভর শিল্প সভ্যতার অবস্থা কেমন হবে? পেট্রোলিয়াম যুগের অবসানে এর প্রতিস্থাপক হিসাবে কোন শক্তিসম্পদ ব্যবহৃত হবে তা নিয়ে বিশ্বের শক্তি বিজ্ঞানীরা গবেষণায় মগ্ন। এর বিকল্প হিসাবে ইতিমধ্যে অনেকরকম শক্তির কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু কোনোটাই পেট্রোলিয়ামের মতো কার্যকরী নয়। তাই সেগুলিকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। নীচে সেরকম কয়েকটি বিকল্প শক্তির কথা উল্লেখ করা হল।

(১) **সৌরশক্তি**--এটির সম্ভাবনা অনেক বেশি। এ থেকে সহজে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় এবং এটি কোনোদিনই ফুরিয়ে যাবে না। কিন্তু এর উৎপাদন ব্যয় অনেক বেশি এবং সৌরালোক না থাকলে সৌরশক্তি উৎপাদন করা যায় না।

(২) **হাইড্রোজেন**--বিজ্ঞানীরা তরল হাইড্রোজেন দিয়ে গাড়ি চালাতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এর উৎপাদন ব্যয় ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় এত বেশি যে এর বাণিজ্যিক ব্যবহার এখন সম্ভব নয়। শিল্পে এর ব্যবহার প্রায় অসম্ভব।

(৩) **অ্যালকোহল**--পেট্রোলের সঙ্গে অ্যালকোহল মিশিয়ে ব্রাজিল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গাড়ি চালানো হয়। এই মিশ্রণের নাম গ্যাসোহল। এতে মাত্র ১০% থেকে ১৫% অ্যালকোহল থাকে। ভবিষ্যতে আশা করা যায় এই জ্বালানী মিশ্রণে অ্যালকোহলের পরিমাণ অনেক বাড়ানো যাবে। তখন অ্যালকোহল হবে মুখ্য জ্বালানী। অ্যালকোহল পাওয়া যায় কৃষিজ শস্য থেকে। তাই এটি পুনর্নবীকরণযোগ্য(Renewable) সম্পদ।

(৪) **ব্যাটারি**--গাড়ি চালানোর জন্য পেট্রোল বা ডিজেলের পরিবর্তে ব্যাটারি ব্যহার শুরু হয়েছে। এই ব্যাটারি হল বারবার চার্জ দেওয়া যায় এমন অ্যাসিড-লেড ব্যাটারি। ব্যাটারি যদি জলবিদ্যুৎ, জোয়ার-ভাটার শক্তি বা বায়ু-বিদ্যুৎ-এর সাহায্যে চার্জ দেওয়া হয় তবে তা কোনোদিন শক্তি সমস্যার সৃষ্টি করবে না।

উপরিউক্ত ক্ষেত্রে গাড়ি চালানোর জন্য পেট্রোলিয়ামের বিকল্প কী হবে শুধু তাই আলোচনা করা হয়েছে। শিল্প কারখানায় পেট্রোলিয়ামের বিকল্প হিসাবে অবশ্যই জলবিদ্যুৎ, জোয়ার-ভাটার শক্তি, ভূতাপ শক্তি, বায়ুশক্তি, জৈব পদার্থ থেকে উৎপন্ন শক্তি ও অবশ্যই সৌরশক্তি ব্যবহার করতে হবে। বিশ্বে এইসব শক্তির ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অন্যান্য নতুন শক্তি আবিষ্কৃত হচ্ছে। পেট্রোলিয়াম যুগের অবসান কোন শক্তি শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করবে তা ভবিষ্যতই বলে দেবে।

৪(জ).৪.৭ খনিজ তেল সংরক্ষণ (Conservation of petroleum)

খনিজ তৈল একটি অমূল্য সম্পদ। এটি অপরিহার্য। সেই সঙ্গে এটি দ্রুত হ্রাসশীল সম্পদ। এর আয়ুষ্কাল খুবই সীমিত। এর জীবন কিছুটা দীর্ঘায়িত করার জন্য এর সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। এর সংরক্ষণের জন্য পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় ঃ

(১) **বিকল্প শক্তির ব্যবহার**--পেট্রোলিয়াম জ্বালানীর ক্ষেত্রে প্রবহমান শক্তি যেমন--সৌরশক্তি, জলবিদ্যুৎ, বায়ুবিদ্যুৎ, জোয়ার-ভাটার বিদ্যুৎ বা তরঙ্গশক্তি, ভূতাপশক্তি এবং আরও অনেক প্রকার শক্তি ব্যবহার করতে হবে। পেট্রোলিয়ামের পরিবর্ত হিসাবে অয়েল শেল, টার স্যান্ড ও কয়লা ব্যবহার করলে একে দ্রুত বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

(২) **অপচয় নিবারণ**--পেট্রোলিয়াম উত্তোলন, পরিবহন ও ব্যবহারের সময় কিছু পেট্রোলিয়াম বিনষ্ট হয়। এই মহার্ঘ্য বস্তুটির অপচয় অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। পুরানো যন্ত্রপাতির সাহায্যে তৈল উত্তোলন, খনি দুর্ঘটনা, আধুনিক প্রযুক্তির অভাব প্রভৃতি কারণে খনিজ তৈলের অপচয় ঘটে।

(৩) **কার্যকারিতা বৃদ্ধি**--অল্প পরিমাণ জ্বালানী তেল খরচ করে কীভাবে বেশি শক্তি পাওয়া যাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য জ্বালানী তেলের কার্যকারিতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৈল ব্যবহারকারী যন্ত্রপাতির দক্ষতাও বৃদ্ধি করতে হবে।

(৪) **বিচার-বিবেচনার সঙ্গে ব্যবহার**--যেখানে খনিজ তৈল ছাড়া চলবে না কেবল সেখানেই এটি ব্যবহার করতে হবে। অন্যত্র বিকল্প জ্বালানী করা কর্তব্য। এ বিষয়ে জনগণকে অর্থাৎ তৈল ব্যবহারকারীকে সচেতন হতে হবে।

৪(জ).৫ সারাংশ

দুটি প্রধান জীবাশ্ম জ্বালানী হল কয়লা ও খনিজ তেল। কয়লার তুলনায় খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়ামের গুরুত্ব বর্তমানে অনেক বেশি। কিন্তু পেট্রোলিয়াম খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে। পেট্রোলিয়ামের পরিবর্তে কী জ্বালানী ব্যবহৃত হবে তার অনুসন্ধান চলছে। ইতিমধ্যে অনেক বিকল্প পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সৌরশক্তি প্রধান শক্তি উৎস হিসাবে ভবিষ্যতে গণ্য হতে পারে। কয়লা ও পেট্রোলিয়াম সংরক্ষণ করাও জরুরি।

৪(জ).৬ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী ঃ

১। কয়লার প্রধান ব্যবহারগুলি কী কী? পৃথিবীর কোন কোন দেশ কয়লা উৎপাদনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে?

২। কয়লা সংরক্ষণে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়?

৩। পেট্রোলিয়ামকে জীবাশ্ম জ্বালানী বলা হয় কেন? এর গুরুত্ব আলোচনা করুন। কোন কোন অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়?

৪। পেট্রোলিয়াম ফুরিয়ে গেলে কী হবে?

৫। পেট্রোলিয়াম সংরক্ষণের জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত?

৬। উদাহরণসহ অশোধিত খনিজ তেলের শ্রেণীবিভাগ করুন।

বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী ঃ

সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন--

(ক) অধাতব খনিজগুলি কী কী?

(খ) লৌহের প্রধান আকরিকগুলির নাম কী?

(গ) কোন কোন ধাতু মিশিয়ে জার্মান সিলভার তৈরি হয়?

(ঘ) বিশ্বের প্রধান তাম্র উৎপাদক দেশ কোনটি?

শূন্যস্থান পূরণ করুন--

(ক) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পেট্রোলিয়াম উৎপাদক দেশ__________।

(খ) বর্তমান বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্বালানি__________।

(গ) স্যাকারিন__________এর উপজাত দ্রব্য।

(ঘ) কয়লা উৎপাদনে ভারত__________স্থান অধিকার করে।

৪(জ).৭ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Alexander E. W–Economic Geography.

(২) Jones and Darken Wald–Economic Geography.

(৩) অনীশ চট্টোপাধ্যায়--বি. কম. সম্পদ সমীক্ষা।

(৪) তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌতম মল্লিক--অর্থনৈতিক সম্পদ সমীক্ষা।

(৫) Prithwish Roy–Resources Studies.

৪(জ).৮ উত্তর সংকেত

(ক) সৌদি আরব।

(খ) পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেল

(গ) কয়লা।

(ঘ) তৃতীয়।

একক ১ ☐ সামুদ্রিক সম্পদ (Marine Resources)

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ প্রস্তাবনা
১.৩ জোয়ার-ভাটার শক্তির উৎসরূপে সমুদ্র
১.৪ খনিজ ও রাসায়নিক শক্তির উৎসরূপে সমুদ্র
১.৫ মহাসাগরীয় তাপীয় শক্তির রূপান্তরকরণ
১.৬ জৈব পদার্থসমূহের উৎসরূপে সমুদ্র
১.৭ সমুদ্র ও জলবায়ু
১.৮ সমুদ্র ও কর্মসংস্থান
১.৯ সমুদ্র ও ব্যবসা-বাণিজ্য
১.১০ সমুদ্র ও স্বাস্থ্য
১.১১ পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎস্যক্ষেত্রসমূহ
১.১১.১ উত্তরপূর্ব আটলান্টিক মৎস্যক্ষেত্র
১.১১.২ উত্তর পশ্চিম আটলান্টিক মৎস্যক্ষেত্র
১.১১.৩ উত্তর পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় মৎস্যক্ষেত্র
১.১১.৪ উত্তর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় মৎস্যক্ষেত্র
১.১২ সমুদ্রের অর্থনৈতিক গুরুত্ব
১.১৩ সারাংশ
১.১৪ অনুশীলনী
১.১৫ উত্তর সংকেত
১.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন —

- সামুদ্রিক সম্পদের ধারণা ;
- সমুদ্রের শক্তির উৎস ;

- সামুদ্রিক শক্তির বিভিন্ন রূপ ;
- জলবায়ুর ওপর সমুদ্রের প্রভাব ;
- ব্যবসা বাণিজ্য ও স্বাস্থ্যের ওপর সমুদ্রের প্রভাব।

১.২ প্রস্তাবনা

মহাসাগর, সাগর, উপসাগর প্রভৃতির রূপ নিয়ে যে লবণাক্ত জলরাশি ভূপৃষ্ঠের প্রায় $\frac{৩}{৪}$ অংশ ঢেকে রয়েছে সেটাও একটি বিরাট প্রাকৃতিক সম্পদ তার বহুমুখী উপযোগের দরুন। জল ছাড়া জীবজগতের অস্তিত্বই সম্ভব নয়। সভ্যতার গোড়ার দিকে অবশ্য মানুষ সমুদ্রের এত সব উপযোগের কথা জানত না। সভ্যতার অগ্রগতির পথে এসেছে জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি, আর তার ফলেই সমুদ্রের নানা উপকারিতা সম্পর্কে মানুষ ক্রমশ অবহিত হয়েছে।

১.৩ জোয়ার-ভাটার শক্তির (Tidal energy)

আমরা জানি যে, সমুদ্রে নিয়মিত জোয়ার-ভাটা হয়। জোয়ারের সময় সমুদ্রপৃষ্ঠের জল ফেঁপে উঠে, ভাটায় সেই জল নেমে যায়। মানুষের আবিষ্কৃত প্রযুক্তি পতনশীল জলের গতিশক্তিকে ব্যবহার করে। ফেঁপে ওঠা জলকে ভরা জোয়ারের সময় ধরে নিয়ে টারবাইনের মধ্য দিয়ে বেগে পড়ার বন্দোবস্ত করা হয় এবং এই পড়ন্ত জল বিদ্যুৎ তৈরি করে (অনেকটা উঁচু বাঁধ থেকে পড়ন্ত নদীজলের মতো)। ফ্রান্স এবং ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে পরিচালিত সমীক্ষা থেকে অনেকের মনে হয়েছে যে, জোয়ার-ভাটায় সমুদ্রজলের ওঠানামা যেসব অঞ্চলে অত্যধিক সেখানে ঊর্মিশক্তি উৎপাদনের খরচ কয়লা থেকে শক্তি উৎপাদনের খরচের চেয়ে বেশি হবে না। অবশ্য শক্তি-উৎপাদনকেন্দ্রগুলি যথেষ্ট বৃহদায়তন হওয়া চাই।

সমুদ্রের ঢেউ থেকে শক্তি উৎপাদনকারী কয়েকটি বিশিষ্ট অঞ্চল হল : (১) মার্কিন যুক্তরাজ্যের আলাস্কায় ফান্ড উপসাগর, (২) রাশিয়ায় শ্বেত সাগর, (৩) ফ্রান্সে সেন্ট মাইকেল মন্ট, (৪) আর্জেন্টিনায় সান জোস, এবং (৫) ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে সেভার্ন।

ভারতবর্ষে সাগর থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কয়েকটি কেন্দ্র চিহ্নিত করা হয়েছে। যথা, পশ্চিম উপকূলে কচ্ছ এবং ক্যাম্বে উপসাগর (গুজরাট), এবং পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবনের উপকূলভাগের সমুদ্র। এই উৎপাদনকেন্দ্রগুলি চালু হলে তাদের কাছ থেকে মোট ৮ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তিন দিকে সাগরবেষ্টিত ভারতে জোয়ার-ভাটা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা খুব বেশি।

১.৪ খনিজ ও রাসায়নিক পদার্থের উৎসরূপে সমুদ্র

সমুদ্রের বিপুল জলরাশির পরিমাণ প্রায় ৩৫ কোটি ঘন মাইল। বিজ্ঞানীদের অনুমান প্রতি ঘনমাইলে প্রায় ১৬.৫ কোটি টন দ্রবীভূত খনিজ ও রাসায়নিক পদার্থ আছে। দ্রবীভূত উপাদানগুলির সংখ্যা আনুমানিক ৫৭। এর মধ্যে রয়েছে ক্লোরিন, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার (গন্ধক), ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ব্রোমাইন, বেরিয়াম, জিঙ্ক (দস্তা), ম্যাঙ্গানিজ (ক্ষুদ্র পিণ্ডের আকারে), হাইড্রো-কার্বন (পেট্রোলের যা সর্বপ্রধান

উপাদান), তামা, আকরিক লোহা, টিন, থোরিয়াম এবং ইউরেনিয়াম (যা পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রয়োজন হয়)।

সমুদ্রজলকে বাষ্প করে উড়িয়ে দিলে লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড) পাওয়া যায়। সমুদ্রজলকে বাষ্পীভূত করে তৈরি লবণ চীন, ভারত, তুরস্ক এবং আরো কয়েকটি দেশে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। ভারতে, প্রধানত গুজরাট, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশে এভাবে লবণ প্রস্তুত করা হয়। বিশ্বে উৎপাদিত লবণের বেশির ভাগ খাবার জন্য নয়, রাসায়নিক শিল্পের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিছু কিছু লবণ কার্পাস বস্ত্র, মৎস্য সংরক্ষণ এবং চর্মশিল্পে ব্যবহৃত হয়। পটাসিয়ামও একজাতের লবণ। মধ্যপ্রাচ্যের মরুসাগর পটাসিয়ামের জন্য বিখ্যাত। ফিল্ম পরিস্ফুটনের জন্য এর প্রয়োজন হয়।

হাইড্রোকার্বন পেট্রোলের মুখ্য উপাদান। সমুদ্রপৃষ্ঠে বিচরণকারী নানা সামুদ্রিক প্রাণীর দেহ মৃত্যুর পরে সমুদ্রতলের কর্দমে আবদ্ধ হয়ে প্রবল চাপে কালক্রমে হাইড্রোকার্বনে রূপান্তরিত হয়। উপকূলবর্তী সমুদ্র থেকে উত্তোলিত তেল বর্তমানে বিশ্বের মোট তেল উৎপাদনের প্রায় ৩০%। বিশ্বের বিশিষ্ট সামুদ্রিক তেল উত্তোলক কেন্দ্রগুলির অবস্থান নীচে দেওয়া হল ঃ

ইউরোপে উত্তর সাগর (বিশেষত গ্রেট ব্রিটেন ও নরওয়ে), মেক্সিকো উপসাগর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), পারস্যোপসাগর (প্রধানত সৌদি আরব), ইন্দোনেশিয়া এবং ভারতেও সামুদ্রিক তেল তোলা হয়। ভারতে উত্তোলিত মোট তেলের প্রায় $\frac{২}{৩}$ ভাগ মহারাষ্ট্রের বোম্বাই দরিয়া (Bombay High) থেকে পাওয়া যায়। সম্প্রতি তামিলনাড়ুর রাভভা তেলপ্রকল্প সামুদ্রিক তেল উত্তোলন শুরু করে দিয়েছে।

সমুদ্রতলে যে পরিমাণ ইউরেনিয়াম রয়েছে তার সাহায্যে যে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদিত হতে পারে তার দ্বারা ৬০০ কোটি বিশ্ববাসীর ৭ লক্ষ বছরের প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান হবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

সমুদ্রতলের কাদা (sediments) এবং ডুবে থাকা প্রস্তরশৈলগুলি (মহাদেশীয় সোপানে যাদের অবস্থান) সোনা, তামা, নিকেল, সীসা, লোহা প্রভৃতি খনিজ পদার্থে আকীর্ণ। প্রযুক্তির উন্নতি হলে ওই সম্পদ ব্যবহার করা যাবে। খনিজ মেশানো ভারি বালুকা ভারতের সমুদ্রোপকূলে বহু স্থানে ছড়িয়ে আছে বলে জানা যায় (বিশেষত তামিলনাড়ু এবং কেরালায়)।

গভীর সমুদ্রের তলদেশেও বিভিন্ন খনিজ (লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি) পদার্থের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে সমুদ্রতলে ফেরো ম্যাঙ্গানিজ (Ferro-manganese) পাওয়া গেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের তিনটি এলাকায় লোহা, তামা, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ প্রচুর পরিমাণে আছে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আপনি নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন যে, সমুদ্র থেকে প্রাপ্তব্য খনিজ সম্পদ মোটের উপর তিন শ্রেণীর ঃ (১) দ্রবীভূত খনিজ (বা রাসায়নিক পদার্থ, যথা, নানা জাতের লবণ) (২) সমুদ্রতলের কাদা এবং লুকোনো প্রস্তরশৈল থেকে পাওয়া যাবে এমন সব খনিজ (দ্রবীভূত নয়) এবং (৩) গভীর সমুদ্রতলের ভূত্বকে প্রোথিত নানা খনিজ (দ্রবীভূত নয়)। উপরোক্ত শ্রেণীগুলিকে আপনি গুলিয়ে ফেলবেন না। অবশ্য নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন যে, কোনও কোনও খনিজ সমুদ্রতলের নরম কাদা এবং অপেক্ষাকৃত কঠিন ভূত্বক উভয় স্থান থেকেই আহরণ করা যেতে পারে।

১.৫ মহাসাগরীয় তাপীয় শক্তি রূপান্তরকরণ [Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC)]

৩০ নং উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যবর্তী উষ্ণ অঞ্চলগুলিতে প্রায় ১০০০ মিটার পর্যন্ত গভীরতার শীতল জল এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের অপেক্ষাকৃত গরম জলের মধ্যে প্রায় ২০° সেঃ তাপমাত্রার তারতম্য থাকে। উপযুক্ত প্রযুক্তির সাহায্যে এই তাপ পাথর্ক্যকে শক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব। সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘ (UNO) হিসাব দিয়েছে যে, ৯৯টি দেশ ওই শক্তিসম্পদে সমৃদ্ধ। ভারতও এদের অন্যতম। ভারতে তামিলনাড়ুর নিকটবর্তী উপকূলে ১০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন একটি রূপান্তরকরণের কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

১.৬ জৈব পদার্থসমূহের উৎস হিসাবে সমুদ্র

সমুদ্রে বিভিন্ন রকমের জৈব পদার্থ (biological organisms) পাওয়া যায়। প্ল্যাংকটন (Plankton) এবং নানা জাতের সামুদ্রিক শৈবাল এগুলির অন্তর্গত। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের অন্যতম খাদ্য মাছ এবং মাছের প্রধান খাদ্য প্ল্যাংকটন। সাগরজলে ভাসমান অতিক্ষুদ্র প্ল্যাংকটন দুই শ্রেণীর—

অতিক্ষুদ্র প্রাণী এবং অতিক্ষুদ্র উদ্ভিদ

শেষোক্ত শ্রেণীর প্ল্যাংকটন সমুদ্র শৈবালের (marine algae) সমগোত্রীয়। উদ্ভিদজাতীয় প্ল্যাংকটনের বেঁচে থাকা এবং বংশবৃদ্ধি সূর্যালোক নির্ভর। জলে ২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত সূর্যকিরণ প্রবেশ করতে পারে। তাই ওই গভীরতার মধ্যেই সবচেয়ে বেশি মাছ পাওয়া যায়। সমুদ্রোপকূলের কাছাকাছি স্থানেই প্ল্যাংকটনের বংশবৃদ্ধির হার বেশি। তাছাড়া আরও তিনটি বিষয় এই ব্যাপারে কাজ করে। (১) নদীতে বাহিত হয়ে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ উপকূলবর্তী সমুদ্রে জমে, যাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি ওদের বৃদ্ধির সহায়ক। (২) নদীর মোহানার কাছে বিপরীতমুখী স্রোতের মিলন ঘটে। ফলে জলের ওঠানামা বেশি হয় এবং অনেক খনিজ লবণ জলের উপরিভাগে উঠে এসে প্ল্যাংকটনদের খাদ্যদান করে। (৩) তীরভূমির কাছাকাছি মগ্ন চড়াগুলির উপর প্রতিনিয়ত বিভিন্ন তাপমাত্রা এবং রাসায়নিক গুণবিশিষ্ট জলের স্রোত এসে মিলিত হয়। প্ল্যাংকটনদের বসবাস এবং বংশবৃদ্ধির পক্ষে এই জাতীয় পরিবেশই দরকার। তাই উত্তরসাগরের ডগার্স ব্যাঙ্ক, নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের উপকূলে গ্র্যান্ড ব্যাঙ্ক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছি জর্জেস ব্যাঙ্কে মৎস্যচাষের জন্য বিখ্যাত হয়ে গেছে। প্ল্যাংকটন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় মৎস্যখাদ্যের পরিমাণ ভারতের পশ্চিমোপকূলের চেয়ে পূর্বোপকূলে অপেক্ষাকৃত কম। আরবসাগরের উপকূলে ধৃত মাছের পরিমাণ তাই বঙ্গোপসাগরের উপকূলে ধৃত মাছের পরিমাণের চেয়ে বেশি।

[**নির্দেশ ঃ** পড়ার সময় পৃথিবীর মানচিত্র সামনে রাখবেন এবং উক্ত স্থানগুলিকে মানচিত্র দেখে চিনে রাখবেন।]

উপরোক্ত জৈবিক পদার্থগুলি শুধু মাছের খাদ্যই নয়, মানুষের খাদ্য হিসাবেও তাদের প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। তদুপরি সার হিসাবেও তাদের ব্যবহার করা যাবে। পূর্ব এশিয়া সামুদ্রিক শৈবাল এবং উদ্ভিদের বৃহত্তম চাষকেন্দ্র। চীনের স্থান এই ব্যাপারে সব দেশের আগে। জাপানে এবং ফ্রান্সের বৃটানিতে সামুদ্রিক উদ্ভিদ সার হিসাবে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

১.৭ সমুদ্র এবং জলবায়ু

কোনও দেশের সীমানায় সমুদ্র থাকলে সেই সমুদ্র তার জলবায়ুর একটি বিশিষ্ট নির্ধারক হয়ে দাঁড়ায়। যদি আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগর দ্বারা একদিকে পরিবেষ্টিত না থাকত, তবে নিরক্ষরেখার অনতিদূরবর্তী ভারতবর্ষ মরুভূমি হয়ে যেত। কেননা তাহলে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হত না, বৃষ্টির মেঘ দক্ষিণ থেকে এসে দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় বারিপাত ঘটাত না এবং গ্রীষ্মের দাবদাহকে কমিয়ে এমন আবহাওয়াকে স্নিগ্ধ ও সহনযোগ্য করে তুলত না। 'আল্লা মেঘ দে পানি দে' বলে ভারতের বেশ কিছুসংখ্যক রাজ্যের অধিবাসীদের সম্বৎসর প্রার্থনা করতে হত।

জলভাগের চেয়ে স্থলভাগ বেশি তাড়াতাড়ি গরম আর শীতল হয়। ফলে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় গরমের দেশে তীরবর্তী ভূখণ্ডের চেয়ে সমুদ্রজল তুলনামূলকভাবে অনেক ঠাণ্ডা থাকে। আর ফলে দিবাবসানের সময় সমুদ্রতীরস্থিত গোটা এলাকাতেই একটা স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে পড়ে, তাপ অসহনীয় হয় না। আবার শীতের দেশে প্রচণ্ড শীতের সময় অপেক্ষাকৃ উষ্ণ সমুদ্র শৈত্য হ্রাস কার তাকে সহনীয় করে দেয়। শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ের তীব্রতা কমিয়ে দেয় বলে সমুদ্রতীরের জলবায়ুর একটা আলাদা আকর্ষণ পর্যটকদের কাছে থাকে। দারুণ শীতের সময় কলকাতা থেকে পুরীর সাগরবেলায় গিয়ে অনেকেরই মনে হয় যেন রাতারাতি কোনও ভোজবাজিতে তীব্র শীত উধাও হয়ে অকালে বসন্ত নেমে এল।

১.৮ সমুদ্র এবং কর্মসংস্থান

সমুদ্র নানাভাবে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সহায়তা করে। সভ্যতার আদিযুগ থেকে মানুষ নানা শ্রেণীর জলযান নির্মাণ করে আসছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে। এককালে যেখানে মানুষ শুধুমাত্র হালকা কাঠের ভেলা ছাড়া আর কিছু তৈরি করতে জানত না সেখানে আজ সেই মানুষ তৈরি করছে ছোট্ট নৌকা থেকে শুরু করে বিরাট জাহাজ এবং ডুবোজাহাজ প্রভৃতি রকমারি সমুদ্রযান। এই সব জলযান ব্যবহৃত হচ্ছে নানা উদ্দেশ্যে। যথা,

(১) স্থানান্তরে যাতায়াত (ভ্রমণ)

(২) আমদানি-রপ্তানির পণ্যবহন (পরিবহন),

(৩) মৎস্য ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী খাদ্যের জন্য শিকার (খাদ্যসংগ্রহ) এবং

(৪) রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা (প্রতিরক্ষা)

বিভিন্ন প্রকার এবং আয়তনের জলযান নির্মাণ, সংরক্ষণ আর মেরামতির কাজে অনেক লোকের কাজের সুযোগ হয়। এটা তো প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান। পরোক্ষভাবেও বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়। যেমন, জলযান নির্মাণ কেন্দ্রের জন্য রাস্তাঘাট, জেটি, বন্দর প্রভৃতি তৈরি করতে হয়। পণ্যবাহী (সামরিক ও অসামরিক) পোতে কিছু লোক চাকুরি পায়। মৎস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামুদ্রিক প্রাণী শিকারেও কর্মসংস্থান হয়। চীন, পেরু, চিলি এবং জাপানে বহু নরনারী সামুদ্রিক মৎস্য সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। ব্রিটেন ও জাপানের পোত শিল্প বিখ্যাত। ভারতে বিশাখাপত্তনমে জাহাজ তৈরি হয়। তদুপরি, সমুদ্র তীরে কোনও কোনও স্থানে পর্যটন শিল্প গড়ে উঠলে সেখানেও অনেক কর্মসংস্থান হয়। ভারতের পশ্চিম উপকূলে গোয়ায় এবং পূর্ব উপকূলে পুরীতে এই ধরনের পর্যটন শিল্প গড়ে উঠেছে।

১.৯ সমুদ্র এবং ব্যবসাবাণিজ্য

সমুদ্রের উপর দিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে পণ্য চলাচল হয়। এক দেশের জিনিসপত্র অন্য দেশে যায়, আমদানি রপ্তানি চলে। বিমানব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি সত্ত্বেও ভারী মালপত্র বহনের জন্য আজো বড় জাহাজ ছাড়া চলে না। পালতোলা জাহাজের যুগ শেষ হয়ে উনবিংশ শতকে যখন বাষ্পীয় জাহাজের যুগ এল, তখন সমুদ্রযাত্রার নিরাপত্তাও বহুগুণ বেড়ে গেল। ফলে সমুদ্রবাহিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণও অনেক বেড়ে গেল। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের সমৃদ্ধি সেই সময়ে বহুলাংশে সামুদ্রিক বাণিজ্য নির্ভর হয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্য থেকে সমুদ্রযানে তেল না এলে ভারতের অর্থনীতি অচল হয়ে যাবে।

১.১০ সমুদ্র ও স্বাস্থ্য

সমুদ্র দুইভাবে মানবজাতির স্বাস্থ্যরক্ষা করে : প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে। মহাসাগর, সাগর ও উপসাগরগুলি মিলে গোটা বিশ্ব জুড়ে যে বিশাল সমুদ্র ব্যবস্থা নির্মাণ করেছে সেটা অক্সিজেনের বৃহত্তম যোগানদার। আর এই অক্সিজেনই মানবস্বাস্থ্যের সবচেয়ে বড় নির্ধারক। বায়ুদূষণে জেরবার হয়ে এবং শ্বাসযন্ত্রের নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে নিরাময়ের জন্য তাই আমরা ছুটে যাই সমুদ্রতীরবর্তী স্বাস্থ্যোদ্ধার কেন্দ্রে। অক্সিজেনসমৃদ্ধ বিশুদ্ধ সামুদ্রিক হাওয়া আমাদের দেহকে সঞ্জীবিত করে। সাগরের দৃশ্য আমাদের মনকেও চাঙ্গা করে। বালুকাবেলায় স্বাস্থ্যের জন্য সূর্যস্নানের প্রতি শীতপ্রধান দেশের নরনারীর একটি বিশেষ টান দেখা যায়। সমুদ্রতীরস্থিত অঞ্চল বায়ুদূষণ থেকে অনেকটা মুক্ত বলে মুম্বাই ও চেন্নাই শহরের বায়ুদূষণ মাত্রা কলকাতার চেয়ে অনেক কম। [অবশ্য অত্যুচ্চ পার্বত্য এলাকাতেও বায়ুদূষণ খুবই কম। সেটা উচ্চতার জন্য। কিন্তু বেশি উচ্চতায় আবার অক্সিজেনের পরিমাণ বাতাসে কম থাকে।] পরোক্ষভাবেও সমুদ্র মানুষের স্বাস্থ্য প্রভাবিত করে। সুঠাম দেহ গঠন ও সংরক্ষণের জন্য চাই উপযুক্ত, বিশেষত প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য। মাছ প্রভৃতি খাদ্য আমরা বহুলাংশে সমুদ্র থেকেই পাই। বিশ্বের মোট মৎস্য সংগ্রহের আশি শতাংশেরও বেশি আসে সমুদ্র থেকে। ভারতে মোট মৎস্য শিকারের অর্ধাংশের সামান্য বেশি সমুদ্র থেকে পাই। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সেটা কুড়ি শতাংশও নয়। পশ্চিমবঙ্গ ভারতে সর্বাধিক মৎস্যসংগ্রহকারী রাজ্য, এবং মোট সংগ্রহের গরিষ্ঠ অংশ আসে নদী, খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতি অন্তর্দেশীয় মৎস্যকেন্দ্রগুলি থেকে। বিশ্বে মৎস্য সংগ্রহে অগ্রণী দেশগুলি হল চীন, পেরু, চিলি ও জাপান।

১.১১ পৃথিবীর প্রধান মৎস্যচারণ ক্ষেত্রসমূহ (Major Fishing Grounds of the World)

পৃথিবীর মোট ধৃত মৎস্যের অধিকাংশই আসে সমুদ্রের নোনাজল থেকে (প্রায় ৮০%)। গোটা ভারতেও অর্ধেকের বেশি ধৃত মৎস্য সমুদ্রজাত, যদিও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তা নয়।

বিশ্বের প্রধান মৎস্যচারণ ক্ষেত্র হচ্ছে চারটি ঃ যথা —

(১) উত্তরপূর্ব আটলান্টিক

(২) উত্তরপশ্চিম আটলান্টিক

(৩) উত্তরপূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর এবং

(৪) উত্তরপশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর।

১.১১.১ উত্তরপূর্ব আটলান্টিক মৎস্যক্ষেত্র

আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্বপ্রান্তে উত্তরমেরু সন্নিহিত আইসল্যান্ড থেকে ইউরোপের গোটা পশ্চিমপ্রান্ত হয়ে ভূমধ্যসাগর অবধি এই সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্র প্রসারিত। এর একটি অংশ উত্তর সাগর হয়ে রাশিয়ার উত্তরে শ্বেতসাগর অবধি চলে গেছে। এই মৎস্যক্ষেত্রটিই বিশ্বে বৃহত্তম। ধৃত মৎস্যের পরিমাণ অনুসারে অগ্রণী দেশগুলি হচ্ছে নরওয়ে, ডেনমার্ক, স্পেন, আইসল্যান্ড, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও পর্তুগাল। সংগৃহীত মৎস্যের মধ্যে প্রধান হল হেরিং, কড ও ম্যাকরল। এই মৎস্যক্ষেত্রের বিখ্যাত মৎস্যবন্দরগুলি হল ব্রিটেনের হাল, ডেনমার্কের কোপেনহাগেন, জার্মানির লুইবেক এবং ফ্রান্সের বুঁলো।

উত্তরপূর্ব আটলান্টিক মৎস্যক্ষেত্রের উন্নতির কারণগুলি হচ্ছে ঃ

(১) একটি অগভীর মহীসোপানের উপরে মৎস্যক্ষেত্রটির অবস্থান;

(২) একাধিক মগ্ন চড়ার অবস্থান (যার মধ্যে উত্তর সাগরের ডগার্স ব্যাঙ্ক বিখ্যাত);

(৩) নরওয়ের উপকূলব্যাপী অসংখ্য ফিয়োর্ড এবং খাঁড়ির অবস্থান (যেখানে একদিকে প্রচুর মৎস্যখাদ্যের জন্য বহু মাছের আগমন হয়, অন্যদিকে ঝড় ঝঞ্ঝার হাত থেকে বাঁচবার জন্য মৎস্যশিকারি জলযান সহজে নিরাপদ পোতাশ্রয় পেয়ে যায়);

(৪) মৎস্য সংরক্ষণ ও মৎস্যজাত বিভিন্ন দ্রব্য নির্মাণ শিল্পের সহায়ক নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু;

(৫) প্রাচীন কাল থেকে আয়ত্ত পশ্চিম ইউরোপবাসীদের নৌ পারদর্শিতা; এবং

(৬) পশ্চিম ইউরোপেই সর্বপ্রথম শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হওয়ার দরুন আধুনিক মৎস্যশিল্প গঠনের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, মূলধন এবং শ্রমদক্ষতার সহজলভ্যতা।

১.১১.২ উত্তর-পশ্চিম আটলান্টিক মৎস্যক্ষেত্র

উত্তর আমেরিকার নিউ ফাউন্ডল্যান্ড থেকে মার্কিন যুক্তরাজ্যের নিউ ইংলন্ড পর্যন্ত উপকূলভাগ জুড়ে উত্তরপশ্চিম আটলান্টিক মৎস্যক্ষেত্র অবস্থিত। কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাজ্য এই মৎস্যক্ষেত্রে অগ্রণী মৎস্যশিকারি দেশ। তবে ব্রিটেন, স্পেন, পর্তুগাল, জাপান প্রভৃতি কয়েকটি দেশও এখানে মৎস্য আহরণ করে থাকে। বিখ্যাত মৎস্যবন্দরগুলি হল কানাডার হ্যালিফেক্স এবং আমেরিকার বোস্টন ও পোর্টল্যান্ড। উল্লেখযোগ্য মাছগুলি হল কড (নিউ ফাউন্ডল্যান্ড যে জন্য বিখ্যাত), হেরিং ও ম্যাকরল। এই বিস্তৃত মৎস্যক্ষেত্রটির বিকাশের বিশিষ্ট কারণগুলি হল ঃ

(১) প্রচুর মৎস্যখাদ্য সমন্বিত একটি অগভীর মহীসোপানে অবস্থান (বিশেষত গ্র্যান্ড ব্যাঙ্ক, জর্জেস ব্যাঙ্ক প্রভৃতি মগ্ন চড়াগুলি মৎস্যখাদ্যমণ্ডিত হওয়ায় মৎস্যকূলের আগমন ও বিচরণ ঘটে);

(২) এই অঞ্চলের নদী মোহনায় নদীজলবাহিত বিবিধ খনিজ ও আবর্জনা থেকে মৎস্যখাদ্য তৈরি হয়ে সমুদ্র-জলে মিশ্রণ ;

(৩) নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের অদূরে শীতল লাব্রাডর স্রোতের সঙ্গে উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের সংমিশ্রণের দরুন মৎস্যক্ষেত্রের জলে শৈত্যের তীব্রতা হ্রাস;

(৪) উত্তর আমেরিকার দূরপ্রসারিত ভগ্ন উপকূল;

(৫) মৎস্য আহরণ ও বিপণন ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় জলযান নির্মাণ শিল্পের উদ্ভব;

(৬) মৎস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উপযোগী জলবায়ু।

১.১১.৩ উত্তরপূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় মৎস্যক্ষেত্র

উত্তর আমেরিকার পশ্চিমভাগে আলাস্কা থেকে মার্কিন যুক্তরাজ্যের ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল বরাবর জলভাগকে বলা হয় উত্তরপূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় মৎস্যক্ষেত্র। এখানে প্রধান মৎস্য হল স্যামন। হ্যালিবাট, কড, হেরিং এবং সার্ডিন মাছও পাওয়া যায়। এই মৎস্যচারণক্ষেত্রে অগ্রণী মৎস্যশিকারি দেশগুলি হল রাশিয়া, জাপান, মার্কিন যুক্তরাজ্য ও কানাডা। কানাডার ভ্যাংকুবার একটি বিরাট মৎস্য শিল্পকেন্দ্র।

উত্তরপূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় মৎস্যক্ষেত্র সৃষ্টির অনুকূল কারণগুলি হল ঃ

(১) প্রশান্ত মহাসাগরে পতিত বিভিন্ন নদীর জলবাহিত মৎস্যসহায়ক খনিজ;

(২) মৎস্যখাদ্যের প্রাচুর্য;

(৩) মৎস্যব্যবসায়ের সহায়ক জলবায়ু,

(৪) উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলে মৎস্যশিকারের উপযোগী জলযান নির্মাণের প্রয়োজনীয় কাঠ সরবরাহের জন্য বনভূমির অবস্থিতি;

(৫) মৎস্যক্ষেত্রে সংগৃহীত অধিকাংশ শ্রেণীর মৎস্যের বিরাট আন্তর্জাতিক বাজার; এবং

(৬) নিয়মিত ভগ্ন উপকূল।

১.১১.৪ উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় মৎস্যক্ষেত্র

বিশ্বের বৃহত্তম মৎস্যশিকার ক্ষেত্র এই মৎস্যাঞ্চল উত্তরে বেরিং সাগর থেকে দক্ষিণে চীনসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার প্রধান মৎস্য হল কড, হ্যালিবাট ও হেরিং। বেরিং সাগরে তিমি ও সীল শিকার করা হয়। অগ্রণী মৎস্যশিকারি দেশগুলি হল জাপান, চীন, দুই কোরিয়া এবং রাশিয়া। মৎস্য আহরণে জাপান বিশ্বে প্রথম স্থানাধিকারী। রাশিয়ার মৎস্যব্যবসায়ীরা অবশ্য শুধু প্রশান্ত মহাসাগরেই নয়, উত্তর আটলান্টিকেও মৎস্য সংগ্রহ করেন। এই মৎস্যক্ষেত্রের সর্বদক্ষিণে রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার চিলি যেখানেও প্রচুর মৎস্য আহরণ করা হয়।

গোলার্ধ হিসাবে ধরলে উত্তর গোলার্ধের প্রশান্ত মহাসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগর থেকে বিশ্বের মোট সমুদ্র মৎস্য শিকারের প্রায় ৮০% আসে। আইসল্যান্ড এবং ফারাও দ্বীপপুঞ্জের জাতীয় আয়ের একটি বৃহৎ অংশ সমুদ্র মৎস্য থেকে প্রাপ্ত। মাছ একটি সহজপাচ্য প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য। বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলিতে অধিবাসীদের খাদ্যে প্রোটিনের তুলনামূলক অভাব দূরীকরণের জন্য মৎস্যচাষ এবং মৎস্যভক্ষণ বৃদ্ধির উপরে সাম্প্রতিক কালে পুষ্টিবিজ্ঞানীরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছেন।

১.১২ সমুদ্রের অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Significance of the Sea)

ভূপৃষ্ঠের প্রায় $\frac{৩}{৪}$ জল, বাকি অংশটুকু স্থল। এই বিস্তীর্ণ জলরাশিতে মিশে আছে মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, হ্রদ, নদী, খালবিল প্রভৃতি। এই জলের অধিকাংশই নোনা সমুদ্রজল। জলভাগের গরিষ্ঠ অংশ দখল করে আছে চারটি বিরাট মহাসাগর। যথা —

১। প্রশান্ত মহাসাগর

২। আটলান্টিক মহাসাগর

৩। ভারত মহাসাগর

৪। সুমেরু মহাসাগর

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে সমুদ্রের গুরুত্ব রয়েছে একাধিক কারণে ঃ

(১) সমুদ্র থেকে সংগৃহীত মাছ শুধু মানুষের খাদ্য হিসাবেই ব্যবহৃত হয় না, তেল প্রভৃতি উৎপাদনে, পশুখাদ্য এবং সার উৎপাদনেও ব্যবহৃত হয়।

(২) মৎস্য সংগ্রহ, বিভিন্ন মৎস্যজাত পণ্য প্রস্তুত ও বিপণনের কাজে বহু লোকের রুজিরোজগার হয়। ম্যাকাও, আইসল্যান্ড প্রভৃতি দেশের মোট জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ মৎস্যরপ্তানি থেকে আসে।

(৩) (আগেই বলা হয়েছে যে,) সমুদ্র খাবার লবণসহ একাধিক খনিজ পদার্থের উৎস।

(৪) সমুদ্র শক্তির উৎস। বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে সমুদ্রের ঢেউ, স্রোত এবং জোয়ার-ভাটা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা চলছে। কোনও কোনও দেশে উপকূলবর্তী দরিয়া থেকে পেট্রোল তুলে আনা হচ্ছে।

(৫) সমুদ্রের বিভিন্ন সম্পদকে (মৎস্য, খনিজ, শক্তি প্রভৃতি) সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোর জন্য বন্দর, রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্মাণ এবং সংরক্ষণের সুবাদেও বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়।

(৬) সমুদ্রপথে ভারী বস্তুর আমদানি ও রপ্তানি সহজসাধ্য হয়, ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে।

(৭) জলচক্রকে (hydrologic cycle) চালু রেখে সমুদ্র বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলের জলবায়ুকে সমভাবাপন্ন করে। পৃথিবীর অধিকাংশ কৃষিপ্রধান দেশে চাষের কাজ এখনও বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল।

(৮) যদিও সমুদ্রজল নোনা বলে অপেয়, তবু আরব প্রভৃতি কোনও কোনও মরুদেশে সমুদ্রজলকে লবণমুক্ত করে (ব্যয়সাপেক্ষ পদ্ধতিতে অবশ্য) পানের, চাষের এবং কলকারখানার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

(৯) সমুদ্র ভূমিভাগ থেকে আগত দূষিত হাওয়াকে তার বিপুল অক্সিজেন দিয়ে দূষণমুক্ত করে বলে সমুদ্রতীর সাধারণত স্বাস্থ্যকর হিসাবে গণ্য হয়।

কিন্তু ক্রমবর্ধমান তেলচালিত জলযানের জন্য সমুদ্রজলও দূষিত হয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রদূষণ নিয়ে পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা চিন্তিত।

১.১৩ সারাংশ

সামুদ্রিক সম্পদ সম্পর্কে উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলিতে বিস্তারিতভাবে অনেক কিছুই আপনাদের বলা হল। সেই আলোচনার সারাংশ এবার আমরা লিখে নিতে পারি। (১) সমুদ্রের জোয়ারভাঁটাকে ঠিকমতো ব্যবহার করলে আমরা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারি। বিশ্বের কোনও কোনও স্থানে সেটাই করা শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারতেও এটা শীঘ্রই করা হবে। (২) সমুদ্র বেশ কিছু সংখ্যক খনিজ ও রাসায়নিক পদার্থের উৎস। এদের মধ্যে একটি হল হাইড্রোকার্বন (যা তেলের মূল উপাদান)। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা মাথায় রাখলে সমুদ্রতলের ইউরোনিয়ামের উল্লেখ করতে হয়, যা কিনা পরমাণুশক্তির উপাদান। মহাসাগরের তাপীয় শক্তিকেও ব্যবহার করা যায়। (৩) সমুদ্রে নানা জাতের ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণী (প্ল্যাংকটন) নানাভাবে মানুষের কাজে আসে। এদের অধিকাংশ মাছের খাদ্য। (৪) সমুদ্র জলবায়ুকে প্রভাবিত করে। ভারতের জলবায়ু অনেকাংশে সমুদ্রনির্ভর। (৫) সমুদ্রসংক্রান্ত অর্থনৈতিক কাজকর্মগুলি (জলযান নির্মাণ, মৎস্য সংগ্রহ, ইত্যাদি) বহু লোকের কর্মসংস্থান করে। (৬) সমুদ্রের পথেই বিশ্বের অধিকাংশ আমদানি রপ্তানির কাজ চলে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারক ও বাহক সমুদ্র। (৭) সমুদ্র মানবজাতির স্বাস্থ্যরক্ষা করে — প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে।

অসংখ্য নদীনালা, খালবিল থেকে মিঠাজলের নানাজাতের মাছ পাওয়া গেলেও বিশ্বের মোট মৎস্য সংগ্রহের অধিকাংশই আসে নোনাজলের সমুদ্র থেকে। বিশ্বের প্রধান মৎস্যক্ষেত্রগুলির সংখ্যা চার : (১) উঃ পূঃ আটলান্টিক, (২) উঃ পঃ আটলান্টিক, (৩) উঃ পূঃ প্রশান্ত মহাসাগর এবং (৪) উঃ পঃ প্রশান্ত মহাসাগর। এইসব মৎস্যক্ষেত্রের প্রাধান্য লাভের পেছনে কিছু কারণ রয়েছে, যথা — সংশ্লিষ্ট মহীসোপানের তুলনামূলক অগভীরতা, একটি শীতল স্রোতের সঙ্গে একটি উষ্ণ সমুদ্র-স্রোতের মিলন, একাধিক মৎস্য আশ্রয় সহায়ক মগ্ন চড়ার অবস্থান, মৎস্য খাদ্যের প্রাচুর্য, মৎস্য ব্যবসায়ের অনুকূল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, উপকূলবর্তী মহাদেশের অধিবাসীদের নৌচালন দক্ষতা এবং উপকূলবর্তী ভূমিখণ্ডে জলযান নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বনসম্পদের প্রাচুর্য।

সমুদ্রের অর্থনৈতিক গুরুত্ব একাধিক :

১। সমুদ্র মানুষকে মাছ নামক একটি প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করে।

২। মৎস্য সংক্রান্ত বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপে বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়।

৩। সমুদ্র বিভিন্ন শক্তির উৎস।

৪। সমুদ্র একাধিক খনিজ পদার্থের উৎস।

৫। সমুদ্র বাণিজ্যদ্রব্য চলাচলের সুলভ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৬। সমুদ্র বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে জলবায়ুর ওপর প্রভাব ফেলে। এবং

৭। সমুদ্র স্থলভাগ থেকে আসা দূষিত বাতাসকে শুদ্ধ করে।

১.১৪ অনুশীলনী

(১) একটি কিংবা দুটি বাক্যে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) সমুদ্র কীভাবে শক্তির উৎস হল? (খ) সাগরজলে আনুমানিক কয়টি দ্রবীভূত উপকরণ আছে? (গ) প্ল্যাংকটন কী? (ঘ) বিশ্বে মোট উৎপাদিত লবণের বেশির ভাগ কীসের জন্য ব্যবহৃত হয়? (ঙ) পটাসিয়াম লবণ ব্যবহারকারী একটি শিল্পের নামোল্লেখ করুন। (চ) সাগরতরঙ্গ থেকে শক্তি উৎপাদনকারী দুটি দেশকে মানচিত্রে সনাক্ত করুন। (ছ) ভারতের কোন্ কোন্ স্থানে সমুদ্র থেকে তেল তোলা হয়? (জ) গ্র্যান্ড ব্যাঙ্ক মৎস্য চাষে এত উন্নত হল কেন? (ঝ) সমুদ্রতলে কি লোহা আর টিন পাওয়া যায়?

(২) সমুদ্র শক্তির অন্যতম উৎস — এই বক্তব্যটি প্রতিপন্ন করুন।

(৩) সমুদ্রের বহুমুখী উপকারিতা নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখুন।

(৪) সমুদ্রের অর্থনৈতিক উপযোগিতা কী কী?

(৫) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ-

(ক) সমুদ্রতলে পরমাণুশক্তি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় ——— পাওয়া যায়।

(খ) ভূপৃষ্ঠের তাপের ওঠানামার চেয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপের ওঠানামা অনেক ———।

(গ) ভারতে সমুদ্রের জল থেকে লবণ প্রস্তুতের একটি অগ্রণী রাজ্য হল ———।

(ঘ) সমুদ্রের মোট জলরাশির পরিমাণ ——— কোটি ঘন মাইল।

(৬) নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে ভুল সংশোধন করে লিখুন ঃ-

(ক) সমুদ্রতল থেকে তেল, লোহা, তামা ও কয়লা পাওয়া যায়।

(খ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গরিষ্ঠ অংশ বিমান পরিবহনের মাধ্যমে চলছে।

(গ) দূরবর্তী বঙ্গোপসাগর হিমালয়ের সিকিম রাজ্যের জলবায়ুর প্রধান নির্ধারক।

(৭) নিম্নোক্ত দুটি স্তম্ভের শব্দগুচ্ছের মধ্যে কোনটির সঙ্গে কোনটির যোগ আছে সেটা নির্ণয় করুন ঃ

ইউরেনিয়াম	মৎস্যচাষ
প্ল্যাংকটন	তেল
মুম্বাই দরিয়া	পরমাণু শক্তি

(৭) নীচে প্রথম সারির শব্দগুলির সঙ্গে দ্বিতীয় সারির শব্দগুলির সঠিক যোগসূত্র ভেবে নিয়ে পাশাপাশি বসান ঃ

ডগার্স ব্যাঙ্ক	মগ্ন চড়া
ভ্যাঙ্কুবার	মৎস্যচারণ ক্ষেত্র
ফিয়োর্ড	মৎস্যবন্দর
বেরিং সাগর	নরওয়ে

(৮) বিশ্বের বৃহত্তম মৎস্যশিকারক্ষেত্র কোন্‌টি?

(৯) উত্তর-পশ্চিম আটলান্টিকে মৎস্যচারণক্ষেত্র গড়ে ওঠার প্রধান কারণগুলি ব্যক্ত করুন।

(১০) বিশ্বের উল্লেখযোগ্য মৎস্যচারণক্ষেত্রগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

(১১) সমুদ্রের অর্থনৈতিক উপযোগিতা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

(১২) সমুদ্রের সঙ্গে জলবায়ুর সম্পর্ক কী?

(১৩) ভারতের কোন্‌ জায়গায় সমুদ্র থেকে তেল উত্তোলিত হয়?

(১৪) কোন্‌টি সঠিক বেছে দিন ঃ—

- বোরিং (ক) একটি মাছ, (খ) একটি বন্দর, (গ) একটি সাগর
- হেরিং (ক) একটি সাগর, (খ) একটি মাছ, (গ) একটি বন্দর
- সার্ডিন (ক) একটি মাছ, (খ) একটি বন্দর, (গ) একটি সাগর

১.১৫ উত্তর সংকেত

(ক) জোয়ার-ভাটার শক্তি, পরমাণু শক্তি ও তেল। (খ) ১.৪ দেখুন। (গ) ১.৫ দেখুন। (ঘ) ১.৪ দেখুন। (ঙ) ১.৪ দেখুন। (চ) ১.৩ দেখুন। (ছ) ১.৪ দেখুন। (জ) ১.৫ দেখুন। (ঝ) ১.৪ দেখুন।

(২) ১.৪, ১.৫ দেখুন।

(৩) পুরো এককটাকে সংক্ষিপ্ত করুন।

(৪) মাছ, সামুদ্রিক উদ্ভিদ প্রভৃতি খাদ্যের উৎস, একাধিক খনিজ ও রাসায়নিক উপাদানের উৎস, শক্তির উৎস, কর্মসংস্থানের উৎস, সমুদ্রনির্ভর পরিবহন ও বৈদেশিক বাণিজ্য শীর্ষক অনুচ্ছেদগুলি পড়ে লিখুন।

(৫) শিক্ষার্থী নিজেই চেষ্টা করে উত্তর লিখুন।

(৬) (ক) 'কয়লা' বাদ দিন। (খ) 'বিমান' শব্দটি বাদ দিন। (গ) 'প্রধান' নির্ধারক নয় লিখুন। নিজে চেষ্টা করে লিখুন।

১.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

১. তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌতম মল্লিক, **অর্থনৈতিক সম্পদ সমীক্ষা** (১৯৯৮), ছায়া প্রকাশনা, কলি-৯

২. সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, **সম্পদ সমীক্ষা** (১৯৯৮), **ইন্ডিয়ান** প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোম্পানি, কলি-৭

৩. অজিতকুমার শীল, **সম্পদ সমীক্ষা** (১৯৯৮), শ্রীধর পাবলিশার্স, কলি-৬,

৪. A.K. Datta Gupta, **Resource Study** (1993), New Central Book Agency. Cal-9

৫. A. Mitra, **Resource Studies** (2000), Sreedhar Publishers, Cal-6.

একক ২ ❑ শক্তি সম্পদ (Energy Resources)

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ শক্তি সম্পদের শ্রেণীবিভাগ

২.২.১ প্রচলিত শক্তির উৎস

২.২.২ অপ্রচলিত শক্তির উৎস

২.৩ সারাংশ

২.৪ অনুশীলনী

২.৫ উত্তরসংকেত

২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন —

- শক্তি সম্পদের ধারণা ;
- শক্তি সম্পদের প্রকারভেদ ও তাদের সম্পর্কে ধারণা ;
- শক্তি সম্পদের গুরুত্ব ;
- শক্তি সম্পদের সীমাবদ্ধতা ;

২.১ প্রস্তাবনা

যে কোনও জৈবিক ব্যবস্থায় (ecosystem) শক্তির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সূর্যশক্তি বহমান না থাকলে জীবনের অস্তিত্ব থাকত না, বাতাস এবং জলরাশি সচল থাকত না, এমন কি ভূত্বকের অপুর্নভব শক্তি সম্পদও তৈরি হতে পারত না। যুগ থেকে যুগান্তরে মানুষ এই শক্তির নানা রূপকে করায়ত্ত করবার জন্য প্রযুক্তির উত্তরোত্তর উন্নতিসাধনে যত্নবান হয়েছে। প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত প্রায় সব সম্পদেরই মূল উৎস সূর্য (আই. জি. সাইমনস্)।

প্রাগৈতিহাস মানব কাঠ থেকে আগুন জ্বালাত। সভ্য মানুষ পশুশক্তির ব্যবহারের পরে জল দিয়েও চাকা ঘোরাতে শিখেছিল। জলীয় বাষ্পের শক্তির ব্যবহার বিংশ শতক পর্যন্ত ছিল। তার পরে এল কয়লা। বিংশ

শতকে মধ্যভাগ পর্যন্ত কয়লার প্রাধান্য ছিল শক্তি আহরণের ক্ষেত্রে। তারপর কয়লার প্রাধান্যকে খর্ব করতে আসরে নামল তেল। তেল সরবরাহকারী অঞ্চলগুলির নেতৃত্বে ছিল মধ্যপ্রাচ্য। খনিজ তেলের পিছু পিছু এল প্রাকৃতিক গ্যাস। বর্তমানে ঘর সংসার, শিল্প এবং পরিবহনের ক্ষেত্রে কয়লার প্রাধান্য খর্ব করে দাঁড়িয়ে আছে খনিজ তেল আর প্রাকৃতিক গ্যাস। কয়লার ব্যবহার সীমাবদ্ধ হয়ে আছে প্রধানত তাপবিদ্যুৎ (Thermal) উৎপাদন এবং স্বল্পোন্নত কিছু দেশে জ্বালানির জন্য ব্যবহারের মধ্যে। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে খনিজ তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি তেল-আমদানি নির্ভর দেশগুলিকে তেলের বিকল্প উদ্ভাবনে উদ্বুদ্ধ করে। তার একটি ফলশ্রুতি হল পরমাণুশক্তিকে বৈদ্যুতিকীকরণ। কিন্তু পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের বিপজ্জনক দিকটি একাধিক বার উন্মোচিত হওয়ায় বর্তমানে অন্য অপ্রচলিত শক্তির উৎসগুলির উন্নয়নের বিষয়টি বিজ্ঞানীদের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে।

২.২ শক্তি সম্পদের শ্রেণীবিভাগ

ব্যবহারের পার্থক্য অনুযায়ী শক্তি সম্পদগুলিকে দু-ভাগে ভাগ করা যায় — (ক) প্রচলিত বা চিরাচরিত শক্তি সম্পদ এবং (খ) অপ্রচলিত বা অচিরাচরিত শক্তি সম্পদ। নীচে পৃথক পৃথকভাবে এগুলি আলোচনা করা হল।

২.২.১ প্রচলিত শক্তির উৎস

প্রচলিত শক্তির উৎসগুলি হচ্ছে কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং জলশক্তি (প্রধানত)। কয়লা, তেল এবং গ্যাসকে জীবাশ্ম জ্বালানিও (fossil fuel) বলা হয়, কেন না লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ভূস্তরের নীচে ঢাকা পড়ে যাওয়া উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের দেহ প্রথমে ফসিল বা জীবাশ্ম হয়ে পরে প্রচণ্ড চাপে আর ভূত্বকের অভ্যন্তরীণ চাপে উদ্ভিদ-জীবাশ্ম কয়লায় এবং প্রাণী-জীবাশ্ম তেলে রূপান্তরিত হয়। তেলের কিয়দংশ আবার নানা প্রক্রিয়ায় গ্যাস হয়।

কয়লা

কয়লাকে শক্তিসম্পদ হিসাবে ব্যবহার করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। সেই আমলের শিল্পশহর এবং শিল্পাঞ্চলগুলি কয়লাখনিগুলির আশেপাশেই গড়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের নিউক্যাসেল, গ্লাসগো ও বার্মিংহাম, জার্মানির রূঢ়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পিট্‌স্‌বার্গ, ভারতের দুর্গাপুর, জামশেদপুর ও বোকারো শিল্পাঞ্চল কয়লাখনিগুলির কাছাকাছি এলাকায় গড়ে উঠেছে।

কয়লার নানা জাত আছে — প্রধানত তিনটি। সব জাতের কয়লার গুণমান এবং উপযোগিতা সমান নয়। কয়লার উৎপাদনে প্রথম পাঁচটি দেশ হল চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষ, রাশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া। চীন অবশ্য কয়লা ব্যবহারকারী দেশগুলির মধ্যেও প্রথম স্থানাধিকারী।

কয়লার ব্যবহার — আধুনিক শিল্প সভ্যতা কয়লা ছাড়া গড়ে উঠতে পারত কিনা সন্দেহ। শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে কলকারখানার চাকা ঘুরিয়ে এসেছে কয়লা। (১) কলকারখানার বয়লারে কয়লা ছাড়া চলে না। এখনও শিল্প বহুলাংশে কয়লা নির্ভর। (২) লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অন্যতম প্রধান কাঁচামাল এই কয়লা। (৩) বাষ্পীয় রেল ইঞ্জিনের যুগে রেল পরিবহন ব্যবস্থা ছিল কয়লানির্ভর। কয়লা পুড়িয়ে ইঞ্জিন চলত। ওই রেলব্যবস্থা ভারত সহ পৃথিবীর অধিকাংশ শিল্পোন্নত দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে জোরদার করে ব্যবসা

বাণিজ্যের উন্নতিবিধানে সহায়ক হয়েছে। (৪) ভারতসহ বেশ কিছু সংখ্যক স্বল্পোন্নত দেশের গ্রামাঞ্চলে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মানুষেরা এখনও কয়লাকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে এবং কুটির শিল্পে শক্তি উৎপাদনের কাজে লাগায় (যথা: কামারশালায়)। (৫) তাপীয় (Thermal) বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লা ছাড়া চলে না। ভারতে মোট কয়লা ব্যবহারের প্রায় $\frac{২}{৩}$ হয় তাপীয় শক্তিকেন্দ্রগুলিতে, আমেরিকায় এটা প্রায় নব্বই শতাংশ। (৬) কোনও কোনও রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করতে কয়লা কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। (যথা: আলকাতরা, গ্যাস, অ্যামোনিয়াম সালফেট ইত্যাদি।) কোনও কোনও চর্মরোগে আলকাতরা দিয়ে ওষুধ তৈরি হয়। প্লাস্টিক তৈরিতেও আলকাতরা লাগে। কৃত্রিম সার প্রস্তুত করতে অ্যামোনিয়া সালফেট লাগে।

এবার আমরা বিশ্বে কয়লা উত্তোলনে অগ্রণী দেশগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলব। এই দেশগুলি হল ঃ

চীন (১ম)
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (২য়)
ভারতবর্ষ (৩য়)
রুশ যুক্তরাষ্ট্র (৪র্থ)
অস্ট্রেলিয়া (৫ম)
জার্মানি (৬ষ্ঠ)
দক্ষিণ আফ্রিকা (৭ম)

অস্ট্রেলিয়া বিশ্বের বৃহত্তম কয়লা রপ্তানিকারক রাষ্ট্র, অন্যদিকে বিশ্বের বৃহত্তম কয়লা আমদানিকারক রাষ্ট্র হল জাপান। ভারতে কয়লার প্রায় ৭৩% চলে যায় শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্রে, ৭% ইস্পাত ক্ষেত্রে এবং ৩% সিমেন্ট শিল্পে [তথ্যসূত্র : A. Mitra, **Resource Studies** 2000, অধ্যায় ১৯] ভারতে মোট কয়লার অধিকাংশই নিম্নমানের। প্রধান কয়লাখনির অবস্থান ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্ধ্রপ্রদেশ। ঝাড়খণ্ডের ঝরিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গের রানিগঞ্জ এলাকায় অনেক কয়লাখনি কাছাকাছি চোখে পড়ে। রানিগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রের কাছেই বিখ্যাত দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল (দুর্গাপুরকে 'ভারতের রুঢ়' বলা হয়)। উড়িষ্যার তালচের কয়লাক্ষেত্রও খুবই বড়। এখানকার কয়লা রউরকেল্লার ইস্পাত কারখানায় যায়। রানিগঞ্জের কয়লা অবশ্য খুবই উচ্চমানের। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজদের মূলধন এবং পরিচালনায় এদেশে কয়লা শিল্প গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে এই শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হয়ে গেছে।

কয়লার গুরুত্বহ্রাসের কারণ

আগেই বলা হয়েছে যে, শক্তি উৎস হিসাবে কয়লার গুরুত্ব গত অর্ধ শতকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। যেখানে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে মোট শক্তি সম্পদ ব্যবহারের ৮০% ছিল কয়লা, সেখানে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে সেটা কমে হল মাত্র ২২%। কয়লার এই আধিপত্য হ্রাসের একাধিক কারণ আছে। (১) কয়লা উত্তোলনের ফলে খনি সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে মানুষজনের বসবাসের নিরাপত্তা কমে আসে। অবৈজ্ঞানিক উপায়ে কয়লা খনন ও উত্তোলনে আশেপাশে ধস নেমে ভূপৃষ্ঠের ক্ষতি হয়, দুর্ঘটনায় শ্রমিকদের প্রাণহানিও ঘটে। (২) কয়লার ধোঁয়ায় কয়লাখনি অঞ্চলগুলিতে প্রচণ্ড বায়ুদূষণ ঘটে, যা কিনা স্থানীয় অধিবাসীদের স্বাস্থ্যহানি করে। যতদিন পর্যন্ত কয়লা সাধারণ মানুষের ঘরে প্রধান জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হত ততদিন পর্যন্ত এই কয়লাজাত ধোঁয়া গ্রামে ও শহরে বায়ুদূষণ ঘটিয়ে নানা রোগের কারণ হয়েছে। সত্তরের দশক পর্যন্ত কলকাতা শহরে কোনও

কোনও এলাকায় শীতকালে কয়লার উনুনের ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করেছে এবং নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়েছে। (৩) কয়লা জামাকাপড়ে দ্রুত ময়লা ধরায়। (৪) উচ্চহারে কয়লা ব্যবহারের ফলে উচ্চমানের কয়লা নিঃশেষিত হবার সম্ভাবনায় কোনও কোনও দেশে (যেমন ভারতে) কয়লার বিকল্প শক্তি ব্যবহারের প্রবণতা এসে গেছে। (৫) প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেলের তুলনায় কয়লা উত্তোলনের খরচা বেশি। (৬) কয়লা স্থানান্তরিত করার জন্য পরিবহন খরচও তুলনামূলকভাবে বেশি, কারণ একই ওজনের তেলের চেয়ে কয়লার দাম অনেক কম বলে একক প্রতি পরিবহন খরচ বেশি হয়ে দাঁড়ায়।

খনিজ তেল

বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক শুরু হবার মুখেই কয়লাকে স্থানচ্যুত করে খনিজ তেল ব্যবহৃত শক্তিসূত্র হিসাবে প্রথম স্থানে চলে আসে। কয়লার চেয়ে তেলে নোংরা কম লাগে, ধোঁয়ার সমস্যা অনেক কম, পরিবহন ও স্থানান্তরে প্রেরণের সমস্যাটাও সহজতর, এবং গোড়ার দিকে কয়লার চেয়ে তেল সস্তাও ছিল অনেক। কয়লাজাত দূষণের চেয়ে তেলজনিত দূষণকে নিয়ন্ত্রণ করাও অনেক সহজ।

খনিজ তেলেরও কয়লার মতো তিনটি শ্রেণী আছে। প্রত্যেকটি সমান গুণমানের নয়। প্যারাফিন ভিত্তিক তেলও সবচেয়ে হালকা এবং সর্বোৎকৃষ্ট। পরিশোধন না করে কাঁচা তেল ব্যবহার করা যায় না। পরিশোধনের বিভিন্ন পর্যায়ে ডিজেল, পেট্রোল, কেরোসিন, পিচ্ছিলকারী দ্রব্য ন্যাপথা প্রভৃতি বেরিয়ে আসে। তেল উৎপাদনে বর্তমানে অগ্রণী দেশগুলি হল ঃ

সৌদি আরব

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

রাশিয়া

ইরান

চীন

তেল উত্তোলন ব্যবসায় ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃত্ব খর্ব করতে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে ওপেক সংস্থা (Organisation of Petroleum Exporting Countries, সংক্ষেপে OPEC) প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই সংস্থার সদস্য সংখ্যা ১২, যার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক রাষ্ট্র ছাড়াও রয়েছে ইন্দোনেশিয়া এবং ভেনিজুয়েলা। বিশ্বের মোট পেট্রোল উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক ওপেকের অবদান। সত্তর দশকে বিশ্বের বাজারে তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির পিছনে ওপেকের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক। ভারতের মতো তেল দরিদ্র দেশগুলিতে এজন্য মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। তেলের ব্যবহারের ক্ষেত্রে মার্কিন মুলুক সকলের আগে। বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ৩১% মার্কিনিরা ব্যবহার করেন। ভারতে প্রয়োজনের তুলনায় তেলের উৎপাদন অনেক কম। আসামের ডিগবয় অঞ্চলে ভারতের প্রথম তেলোত্তলোন কেন্দ্র ও শোধনাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে আসামের নাহারকাটিয়া, রুদ্রসাগর এবং লাকোয়া অঞ্চলেও তেলোত্তোলনের ব্যবস্থা হয়েছে। বর্তমানে মুম্বাই দরিয়ায় সমুদ্রতল থেকে তেল তোলা হচ্ছে। নতুন নতুন তেলখনি আবিষ্কারের জন্য ভারত সরকার তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন (Oil and Natural Gas Commission, সংক্ষেপে ONGC) গড়েছেন। কমিশন পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে তেলের খোঁজ পেয়েছেন। বেশ কয়েক বছর আগে পশ্চিম উপকূলে কালোল, আঙ্কলেশ্বর এবং খাম্বাতাতে তেল উত্তোলন শুরু হয়ে গিয়েছে।

খনিজ তেল প্রধানত বিমান, লরি, জলযান, বাস, ডিজেল ইঞ্জিন, মোটর গাড়ি, মোটর বাইক, স্কুটার প্রভৃতি চালাতে ব্যবহৃত হয়। [তেলের উপজাত দ্রব্য (by product) হিসাবে পাওয়া যায় মোম, রং, বার্নিস, প্লাসটিক, কৃত্রিম রবার, অ্যালকোহল, গ্যাস, নাইলন জাতীয় কৃত্রিম তন্তু, ইত্যাদি।] কারখানার বয়লার সচল রাখতেও আজকাল তেল ব্যবহৃত হয়। তেলভিত্তিক এক বহুমাত্রিক রাসায়নিক প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়ায় গড়ে উঠছে। রন্ধন এবং আলো প্রজ্বলনের কাজে পেট্রোলজাত গ্যাসের ব্যবহারও আজকাল ঘরে ঘরে। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণী ঐসব কাজে ব্যবহার করেন অপেক্ষাকৃত সস্তা কেরোসিন।

স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে পরিস্রুত তেলের প্রায় সবটাই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হত। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার পরে একে একে ভারতে অনেক শোধনাগার গড়ে উঠেছে। বর্তমানে আছে ১৭টি শোধনাগার। এগুলির অবস্থান হল: ডিগবয় (অসম), ট্রম্বে (মহারাষ্ট্র ২টি), বিশাখাপত্তনম (অন্ধ্র), নুনমাটি (অসম), বারাউনি (বিহার), কয়াল (গুজরাত), কোচি (কেরালা), মানালি (তামিলনাড়ু), হলদিয়া (পঃবঙ্গ), বঙ্গাইগাঁও (অসম) মথুরা (উত্তরপ্রদেশ), নুমালিগড় (অসম), জামনগর (গুজরাট), নরিমানম (তামিলনাড়ু), ম্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক) এবং পানিপত (হরিয়ানা)। বিশ্বে শোধনাগারের সংখ্যা ৭৬১। যার মধ্যে ১৫৮টি মার্কিন যুক্তরাজ্যে, ৯৫টি চীনে, ৪৩টি রাশিয়ায় এবং জাপানে ৪০টি। কিন্তু [নির্দেশ ঃ উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলি পাঠের সময় মানচিত্র সামনে রেখে উল্লিখিত স্থানগুলির ভৌগোলিক অবস্থান জেনে নেবেন।] এখনও ভারতকে অনেক তেল আমদানি করতে হয় প্রধানত মধ্যপ্রাচ্য থেকে। দেশে এনে ওই তেলকে পরিস্রুত করা হয় শোধনাগারে।

প্রাকৃতিক গ্যাস

প্রাকৃতিক গ্যাসও সাম্প্রতিক কালে কয়লা এবং তেলের প্রতিদ্বন্দ্বী জ্বালানি হিসাবে এগিয়ে এসেছে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে যেখানে বিশ্বের মোট শক্তি ব্যবহারে মাত্র ৫% ছিল প্রাকৃতিক গ্যাস, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে সেটা হয়ে যায় ২৩% । মাটির নীচে এই গ্যাস কোনও কোনও ক্ষেত্রে তেলের সঙ্গে মিশে থাকে, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে এককভাবেও থাকে। যদিও বিশ্বের প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাস তোলা হয় খ্রিস্টজন্মেরও প্রায় দুশ বছর আগে চীনদেশে, তথাপি এই গ্যাসের বহুল প্রয়োগের ব্যাপারটা বিংশ শতকেই ঘটেছে। এই গ্যাসের ভাণ্ডারী রাশিয়া (৩৩%)। এর পরে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক তেলসমৃদ্ধ রাষ্ট্র। তাছাড়া রয়েছে আমেরিকা। ভারতের গ্যাসের পরিমাণ পৃথিবীর গ্যাসভাণ্ডারের মাত্র ০.৫%। ভারতে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় ৯৫% আসে মুম্বাই দরিয়া (Bombay High) থেকে। কয়লা ও তেলের তুলনায় প্রাকৃতিক গ্যাসে দূষণ অনেক কম হয়।

[আমাদের গৃহস্থবাড়িতে সিলিণ্ডার ভর্তি গ্যাস কিন্তু প্রাকৃতিক নয়, খনিজ তেল সঞ্জাত গ্যাস বা L P G]

প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলি হল ঃ (১) শিল্পের জ্বালানি, (২) গৃহস্থবাড়িতে রান্নার জ্বালানি, (৩) বিদ্যুৎ উৎপাদন, (৪) পেট্রো-রাসায়নিক শিল্পের কাঁচামাল এবং (৫) গ্যাসের উপজাত পদার্থগুলির উৎপাদন। এই গ্যাস ব্যবহার সর্বাধিক হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (বিশ্বের মোট ব্যবহারের প্রায় ২৭%)।

অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানি

কয়লা, তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ছাড়াও আরও কয়েকটি জীবাশ্ম জ্বালানি আছে, যথা ঃ তেল-শিলা (oil shale) এবং টার স্যান্ড (tar sand)। কিন্তু এদের উৎপাদন ব্যয় অত্যধিক বলে ব্যবহারও স্বল্প। তেলশিলা সঞ্চয়ের পরিমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাধিক। টার স্যান্ডের সম্ভার সর্বাধিক কানাডায়। স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হলে এই সব জ্বালানির ব্যবহার হয়তো বেড়ে যাবে।

জলশক্তি (Hydro Power)

জল একটি পূরণীয় (বা প্রবহমান) সম্পদ। বেগে চলমান জলস্রোত থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। উচ্চ পার্বত্য এলাকা সুবিধাজনক হলেও অনেক সময় সমতল অঞ্চলে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে বাঁধ নির্মাণ করা হয়। সেই বাঁধে নদীর আটক জলকে নিম্নগামী নিঃসরণের পথে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে প্রবাহিত করা হয়। সেই জলস্রোতের শক্তি চাকা ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করে। অবশ্য বাঁধবন্দি জল শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনেই নিঃশেষ হয়ে যায় না। খালব্যবস্থার মাধ্যমে এই জল কৃষিক্ষেত্রে সেচকার্যে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু বাঁধ (dam) নির্মাণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে অপরিহার্য, তাই এই শক্তিসৃষ্টিতে প্রাথমিক খরচ (বাঁধ তৈরির দরুন) খুবই বেশি। বৃষ্টিপাত খুব অনিয়মিত হলেও চলবে না, কারণ সেক্ষেত্রে বছরের কোনও কোনও সময় বাঁধের জল অত্যধিক কমে গিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে অসুবিধা সৃষ্টি হবে। অত্যধিক উষ্ণ অঞ্চলে জলপ্রবাহ বেশি বাষ্পীভূত হয়ে যায় বলে ওই জলবায়ুর দেশেও নিয়মিত প্রয়োজনীয় জলবিদ্যুৎ প্রাপ্তির সম্ভাবনা কম থাকে। অতি শীতের দেশেও আবার বৎসরের অধিকাংশ সময় নদীর জল বরফ হয়ে থাকে বলে সেখানেও নিয়মিত জলবিদ্যুৎ পাওয়া যাবে না। নদীজলের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণে বনভূমিও সহায়ক। সুতরাং উপযুক্ত ভৌগোলিক পরিবেশ জলবিদ্যুতের জন্য খুবই দরকার। পার্বত্য সুইরাজল্যান্ডে কয়লা ও খনিজ তেল পাওয়া যায় না বলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। জলশক্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনার দিক থেকে বিচার করলে চীনের স্থান সর্বাগ্রে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে আসবে ব্রাজিল ও ইন্দোনেশিয়া। কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন এবং ব্যবহার খতিয়ে দেখলে উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপ প্রথম সারিতে আসবে।

ভারতের বহু জায়গায় জলবিদ্যুৎ তৈরির প্রয়োজনীয় পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও ইংরেজ আমলে এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশেষ চেষ্টা ছিল না। দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি উৎপাদন কেন্দ্র এবং টাটা কোম্পানির জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতার পরে আমেরিকার টেনেসি উপত্যকা পরিকল্পনার অনুকরণে অধিকাংশ প্রকল্পই এসেছে বহুমুখী বিরাট ব্যয়ের নদী পরিকল্পনাগুলির অংশ হিসাবে। ভারতের কয়লা ও তেল সম্ভারের সীমাবদ্ধতা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সবিশেষ উৎসাহিত করেছে। বহুমুখী নদীপ্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ভাকরা-নাঙ্গল কুর্শী, তুঙ্গভদ্রা, হীরাকুঁদ, দামোদর, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি। শুধুমাত্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি জলপ্রপাতের পথেই সাধারণত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন, কর্ণাটকে কাবেরী নদীর জলপ্রপাতকে ব্যবহার করা হয়েছে শিবসমুদ্রম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে। উত্তরপ্রদেশের উত্তরাংশে গঙ্গানদীর বিভিন্ন খরস্রোতা খাল থেকে হরিদ্বার, বাহাদুরাবাদ, ভোলা প্রভৃতি স্থানে বিদ্যুৎ তৈরি করা হচ্ছে। ভারতে প্রচ্ছন্ন [সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা থেকে লব্ধ শক্তিও এক হিসাবে জলশক্তি। কিন্তু সাধারণত সম্পদপাঠে এই শক্তিকে জলশক্তি বলে গণ্য করা হয় না।] জলশক্তির পরিমাণ ৪ কোটি কিলোওয়াটের কিঞ্চিদধিক (বিশ্বে ৫ম স্থান)। এর ৬০% উত্তরপূর্ব ভারতের পার্বত্য এলাকাসহ হিমালয় পর্বতমালায় রয়েছে।

প্রচলিত জীবাশ্ম জ্বালানির সমস্যা

গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কয়লার প্রাধান্য খর্ব করে খনিজ তেল সর্বাধিক ব্যবহৃত শক্তিসূত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সত্তরের দশকে তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি পৃথিবীব্যাপী এক সংকটের সৃষ্টি করে। তেলসম্পদ বিশ্বের সর্বত্র সমানভাবে বণ্টিত না হওয়ায় স্বল্পতেলযুক্ত দেশগুলি (ভারত সহ) বিশেষভাবে বিপন্ন হয়। অবশ্য ওই সংকট ছিল সাময়িক। বহুদেশে নতুন নতুন তেল খনির অনুসন্ধান শুরু হয়ে যায়। স্বল্পতেল ব্যবহারের প্রযুক্তি (বিশেষত স্থলযানের ক্ষেত্রে) আবিষ্কৃত হতে থাকে, এবং বিকল্প শক্তি উৎস ক্রমবর্ধমান হারে ব্যবহৃত হয় (যথা পারমাণবিক শক্তি)। ফলে আশির দশকে তেলের দাম নেমে যায়।

কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানিগুলির দুটি সমস্যা ক্রমশ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। (১) প্রথমটি হল পরিবেশ দূষণের সমস্যা, যা কিনা জনস্বাস্থ্যের প্রতিকূল। দ্বিতীয়টি হল এদের কালক্রমে অতিব্যবহারে নিঃশেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। কয়লা ও তেল পোড়ালে তা থেকে কার্বন ও সালফার বেরিয়ে আসে। কার্বন হাওয়ায় এসে যথাক্রমে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) এবং সালফার-ডাই-অক্সাইডে (SO_2) রূপান্তরিত হয়। অতিরিক্ত CO_2 আবহাওয়ার উষ্ণতা বৃদ্ধি করে বিশ্বে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটাচ্ছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। এই উষ্ণতাবৃদ্ধি জীবজগতের অস্তিত্বের সংকট সৃষ্টি করতে পারে। [এটাকেই গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া বলা হয়।] SO_2 থেকে অম্লবৃষ্টি হতে পারে যদি SO_2 সালফিউরিক অ্যাসিডে (H_2SO_4) রূপান্তরিত হয়। তাতেও পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কয়লা, তেল ও গ্যাসের দহনজাত ধোঁয়া শ্বাসযন্ত্রের নানা রোগ সৃষ্টি করে। (২) জীবাশ্ম জ্বালানিগুলি অপূরণীয় সম্পদ। অত্যধিক হারে যদি এগুলি ব্যবহৃত হতে থাকে তবে একদিন ভূগর্ভে এদের সঞ্চিত ভাণ্ডার নিঃশেষ হতে বাধ্য! এদের যোগান যে অফুরন্ত নয় সেই বিষয়টির প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত আমেরিকার ক্লাব অব রোমের বিখ্যাত বিবরণী 'বিকাশের সীমানা' (Limits to Growth)। যদিও কয়লা এবং তেলসমৃদ্ধ দেশগুলির এই সমস্যাটি নিয়ে অনেক দিন মাথা না ঘামালেও চলবে, তবু সামগ্রিকভাবে এদের সংরক্ষণ আর বিকল্প ব্যবহারের চেষ্টা বিশ্ব জুড়ে চলেছে।

জলশক্তির একটি বিশেষ পরিবেশগত সমস্যা

স্বাধীনতার পর ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের গরিষ্ঠ অংশ বহুমুখী নদী-পরিকল্পনাগুলি থেকে আসছে। মার্কিন যুক্তরাজ্যের টেনেসি উপত্যকা প্রকল্পের ধাঁচে এদেশেও দামোদর, হীরাকুঁদ প্রভৃতি অনেকগুলি বহুমুখী (multi-purpose) নদী প্রকল্প কার্যকরী হয়েছে, জলবিদ্যুৎ তৈরি যাদের একাধিক লক্ষ্যের একটি মাত্র। কিন্তু একটি নদীপ্রকল্পের বাঁধগুলি তৈরি হলে অনেকখানি স্থান জলমগ্ন হয়, বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজন বাস্তুচ্যুত হয়, পশুপাখি এবং গাছপালার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। পরিবেশের এই ক্ষতি অনেক সময় কোনও বিকল্প বন্দোবস্তে পূরণ করা যায় না বলে আমাদের দেশের পরিবেশবাদী মহল এই সব নদী প্রকল্পের বিরুদ্ধে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সরব হয়ে উঠেছেন (যথা নর্মদা প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন)।

২.২.২ অপ্রচলিত শক্তির উৎস

সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, সমুদ্রের তরঙ্গজাত শক্তি, পরমাণুশক্তি এবং জৈবস্তূপ (bio-mass) থেকে প্রাপ্ত শক্তির ব্যবহার ক্রমশই বাড়ছে। এরা হল অপ্রচলিত (বা অচিরায়ত) শক্তিসূত্র। এরা পরিবেশ দূষণ করে না। অবশ্য পরমাণুশক্তির পরিবেশনাশনের বিষয়টি একটু বিতর্কিত। তাই এটাকে নিয়েই আমাদের আলোচনা শুরু করা যাক।

পরমাণু শক্তি (nuclear energy) — বিভাজন পদ্ধতিতে (fission) প্রধানত ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়াম পরমাণুর বিভাজন থেকে পারমাণবিক শক্তি তৈরি হচ্ছে। শক্তিসূত্র হিসাবে পরমাণু শক্তির সম্ভাব্য পরিমাণ প্রায় অসীম, কেননা মাত্র ১ মেগাটন ইউরেনিয়াম থেকে প্রাপ্য বিদ্যুৎ গোটা আফ্রিকা মহাদেশের আলো, রন্ধন এবং শিল্পের প্রয়োজন মেটাতে পারে। সত্তরের দশকে খনিজ তেলের মূল্যবৃদ্ধি পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিজ্ঞানীদের বিশেষ প্রেরণা যোগায়। ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে দ্রুত বেশ কয়েকটি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। ভারত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশেও পরমাণু বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার ইউরেনিয়াম সম্ভার সর্বাধিক হলেও পরমাণু শক্তি উৎপাদনে আমেরিকার স্থান বিশ্বে প্রথম। পরমাণু বোমা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু আজ যুদ্ধাস্ত্র তৈরির সাথে সাথে শান্তিপূর্ণ উন্নয়নের কাজেও এই শক্তি ব্যবহৃত

হচ্ছে। প্রধানত বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ ছাড়াও একাধিক অন্য ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করা যায়। যথা মহাকাশ যান চালানোর জন্য, মাটির তলা থেকে খনিজ পদার্থ তোলার জন্য, ভূতাপ (geothermal) শক্তিকে উদ্ধার করতে, সমুদ্রে বরফের চাঁই ভেঙে মিষ্টি পানীয় জল আহরণ করতে এবং ডুবোজাহাজ চালাতে।

ভারত আজ শুধু পরমাণু বোমাই তৈরি করতে সক্ষম তা নয়। এদেশে আণবিক বিদ্যুৎ পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে। আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি হল মুম্বাইয়ের কাছে তারাপুর (৪২০ মে), রাজস্থানে কোটা, উত্তরপ্রদেশে নারোরা, তামিলনাড়ুতে কালপাক্কাম, এবং গুজরাটে কাকরাপার। ভারতে বর্তমানে বিশ্বের মোট উৎপাদনের ০.৩৫% উৎপাদিত হয়।

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েট রাশিয়ার চের্নোবিলে) পরমাণু কেন্দ্রে বিধ্বংসী বিস্ফোরণের পর এই শক্তির বিপজ্জনক দিকগুলি বিজ্ঞানীদের ভাবাতে শুরু করেছে। [তার আগে ১৯৭৯ সালে আমেরিকাতেও অনুরূপ এক বিস্ফোরণ হয়েছিল।] বিদ্যুৎকেন্দ্রের সন্নিহিত অঞ্চল তেজস্ক্রিয়তা মুক্ত হতে পারছে না। এই তেজস্ক্রিয়তা ক্যানসার রোগ ঘটায়। তাই অন্যান্য অপ্রচলিত শক্তিসূত্রগুলিকে ব্যবহারের উপরেও বিজ্ঞানীরা গুরুত্ব আরোপ করে তাদের উন্নয়নের জন্য গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সৌরশক্তি (solar energy) — সূর্যালোককে যদি ঠিকমত কাজে লাগানো যেত তাহলে পৃথিবীতে শক্তি সমস্যাই থাকত না, কেননা প্রবহমান এই শক্তির পরিমাণ প্রায় অনন্ত। একে খরচ করে শেষ করা যাবে না, এবং এর দ্বারা পরিবেশ দূষণও হবে না। নিরক্ষরেখার দুই ধারে গ্রীষ্মপ্রধান তীব্র সূর্যালোকের দেশগুলিতেই সূর্যরশ্মি থেকে বিদ্যুৎ তৈরির সুযোগ সর্বাধিক। এই উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিকেরা একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন। কিন্তু বর্তমানে চালু প্রযুক্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ খুবই বেশি। সূর্যালোককে অবশ্য শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যই নয়, তাপসৃষ্টির জন্যও ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারতের বিদ্যুৎবিহীন গ্রামগুলিতে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যেসব স্থানে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছে সেগুলি হল উত্তরপ্রদেশে কল্যাণপুর আর সরাইসাদি এবং রাজস্থানে মাথানিয়া। সূর্যচুল্লিও রন্ধনের জন্য তৈরি হচ্ছে। দূষণমুক্ত একটি ভাল জ্বালানি হাইড্রোজেন গ্যাস। একে মজুত করেও রাখা যায়। সূর্যালোক যখন মেঘবৃষ্টি প্রভৃতির জন্য সরাসরি পাওয়া যায় না, তখন সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে থাকার সম্ভাবনা হয় বলে সৌরশক্তির দ্বারা জলকে ভেঙে হাইড্রোজেন তৈরির জন্য বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট হয়েছেন। এইভাবে উৎপন্ন গ্যাসকে উচ্চ চাপে তরলীভূত করে স্থানান্তরে পাঠানো সম্ভব।

বায়ুশক্তি (wind power) — বায়ুশক্তি থেকেও বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হচ্ছে। এই উৎপাদনে পরিবেশ দূষণ হয় না। বায়ুকলের বিশালাকৃতি পাখা হাওয়ায় ঘুরতে থাকলে বিদ্যুৎ তৈরি করা সম্ভব হয়। চাল, গম প্রভৃতি দানাশস্যের দানা নিষ্কাশন, পানীয় ও সেচের জল তোলা প্রভৃতি যান্ত্রিক কাজের জন্য বহু শতাব্দী আগে থেকেই অবশ্য বায়ুকল ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। ১৯ শতক থেকে বায়ুশক্তিকে বিদ্যুতে রূপান্তরের চেষ্টা শুরু হয়। বর্তমান বিশ্বে বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে অগ্রণী হচ্ছে জার্মানি (১ম) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (২য়), ডেনমার্ক (৩য়), ভারত (৪র্থ) এবং নেদারল্যান্ড (৫ম)। ভারতের উৎপাদন ৮৪.৫ মেঃ ওঃ। ভারতে বায়ুশক্তি ব্যবহারের বিশিষ্ট অঞ্চলগুলি হচ্ছে তামিলনাড়ু, গুজরাট ও অন্ধ্রপ্রদেশ। পশ্চিমবঙ্গে সাগরদ্বীপে একটি বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতে প্রায় ২০ হাজার মেগাওয়াট বায়ুশক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার শক্তি (tidal energy)

(আগে অনুচ্ছেদ ১.৩ এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।)

ভূতলতাপের শক্তি (Geothermal energy) — ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (UNO) তরফে রোমে শক্তির নতুন নতুন উৎস সম্পর্কে এক আলোচনাসভা বসে। সেখানে ভূতলতাপের শক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সর্বপ্রথম ঘটে ইতালিতে (১৯০৪)। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (সর্বাধিক ভূতল তাপবিদ্যুৎ উৎপাদক), ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মেক্সিকো, ইতালি এবং জাপান এই জাতের বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অবশ্য, এই শক্তির গরম করা, চাষবাস, মৎস্যচাষ প্রভৃতি বিদ্যুৎ-বহির্ভূত ব্যবহারও হচ্ছে জাপান, চীন, রাশিয়া, আইসল্যান্ড প্রভৃতি দেশে।

ভূতল শক্তি আহরণের জন্য আমাদের জানা দরকার যে, ভূপৃষ্ঠের যে কোনও অঞ্চলই তাপীয় (thermal) নয়। তাপীয় এলাকাতেই এই শক্তি লভ্য। একটি তাপীয় অঞ্চলে মাটির নীচে এমন ধরনের শিলাস্তর থাকতে হবে যেখানে জল এবং/কিংবা বিশেষ কয়েকটি গ্যাসের তরল (fluid) সেখানে পাওয়া যাবে। এই তরলের মাধ্যমেই ভূত্বকের ঘনসন্নিবিষ্ট তাপ ভূপৃষ্ঠে উঠিয়ে আনা সম্ভব হয়।

২.৩ সারাংশ

শক্তি সম্পদকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় — প্রচলিত এবং অপ্রচলিত। প্রধান প্রচলিত শক্তির উৎসগুলি হল কয়লা, খনিজ তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং জলশক্তি। জল ছাড়া বাকি তিনটি অপূরণীয় সম্পদ। অপ্রচলিত শক্তি সম্পদের মধ্যে আছে সূর্যালোক শক্তি, বায়ুশক্তি, জোয়ার-ভাটার শক্তি এবং পারমাণবিক শক্তি। শেষোক্ত শক্তি ছাড়া অন্যগুলি পূরণীয় সম্পদ এবং পরিমাণেও অঢেল। কিন্তু পরমাণুশক্তির মূল খনিজ উপাদানগুলির পরিমাণ সীমাবদ্ধ, যদিও সেগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে বিশ্ববাসীর আগামী কয়েক সহস্রাব্দের শক্তি চাহিদা হয়তো মেটানো যাবে।

গত দুই শতকে কারখানা শিল্পের সম্প্রসারণ কয়লাজাত শক্তির দ্বারা প্রধানত সম্ভব হয়েছিল। কয়লার ব্যবহার শুধুমাত্র কলকারখানার চাকা চালানোতেই সীমাবদ্ধ নয়। এর একাধিক ব্যবহার আছে। গত শতকের মধ্যভাগ থেকে শক্তির মূল উৎস হিসাবে কয়লার প্রাধান্য খর্ব করতে থাকে খনিজ তেল। তেলের একাধিক ব্যবহার রয়েছে। তেলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহারও গত শতকে বেড়ে গেছে। পার্বত্য নদীনালা থেকে জলশক্তিসম্পদ পূরণীয় হলেও বিশ্বের সর্বত্র অঢেল পরিমাণে লভ্য নয়। কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রে দুটি সমস্যা তীব্র হয়ে উঠছে। প্রথমটি হল তাদের দহনজাত পরিবেশদূষণের সমস্যা, দ্বিতীয়টি হল তাদের অত্যধিক ব্যবহারে অদূর ভবিষ্যতে তাদের সম্ভার পৃথিবীর অনেক দেশে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। জলশক্তি যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি তৈরি করছে সেটা হল নদীজলের বহুমুখী ব্যবহারের জন্য বাঁধ নির্মাণের ফলে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জৈব পরিবেশের (ecology) ব্যাপক ক্ষতিসাধন।

প্রচলিত শক্তিসম্পদ ব্যাপকভাবে ব্যবহারের নানা অসুবিধার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, সমুদ্র তরঙ্গজাত শক্তি, জৈবস্তূপ থেকে লভ্য শক্তি এবং পরমাণুশক্তি প্রভৃতি অপ্রচলিত শক্তিসূত্রগুলিকে ক্রমশ বেশি মাত্রায় ব্যবহারের প্রযুক্তি সন্ধানে ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন। পরমাণু শক্তি ছাড়া অন্যগুলি পরিবেশ বিরূপ নয়। পরমাণুর পরিবেশ দূষণের বিষয়টি অবশ্য তর্কসাপেক্ষ।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ **বাস্তুবিজ্ঞান (Ecology)** সাম্প্রতিককালের একটি বহু আলোচিত বিষয়। আমরাও ইতিমধ্যে বিষয়টি আমাদের পাঠে এনে ফেলেছি। এই বিজ্ঞানের উপজীব্য হচ্ছে প্রাণসম্পন্ন পদার্থের সঙ্গে তার পরিবেশের সম্পর্ক। যে কোনও উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী তার পারিপার্শ্বিক অনুযায়ী বেড়ে ওঠে এবং তার আচরণে তদনুযায়ী কিছু কিছু প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য পারিপার্শ্বিকও প্রাণবান পদার্থদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিশেষত মানুষ তো নানাভাবে তার পরিবেশকে পাল্টে দিচ্ছে। সুতরাং সম্পর্কটা উভয়মুখী।]

অতিরিক্ত সংযোজন

খনিজ তেলের দহনের ফল হিসাবে বায়ুদূষণ আমাদের আলোচনায় বিশদভাবে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এই তেলের দ্বারা জলদূষণও হচ্ছে। তেলচালিত ছোট বড় নানাজাতের জলযান থেকে নিঃসৃত বর্জ্য নদনদী এবং সমুদ্রোকূলসংলগ্ন জলরাশিতে জলদূষণ ঘটাচ্ছে।

বর্তমানে পরমাণুশক্তি সুলভ নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে হবে। অতএব নিকট ভবিষ্যতে তার বিপদ প্রবণতা সত্ত্বেও হয়তো এই শক্তিকেই আমাদের বৃহত্তম শক্তি-উৎস হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। সৌরশক্তি এখন পর্যন্ত মহার্ঘ, সুতরাং দরিদ্র দেশে গ্রহণযোগ্য নয়। অনেকেই জানেন ভারতে সৌরশক্তির উন্নতি অবহেলা করবার মতো নয়। সৌরকোষের ব্যবহারে ভারত তৃতীয় — আমেরিকা ও জাপানের পরেই। পশ্চিমবঙ্গ ভারতে সৌরশক্তির ব্যবহারে অগ্রণী। বঙ্গোপসাগরের সাগর দ্বীপকে 'সৌরদ্বীপ' তৈরি করে গোটা বিশ্বে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রয়াস আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলছে। মোট যা শক্তি ভারত সূর্য থেকে পায় তার পনেরো হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র ব্যবহার করতে পারলেই শক্তির পুরো চাহিদা মিটতে পারে বলে বিজ্ঞানী মহলের ধারণা। তেল-কয়লা নিঃশেষিত হবে দূষণে পৃথিবী উষ্ণ হবে, ক্ষতিকর অম্লবৃষ্টি হবে, রোগ বাড়বে, আবহাওয়ার বিপজ্জনক পরিবর্তন হবে। এগুলি এড়ানো সম্ভব ন্যূনতম দূষণের সৌরশক্তি ব্যবহারে।

[**বিঃ দ্রঃ** শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, ecology শব্দটির বদলে দুটি বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। একটি 'জৈব পরিবেশ', অন্যটি 'বাস্তুবিজ্ঞান। ইংরেজিতেও ecology উপরোক্ত দুটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ধরুন, high-tech prawn culture has resulted in the destruction of coastal ecology in many countries । এখানে বাংলা তর্জমায় ecology-র বদলে জৈব পরিবেশ লিখতে হবে। আবার ধরুন, ecology is a science বাক্যের বাংলা তর্জমায় ecology শব্দের প্রতিশব্দ হবে বাস্তুবিজ্ঞান।]

২.৪ অনুশীলনী

(১) একটি কিংবা দুটি বাক্যে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ-

(ক) দুটি প্রচলিত শক্তিসূত্রের নামোল্লেখ করুন। (খ) বায়ুশক্তি এবং জলশক্তি কী পরিবেশের হানি ঘটায়? (গ) কয়লার সর্বাধিক ব্যবহারের ক্ষেত্র কোনটি? (ঘ) বর্তমানে কোন্ শক্তিসূত্রটি সর্বাধিক ব্যবহৃত? (ঙ) কয়লা কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় এমন দুটি শিল্পের নামোল্লেখ করুন। (চ) খনিজ তেলের দুটি উপজাতদ্রব্যের নাম করুন। (ছ) মথুরা ও বারাউনির সঙ্গে তেলশিল্পের কী সম্পর্ক? (জ) বিশ্বে মোট তেল শোধনাগারের সংখ্যা কত এবং তার মধ্যে কয়টির অবস্থান ভারতবর্ষে? (ঝ) অত্যধিক জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের দুটি প্রধান সমস্যা কী? (ঞ) নর্মদা প্রকল্প রূপায়ণের বিরোধীদের মূল বক্তব্য কী? (ট) জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে দুটি অগ্রণী দেশের নামোল্লেখ করুন। (ঠ) ভারতের দুটি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের অবস্থান উল্লেখ করুন। (ড) ভারতে বায়ুশক্তি উৎপাদনের প্রধান এলাকাগুলি কোথায়?

(২) প্রচলিত জীবাশ্ম জ্বালানিগুলির ব্যবহার সম্পর্কে আপনার বক্তব্য সংক্ষেপে পেশ করুন।

(৩) ভারতের সবিশেষ উল্লেখসহ সৌরশক্তি এবং পরমাণু শক্তি ব্যবহার সম্পর্কে আপনার স্থান সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করুন।

(৪) গত শতাব্দীর আধাআধি না পেরোতেই কেন কয়লার প্রাধান্য তেলের দ্বারা খর্ব হল? সত্তর দশকের তেল সংকট কেন এসেছিল এবং কীভাবে মেটানো হয়েছিল?

(৫) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ-

(ক) ভারতীয় রেলপথে ইঞ্জিনগুলি এখন আর ———— ব্যবহার করছে না।

(খ) কয়লা উৎপাদনে সর্বাগ্রগণ্য দেশ হল ———— ।

(গ) বায়ুশক্তি উৎপাদনে ভারতের স্থান ————।

(ঘ) ভারতে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি কেন্দ্র হল ————।

(ঙ) ভূতলতাপের শক্তি ব্যবহারকারী একটি দেশ হল ————।

(চ) প্রাকৃতিক গ্যাসের বৃহত্তম ভাণ্ডারের দেশের নাম ————।

(৬) নিম্নোক্ত বাক্যগুলিকে ভুল সংশোধন করে লিখুন ঃ—

(ক) ভারত এখন বৈদেশিক তেলের উপর নির্ভরশীল নয়। (খ) ভারতে মোট উত্তোলিত কয়লার প্রায় $\frac{১}{৩}$ তাপীয় শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। (গ) তেলোৎপাদনে সর্বাগ্রগণ্য দেশের নাম ইরাক।

(৭) নীচের স্তম্ভ দুটির শব্দগুচ্ছের মধ্যে যোগাযোগ চিহ্নিত করুন ঃ—

(ক) কয়লা	পরমাণু বিদ্যুৎ
তেল	ভেনিজুয়েলা
তারাপুর	আলকাতরা

২.৫ উত্তর সংকেত

(১) (ক) কয়লা ও তেল; (খ) বায়ুশক্তি ঘটায় না, জলশক্তি ঘটাতে পারে। (গ) তাপীয় বিদ্যুৎ সৃষ্টি; (ঘ) খনিজ তেল; (ঙ) নিজে চেষ্টা করুন, (চ) মোম ও রং; (ছ) নিজে চেষ্টা করুন, (জ) বিশ্বে ৭০২ এবং ভারতে ১৪টি। (ঝ) দূষণ এবং সম্পদ হ্রাস (ঞ) পরিবেশ বিনাস (ট) নিজে চেষ্টা করুন। (ঠ) নিজে চেষ্টা করুন। (ড) গুজরাট ও মহারাষ্ট্র।

(২) ২.২.১

(৩) ২.২.২

(৪) ২.২.১

(৫) (ক) 'কয়লা', (খ) চীন, (গ) ৪র্থ (ঘ) কল্যাণপুর (ঙ) জাপান (চ) রাশিয়া

(৬) নিজে চেষ্টা করুন। তবে (ক) প্রশ্নে বাক্যটির শুদ্ধ বয়ান হবে — ভারত এখনও বৈদেশিক তেলের উপর নির্ভরশীল।

(৭) কয়লা → আলকাতরা

তেল → ভেনিজুয়েলা

তারাপুর → পরমাণু বিদ্যুৎ

২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১. তরুণ বন্দোপাধ্যায় ও গৌতম মল্লিক, **অর্থনৈতিক সম্পদ সমীক্ষা** (১৯৯৮) ছায়া প্রকাশণী; কলি-৯

২. সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, **সম্পদ সমীক্ষা** (১৯৯৮), ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোম্পানি, কলি-৭

৩. অজিতকুমার শীল, **সম্পদ সমীক্ষা** (১৯৯৮), শ্রীধর পাবলিশার্স, কলি-৬,

৪. A.K. Datta Gupta, **Resource Study** (1993), New Central Book Agency, Cal-9

৫. A. Mitra, **Resource Studies,** Sreedhar Publishers, Cal-6

একক ৩ ❑ শিল্প সম্পদ (Industrial Resources)

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ নির্মাণকর্মের (শিল্পের) অবস্থান

৩.২.১ নির্মাণকর্মের অবস্থান সম্পর্কীয় ওয়েবারের ন্যূনতম উৎপাদন ব্যয় তত্ত্ব

৩.২.২ অগাস্ট লোশের মুনাফা সর্বাধিকীকরণ তত্ত্ব

৩.২.৩ ওয়েবার ও লোশ তত্ত্বের পার্থক্য

৩.৩ নির্মাণকর্মের বাছাই করা কয়েকটি শাখা

৩.৩.১ লৌহ-ইস্পাত শিল্প

৩.৩.২ কার্পাস-বয়ন শিল্প

৩.৪ সারাংশ

৩.৫ অনুশীলনী

৩.৬ উত্তর সংকেত

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি ভালো করে পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন —

- নির্মাণ শিল্পের আবিষ্কারের ইতিকথা ;
- নির্মাণ শিল্পের অবস্থান সম্পর্কীয় বিশেষ বিশেষ তত্ত্বসমূহ ;
- কোন স্থানে লৌহ-ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠার কারণসমূহ এবং সাম্প্রতিক পরিবর্তনের কারণসমূহ ;
- পৃথিবীর বেশ কয়েকটি লৌহ-ইস্পাত এবং কার্পাস-বয়ন শিল্পের বর্ণনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, আমরা 'স্থানিকতা' এবং 'অবস্থান' এই দুটি শব্দ ব্যবহার করছি ইংরেজি প্রতিশব্দ 'location'-এর বদলে, কেননা এই দুটি শব্দই আজকাল পাঠ্যপুস্তকে বহুব্যবহৃত।

ইংরেজি 'manufacturing'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করছি 'নির্মাণ'। সুতরাং 'নির্মাণশিল্প' কথাটি ব্যবহার করব ইংরেজি 'manufacturing industry' কথাটির বদলে। যদিও বাংলায় কোনও কোনও পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা 'শ্রমশিল্প' কথাটি ব্যবহার করেছেন। আসলে আমাদের বোঝানো দরকার যে, আমরা ওই শিরোনামে কারখানায় পণ্য প্রস্তুতের ব্যাপারটাই আলোচনা করতে চাই। কুটিরশিল্পকে সাধারণত কারখানাশিল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। অথচ 'শ্রমশিল্প' কথাটি ব্যবহার করলে প্রথমেই আমাদের মনে আসবে শ্রমনিবিড় কুটির শিল্পের কথা। কারখানা শিল্প বোঝাতে অনেক ক্ষেত্রে 'নির্মাণ শিল্পের' বদলে শুধু 'শিল্প' কথাটিও ব্যবহার করব।]

৩.১ প্রস্তাবনা

নির্মাণ শিল্পের আবির্ভাব মানবসভ্যতার অগ্রগতির একটি বিশিষ্ট বাহক। আদিম মানুষ কাঁচা ফলমূল ও মাছ মাংস খেয়ে জীবনধারণ করত। প্রাকৃতিক নানা সম্পদকে রূপ অবিকৃত রেখেই ব্যবহার করা হত। সভ্যতার প্রথম অগ্রগতি সূচিত হল প্রযুক্তির উদ্ভাবনে। মানুষ আদিম প্রযুক্তি খাটিয়ে আগুন জ্বালাতে শিখল, ফলমূল আর মাংস কাটবার ছুরি প্রভৃতি তৈরি করল। যাযাবর মানবগোষ্ঠীরা ক্রমে স্থায়ীভাবে বসবাস করে জমি চাষ শুরু করল। এল কৃষিকাজ। নব নব প্রযুক্তি এবং পুরানো প্রযুক্তির উন্নতির সাহায্যে মানুষ তুলা থেকে পরিধেয়, চামড়া থেকে জুতো, আখ থেকে গুড় প্রভৃতি তৈরি করতে লাগল। এটাই নির্মাণের বা শিল্পের গোড়াপত্তনের কাহিনী। এই সময়ে অর্থনীতি ছিল কৃষি ও কুটির শিল্পভিত্তিক।

পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা এবং তাদের চাহিদার বৈচিত্র বৃদ্ধির ফলে নিছক কৃষি-কুটির শিল্পনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাগুলি ক্রমশই প্রকট হয়ে পড়তে লাগল। ফলে অনিবার্যরূপেই এল শিল্পবিপ্লব (যার সূচনা হল ইউরোপ — বিশেষত গ্রেট ব্রিটেন থেকে)। বৃহদায়তন কারখানায় যন্ত্রের ব্যবহার এই নতুন জমানার বৈশিষ্ট্য। গ্রেট ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবের গোড়াপত্তন করল কার্পাসবস্ত্রবয়ন শিল্প এবং লৌহ-ইস্পাত শিল্প। ছোট বড় নানা জাতের কারখানায় শ্রমিকদের জড়ো করে উৎপাদনের বন্দোবস্তটাই হল নির্মাণশিল্প। কালক্রমে এই বন্দোবস্তটা বিশ্বের অন্যান্য মহাদেশেও প্রসারিত হয়। একাধিক দরিদ্র দেশেও বৃহদায়তন যন্ত্রনিবিড় নির্মাণশিল্প গড়ে ওঠে। যেমন ভারতবর্ষ। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগেই পশ্চিমভারতে আধুনিক কার্পাসবয়ন শিল্প গড়ে ওঠে। বিংশ শতকের গোড়ায় বিহারের জামশেদপুরে টাটা কোম্পানির ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়।

তবে শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতি শিল্পায়ন বিশ্বের সর্বত্র সমভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। শিল্পোন্নত পশ্চিমের দেশগুলিতে আয় এবং জীবনযাত্রার মানের অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে। অথচ এখনও বিশ্বের বহুদেশে সার্থক শিল্পায়ন ঘটেনি, অতি নিম্নতলে থেকে গেছে জীবনযাত্রার মান। বিশ্বের প্রায় সত্তর শতাংশ নরনারী এখনও দারিদ্র্য, অপুষ্টি এবং অশিক্ষার শিকার, যা কিনা নোবেল-পুরস্কার বিজয়ী অর্থবিজ্ঞানী অমর্ত্য সেনের একাধিক রচনার উপজীব্য।

৩.২ নির্মাণকর্মের (শিল্পের) অবস্থান

শিল্পনির্দেশক বিশ্ব মানচিত্রের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে, সুসংগঠিত বৃহৎ শিল্পগুলি বিশ্বের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলেই স্থানীয়কৃত, অর্থাৎ সন্নিবিষ্ট। কারণ অনুমান করা খুব কঠিন নয়। নির্মাণের জন্য যেসব উপকরণের প্রয়োজন — কাঁচামাল, বাজার, শক্তি, দক্ষ শ্রমিক, সহায়ক জলবায়ু, পরিবহন ব্যবস্থা ও মূলধন — সেগুলি যেখানে সহজে ও সস্তায় পাওয়া যাবে, সেখানেই যে কলকারখানাগুলি গড়ে উঠবে তা তো

সহজবোধ্য। নির্মাণশিল্পের এই স্থানিকতা বা একদেশীকরণের (localisation) কারণগুলি মাথায় রাখলে পশ্চিমবঙ্গে পাটশিল্পের কিংবা আমেদাবাদে কার্পাসবয়ন শিল্পের স্থানিকতা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না।

৩.২.১ নির্মাণ কর্মের (শিল্পের) অবস্থান সম্পর্কীয় ওয়েবারের ন্যূনতম উৎপাদন ব্যয় তত্ত্ব

জার্মান অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড ওয়েবার সর্বপ্রথম শিল্পস্থানিকতার এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পরিবেশন করেন। এই তত্ত্বে শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামালকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। (ক) কোনও কোনও কাঁচামাল সর্বত্র লভ্য (Ubiquitous)। যথা ঃ জল, বাতাস ও সূর্যকিরণ। আবার কোনও কোনও কাঁচামাল স্থানীয়কৃত (অর্থাৎ সর্বত্র সমানভাবে প্রাপ্তব্য নয় (localised)। যথা ঃ বিভিন্ন খনিজ এবং কৃষিজ দ্রব্য। স্থানীয়কৃত কাঁচামালগুলির আবার দুটি শ্রেণী আছে — অপরিশুদ্ধ (impure) বা ওজনবিদায়ী (weight-losing), এবং বিশুদ্ধ (Pure) বা ওজনরক্ষী (non-weight-losing)। ওজনবিদায়ী কাঁচামালের প্রকৃষ্ট উদাহরণ আখ। ১০০ টন আখ থেকে মাত্র ১০-১১ টন চিনি হয়, বাকি অংশ হয়ে যায় ছিবড়ে। সুতরাং আখচাষ কেন্দ্র থেকে চিনি তৈরির কেন্দ্র যত দূরে হবে, চিনি তৈরির খরচ ততই বাড়তে থাকবে। তাই আখ চাষ অঞ্চলগুলির কাছাকাছি চিনিকল প্রতিষ্ঠিত করাই লাভজনক, কেননা এক্ষেত্রে আখ পরিবহনের খরচটা কম হবে। তাই ভারতের উত্তরপ্রদেশের ইক্ষুপ্রধান এলাকাগুলির মধ্যেই চিনিশিল্প মোটের উপর স্থানীয়কৃত হয়ে গেছে। লোহাও একই ধরনের ওজনবিদায়ী কাঁচামাল যার জন্য বিশ্বের অনেক স্থানে ইস্পাতকেন্দ্রগুলি লৌহখনিগুলির সন্নিহিত স্থানে গড়ে উঠেছে (যথা ভারতে জামশেদপুরের ইস্পাত কারখানা)। অন্যদিকে ওজনরক্ষী কাঁচামালের উদাহরণ স্বরূপ পশমের নাম করা যায়। কাঁচা পশম বস্ত্রে রূপান্তরিত হওয়ার পরেও ওজনে বিশেষ কমে না। তাই কাঁচাপশম রপ্তানি এবং পশমবস্ত্র রপ্তানির পরিবহন খরচ মোটের উপর সমান। সুতরাং অস্ট্রেলিয়া পশমবস্ত্র রপ্তানি না করে কাঁচা পশম রপ্তানি করে বেশি।

একটু বিস্তারিতভাবে ওয়েবার তত্ত্ব বোঝানোর জন্য একটি কাঁচামাল সূচক (material index)। ব্যবহার করা হয়। কাঁচামাল সূচক হচ্ছে স্থানীয়কৃত কাঁচামালের ওজন এবং চূড়ান্ত পণ্যের (finished product) ওজনের অনুপাত। এই অনুপাতের তিনটি অবস্থা আছে ঃ অনুপাত ১ এর বেশি, অনুপাত ১ এর সমান এবং অনুপাত ১ এর কম।

$$(\text{কাঁচামালসূচক})\frac{\text{কাঁচামালের ওজন}}{\text{চূড়ান্ত পণ্যের ওজন}} > ১, \text{ কিংবা } = ১, \text{ কিংবা } < ১,$$

প্রথম অবস্থায় পণ্যের মোট খরচ ন্যূনতম করবার জন্য শিল্পটিকে যথাসম্ভব কাঁচামালের কাছাকাছি গড়ে তুলতে হবে। তৃতীয় অবস্থায় ঘটনা হবে সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থাৎ শিল্প বাজার বা বিক্রয়কেন্দ্রের কাছাকাছি গড়ে উঠবে। দ্বিতীয় অবস্থায় শিল্পটি বিশেষ কোনও স্থানে সন্নিবিষ্ট নাও হতে পারে। পরিবহন খরচ এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। সুতরাং অন্যান্য বিষয় (সস্তায় মজুর পাওয়া, সস্তায় শক্তি পাওয়া) শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখছি যে, প্রথমাবস্থায় পশ্চিম ভারতের কার্পাস বলয়ের সন্নিধানে স্থানীয়কৃত হলেও পরবর্তীকালে ভারতের কার্পাসবয়ন শিল্প উত্তর-পূর্ব ভারতে পণ্য বাজারের সন্নিহিত অঞ্চলেও কিছুটা গড়ে উঠেছিল। সস্তা জলবিদ্যুৎ এবং দক্ষ শ্রমিকের সহজলভ্যতার দরুন অনেক কাপড়ের কল দক্ষিণ ভারতেও গড়ে উঠেছে। তৃতীয় অবস্থায় শিল্পটি কাঁচামালের ধারেকাছেও সন্নিবিষ্ট না হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ চা প্যাকিং শিল্প উল্লিখিত হতে পারে। চা পাতার সঙ্গে প্যাকিং উপাদানগুলির ওজন যুক্ত হলে চূড়ান্ত সামগ্রীর ওজন অনেকখানি বেড়ে যায়। তাই চা প্যাকিং শিল্প চা বাগানগুলির চারপাশে গড়ে ওঠেনি। কাঁচামালের

তুলনায় শ্রমিক এবং প্রযুক্তিজনিত ব্যয় অনেক বেশি বলে ঔষধশিল্প এবং ঘড়িশিল্পও কাঁচামালের নিকটস্থ অঞ্চলে স্থানীয়কৃত হয়নি।

ওয়েবার অনুযায়ী কাঁচামালের শ্রেণীবিভাগ

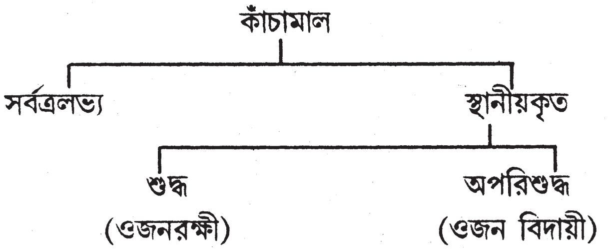

ওয়েবার তত্ত্বের সমালোচনা ঃ

ওয়েবার তত্ত্বের সমালোচকেরা ওই তত্ত্বের একাধিক ত্রুটির কথা ব্যক্ত করেছেন।

(১) ওয়েবার তত্ত্ব অতি সরলীকৃত, কেন না আজকের দিনে পরিবহন খরচাই শিল্পের স্থানিকতা নির্ধারণে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। যেমন, ওয়েবার নিজেই শ্রমিক খরচার দরুন স্থানিকতা ন্যূনতম পরিবহন খরচানুসারী নাও হতে পারে বলে স্বীকার করেছেন। (২) যেসব ক্ষেত্রে শিল্পের কাঁচামাল আমদানি করে চূড়ান্ত পণ্য রপ্তানি করতে হয় সেখানেও এই তত্ত্ব ঘাটে না। (৩) পরিবহন সম্পর্কে ওয়েবারের ধারণাও গ্রহণযোগ্য নয়। পরিবহন খরচা কেবলমাত্র ওজন এবং দূরত্ব দিয়ে নির্ণীত হয় না। বিগত অর্ধশতকে চূড়ান্ত পণ্যের উপরে দেয় পরিবহন খরচা কাঁচামালের উপরে দেয় পরিবহন খরচার চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে গেছে (৪) ওয়েবার মূলত ঃ রেলপরিবহন খরচের দ্বারাই ভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে, জলপরিবহন রেল পরিবহনের চেয়ে ঢের সস্তা। (৫) কোনও দেশের সরকারি নীতির দ্বারাও শিল্পস্থাপনের অঞ্চল নির্ধারিত হতে পারে ভারতে সরকারি নীতির ফলে অনেক শিল্পকেন্দ্র অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর অঙ্গরাজ্যেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যদিও সেখানে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল লভ্য নয়।

একই বাজার কিন্তু দুটি কাঁচামালের ক্ষেত্রে ওয়েবার তত্ত্বের প্রয়োগ

ইস্পাত তৈরি করতে লোহা এবং কয়লা দুই-ই লাগে। দুটিই ভারী পদার্থ, ফলে উভয়েরই পরিবহন খরচ বেশি। ইস্পাত কারখানা লৌহখনির কাছে থাকবে, না কয়লাখনির কাছে থাকবে, না থাকবে মধ্যপথে কোথাও? রুশ যুক্তরাজ্যে কয়লা সমৃদ্ধ কুজনেৎস্ক এবং লৌহসমৃদ্ধ ম্যাগোনিটোগরস্ক উভয় স্থানেই ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠেছে। কারণ, যে গাড়ি কয়লা নিয়ে লৌহ এলাকায় যায়, তা-ই আবার খালি না এসে লোহা ভর্তি হয়ে কয়লা অঞ্চলে ফেরে। ফলে পরিবহন খরচ কম হয়। এভাবে উভয় অঞ্চলেই ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠেছে। এক অঞ্চলের কাঁচা ওজনবিদায়ী মাল অন্য অঞ্চলে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আবার মধ্যপথেও (ক্লিভল্যান্ড, বাফেলো প্রভৃতি শহরে) ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গোটা ব্যাপারটা নাম রাখা হয়েছে **পরিবহনের দোলকনীতি** (pendulum principle)। নীচের ছবি থেকে বিষয়টি আরো ভালো বোঝা যাবে।

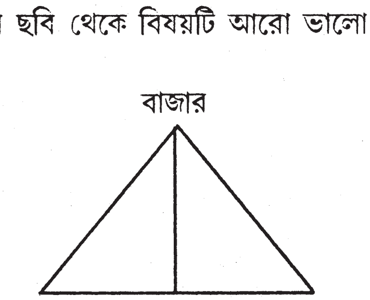

৩.২.২ অগাস্ট লোশের মুনাফা সর্বাধিকীকরণ তত্ত্ব ঃ

পরবর্তীকালে অগাস্ট লোশ (Losch) নামে আরেক জার্মাণ অর্থনীতিবিদ শিল্পস্থানিকতার জন্য যে তত্ত্ব প্রচার করেন তাকে মুনাফা সর্বাধিকীকরণ (Profit-maximisation) বা বাজার এলাকা তত্ত্ব বলা হয়। লোশের মতে, সর্বাধিক মুনাফা অর্জনই যে কোনও শিল্পোদ্যোগের মূল লক্ষ্য। সুতরাং যতখানি পণ্য উৎপাদন করে বাজারে এনে বিক্রি করলে সবচেয়ে বেশি মুনাফা পাওয়া যাবে ততখানি পণ্যই উৎপাদন করা হবে। বিক্রি নির্ভর করবে বাজারের আয়তনের উপর। লোশের চোখে যে আয়তনের বাজার সর্বোচ্চ মুনাফা এনে দেবে সেটাই আদর্শ বাজার।

লোশ তাঁর লেখায় অর্থনৈতিক দৃশ্যপটে কিছু সংখ্যক কেন্দ্রীয় স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। এই সব স্থানে উৎপাদন ব্যয় — যা কিনা পরিবহন ব্যয়ের থেকে আলাদা — সর্বত্র এক থাকে, কিন্তু পরিবহন ব্যয় (বা খরচা) দূরত্ব অনুসারে কমবেশি হয়। লোশের মতে, একক প্রতি পণ্যমূল্য = উৎপাদন ব্যয় + পরিবহন ব্যয় + ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মুনাফা।

যে কোনও কেন্দ্রীয় স্থানের মধ্যে উৎপাদন সীমাবদ্ধ থাকলে উৎপাদন ব্যয় এবং (ন্যূনতম) মুনাফা অপরিবর্তিত থাকবে। কাজেই পণ্যমূল্য পরিবহন ব্যয়ের (অর্থাৎ দূরত্বের উপর নির্ভরশীল হবে। অন্যদিকে চাহিদার সূত্রানুসারে পণ্যমূল্যের সঙ্গে জড়িত হল পণ্যের চাহিদা। উৎপাদন কেন্দ্রের কাছে পরিবহনব্যয় ন্যূনতম থাকবে বলে চাহিদা বৃহত্তম থাকবে, কেননা এখানে মূল্য নিম্নতম হবে (উৎপাদন ব্যয় + ন্যূনতম মুনাফা অপরিবর্তিত থাকবে বলে)। দূরত্ব যত বাড়বে, মূল্যও ততই বাড়বে, ফলে পণ্যের চাহিদাও তত কমবে। কিন্তু মূল্য একটি বিশেষ স্তর পেরিয়ে গেলে ক্রেতা ওই উচ্চমূল্যে পণ্যক্রয় করতে রাজি হবে না। সুতরাং মুনাফা বৃহত্তম করতে গেলে কেন্দ্রীয় স্থানে পণ্যের উৎপাদন ঘটাতে হবে। তাতে বিক্রয় বৃহত্তম হবে এবং মোট মুনাফা (একক প্রতি ন্যূনতম মুনাফা X মোট বিক্রীত পণ্য) সর্বাধিক হবে। মূল্য বৃদ্ধি করে নয়, অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বেশি বিক্রি করলেই মুনাফা সর্বাধিক হবে।

লোশতত্ত্বের সমালোচনা

(১) কাঁচামালের নৈকট্য বা সহজলভ্যতা সম্পর্কে লোশ পরিষ্কার করে কিছু বলেননি। (২) ন্যূনতম মুনাফাতেই সবসময় বিক্রেতা পণ্য বিক্রয় করলে তার মুনাফা সর্বাধিক হবে পূর্ণ প্রতিযোগিতার পরিবেশে। একচেটিয়া বাজারে এই তত্ত্ব তাই খাটে না। (৩) লৌহ উত্তোলন, ইস্পাত উৎপাদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে নির্মাণের স্থানিকতা লোশতত্ত্বের দ্বারা সন্তোষজনকভাবে বোঝানো যায় না। (৪) রপ্তানিনির্ভর শিল্পের ক্ষেত্রেও লোশতত্ত্ব অচল।

তবে একথা মানতেই হবে যে, ভোগপণ্য উৎপাদনের স্থানিকতা লোশতত্ত্বের দ্বারা অনেকখানি বোঝানো যায়। পরিবহন খরচের এই তত্ত্বে কোনও ভূমিকা নেই একথা সত্য নয়।

৩.২.৩ ওয়েবার ও লোশতত্ত্বের পার্থক্য

(১) যেখানে ওয়েবার শিল্পস্থানিকতা নির্ধারণের পরিবহন খরচের উপরে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন (যা কিনা ভারী খনিজ দ্রব্যের ক্ষেত্রে বহুলাংশে সত্য), লোশ সেখানে অন্যান্য খরচকেও টেনে এনেছেন। (২) ওয়েবার তত্ত্বে উৎপাদন ব্যয়ের (যার মধ্যে পরিবহনব্যয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ) সর্বপ্রধান ভূমিকা। সরবরাহের (বা যোগানের) মুখ্য নির্ধারক হল উৎপাদনব্যয়। সুতরাং বলা চলে যে, ওয়েবার তত্ত্ব যোগানমুখী। অপরপক্ষে,

লোশতত্ত্বে চাহিদা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং লোশতত্ত্ব এক হিসাবে চাহিদামুখী। বাজারে ন্যূনতম চাহিদা আছে, যেটা ওয়েবার ধরেই নিয়েছিলেন, কিন্তু লোশ ধরে নেননি।

[বি: দ্র : cost শব্দের বদলে বাংলায় উৎপাদন ব্যয় এবং খরচ দুটি শব্দই ব্যবহৃত হচ্ছে বলে আমরাও উভয় শব্দই ব্যবহার করেছি।]

৩.৩ নির্মাণকর্মের বাছাই করা কয়েকটি শাখা

নির্মাণকর্মের বাছাই করা কয়েকটি শাখা সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

৩.৩.১ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (Iron and Steel Industry)

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ যদি হয় পরমাণু শক্তির যুগ, তবে প্রথমার্ধ নিঃসন্দেহে ইস্পাতের যুগ। বস্তুত আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার অন্যতম স্তম্ভ হল লৌহ-ইস্পাত শিল্প। লোহা থেকে ইস্পাত আসে বলে উভয়কে পাশাপাশি রেখে আলোচনা করা হয়। যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, জাহাজ, রেলগাড়ি, লরি, রেলপথ, দেশরক্ষার সাজসরঞ্জাম (কামান, বন্দুক প্রভৃতি) প্রভৃতি বহু সামগ্রী তৈরি করতে লৌহ-ইস্পাত অত্যাবশ্যক। সুতরাং এটি একটি মূল (basic) শিল্প।

লৌহ-ইস্পাত শিল্পের কাঁচামাল ঃ — ইস্পাত উৎপাদনে তিনটি পর্যায় (stage) আছে। (১) প্রথম পর্যায় হল বাত-চুল্লির পর্যায়। এই পর্যায়ে তিনটি মূল কাঁচামাল — খনি থেকে আনা লৌহ আকরিক, কোক কয়লা এবং চুনা পাথর মিশিয়ে চুল্লির তাপে গলিয়ে মেশানো হলে কাঁচা লোহা (pig iron) নীচে জমা হতে থাকে। একে উত্তপ্ত অবস্থায় ছাঁচে ফেলে ঢালাই করা হয় বলে ঢালাই লোহাও বলে। (২) দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে ইস্পাতে রূপান্তরের পর্যায়। এখানে ঢালাই লোহার সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ আর সিলিকন মিশিয়ে একাধিক প্রক্রিয়ার যে কোনও একটিতে (বেসেমার, প্রকাশ্য চুল্লি, ইত্যাদি) ইস্পাত বানানো হয়। ইস্পাত তৈরির সময় অ্যালুমিনিয়াম, সিসা, দস্তা প্রভৃতির মিশ্রণে নানা জাতের সঙ্কর ইস্পাত (alloy steel) আজকাল তৈরি হচ্ছে। এই ইস্পাত সাধারণ ইস্পাতের থেকে ঢের বেশি শক্ত এবং মরচে ধরে না সহজে। (৩) শেষ পর্যায় হল শেষ মিল (finishing mill)। এখানে ইস্পাতকে টিউব, রেল, লম্বা অর্গল (bar) প্রভৃতির রূপ দেওয়া হয়। যে ইস্পাত কেন্দ্রে তিনটি পর্যায়ের কাজই সম্পন্ন হয় সেই কেন্দ্রকে বলা হয় সমন্বিত ইস্পাত কেন্দ্র (Integrated Steel Mill)।

- **লৌহ-ইস্পাত শিল্পের স্থানিকতার বিষয়**

লৌহ-ইস্পাত শিল্প প্রধানত ওজনবিদায়ী কাঁচামাল নির্ভর। প্রধান দুটি কাঁচামাল হল কয়লা আর আকরিক লোহা। ১ টন ইস্পাতের জন্য প্রায় ৪ টন কয়লা এবং ২ টন আকরিক লোহা লাগে। সুতরাং ওই দুইটি উপাদানের পরিবহন খরচ ইস্পাত শিল্পের অবস্থান নির্বাচনে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকার পিট্‌স্‌বার্গ, জার্মানির রূঢ়, ইউক্রেনের ডনবাস এবং ভারতের দুর্গাপুর ও বার্নপুর ইস্পাত কেন্দ্র কয়লাখনি অঞ্চলের কাছে গড়ে উঠেছে। লৌহখনির নিকটবর্তী স্থানেও কোথাও কোথাও ইস্পাত শিল্প অবস্থিত হয়েছে। আমেরিকার সুপিরিয়ার হ্রদের কাছে এবং ফ্রান্সের লোরেন প্রদেশের কাছে একই কারণে ইস্পাত কলগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

- **অবস্থান বিন্যাসে সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলির কারণ**

গোড়ার দিকে ইস্পাত কারখানাগুলির অধিকাংশই হয় কয়লাখনি নচেৎ লৌহখনি অঞ্চলের সন্নিধানে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বাজারের নৈকট্য প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়গুলিও ইস্পাত শিল্পের অবস্থান নির্ধারণে অংশগ্রহণ করেছে। ফলে খনি অঞ্চলের নৈকট্য ছাড়াও অনেক ইস্পাতকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এই অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে বাজারের নৈকট্য এবং শক্তির সুলভতা ও সহজপ্রাপ্যতা! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির অন্যতম ফলশ্রুতি হল একক প্রতি ইস্পাত উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কয়লার পরিমাণ হ্রাস। তা ছাড়া, বিকল্প শক্তিসূত্রের (যেমন জলবিদ্যুৎ) উদ্ভাবনের ফলে এবং বৈদ্যুতিক চুল্লির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের দরুন শক্তির উৎস হিসাবে কয়লার গুরুত্ব অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। তাই আধুনিক ইস্পাত কলগুলি আর কয়লাখনি অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। তদুপরি কয়লা ও কাঁচা লোহার জন্য দেয় পরিবহন হারের চেয়ে সম্পূর্ণ করা ইস্পাতের জন্য দেয় পরিবহন হার অনেক বেশি। তা ছাড়া, বাজার থেকে লভ্য নানাজাতের পরিত্যক্ত লোহার জিনিস (scrap) ঢালাই লোহার চেয়ে অনেক সস্তা। তাই খনি অঞ্চলের কাছে না থেকে অনেক ইস্পাত কল বাজারের কাছে স্থাপিত হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইরি হ্রদের কাছে ডেট্রইটের ইস্পাত কেন্দ্র বাজার নির্ধারিত স্থানিকতার সেরা উদাহরণ। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের শেফিল্ড শহরের ইস্পাত কলগুলি কাছের বাজার থেকে সংগৃহীত সস্তা পরিত্যক্ত ধাতবের উপর প্রধানত নির্ভরশীল। তাদের তৈরি বিশেষ ধরনের ইস্পাতের বাজারও তাদের ধারেকাছেই তারা পেয়ে যায়। স্বদেশ থেকে পাওয়া কয়লা এবং লোহা দিয়ে বাজারের (বিশেষত বিদেশের) সম্পূর্ণ চাহিদা মেটানো যাচ্ছিল না বলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আমেরিকায় অনেক ইস্পাত কেন্দ্র সমুদ্রবন্দরের কাছে গড়ে তোলা হয়েছে। বিদেশ থেকে অপেক্ষাকৃত সুলভ সমুদ্র পরিবহনে কয়লা ও লোহা আমদানি করে আবার সেই পরিবহনেই সাগরপারে ইস্পাত রপ্তানি করে ব্যয়সংক্ষেপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতের বিশাখাপত্তনমের ইস্পাত কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় কয়লা আসে অস্ট্রেলিয়া থেকে [শিক্ষার্থী মনে রাখবেন যে, ভারতে কয়লা প্রচুর প্রাপ্য হলেও ইস্পাতের জন্য প্রয়োজনীয় কোক কয়লার পরিমাণ স্বল্প]। জাপানে প্রয়োজনীয় কয়লা ও লৌহ আকরিক বিদেশ থেকে আনতে হয় বলে সেখানকার ইস্পাত শিল্প বন্দরভিত্তিক হয়েছে। সরকারি হস্তক্ষেপও কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইস্পাত কারখানার অবস্থান স্থির করেছে। যেমন, ভারতে সরকার রচিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে ভিলাই, বোকারো প্রভৃতি স্থানে ইস্পাত কল স্থাপিত হয়েছে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের স্বার্থ মাথায় রেখে, ন্যূনতম উৎপাদন ব্যয়ের কথা মাথায় রেখে নয়।

- **বিশ্বের অগ্রণী লৌহ-ইস্পাত উৎপাদক দেশগুলি**

বিগত দশকের শেষপাদে পৃথিবীর অগ্রণী ইস্পাতোৎপাদক দেশগুলির মধ্যে ১ম স্থানে ছিল চীন, ২য় স্থানে জাপান, ৩য় স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ৪র্থ স্থানে রুশ যুক্তরাষ্ট্র, এবং ৫ম স্থানে জার্মানি। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের অর্ধেকের সামান্য বেশি উপরোক্ত রাষ্ট্রপঞ্চকেই তৈরি হয়েছে। অথচ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ইস্পাত তৈরির কল স্থাপিত হয় বিলেতে।

প্রজাতন্ত্রী চীন

চীনদেশে প্রচুর উৎকৃষ্ট লৌহ আকরিক এবং কয়লা থাকলেও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের (১৯৪৯) আগে ইস্পাত উৎপাদনে চীনের অংশ ছিল নগণ্য। কিন্তু বিপ্লবোত্তর চীনে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের পরে মাত্র চার দশকের মধ্যে ইস্পাত শিল্পের যে উন্নতি ঘটেছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব। এই দেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে অধিকাংশ কয়লা ও আকরিক লোহার খনিগুলির অবস্থান বলে মাঞ্চুরিয়ার আনসান

অঞ্চলে এবং ইয়াসি নদীর নিম্ন উপত্যকায় অধিকাংশ ইস্পাত কলগুলি গড়ে উঠেছে (অনেকটা ওয়েবার তত্ত্বকে সমর্থন করে)। চীনের বৃহৎ ইস্পাত কারখানাগুলি হল আনসান লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানি, বাওটাউ লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানি, উহান লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানি, পাঞ্জিহুয়া লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানি, এবং ক্যাপিটাল লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানি।

[শিক্ষার্থী চীনের প্রাকৃতিক মানচিত্র এই প্রসঙ্গে অবশ্যই ব্যবহার করবেন।]

জাপান

জাপানের লৌহ-ইস্পাত শিল্প বয়সে যথেষ্ট প্রবীণ হলেও (১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে মেইজি পুনরানয়নের সময়েই জাপানে ইস্পাত উৎপাদন শুরু হয়) এবং সর্বপ্রথম পশ্চিমী ধাঁচের চুল্লিভিত্তিক ইস্পাতকল ১৮৭৪ সালে হনসু প্রদেশের কামাইসিতে চালু হলেও তার সত্যকারের বিকাশ ঘটে বিংশ শতকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অবশ্য অনেক ইস্পাত কল বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু চমকপ্রদ দ্রুততায় জাপানি ইস্পাত শিল্প নিজেকে পুনর্গঠিত করে। জাপানে সামান্য কোক কয়লা এবং লোহা থাকলেও জাপ ইস্পাত শিল্পের প্রয়োজনীয় লোহার গরিষ্ঠ অংশ আসে ভারত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ থেকে আমদানি মারফত। বিশ্বের মোট ইস্পাত উৎপাদনের প্রায় ১৫% জাপানের অবদান। এই উৎপাদনের বৃহত্তম অংশ জাপান বিদেশে রপ্তানি করে। [বি: দ্র: জাপানের মানচিত্র বাবহার করবেন।]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (USA)

আমেরিকায় প্রথম সফল ইস্পাতকল বসানো হয়েছিল ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে বাল্টিমোরে। বর্তমানে বিশ্বের ইস্পাত উৎপাদনের প্রায় ১৩% আমেরিকা থেকে আসে। এখানকার হ্রদ অঞ্চলে উচ্চমানের লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। হ্রদ দিয়ে জলযানে লোহা ও কয়লার মতো ভারী মাল পাঠাতে পরিবহন ব্যয় খুবই কম হয়। ইরি হ্রদঅঞ্চলে বাফেলো, ডেট্রইট প্রভৃতি স্থান ইস্পাত উৎপাদনের জন্য সুপরিচিত। মিচিগান হ্রদ অঞ্চলে চিকাগো ইস্পাত উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। সুপিরিয়ার হ্রদের এলাকায় রয়েছে ইস্পাত নগরী দুলুথ। ভাল কয়লা এবং উৎকৃষ্ট আকরিক লোহার নৈকট্য আর উন্নতি পরিবহন ব্যবস্থার দরুন পিট্‌স্‌বার্গ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইস্পাত নগরী। বন্দর ব্যবস্থার সুযোগসুবিধা ব্যবহার করে অতলান্ত মহাসাগরের তীরেও নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি নগরে ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠেছে। প্রয়োজনীয় লোহার কিছুটা এরা চিলি, পেরু, কানাডা প্রভৃতি দেশ থেকে আমদানি করে। [বি: দ্র: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানচিত্র সঙ্গে রেখে পড়বেন।] বর্তমানে পিট্‌সবার্গ, হ্রদ অঞ্চল, পেনসিলভানিয়া ও বার্মিংহাম — এই চারটি আমেরিকার প্রধান লৌহ-ইস্পাত অঞ্চল।

রুশ যুক্তরাজ্য

রাশিয়ায় যথেষ্ট কয়লা এবং লোহা থাকা সত্ত্বেও লৌহ-ইস্পাত শিল্পের তেমন কোনও উন্নতি হয়নি। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে বিভিন্ন পাঁচসালা পরিকল্পনায় সোভিয়েট দেশে লৌহ-ইস্পাত শিল্পের অভাবনীয় বিকাশ ঘটে। বর্তমান রুশদেশে নিম্নোক্ত অঞ্চলগুলি এই শিল্পের জন্য বিখ্যাত ঃ

(১) ইউরাল অঞ্চল — এখানে রুশ যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে বেশি ইস্পাত তৈরি হয়। এখানে লৌহখনিগুলির কাছেই বেশির ভাগ কারখানায় অন্য জায়গা থেকে কয়লা এনে ইস্পাত প্রস্তুত হয়। সবচেয়ে বড় ইস্পাত কল হচ্ছে ম্যাগনিটোগরস্ক। [পরিবহনের দোলননীতির ফলে সাইবেরিয়ার যে কুজনেৎস্ক অঞ্চল থেকে কয়লা আনা হত, সেই কয়লাবাহী গাড়িগুলিই ইউরাল থেকে লোহা নিয়ে কুজনেৎস্ক অঞ্চলে আরেক ইস্পাতকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেছে।] রাশিয়ার $\frac{১}{৪}$ ইস্পাত ইউরাল অঞ্চলে তৈরি হয়।

(২) মস্কো অঞ্চল — ইউক্রেনের কয়লা-লৌহের সাহায্যে এখানেও ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠেছে। মস্কো, টুলা, গোর্কি প্রভৃতি শিল্পনগরী রয়েছে এই অঞ্চলে।

(৩) পশ্চিম সাইবেরিয়া — সোভিয়েট আমলে পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসরণের ফলে দূর প্রাচ্যেও লৌহ-ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠেছে (যেমন স্থানীয় কয়লা-লৌহের সাহায্যে বৈকাল হ্রদ এলাকায় এবং কুজনেৎস্ক এলাকায়)।

উপরোক্ত অঞ্চলগুলি ছাড়াও ইউরোপীয় রাশিয়ার উত্তরাংশে, উত্তর ককেশাস এবং পূর্ব সাইবেরিয়াতেও ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠেছে।

ইউক্রেন

রুশ সংযুক্ত জোটের ইউক্রেনে একাধিক স্থানে উচ্চমানের কোক কয়লা এবং উচ্চমানের লোহা থাকার ফলে ইস্পাত শিল্প দারুণভাবে গড়ে উঠেছে (যথা নীপার পেট্রোভস্ক ও স্ট্যালিনো)। তদুপরি ডন ও নীপার নদী দিয়ে সুলভ পরিবহনের সুযোগ। আবার কোথাও আছে জলশক্তির সহজলভ্যতা। শিল্প স্থানীয়করণের জন্য প্রয়োজনীয় এতগুলি উপাদান অন্য কোনও রুশ রাষ্ট্রে নেই।

জার্মানি

রূঢ় অঞ্চলেই জার্মানির মোট ইস্পাত উৎপাদনের প্রায় ৭০% কেন্দ্রীভূত। রূঢ় উপত্যকায় উচ্চমানের কয়লার লভ্যতা, দেশের মধ্যেই পণ্যের ভাল বাজার, নদী দিয়ে মাল পরিবহনের ভাল ব্যবস্থা, দক্ষ শৃঙ্খলাপরায়ণ শ্রমিক এবং উন্নত প্রযুক্তি জার্মান ইস্পাত শিল্পকে সম্ভ্রান্ত করে তুলেছে। [বি: দ্র: কলকাতা-হাওড়া সংযোগকারী রবীন্দ্রসেতু নির্মাণে প্রধানত জার্মান প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছিল।]

ভারতবর্ষ

ভারতের শিল্পায়নে লৌহ-ইস্পাত শিল্পের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে এই শিল্প ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। জামশেদপুরে ছিল টাটা কোম্পানি (১৯১১) বা TISCO, আসানসোলের কাছে বার্নপুরে ছিল ভারতীয় লৌহ-ইস্পাত কোম্পানি (১৯১৮) বা ISCO, যে দুটিই ছিল বেসরকারি উদ্যোগের। মহীশূরের ভদ্রাবতীতে সরকারি মালিকানাধীন বিশ্বেশ্বরায়া ইস্পাত কোম্পানি (১৯২৩) বা VSL। বার্নপুর পরবর্তীকালে সরকারি ক্ষেত্রে চলে আসে। স্বাধীনতার পর সরকারি উদ্যোগে একে একে দুর্গাপুর, ভিলাই, রাউরকেল্লা, বোকারো, সালেম, বিশাখাপত্তনম, এবং যৌথ উদ্যোগে কর্ণাটকের বিজয়নগরে ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য বেসরকারি উদ্যোগের ইস্পাত কলও পরে আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (যেমন মুকুন্দ ইস্পাত) তদুপরি রয়েছে (জগদীশপুর উত্তরপ্রদেশ) ঊষা গোষ্ঠীর মালবিকা ইস্পাত, ইসার গোষ্ঠীর ইসার গুজরাত, ইত্যাদি। সরকারি ক্ষেত্রের ইস্পাত কেন্দ্রগুলি ভারতীয় ইস্পাত কর্তৃপক্ষ (Steel Authority of India) নামক কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাধীন। ১৯৯০ সালের নয়া অর্থনীতির ফলে ইস্পাত নির্মাণের দুয়ার বেসরকারি উদ্যোগের জন্য আবার খুলে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে দেশের প্রয়োজনের অধিকাংশ আমাদের লৌহ-ইস্পাত শিল্প মেটাতে সক্ষম। বিশেষ শ্রেণীর কিছু ইস্পাত আমদানি করলেও ভারত ইস্পাত রপ্তানিও করে।

[বি: দ্র: ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু হওয়ার পরে এক শিল্পনীতি ঘোষণা করে ভারত সরকার কয়েকটি শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের বিষয়টি পুরাপুরি সরকারের ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। লৌহ-ইস্পাত শিল্প ছিল এদের অন্যতম।]

ভারতের বিশিষ্ট ইস্পাত কেন্দ্রগুলির পরিচয়

টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি (TISCO), ১৯১১ — ভারতের সর্বপ্রথম আধুনিক ইস্পাত কারখানা, উদ্যোগ বেসরকারি অবস্থান বিহারের সাকচি যার বর্তমান নাম প্রতিষ্ঠাতা জামশেদজী টাটার স্মৃতিতে জামশেদপুর (রেলস্টেশনের নাম টাটানগর)।

বিশ্বেশ্বরাইয়া আয়রন অ্যান্ড স্টিল লি ঃ (VISL), ১৯২৩ — ভারতের এথম সরকারি ইস্পাত কল (ভদ্রাবতী, কর্ণাটক)

ভিলাই সরকারি ইস্পাত কারখানা — ১৯৫৯ সালে সাবেক সোভিয়েট সরকারের প্রায়োগিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত (মধ্যপ্রদেশ)

দুর্গাপুরে সরকারি ইস্পাত কারখানা, ১৯৫৯ (পশ্চিমবঙ্গ) — ব্রিটিশ কারিগরি সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত, কয়লা বলয়ের অতি কাছে, লৌহ খনির অনতিদূরে।

রাউরকেল্লা সরকারি ইস্পাত কারখানা (১৯৬৫, উড়িষ্যা) — জার্মান প্রযুক্তি সহায়তায় স্থাপিত।

বোকারো সরকারি ইস্পাত কারখানা (১৯৭৩, বিহার) — রুশ কারিগরি সহায়তায় স্থাপিত।

বিশাখাপত্তনম সরকারি ইস্পাত কারখানা (১৯৮২ অন্ধ্র) — বন্দরভিত্তিক।

সালেম সরকারি ইস্পাত কারখানা (১৯৮২, তামিলনাড়ু) — বাসনপত্র এবং আসবাবের জন্য উৎকৃষ্ট কলঙ্কবর্জিত ইস্পাতের প্রস্তুতকারক।

৩.৩.২ কার্পাস বয়ন শিল্প (অকৃত্রিম কাঁচামাল ব্যবহারকারী) (Cotton Textile Industry)

পুরাকালে লোকে গাছের ছাল এবং পশুচর্ম পরে লজ্জা ও শীত নিবারণ করত। পরে মানুষ তুলা (কার্পাস) থেকে কাপড় তৈরি করতে শেখে। এখনও ভারত ও অন্যান্য অনেক অনগ্রসর দেশে হস্তচালিত তাঁত ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে পুরানো ঢাকার মসলিন এবং কেরালার কেলিকো কাপড়ের নাম উল্লেখ্য। বিলেতে অষ্টাদশ শতকে যান্ত্রিক সুতাকাটা এবং বস্ত্রবয়নের প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হলে এক শিল্পবিপ্লব ঘটে যায়। ফলে সেখানেই বৃহদায়তন কার্পাস বয়ন শিল্পের গোড়াপত্তন হয়। পরে অবশ্য আমেরিকা, ভারত, চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশেও কার্পাস বয়ন শিল্প ছড়িয়ে পড়ে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী তুলাবস্ত্র বয়নের ক্ষেত্রে অগ্রণী দেশগুলি হল ভারত (১ম), চীন (২য়), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৩য়), রাশিয়া (৪র্থ), জাপান (৫ম) এবং দক্ষিণ কোরিয়া (৬ষষ্ঠ)। কার্পাসবস্ত্র তৈরিতে তিনটি পর্যায় আছে — (১) সুতাকাটা, (২) কাপড়বোনা এবং (৩) কাপড়ে রং চড়ানো। তিনটি পর্যায়কেই রাখা হয়েছে এমন কলও যেমন আছে, তেমনি আছে নিছক সুতাকাটার কলও।

[বি: দ্র: আমরা 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র' শব্দগুচ্ছের বদলে আমেরিকা শব্দটি মাঝে মাঝেই ব্যবহার করছি, যেমনটি করে খবরের কাগজগুলি। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে সাবেক সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (USSR) ভেঙে গিয়ে আয়তনে অপেক্ষাকৃত ছোটো এক স্বাধীন রাষ্ট্রজোট (Commonwealth of Independent States) প্রতিষ্ঠিত হয়, যেটা সমাজতান্ত্রিক নয়। তার মধ্যে প্রধান দেশ রাশিয়া।]

তুলা (কার্পাস) বয়নশিল্পের প্রধান কাঁচামাল। তুলার ওজন খুব কম এবং তুলা একটি ওজনরক্ষী কাঁচামাল বলে

সর্বত্র তুলাবলয়ে এই শিল্প স্থানীয়কৃত হয়নি। আমেরিকা, ভারত, চীন ও রুশ যুক্তরাজ্যে প্রধানত তুলা বলয়েই বয়নশিল্প গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে বিলেত, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে দূরস্থান থেকে তুলা আমদানি করে বয়নশিল্প বিকশিত হয়েছে। জাপানে তো বলতে গেলে তুলাই হয় না। অথচ জাপানই বিশ্বে তুলাবস্ত্র রপ্তানিকারী দেশগুলির মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। আমেরিকায় মজুরি এই শিল্পের স্থানিকতার চিত্র পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে কৃত্রিম অ-কার্পাস সুতার আবির্ভাব, যার ব্যবহার গোটা দুনিয়া জুড়েই বেড়ে চলেছে।

বিশ্বের বিশিষ্ট কার্পাসবয়নকারী দেশগুলি ঃ

ভারতবর্ষ — ইংরেজ শাসনের আগে ভারতের হস্ততাঁতচালিত বস্ত্রশিল্পের পরিচিতি ছিল পৃথিবী জুড়ে। সূক্ষ্ম মসলিন ও কেলিকো কাপড়ের নাম ছিল সুবিস্তৃত। কিন্তু ইংরেজ আমলে বিলেতের ল্যাঙ্কেশায়ারের যন্ত্রচালিত বৃহদায়তন বয়নশিল্পের স্বার্থে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী নানাভাবে ভারতের তাঁতশিল্পের ক্ষতিসাধন করেন, যদিও তাঁরা একে সম্পূর্ণভাবে মেরে ফেলতে পারেননি। স্বাধীন ভারতে ক্ষুদ্রায়তন হস্তচালিত ও অনেক ক্ষেত্রে বিজলিচালিত তাঁতশিল্প গোটা বয়নশিল্পে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। মোট বস্ত্র-উৎপাদনের প্রায় $\frac{১}{৩}$ ক্ষুদ্র তাঁতশিল্পের অবদান। সরকার লুঙ্গি, গামছা, গরদ, মুগার কাপড় প্রভৃতি কিছুসংখ্যক জিনিস তাঁতশিল্পের জন্য সংরক্ষিত করে দিয়েছেন।

বস্ত্রবয়ন শিল্প (বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন মিলে) বর্তমানে ভারতের একটি অগ্রগণ্য শিল্প। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে প্রথমে বোম্বাই (অধুনা মুম্বাই) এবং পরে গুজরাতের আহমেদাবাদ, ব্রোচ, সুরাট প্রভৃতি শহরে বস্ত্রবয়নের কলগুলি একে একে গড়ে উঠে। কাছেই ছিল গুজরাত ও সিন্ধু প্রদেশের কার্পাসবলয়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বৃহদায়তন বস্ত্রশিল্প পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। তুলা ওজনরক্ষী কাঁচামাল বলে শুধুমাত্র পশ্চিম ভারতের কার্পাস বলয়েই বয়নশিল্প সন্নিবিষ্ট থাকতে পারেনি। বাজারের নৈকট্য, সুলভ পরিবহন, শক্তিলভ্যতা, মজুরিও এই চিত্রবদলে সহায়তা করেছে। কৃত্রিম সুতিবস্ত্র কার্পাসবয়ন শিল্পের একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কার্পাসবস্ত্রের উৎপাদন কমে যাচ্ছে এবং অনেক কাপড়ের কল কৃত্রিম সুতার কাপড় তৈরিতে চলে যাচ্ছে। কৃত্রিম ও তুলার সুতা মিশিয়ে কাপড়চোপড় তৈরি করাটাই ক্রমে রেওয়াজ হয়ে পড়েছে।

চীন — ভারতের মতো চীনের বস্ত্রবয়ন শিল্পও অত্যন্ত প্রাচীন। ঊনবিংশ শতকে সাংহাই অঞ্চলে আধুনিক বস্ত্রবয়ন শিল্পের গোড়াপত্তন হয়। চীনের উত্তরাংশে ও মধ্যাংশে অধিকাংশ তুলা উৎপন্ন হয় বলে সাংহাই, নানকিং, হাঞ্চাও এবং তিয়েনশান অঞ্চলে অধিকাংশ বয়নকল সংস্থাপিত। সমাজতান্ত্রিক চীনে এই শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। বিশ্বে সর্বাগ্রগণ্য তুলা উৎপাদক দেশ হলেও চীনকে দেশের মানুষের বস্ত্রের বিপুল চাহিদা (চীনের জনসংখ্যা বিশ্বে বৃহত্তম) মেটাতে বিদেশ থেকে তুলা আমদানি করতে হয়।

আমেরিকা — চীন, জাপান, ভারত প্রভৃতি এশীয় দেশগুলিতে বয়নশিল্পের উন্নয়নের আগে পর্যন্ত বিশ্বে আমেরিকা ছিল বয়নশিল্পে সর্বাগ্রগণ্য। উৎকৃষ্ট মানের তুলা, শক্তিসম্পদের প্রাচুর্য, অনুকূল জলবায়ু, বন্দরের নৈকট্য, দক্ষ শ্রমিকের সহজলভ্যতা, উপযুক্ত পরিবহন কাঠামো প্রভৃতি উপাদান আমেরিকার বস্ত্রবয়ন শিল্পকে প্রথমে নিউ ইংলন্ড এবং পরে দক্ষিণ পূর্বে ভার্জিনিয়া থেকে জর্জিয়া পর্যন্ত অঞ্চলে প্রসারিত করে। বর্তমানে আমেরিকার তুলা-বস্ত্রের বৃহত্তম অংশ এই অঞ্চলে তৈরি হয়।

রাশিয়া — ইউরোপীয় রাশিয়ার মস্কো ও আইভানোভো অঞ্চলে যার শাসনাধীনে রাশিয়ার বস্ত্রবয়ন শিল্প গড়ে উঠেছিল। পরে পশ্চিম সাইবেরিয়ার ওমস্ক প্রভৃতি স্থানেও এই শিল্প গড়ে ওঠে।

জাপান — প্রধানত আমদানি করা তুলা (প্রথমে চীন এবং পরে তৎসহ ভারত থেকে) দিয়েই জাপানি বয়নশিল্প গড়ে উঠেছে। রপ্তানি এই শিল্পের প্রধান ধারক বলে বন্দরের কাছাকাছিই বস্ত্রকলগুলি সংস্থাপিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান অর্থনৈতিক এবং বাস্তবিক সব দিক দিয়েই বিধ্বস্ত হয়েছিল। কিন্তু প্রচণ্ড পরিশ্রমের দ্বারা এবং বৈদেশিক সাহায্যের (প্রধানত আমেরিকার কাছ থেকে) গুণে জাপান তার শিল্পোদ্যোগকে আবার প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। চুকিয়ো এবং কেইহানাসিন জাপানের বৃহত্তম বয়নশিল্প কেন্দ্র। তবে ওসাকা অঞ্চলও যথেষ্ট নামী। ওসাকাকে জাপানোর ম্যানচেস্টার বলা হয়।

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য (UK) — তুলাবস্ত্রবয়ন শিল্প (এবং ইস্পাত শিল্প) বিলেতে অষ্টাদশ শতকে শিল্পবিপ্লবে নেতৃত্ব দেয়। বৃহদায়তনে যন্ত্রের সাহায্যে বস্ত্র তৈরি এখানেই প্রথম শুরু হয়। ইংরেজদের বিশ্বজোড়া উপনিবেশগুলি থেকে তুলা এনে অনুকূল'জলবায়ুতে ল্যাঙ্কেশায়ার অঞ্চলে (ম্যানচেস্টার শিল্পনগরী ছিল যার মধ্যমণি) কার্পাসবস্ত্র শিল্প স্থানীয়কৃত হয়। এই বস্ত্রের বাজারও ছিল বিশ্বজুড়ে, বিশেষত ভারত, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশগুলিতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত বিশ্বের মোট বস্ত্ররপ্তানিবাজারের গরিষ্ঠ অংশ ইংরেজদের দখলে ছিল। কিন্তু দুটি বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতি, সাম্রাজ্য হারানো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমেত অনেক দেশে আধুনিক বস্ত্রবয়ন শিল্পের জন্ম ও বিকাশ ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যকে অনেক নীচে নামিয়ে এনেছে। তবে একথা মানতেই হবে যে, একদা ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষে বস্ত্রবয়ন শিল্পের সম্প্রসারণে ইংরেজদের একটা অবদান আছে। [গত শতকের বিশের দশকে প্রবর্তিত দেশীয় শিল্পসংরক্ষণ নীতির দ্বারা ভারতীয় বস্ত্রবয়ন শিল্প যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিল।]

[বি: দ্র: উপরোক্ত নির্মাণকর্ম বা শিল্পগুলির পাঠ নিতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা দেশগুলির রাজনৈতিক এবং প্রাকৃতিক মানচিত্র সামনে রেখে উল্লিখিত অঞ্চল এবং শহরগুলির অবস্থান ভালভাবে জেনে নেবার চেষ্টা করবেন।]

ভারতে তুলাবস্ত্রবয়ন কল সম্পর্কে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান (১৯৯৫)

রাজ্যের নাম	কলসংখ্যা	রাজ্যের নাম	কলসংখ্যা
তামিলনাড়ু	৪৩৮	কেরালা	২৯
গুজরাত	১২০	মধ্যপ্রদেশ	২৬
মহারাষ্ট্র	১২৮	উড়িষ্যা	১৩
অন্ধ্রপ্রদেশ	৬৮	পাঞ্জাব	২২
পশ্চিমবঙ্গ	৪১	দিল্লি	৪
উত্তরপ্রদেশ	৫৫	হিমাচল প্রদেশ	৫
রাজস্থান	৩৪	মণিপুর	১
কর্ণাটক	৪৪	গোয়া	১
হরিয়ানা	১৬	জম্মু ও কাশ্মীর	২
বিহার	৬		
আসাম	৫	পণ্ডিচেরী	৭

উৎস ঃ C. M. I. E

৩.৪ সারাংশ

দেখা গেছে যে, অধিকাংশ শিল্পোন্নত দেশে শিল্পবিশেষের কলগুলি দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে না থেকে অঞ্চল বিশেষে সন্নিবিষ্ট হয়। ব্যাপারটাকে বলা হয় শিল্পের স্থানিকতা (বা একদেশীকরণ)। স্থানিকতার কারণ সম্পর্কে দুটি প্রধান তত্ত্ব হল ওয়েবারের তত্ত্ব এবং লোশের তত্ত্ব। ওয়েবারের তত্ত্বে ন্যূনতম উৎপাদনব্যয়ের নিরিখে স্থানিকতা নির্ণীত হয়। পণ্যোৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের পরিবহন ব্যয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। লোশের মুনাফা সর্বাধিকীকরণ বা বাজার এলাকা তত্ত্ব অনুযায়ী যতখানি পণ্য বিক্রি করলে মুনাফা বৃহত্তম হবে ততখানি পণ্যই বিক্রেতা উৎপাদনের চেষ্টা করবে। বৃহত্তম মুনাফা অর্জন যে আয়তনের বাজারে সম্ভব হয় সেটা আদর্শ বাজার। পরিবহন খরচা এই তত্ত্বে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। আদর্শ বাজারের যত কাছে উৎপাদনকেন্দ্র থাকবে ততই সর্বাধিক লাভের সম্ভাবনা বেশি হবে। মূল কাঁচামালের অবস্থান আদর্শ বাজারের খুব কাছে নাও হতে পারে। সুতরাং কাঁচামালের পরিবহন খরচা লোশতত্ত্বে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। নির্মাণ কর্ম বা শিল্পের দুটি প্রধান শাখা হল লৌহ ইস্পাত শিল্প এবং কার্পাস বস্ত্রবয়ন শিল্প। লৌহ-ইস্পাত শিল্প প্রধানত ওজনবিদায়ী কাঁচামাল (কোক কয়লা ও লোহা) নির্ভর। সুতরাং কাঁচামালের পরিবহন খরচা ইস্পাত উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিশ্বের সর্বত্র কাঁচামালের সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতেই লৌহ-ইস্পাত শিল্প স্থানীয়কৃত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে অবশ্য নানা কারণে কাঁচামালের প্রাপ্তিস্থান থেকে দূরেও ইস্পাত কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। বিংশ শতকের শেষ ভাগে বিশ্বের ইস্পাতোৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে অগ্রণী ছিল চীন, জাপান, আমেরিকা, বিলেত ও জার্মানি। তুলা বা কার্পাস একটি ওজনরক্ষী কাঁচামাল বলে সর্বত্র তুলাবলয়েই বৃহদায়তন বয়নশিল্প গড়ে ওঠেনি। দুনিয়ার বিশিষ্ট তুলাবস্ত্র বয়নকারী দেশগুলি হল ভারতবর্ষ, চীন, আমেরিকা ও রুশ যুক্তরাজ্য।

৩.৫ উত্তরসংকেত

(১) একটি কিংবা দুটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) শিল্পের স্থানিকতা সম্পর্কে প্রচারিত দুটি তত্ত্বের নামোল্লেখ করুন।

(খ) মানব সভ্যতার প্রথম অগ্রগতি কীসের দ্বারা সূচিত হল?

(গ) বিশ্বে কোন দেশে সর্বপ্রথম শিল্পবিপ্লব শুরু হয়?

(ঘ) জল ও খনিজ পদার্থ কোন্ জাতীয় কাঁচামাল?

(ঙ) কাঁচামাল সূচক কী?

(চ) লোশের মতে আদর্শ বাজার কী?

(ছ) যে কোনও শিল্পোদ্যোগের মূল লক্ষ্য কী?

(জ) বিশ্বের দুটি অগ্রণী ইস্পাত উৎপাদনকারী দেশের নাম করুন।

(ঝ) বৃহদায়তন বয়নশিল্পের প্রথম আবির্ভাব কোন্ দেশে?

(ঞ) বিশ্বের দুটি বিশিষ্ট তুলাবস্ত্র উৎপাদনকারী দেশের নামোল্লেখ করুন।

(ট) ভারতের একটি প্রধান কয়লাখনি অঞ্চল এবং একটি বিশিষ্ট ইস্পাত কেন্দ্রের নামোল্লেখ করুন।

(ঠ) কোন্ নগরীকে প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার এবং কোন্ অঞ্চলকে প্রাচ্যের ল্যাঙ্কেশায়ার বলা হয়?

(২) আলফ্রেড ওয়েবারের ন্যূনতম উৎপাদন ব্যয় তত্ত্ব সংক্ষেপে পর্যালোচনা করুন।

(৩) অগাস্ট লোশের মুনাফা সর্বাধিকীকরণ তত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

(৪) লৌহ-ইস্পাত শিল্পের স্থানিকতা বিকাশের প্রথম পর্যায়ে যেরকম ছিল পরবর্তী পর্যায়ে সেরকম হয় নি কেন?

(৫) পৃথিবীর চারটি বিশিষ্ট ইস্পাত প্রস্তুতকারী দেশের বিবরণ দিন।

(৬) ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জাপানের তুলাবস্ত্রবয়ন শিল্প সম্পর্কে যা জেনেছেন সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করুন।

(৭) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

(ক) লোহা একটি ———— কাঁচামাল।

(খ) কাঁচামাল সূচক ১-এর বেশি হলে শিল্পটি ———— কাছাকাছি গড়ে উঠবে।

(গ) অতি সম্প্রতি ———— বিশ্বের সর্বাগ্রগণ্য তুলাবস্ত্র প্রস্তুতকারী দেশ।

(ঘ) ওয়েবার তত্ত্বের একটি ফলশ্রুতি হল পরিবহনের ————।

(ঙ) জার্মানির———— অঞ্চল ইস্পাত শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

(চ) ভারতের সর্বপ্রথম ইস্পাত নগরীর নাম ————।

(ছ) ভারতের ———— রাজ্যে সর্বাধিক তুলাকল রয়েছে।

(জ) যে দেশে সর্বপ্রথম বৃহদায়তন তুলাবস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয় তার নাম ————।

(৮) নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে ভুল শুধরে লিখুন ঃ—

(ক) বিলেতের বার্মিংহাম নগর তুলাবস্ত্রবয়ন শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

(খ) কোক কয়লা একটি ওজনরক্ষী কাঁচামাল।

(গ) খড়্গাপুরে পেট্রোকেমিকেল প্রকল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গের বক্রেশ্বরে একটি ইস্পাত প্রকল্প সংস্থাপিত হয়েছে।

(ঙ) দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত।

(৯) নিম্নোক্ত স্তম্ভ দুটির শব্দগুচ্ছের মধ্যে সঠিক যোগাযোগ চিহ্নিত করুন ঃ

শিল্প স্থানীয়করণ তত্ত্ব	আমেদাবাদ
রাঢ় অঞ্চল	লোহা
ওজনবিদায়ী কাঁচামাল	ইস্পাত উৎপাদন
কার্পাস বস্ত্রবয়ন	লোশ

৩.৬ উত্তর সংকেত

(১) (ক) নিজে চেষ্টা করুন। (খ) প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে। (গ) বিলেতে (ঘ) জল সর্বত্রলভ্য এবং খনিজ স্থানীয়কৃত কাঁচামাল। (ঙ) অনুচ্ছেদ ৩.২.১ দেখুন। (চ) অনুচ্ছেদ ৩.২.২ দেখুন। (ছ) সর্বাধিক মুনাফা, (জ) অনুচ্ছেদ ৩.৩.২ দেখুন। (ঝ) নিজে চেষ্টা করুন। (ঞ) চীন ও ভারতবর্ষ। (ট) ঝরিয়া (কয়লা) এবং জামশেদপুর (ইস্পাত) (ঠ) জাপানের ওসাকাকে প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার এবং ভারতের আমেদাবাদকে প্রচ্যের ল্যাঙ্কেশায়ার বলা হয়।

(২) ৩.২.১ দেখুন।

(৩) ৩.২.২ দেখুন।

(৪) ৩.৩.১ দেখুন।

(৫) ৩.৩.১ দেখুন।

(৬) ৩.৩.২ দেখুন।

(৭) (ক) ওজন বিদায়ী (খ) কাঁচামালের (গ) ভারতবর্ষ (ঘ) দোলননীতি (ঙ) রূঢ় (চ) জামশেদপুর (ছ) তামিলনাড়ু (জ) বিলেত (ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য)

(৮) প্রত্যেকটি নিজে চেষ্টা করে লিখুন —

(৯) শিল্প স্থানীয়করণ তত্ত্ব → লোশ

রূঢ় অঞ্চল → ইস্পাত উৎপাদন

ওজনবিদায়ী কাঁচামাল → লোহা

কার্পাস বস্ত্রবয়ন → আমেদবাদ

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১. তরুণ বন্দোপাধ্যায় ও গৌতম মল্লিক, **অর্থনৈতিক সম্পদ সমীক্ষা** (১৯৯৮), ছায়া প্রকাশনা, কলি-৯

২. সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, **সম্পদ সমীক্ষা** (১৯৯৮), ইন্ডিয়ান প্রোগেসিভ পাবলিশিং কোম্পানি, কলি-৭

৩. অজিতকুমার শীল, **সম্পদ সমীক্ষা** (১৯৯৮), শ্রীধর পাবলিশার্স, কলি-৬

৪. A. K. Datta Gupta, **Resource Study** (1993), New Central Book Agency, Cal-9

৫. A. Mitra, **Resource Studies** (2000), Sreedhar Publishers.

একক ৪ ❑ সম্পদ-হ্রাস ও সম্পদ-সংকট (Resource Depletion and Resource Crisis)

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ প্রাকৃতিক সম্পদের অত্যধিক ব্যবহার

৪.৩ সম্পদ-হ্রাস ও পরিবেশ বিনাশ

৪.৪ অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সীমাবদ্ধতা

৪.৪.১ মেডোসদের প্রতিবেদন ও তার সমালোচনা

৪.৫ ধারণযোগ্য উন্নয়ন

৪.৬ ভারতের সম্পদ-পরিবেশ সমস্যা

৪.৭ সারাংশ

৪.৮ অনুশীলনী

৪.৯ উত্তর সংকেত

৪.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন —

- সম্পদের ক্রমাগত হ্রাসের কারণসমূহ ও পরিণাম ;
- সম্পদের অতি ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব ;
- সম্পদ-হ্রাস ও পরিবেশ বিনাশের পারস্পরিক সম্পর্ক ;
- পরিবেশ দূষণের ধারণা;
- অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে মেডোসদের প্রতিবেদন।

৪.১ প্রস্তাবনা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শৈশবেরও আগে মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে ছিল খুবই কম। তখন মানুষ প্রকৃতিকে ব্যবহার করতে শেখেনি। কাঁচা ফলমূল আর মাংস খেয়ে যারা বেঁচে থাকত নগ্ন দেহে, তাদের প্রাকৃতিক

সম্পদের চাহিদা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাই সেই সময়ে মানুষের চাহিদার তুলনায় প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান ছিল অনেক বেশি। দূষণ সমস্যাও ছিল না, কেন না মানুষের উৎপাদন এবং ভোগকর্মের ফলে যেটুকু বর্জ্য নানারূপে উৎপন্ন হত সেটা পরিবেশ সহজেই হজম করে নিত। [হজম করবার এ ধরনের একটা ক্ষমতা পরিবেশের আছে, যদিও তার একটা সীমা আছে।] বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে মানুষ জল, মাটি, খনিজ, অরণ্য প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে নিজেদের নানা প্রয়োজন মেটাতে শিখল। প্রয়োজনের সংখ্যাও সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে বেড়ে চলল (যেমন হাঁটার বদলে যানে চড়ে কর্মস্থলে যাওয়ার তাগিদ), যার ফলশ্রুতি হল বিভিন্ন যানবাহনের আবিষ্কার, উৎপাদন ও ব্যবহার, এবং তজ্জন্য আরো প্রাকৃতিক সম্পদ — লোহা, কাঠ, ইত্যাদি উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হতে লাগল। এভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা বাড়তে বাড়তে দেখা গেল যে, কোনও কোনও প্রাকৃতিক সম্পদ কোনও কোনও অঞ্চলে চাহিদার তুলনায় কম হয়ে যাচ্ছে। যথা ভাল চাষের জমি। অন্যদিকে খনিজ উত্তোলন ও ব্যবহার, অতিরিক্ত বনচ্ছেদন প্রভৃতি কর্মের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের অবনয়নও ঘটতে লাগল। এভাবে সম্পদ-পরিবেশের দ্বৈত সমস্যার উৎপত্তি হল মানুষের বিভিন্ন উৎপাদন এবং পণ্যভোগ কর্মের ফলশ্রুতি হিসাবে। অপূরণীয় প্রাকৃতিক সম্পদগুলি অত্যধিক ব্যবহারে অদূর ভবিষ্যতে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে এমন সম্ভাবনার কথা বৈজ্ঞানিকেরা বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পেরোবার আগেই বলতে শুরু করলেন। মানুষ এবং অন্যান্য জীবন সম্পন্ন প্রাণীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর পরিবেশ বিনাশের কথাও একই সঙ্গে উচ্চারিত হতে থাকল। মানবসভ্যতা একবিংশ শতকে এক কঠিন সংকটের সম্মুখীন হবে এমন আশঙ্কার কথা কোনও কোনও মহলে প্রকাশ পেল। এ সম্পর্কে এবার আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনা করব।

৪.২ প্রাকৃতিক সম্পদের অত্যধিক ব্যবহার

প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের কথা আগের অনুচ্ছেদেই বলা হয়েছে। আদি মানবের চাহিদা এত কম ছিল যে, প্রকৃতির উপর তাকে কোনও চাপ সৃষ্টি করতে হয়নি। প্রকৃতি নিজে থেকেই যা দিয়েছে তাতেই সে প্রাণ বাঁচিয়েছে। তদুপরি মানবজাতির লোকসংখ্যাও ছিল খুব কম। মানুষ যখন প্রথম জমিকর্ষণ শুরু করে তখন বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৫০ লক্ষের বেশি ছিল না বলে বিজ্ঞানীদের অনুমান। ১৮২০ নাগাদ সেই সংখ্যা বেড়ে হয় ১০০ কোটি। মধ্যবর্তী সময়ে কিন্তু মানুষের মাথাপিছু ভোগসামগ্রীর চাহিদা সভ্যতার বিবর্তনে অনেক বেড়ে গেছে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের মারফত। [ব্যাপারটা অনেকটা এইরকম ঃ একটা জায়গায় যদি ১০ জন মানুষ থাকে এবং তারা প্রত্যেকে ২টা করে কাপড় পরে তাহলে মোট ১০ × ২ = ২০টা কাপড় তৈরি করতে হয়। এবার যদি মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২০, তবে মাথাপিছু ২টি করে কাপড়ের চাহিদা হলে ২০ × ২ = ৪০টা কাপড় তৈরি হবে। কিন্তু ২০টা কাপড় তৈরি করতে একাধিক প্রাকৃতিক সম্পদ যতখানি লাগবে, ৪০টা কাপড় তৈরি করতে লাগবে তার দ্বিগুণ প্রাকৃতিক সম্পদ। দেখা গেল যে, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন না ঘটলেও শুধুমাত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধির হেতু প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা বাড়ে। ফলে সম্পদ আহরণ এবং ব্যবহার কর্মের পরিধি বাড়ে। কিন্তু যদি জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ফলে প্রতিটি মানুষ মাথাপিছু ২টির পরিবর্তে ধরুন ৮টি কাপড় একই সময়ে, ধরুন ফি বছর, ব্যবহার করতে চান, তবে ৪০টার বদলে ৪০ × ৪ = ১৬০টা কাপড় তৈরি করতে হবে ফি বছর। সুতরাং প্রাকৃতিক সম্পদ ভাণ্ডারের উপরে চাপ আরো বেড়ে যাবে]। ১৮২০ সালের পর থেকে বিশ্বের জনসংখ্যা খুবই উচ্চহারে বেড়েছে। ১৯৯৯ সালে নাগাদ বিশ্ব জনসংখ্যা প্রায় ৬০০ কোটি ছিল। এই বৃদ্ধির হার আবার স্বল্পোন্নত এবং অতি দরিদ্র দেশগুলিতে সমুন্নত দেশগুলির চেয়ে বেশি।

গত শতাব্দীর ষাট এবং সত্তরের দশকে বিশ্ব অর্থনীতির উৎপাদন বৃদ্ধি ছিল অভাবনীয়। পাশাপাশি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ২ শতাংশ এবং নানাবিধ পণ্য-পরিষেবার চাহিদা বৃদ্ধির হার (যা কিনা জনসংখ্যার বৃদ্ধির অন্যতম ফল) ছিল প্রায় ৪ শতাংশ ফি বছর। সঙ্গে রয়েছে উন্নত জীবনমানে চাহিদার বৈচিত্র্যবদল। এইসব কিছুর ফলশ্রুতি হল প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি। কিন্তু পৃথিবীর সম্পদ-ভাণ্ডার তো অফুরান নয়, যদিও এককালে এ জাতীয় একটা ধারণা সাধারণ মানুষের গরিষ্ঠ অংশের মনে বদ্ধমূল ছিল। [এখনও ভারতে বহু মানুষ মনে করেন যে, ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ ভাণ্ডার অফুরান এবং সেটা ১০০ কোটি মানুষকে খাইয়ে পরিয়ে সুখে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট।] সত্তরের দশক থেকেই তাই অনেক মহলে কথা উঠেছে যে, বিশ্বের মোট প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতার নিরিখে বর্তমান ব্যবহারের হার অত্যধিক। যদি এই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে, অর্থাৎ আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের হারবৃদ্ধি কমাবার চেষ্টা না করি, তাহলে একবিংশ শতক পেরোবার আগেই একাধিক খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এই অভিমতের প্রথম যুক্তিভিত্তিক উপস্থাপনা হয় ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বৃদ্ধির সীমানা (Limits to Growth) শীর্ষক এক প্রতিবেদন বা রিপোর্টে, যা তৈরি করেছিলেন আমেরিকার এক বিজ্ঞানী গোষ্ঠী।

৪.৩ সম্পদ-হ্রাস ও পরিবেশ বিনাশ

স্থিরহারে (exponential) উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ ভাণ্ডারের উপর চাপ পড়ছে, বিশেষত অপূরণীয় সম্পদ ভাণ্ডারের উপর। এতে অপূরণীয় সম্পদগুলি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনার কথা বিজ্ঞানী মহলে বহু আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। চাঁদে অবতরণের আগে পর্যন্ত অনেকে ভাবতেন যে, চাঁদে যাওয়া সম্ভব হলে বহু মানুষ চন্দ্রলোকে গিয়ে বসবাস করবেন। ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠের জনসংখ্যার চাপ কিছুটা কমবে, চাপ কমবে পৃথিবীর সম্পদ ভাণ্ডারের উপর থেকেও। চাঁদ থেকে মূল্যবান খনিজ পৃথিবীতে এনে এখানকার ক্রমহ্রাসমান সম্পদভাণ্ডারকে আবার ভরিয়ে তোলাও সম্ভব হবে। সুতরাং তেমন কোনও সম্পদ-সমস্যা পৃথিবীতে থাকবে না। কিন্তু ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে চাঁদে অবতরণের পর আমরা বুঝে গেলাম যে, পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও এই মানবজাতির বেঁচে থাকা সম্ভবপর নয়। সুতরাং, এই পৃথিবী গ্রহে প্রাকৃতিক সম্পদ আছে তা নিয়েই আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটাতে হবে।

সম্পদ হ্রাসের ব্যাপারটা, শুধুমাত্র অপূরণীয় সম্পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অতিব্যবহারে পূরণীয় সম্পদের ভাণ্ডারেও টান পড়ছে। অতিকর্ষণে চাষজমি বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, অতি মৎস্য সংগ্রহে মৎস্যচারণক্ষেত্রে মাছের সংখ্যা কমে গেছে (১৯৭০ এর অব্যহতি পরে), অতি গোচারণে চারণ ক্ষেত্র ক্রমে তৃণবিহীন মরুতে রূপান্তরিত হয়েছে, অতি বৃক্ষছেদনে বনভূমি ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেছে বিশ্বের অনেক বলয়ে। আসলে পূরণীয় সম্পদ ভাণ্ডার অটুট থাকার একটা শর্ত আছে। সেটা হল ঃ ব্যবহারের হার প্রাকৃতিক পূরণের হারের চেয়ে বেশি হবে না। যে হারে বনে গাছ কাটা হয় সেই হারে যদি বনে নতুন গাছ না জন্মায়, তবে বন ক্রমশঃ বৃক্ষবিহীন হয়ে যাবেই। যে হারে মাছ ধরা হয়, সেটা যদি স্বাভাবিক মৎসজন্মহারের চেয়ে বেশি হয়, তবে মৎসচারণক্ষেত্রে মাছের সংখ্যা কমবেই। প্রকৃতি পূরণীয় সম্পদ ভাণ্ডারকে অক্ষত রাখবার জন্য সততই সচেষ্ট। কিন্তু ক্রমবর্ধমান মানুষ প্রজাতির পূরণীয় সম্পদের উপর ক্রমশ চাপ বৃদ্ধির জন্য অনেক ক্ষেত্রে সেটি আর হয়ে উঠছে না। ফলে অপূরণীয় (বা অপুনর্ভব) সম্পদ যেমন কমছে, পূরণীয় সম্পদও তেমনি কমছে — কোথাও সেটা বেশি কোথাও কম, এই যা। পূরণীয় সম্পদ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করলেও তার পরিমাণ কমবে

না — এটা ভ্রান্ত ধারণা। সীমিত সংখ্যক পূরণীয় (বা প্রবহমান) সম্পদের ক্ষেত্রেই শুধু এটা সত্য। যেমন সূর্যালোক ও বাতাস। সব পূরণীয় সম্পদই যদি অনন্তকাল পূরণীয় থাকত, তবে তো সম্পদ সমস্যার তীব্রতা অনেকখানি থাকত না। কিছু কিছু অপূরণীয় সম্পদের বিকল্প হিসাবে আমরা কোনও কোনও পূরণীয় সম্পদকে কাজে লাগাতাম। পূরণীয় সম্পদকে তাই দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে — সংকট বলয়স্থিত এবং সংকট বলয়বহির্ভূত। সংকটবলয়স্থিত (critical-zone renewable resource) পূরণীয় সম্পদ হল সেগুলি যেগুলি অতিব্যবহারে পরিমাণে হ্রাস পায় (যথা মৎস্যক্ষেত্র ও অরণ্য। যেগুলি অতিব্যবহারেও পরিমাণে কমে না সেগুলি সংকট বলয় বহির্ভূত পূরণীয় সম্পদ (non-critical-zone renewable resource)। যথা-বাতাস ও সূর্যালোক।

পরিবেশ বিনাশের সমস্যাটা সম্পদ ব্যবহারেরই ফলশ্রুতি। যদি মানুষ কোথাও আগুন না জ্বালাত, যদি মানুষ নির্বিচারে গাছ না কাটত, যদি মানুষ চাষ জমিকে অতিকর্ষণ না করত কিংবা রাসায়নিক সারে ও কীট নিরোধকে বিষাক্ত না করত, ধাতব যন্ত্র উৎপাদন ও ব্যবহার না করত, কয়লাভিত্তিক বয়লার চালু না করত, তেলভিত্তিক যান ও পরিবহন ব্যবস্থায় না ঢুকত, শুধুমাত্র পেশিশক্তি ও পশুশক্তির সাহায্যে পণ্য উৎপাদন করত, তা হলে পরিবেশ সমস্যার সৃষ্টিই হত না। জীবনের মানোন্নয়নই মানুষকে পরিবেশনাশনে বাধ্য করেছে। উৎপাদনে প্রাকৃতিক সম্পদ কমবেশি লাগবেই। উৎপাদন থেকে কিছু বর্জ্য আসবেই। আবার বর্জ্য আসবে পণ্য ব্যবহারের পরে পরিত্যক্ত হলে। মোট বর্জ্যের সামান্য অংশ আবর্তিত (recycled) হয়ে উৎপাদনে ফিরে যায় (যথা পরিত্যক্ত লোহা, তামা ইত্যাদি)। কিন্তু গরিষ্ঠ অংশ পরিবেশে — জল, বাতাস এবং ভূমিতে প্রবেশ করে। কিন্তু পরিবেশ সবটুকু সহ্য বা হজম করতে পারে না। ফলে জল, বাতাস ও ভূমি দুষিত হয়ে মানুষ এবং মাছ, মানুষ এবং অন্যান্য জীবের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। উৎপাদন না বাড়িয়েও উপায় নেই, কেননা যেমন জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে, তেমনি চলেছে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের অক্লান্ত প্রয়াস বিশ্বের সব দেশে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মূলত জনসংখ্যা বৃদ্ধিই পরিবেশ নাশনের জন্য দায়ী।

পরিবেশ বিনাশ এবং পরিবেশ দূষণ এক বস্তু নয়। দূষণ পরিবেশ বিনাশের একটি বিশিষ্ট রূপ মাত্র। পরিবেশ বিনাসকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে হলে আরও কয়েকটি বিষয়কে জানতে হবে। সেগুলি হল ঃ ভূমি বিনাশ, জীববৈচিত্র্য হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বনভূমির দৃশ্য প্রভৃতি আনন্দদায়ক এবং প্রেরণাজ্ঞাপক পরিবেশ সম্পদের পরিমাণ হ্রাস। ভূমিবিনাসের একাধিক রূপ হল ভূমিক্ষয়, শ্যামল মাটির মরুভূমি হওয়া (যেমনটি ঘটেছে সাহারা অঞ্চলে যা কিনা এককালে ছিল রোমক সাম্রাজ্যের শস্যভাণ্ডার), অতি কর্ষণে ভূমির উর্বরতা নাশ এবং সেচের জলের দরুন পৃথিবীর কোনও কোনও অঞ্চলে চাষ জমির লবণ বৃদ্ধি (salination)। মানুষের নানাবিধ আর্থ ক্রিয়াকলাপের ফলে ভূপৃষ্ঠে বহু জীবপ্রজাতি (পশুপাখি) নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং বহু প্রজাতির (ভারতের রয়েল বেঙ্গল ব্যাঘ্র ও গণ্ডারসহ) অস্তিত্ব বিপন্ন। ফলে জীববৈচিত্র্য দ্রুত কমে আসছে। অথচ যে কোনও প্রজাতি একাধিক অন্য প্রজাতিকে এক প্রাকৃতিক ভারসাম্যজনিত (ecological balance) পারস্পরিক জীবনরক্ষা ব্যবস্থায় পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। সুতরাং যে কোনও একটি প্রজাতি ভূপৃষ্ঠ থেকে হারিয়ে গেলে বেশ কিছু সংখ্যক অন্য প্রজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। গাছপালার রোগনাশন ক্ষমতার কথা কে না জানে? অথচ বনবিনাশের ফলে আমরা এদের সংখ্যাও কমিয়ে আনছি। একদা মনে করা হত যে, সূর্য, বাতাস, সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা এবং ঢেউয়ের দ্বারা উৎপন্ন শক্তিপ্রবাহ মানবিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানীদের সেই বিশ্বাস আজ আর নেই। জলবায়ু পরিবর্তনের আশংকা বিজ্ঞানীমহল সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। জলবায়ু বদলের আলোচনায় দুটি বিষয় সবিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। একটি হল **ওজনস্তরের ক্ষতি,** অন্যটি হল **গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া**। এই দুইটি প্রক্রিয়া বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা

বাড়াবে, ফলে ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা বেড়ে গিয়ে এমন এক অবস্থা ভবিষ্যতে আসতে পারে যখন জীবকুলের বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে পড়বে। পৃথিবীকে ঘিরে আছে ওজন গ্যাসের এক স্তর, যা কিনা সূর্য থেকে আগত রশ্মির বেগনিপারের আলোকে শুষে নিয়ে বিকীর্ণ সূর্যালোকের তীব্রতা থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে। কোনও কোনও শিল্পোৎপাদন থেকে নিঃসৃত ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (CFC) এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড উচ্চমণ্ডলের ওজনস্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে আবহাওয়ার উষ্ণতাবৃদ্ধিতে অংশ নিচ্ছে। উষ্ণতাবৃদ্ধির আরও একটি কারণ হিসাবে কাজ করছে গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া (Green house effect)। কিছুসংখ্যক গ্যাসকে গ্রীনহাউস গ্যাস বলে। যথা, কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) ও নাইট্রাস অক্সাইড (NO) । এই গ্যাসগুলি বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে। আমাদের শিল্পোৎপাদন, চাষবাস, কয়লা পোড়ানো ও বিভিন্ন যানবাহনে তেল পোড়ানো থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ক্রমবর্ধমান মাত্রায় বেরিয়ে হাওয়ায় মিশেছে এবং হাওয়ার তাপমাত্রা বাড়াচ্ছে। গাছপালা হাওয়া থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড শুষে নেয়। অতিরিক্ত বনবিনাশের ফলে এই শুষে নেওয়াটা অনেক কমে এসেছে। এভাবে যদি এই গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বেড়েই যেতে থাকে, তবে অচিরে জলবায়ু বদলে যেতে বাধ্য বলে বিজ্ঞানীদের অভিমত। ঘরবাড়ি, কলকারখানা প্রভৃতি নির্মাণের জন্য অরণ্য-সমন্বিত পর্বত, হ্রদ, নদীতীর ও সাগরবেলার মনোরম প্রাণ ও প্রেরণাদায়ী দৃশ্যপটকে আমরা আমূল বদলে দিয়ে বহু মানুষেব শরীর ও মনের স্বাস্থ্যহানি ঘটাচ্ছি। তদুপরি রয়েছে জল, বাতাস ও মাটির দূষণ একাধিক কারণে।

দূষণ — পরিবেশের তিনটি অংশ ঃ জল, বায়ু ও ভূমি। তিনটি অংশই দূষিত হতে পারে এবং হচ্ছে। দূষণ হল কোনও প্রাকৃতিক সম্পদের মনুষ্যকৃত এমন একটি পরিবর্তন যাতে ওই সম্পদের উপকার ক্ষমতা কমে যায় এবং ওই সম্পদ জীবকুলের রক্ষক না হয়ে হন্তারক হয়ে দাঁড়ায়। প্রধানত দূষণ তিন শ্রেণীর — জল দূষণ, বায়ু দূষণ এবং ভূমি দূষণ। জল দূষণের প্রধান কারণগুলি হল: বহিরাগত ধূলো, বালি, কাদা, ফসফেট নাইট্রেট প্রমুখ একাধিক রাসায়নিক পদার্থ, আর্সেনিক ও সীসার দ্রবণ, এবং নানা জাতের ক্ষতিকর জীবাণু। নদীতীরস্থিত কলকারখানার বর্জ্য বিষাক্ত রাসায়নিকগুলি গঙ্গা, দামোদর প্রভৃতি নদীর জলকে বিষিয়ে তুলেছে। বায়ুদূষণের প্রধান কারণগুলি হল ঃ গ্রামাঞ্চলে কাঠ ও কয়লা জ্বালানির ধোঁয়া, শিল্পাঞ্চলে কারখানার নল দিয়ে বেরোনো ধোঁয়া, শহর এবং আধা-শহর এলাকায় পেট্রোল ও ডিজেল চালিত যান থেকে নির্গত ধোঁয়া। ওই ধোঁয়ায় থাকে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মতো গ্রিনহাউস গ্যাস যার আধিক্য স্বাস্থ্যহানিকর। ওই ধোঁয়ায় সালফার-ডাই-অক্সাইডও থাকে, যা থেকে ক্ষতিকর অম্লবৃষ্টি ঘটে যায় বৃষ্টি ও তুষারপাতের দিনে। ধোঁয়া ছাড়াও হাওয়াতে ভাসমান ধূলোবালি এবং নানা জাতের ক্ষতিকর জীবাণু ও ধাতুকণা দূষণ ঘটায়। তদুপরি পরমাণু বিস্ফোরণ এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে নির্গত তেজস্ক্রিয়তাও বাতাসকে সাম্প্রতিককালে দূষিত করছে এবং তার উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে মদত দিচ্ছে। ভূমি দূষণের মুখ্য কারণগুলি হল রাসায়নিক চাষের জন্য মাঠে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, শিল্প ও পৌর এলাকার অস্বাস্থ্যকর বর্জ্যপদার্থ, অম্লবৃষ্টি এবং পরমাণু ব্যবহারের কেন্দ্রগুলি থেকে উৎসারিত তেজস্ক্রিয় বর্জ্য। আজকাল এই সব বর্জ্যকে কিছুটা শোধন করে পরিবেশে নিক্ষেপ করা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এতে তাদের স্বাস্থ্যহানির ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না।

সাম্প্রতিককালে আরো দুই জাতের দূষণ চিহ্নিত হয়েছে। প্রথমটি শব্দদূষণ, দ্বিতীয়টি দৃষ্টিদূষণ। শব্দদূষণ কথাটির সঙ্গে জনাকীর্ণ নগর এবং হাওড়ার মত শিল্পশহরের মানুষজন যথেষ্ট পরিচিত। শব্দদূষণ প্রক্রিয়ায় মানুষের সহনক্ষমতার অতিরিক্ত শব্দধারা বাতাসে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে মানুষের শরীর এবং মন উভয়েরই ক্ষতিসাধন করে। বিমানক্ষেত্রের কাছাকাছি অঞ্চলের মানুষ বিমানের অত্যধিক আওয়াজে সদাই বিব্রত। দৃশ্যদূষণ বলতে বিজ্ঞানীরা শহরাঞ্চলে পাশাপাশি একই ধরনের বাড়িঘর এবং বহুতল দিনের পর দিন দেখার একঘেঁয়েমি থেকে মনের উপর একটা অদৃশ্য চাপকে বুঝিয়েছেন। সরকারি এবং বেসরকারি আবাসনগুলিতে এই ছবিটা প্রায়

সর্বত্র চোখে পড়ে। তাই চণ্ডীগড় নগর পরিকল্পনায় প্রথম থেকেই দৃশ্যদূষণ মনে রেখে ঘরবাড়ি তৈরির প্ল্যান অনুমোদন করা হয়েছে। ফলে সেখানে পাশাপাশি দুটি দালান কখনো দেখতে একরকমের হয়নি।

অবশ্য দূষণের ব্যাপারে প্রকৃতির ভূমিকাও এড়িয়ে যাব না। আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণ এবং ভূমিকম্প হরেক রকমের দূষক পরিবেশে ছড়িয়ে দেয়। প্লেগ প্রভৃতি মহামারী কত লোকের প্রাণহানি করে।

অম্লবৃষ্টি সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে কিছু বলা দরকার, কেন না এটি সাম্প্রতিককালে পরিবেশবিজ্ঞানের একটি বহু আলোচিত প্রসঙ্গ। হাওয়ায় ভাসমান অম্ল (acid) বৃষ্টি, শীতকালীন তুষার ও কুয়াশার মাধ্যমে মাটির উপরে বৃষ্টির মত পড়তে থাকে যখন, তখন এই অম্লপতনকে অম্লবৃষ্টি বলা হয়। এই সব অম্লের মধ্যে অগ্রণী হল সালফিউরিক অ্যাসিড বা গন্ধকী অম্ল। কী করে এই অম্লের কণা বাতাসে আসে? গৃহস্থবাড়ি, যানবাহন এবং কলকারখানায় ব্যবহৃত খনিজ জ্বালানি দহনের ফলে গন্ধক বেরোয়। এই গন্ধক বাতাসে এসে সেখানকার অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে হয় সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO_2)। তারপর আরো একটি স্তর পেরিয়ে বাতাসে ভাসমান জলকণার (H_2O) সংস্পর্শে সেটা বদলে হয়ে যায় সালফার অম্ল (H_2SO_4)। স্তরগুলি নিম্নরূপ ঃ —

$$S+O_2 = SO_2$$

$$SO_2+O = SO_3$$

$$SO_3+H_2O = H_2SO_4$$

এই অম্লবৃষ্টি দ্রুত মরচে পড়ার প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ও যানবাহনের ক্ষতি করে, শস্যক্ষেত্রে শস্যহানি ঘটায়, অরণ্যে বৃক্ষকুলের এবং মৎস্যক্ষেত্রে মৎস্যকুলের অকাল মৃত্যুর কারণ হয়। জার্মানির কৃষ্ণ অরণ্যে (Black Forest) এবং নরওয়ের উপকূলে যথাক্রমে বহু গাছ ও মাছ বিনষ্ট হয়েছিল একসময়ে অম্লবৃষ্টির দরুন।

৪.৪ অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সীমাবদ্ধতা (Limit to Growth)

বর্তমান এককে এই পর্যন্ত যা আলোচিত হল তাতে একটা ধারণা শিক্ষার্থীর মনে নিশ্চয়ই জন্মে গেছে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির (বা আর্থ বিকাশের) সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে। উৎপাদন বৃদ্ধিই আর্থ বিকাশের মূল স্তম্ভ।

উৎপাদন = f (প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি)

সংস্কৃতি যতই উৎপাদন সহায়ক হোক না কেন, প্রযুক্তি যতই প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োগ ন্যূনতম করতে সচেষ্ট হোক না কেন, প্রাকৃতিক সম্পদকে একেবারে বাদ দিয়ে এখনও উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না। এটা ঠিক যে বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে ক্রমদুর্লভ প্রাকৃতিক সম্পদের বিকল্প উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং সমুন্নত দেশগুলিতে প্রাকৃতিক সম্পদের বদলে মানুষের তৈরি সম্পদ (বা মূলধন) ক্রমশ বেশি অনুপাতে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু এতে আবার পরিবেশ দূষণ ঘটছে বেশি, কেননা উন্নতমানের প্রযুক্তি পুরনো প্রযুক্তির চেয়ে অনেক বেশি পরিবেশ-হন্তারক হয়ে দেখা দিয়েছে। কাঠের বিকল্প বিষাক্ত প্লাস্টিক উৎপাদন। ভোগ অন্তে পরিবেশে (জলে কিংবা মাটিতে কিংবা পুড়িয়ে বাতাসে) পরিত্যক্ত হলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। অন্যদিকে আমরা যদি প্রাকৃতিক সম্পদ-প্রধান পরিবেশ সহায়ক উৎপাদন পদ্ধতিকে না ছাড়তে পারি, তাহলে অপূরণীয় প্রাকৃতিক সম্পদগুলি একদিন অদূর ভবিষ্যতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে, পূরণীয় সম্পদগুলিও অতি ব্যবহারে ক্রমশ ফুরিয়ে

যাবে। বিজ্ঞান যদি এই সমস্যার সমাধান করতে না পারে, তা হলে যেনতেন উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য থেকে আমাদের সরে আসতেই হবে। প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতাই আর্থবিকাশের সীমারেখা টেনে দেবে। কিন্তু বিশ্বের জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদনবৃদ্ধি যদি না ঘটানো যায়, তবে দরিদ্র দেশগুলিতে দারিদ্রমোচন হবে কী করে? এটাই আজকের দুনিয়ায় বিজ্ঞানীদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার বিষয়। স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সমুন্নত দেশগুলির চেয়ে বেশি (বার্ষিক প্রায় ২.৫ ও ১.০০ শতাংশ যথাক্রমে)।

[বি: দ্র : শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, ইংরাজি economic growth কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে একাধিক শব্দ ব্যবহার করেছি। যথা — অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও আর্থ বিকাশ।]

৪.৪.১ মেডোসদের প্রতিবেদন এবং তার সমালোচনা

মেডোসদের প্রতিবেদন (বা রিপোর্ট) — আমেরিকার এম-আই-টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাব অফ রোম নামক এক সংস্থার দ্বারা নিযুক্ত একদল বিজ্ঞানী ডি-এল মেডোসের নেতৃত্বে গবেষণা চালিয়ে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন, যার শিরোনাম ছিল 'বৃদ্ধির সীমানা' (Limits to growth)। এই প্রতিবেদনে বলা হয় যে, পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি (জনসংখ্যা, কৃষি উৎপাদন, শিল্পায়ন, পরিবেশ দূষণ এবং অপূরণীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার) একে অন্যকে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় প্রভাবিত করে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করতে চলেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে — একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে — পৃথিবীর জীবন ব্যবস্থাকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেবে। মানবসভ্যতা হবে এক মহাসংকটের সম্মুখীন। জনসংখ্যাবৃদ্ধি কৃষিজ উৎপাদন এবং শিল্পোৎপাদন বাড়াতে বাধ্য করছে, কেননা মানুষজনকে খাইয়ে পরিয়ে তো রাখতে হবে। কিন্তু বেড়ে চলা উৎপাদন এবং পণ্য পরিষেবা ব্যবহার (consumption) থেকে নিঃসৃত অস্বাস্থ্যকর বর্জ্য পরিবেশদূষণ ঘটায়। ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের জন্য অপূরণীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার ক্রমশ কমে আসতে থাকে। অপূরণীয় খনিজ শক্তিসম্পদগুলি (কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস) ফুরাতে থাকলে দেখা দেবে প্রচণ্ড শক্তি সমস্যা। পরিবেশ দূষণের ফলে মৃত্যুহার বেড়ে গিয়ে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারকে প্রভাবিত করবে। জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি সমাজ জীবনের সুস্থতা নষ্ট করবে। সামাজিক অনিশ্চয়তা, অপরাধ প্রভৃতি বেড়ে চলবে। কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি অত্যধিক সম্পদ ব্যবহার ঘটালে সম্পদ হ্রাস হয়ে এক সময় উৎপাদন বৃদ্ধির গতিকে স্তিমিত করে দেবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনেক প্রাকৃতিক সম্পদই আর হয়তো থাকবে না। মানবজাতি এক ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়বে। জীবন সেখানে নিরানন্দ ও বিষময় হতে বাধ্য।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে **ক্লাব অফ রোমের** দ্বিতীয় প্রতিবেদন (মেসারোভিক ও পেস্টেলের তৈরি) বের হয়। সেখানে অবশ্য সামান্য আশার আলো ছিল। কেননা বিজ্ঞানীদ্বয় বললেন যে, বিপদটা বিশ্বের সর্বত্র একই সময়ে নেমে আসবে না। কোথাও আসবে আগে, কোথাও পরে। কারণ চাষবাস, শিল্পোৎপাদন, সম্পদ লভ্যতা এবং সম্পদ ব্যবহার বিশ্বের সব দেশে সমান নয়। [যেমন, তেলসমৃদ্ধ দেশগুলিতে তেলের অভাব অদূর ভবিষ্যতে কখনো হবে না।]

১৯৭২ সালে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোম নগরীতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (UNO) উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পরিবেশ সমাবেশেও পরিবেশের অবনতি এবং তার প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল এবং একাধিক সুপারিশও গৃহীত হয়েছিল। স্টকহোম ঘোষণায় অপূরণীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে সংযত হওয়ার আহ্বানও ছিল। সুতরাং বলা চলে যে, মেডোসদের রিপোর্ট এবং স্টকহোম ঘোষণা ছিল একে অন্যের পরিপূরক। সম্পদ-পরিবেশ পাঠের ইতিহাসে **১৯৭২** খ্রিস্টাব্দ একটি বিশিষ্ট সময় হিসাবে চিহ্নিত হবে।

মেডোস প্রতিবেদনের আগে ও পরে প্রকাশিত একাধিক রচনাতেও সম্পদ-পরিবেশ সম্পর্কে, বিশেষত পরিবেশ নিয়ে, দুর্ভাবনা ও আশঙ্কা প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত প্রকাশনাগুলি উল্লিখিত হতে পারে — কার্সনের **সাইলেন্ট স্প্রিং** (Silent spring, 1965), বেরি কমনারের **দি ক্লোজিং সার্কেল** (The Closing Circle, 1971), এবং **Time Table for Disaster** (1973)। সামগ্রিকভাবে মেডোসদের চিন্তাধারা এবং তার সহমর্মী ভাবনাকে **হতাশবাদী মহল** (pessimist) বলে গণ্য করা হয়েছে। মেডোসদের ভবিষ্যদ্বানী ছিল এই যে, তাঁদের সমীক্ষার সময়ে সম্পদ ব্যবহারের যে হার ছিল সেটা যদি বজায় থাকে, তা হলে লৌহভাণ্ডার ৯৩ বছরে, নিকেল ভাণ্ডার ৫৩ বছরে, এলুমিনিয়াম ভাণ্ডার ৩১ বছরে, সীসা আর তামার ভাণ্ডার ২১ বছরে, তেলভাণ্ডার ২০ বছরে, সব দস্তা ১৮ বছরে এবং সব টিন ১৫ বছরে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

মেডোস প্রতিবেদনের সমালোচনা ঃ—

মেডোস প্রতিবেদন নিম্নোক্ত সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। (১) ভূতলে অবস্থিত মোট প্রাকৃতিক সম্পদ-ভাণ্ডার অসীম নয় সেটা ঠিক হলেও প্রতিটি সম্পদের পরিমাণ সঠিক কত সেটা তো জানা যায়নি। উত্তোলন এবং নিষ্কাশন প্রযুক্তির ক্রমোন্নতির ফলে অনেক খনিজ পদার্থের লভ্যতা বেড়ে গিয়েছে এবং যাচ্ছে। সঙ্গে রয়েছে পুনর্ব্যবহার (recycling) ব্যবস্থা, কম্পিউটার ব্যবহার এবং কৃত্রিম উপগ্রহ ভিত্তিক খনিজ সম্পদের লুক্কায়িত অবস্থা জানার বন্দোবস্তের উন্নয়ন। সর্বশেষে রয়েছে নতুন নতুন ধাতুখনি ও তেলক্ষেত্র আবিষ্কার। ফলে লভ্য খনিজ সম্পদগুলির অধিকাংশের যোগানবৃদ্ধির হার ব্যবহার বৃদ্ধির হার থেকে পিছিয়ে নেই। (২) জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ফলে মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদের বিকল্প আবিষ্কার করে সম্পদ সংকট সমস্যার সমাধান করছে। এটি ঘটছে বিশেষভাবে আমেরিকা ও জাপানে। আমেরিকায় সত্তরের দশকের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, বিগত কয়েক দশকে শ্রম ও মূলধনের তুলনায় প্রাকৃতিক সম্পদ ক্রমশ কম মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ উৎপাদনবৃদ্ধির হার কমেনি। (৩) সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলে সম্পদবিশেষের চাহিদা কালক্রমে পরিবর্তিত হয়। তখন সেই সম্পদটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে আসলেও লোকের তাতে কিছুই আসে যায় না। যেমন ধরুন গহনার সোনার চাহিদা। এককালে মেয়েরা গা ভর্তি সোনার গয়না পরতেন, এখন পরেন না। ফলে গয়নার জন্য সোনার চাহিদা এখন আগের মতো তীব্র নয়। একটা যুগে গয়নার জন্য সমুদ্র শঙ্খের দারুণ চাহিদা ছিল। যদি সেটা আজো তেমনটিই থাকত তবে শঙ্খ এত বেশি পরিমাণে সংগ্রহ করতে হত যে, অতিসংগ্রহে সমুদ্রের শঙ্খ সংখ্যা কবে নিঃশেষ হয়ে যেত। (৪) খোলা বাজারে দামযন্ত্র চাহিদা ও যোগানের হেরফের ঘটিয়ে সম্পদ বিশেষের দুষ্প্রাপ্যতার সমস্যাটির সমাধান করতে এগিয়ে আসবে। সম্পদটির যোগান কমে এলে তার দাম বেড়ে চলবে। এই বর্ধিত দামের দরুণ একদিকে চাহিদা কমবে, অন্যদিকে কালক্রমে যোগান ফের বাড়তে পারে। চাহিদা যদি কমে যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে, সম্পদটির বিকল্প পাওয়া গেছে (যেমন চামড়া ও কাঠের বদলে প্লাস্টিক, এবং তামার বদলে অ্যালুমিনিয়াম)। সুতরাং সম্পদটির দুষ্প্রাপ্যতায় কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কালক্রমে যোগান ফের বাড়তে পারে কয়েকটি কারণে। যথাঃ (ক) সম্পদ-সাশ্রয়ী প্রযুক্তি আবিষ্কার (যেমন-স্কুটার ও মোটর সাইকেলে সাম্প্রতিক ইঞ্জিনে আগের চেয়ে তেল অনেক কম লাগে, (খ) এবং নতুন নতুন সম্পদক্ষেত্র চিহ্নিত করণ (যেমন, ভারতের সুন্দরবন এলাকায় মাটির নীচে বিরাট তৈলভাণ্ডারের অস্তিত্ব জানা গেছে)। ভূতলের অপূরণীয় সম্পদ ভাণ্ডারের বেশির ভাগ আজও অনাবিষ্কৃত। সমুদ্রতলেও রয়েছে অনেক মূল্যবান সম্পদ। (৪) পরিবেশদূষণের সমস্যাও উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব বলে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটা সম্ভবও হচ্ছে (যেমন যন্ত্র বসিয়ে জলশোধন)। সুতরাং মানব সভ্যতা বর্তমান শতকের শেষার্ধে এক মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন হবেই এমন ভাবার কোনও অর্থ হয় না। যাঁরা এভাবে মেডোসদের চিন্তাধারার সমালোচনা করেছেন তাঁদের বলা হয়েছে আশাবাদী মহল (Optimist)।

৪.৫ ধারণযোগ্য উন্নয়ন (Sustainable Development)

অত্যধিক হারে উৎপাদনবৃদ্ধির বিপদ সম্পর্কে ১৯৭২ সালে মেডোসদের প্রতিবেদনের পর থেকে উৎপাদনবৃদ্ধি কতখানি হওয়া উচিত সে নিয়ে একটা বিতর্ক চলে আসছে। মেডোস মডেলের অনেক সমালোচনা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি (উন্নয়নের প্রধান সূচক) উত্তরসূরিদের স্বার্থ এবং পরিবেশরক্ষার তাগিদ অন্তত খানিকটা মেনে চলুক এমন একটা ধারণা বিজ্ঞানী সমাজে ঐকমত্য পেয়েছে। সেই ঐকমত্য থেকে জন্ম নিয়েছে ধারণযোগ্য উন্নয়নের ধারণা। এই ধারণার প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় ব্রান্ডল্যান্ড কমিশনের (Brund land Commission) 'আমাদের অভিন্ন ভবিষ্যৎ' (Our Common Future, 1987) শীর্ষক প্রতিবেদনে, যদিও কথাটি তার আগে থেকেই চালু হয়ে গিয়েছিল। ১৯৯২ সালে কানাডার মানিটোবা গোলবৈঠকে স্পষ্ট করে বলা হয় যে, ধারণযোগ্য উন্নয়ন হচ্ছে সম্পদ হ্রাস এবং পরিবেশবিনাশ উভয় প্রক্রিয়াকে ন্যূনতম করতে পারে এমনধারার উন্নয়ন। বর্তমান প্রজন্ম এমনভাবে প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে আর্থবিকাশের কাজে লাগাবে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ থেকে যায়, এবং সম্পদ ব্যবহারের প্রকল্পগুলি পরিবেশনাশক না হয়ে পরিবেশ সহায়ক হয়। এখন বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশের মত ভারতেও নতুন আর্থিক উদ্যোগকে তার পরিবেশ প্রভাব বিচার না করে অনুমোদন দেওয়া হয় না। বিশ্বব্যাঙ্কও কোনও দেশের কোনও উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য আর্থিক সাহায্য দেবার আগে তার পরিবেশ প্রভাবের বিষয়টা ভালভাবে খতিয়ে দেখে। ১৯৭২ সালের পরে আবার ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্ব পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলনে জগতের জীব-বৈচিত্র্য রক্ষার্থে ধারণযোগ্য উন্নয়নের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উন্নয়ন ছাড়া দারিদ্রমোচনও তো সম্ভব নয়।

৪.৬ ভারতের সম্পদ-পরিবেশ সমস্যা

কয়েক বছর আগে এক মার্কিন গবেষক সংস্থা ভারতের প্রধান সম্পদ-পরিবেশ সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করেছিলেন। সেগুলি হল বায়ুদূষণ, অন্তর্দেশীয় নদীনালার এবং উপকূলবর্তী সমুদ্রের জলদূষণ, ভূমি বিনাশ (যার মধ্যে রাজস্থানের মতো কিছু সংখ্যক অঞ্চলে মরুভূমির আগ্রাসনও আছে), বনবিনাশ, অত্যধিক মৎস্য আহরণ এবং বন্য পশুপাখির আবাসস্থানের সংকোচন। বায়ুদূষণের মূল কারণগুলি হল শহর এবং আধা-শহর এলাকায় অপরিকল্পিতভাবে স্থাপিত কলকারখানার ধোঁয়া, ঘনবসতি অঞ্চলে কাঠ-কয়লা-গ্যাসের জ্বালানি ব্যবহার এবং ক্রমবর্ধমান তেলচালিত যানবাহন, গ্রামাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কাঠের জ্বালানি ব্যবহার। বনবিনাশের ফলেও বাতাসে অক্সিজেন কমে গিয়ে তুলনামূলকভাবে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। অন্তর্দেশীয় জলখণ্ডের দূষণের মূল কারণগুলি হচ্ছে গৃহস্থবাড়ির বর্জ্য ও মলমূত্র, কলকারখানা থেকে আগত বিষাক্ত রাসায়নিক, এবং ক্ষেতের রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের নানাভাবে সংলগ্ন নদীখালের জলে অনুপ্রবেশ। তেলচালিত জলযান থেকে নিঃসৃত তেলও অন্তর্দেশীয় জলপথগুলির জলকে দূষিত করছে। উপকূলবর্তী সমুদ্রের জল দূষিত হচ্ছে তেলচালিত নানা জলযানের তেলে, দূরাগত অম্লবৃষ্টিতে এবং নদীবাহিত নানা বিষাক্ত দূষকে। পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গা ও দামোদর নদীর জলদূষণের কথা তো বহুজনবিদিত। ভারতের অন্তত ২০ শতাংশ মাটি বিনষ্ট হয়েছে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, অম্লতা বৃদ্ধি, নিষ্ক্রমণের পথবিহীন বহিরাগত জলের দীর্ঘদিন জমে থাকা (water logging), ভূপৃষ্ঠের ফাটল ধরা এবং ভূমিক্ষয়। বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ভূমিক্ষয়ের ফলে বালুময় মরুতে পরিণত হয় (যা কিনা রাজস্থানে হচ্ছে)। পঞ্চাশ থেকে আশি পর্যন্ত চার দশকে এদেশে বনবিনাশ হয়েছে

ব্যাপকভাবে। কারণগুলি ছিল ঘরবাড়ি আর কলকারখানা নির্মাণের জন্য জঙ্গল সাফাই, জ্বালানি কাঠের জন্য গাছ কাটা, দাবানল এবং গবাদি পশুর খাদ্যসংগ্রহের জন্য অরণ্যের উপর অত্যাচার। অতিরিক্ত পরিমাণে মাছ ধরার কাজ চলেছে অবাধে। বনের পশুপাখির নিবাসগুলি ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে শুধু শিল্পপ্রসার নয়, রাস্তাঘাট, বাঁধ, বিমানক্ষেত্র ইত্যাদি নির্মাণের জন্য বনাঞ্চল সাফাইয়ের ফলেও। ফলে অন্তত ২৫ থেকে ৩০টি প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ার পথে। বাঘ, গণ্ডার, হায়েনা, শিয়াল, কৃষ্ণসার হরিণ প্রভৃতি প্রাণীর সংখ্যা আশংকাজনকভাবে কমে গেছে। কমে গেছে ঘুঘু, মাছরাঙা, হরিয়াল প্রভৃতি পাখির সংখ্যা। একশো বছর আগে কলকাতার আশেপাশে বাঘ দেখা যেত। এখন খোদ সুন্দরবনেও যত্রতত্র বাঘের দেখা মিলবে না। সাম্প্রতিক কালে অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলি সম্পদ সংরক্ষণের এবং পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সচেতনভাবে বিভিন্ন পথ অনুসরণ করে চলেছেন [যা আমরা পরবর্তী এককে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব]। জনগণও সম্পদ ও পরিবেশের সমস্যাগুলি সম্পর্কে ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছেন। পরিবেশ রক্ষণে একটি মহল ক্রমেই শক্তিশালী এবং সোচ্চার হয়ে উঠছেন। বহুমাত্রিক নদীবাঁধ-প্রকল্পগুলির বিরুদ্ধে এই মহলের আন্দোলন কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাঁধ নির্মাণই বন্ধ করে দিয়েছে। নর্মদা বাঁধপ্রকল্পের বিরুদ্ধে পরিবেশবাদীদের লড়াই এখনও অব্যাহত।

৪.৭ সারাংশ

আর্থিক উন্নয়নের মোদ্দা কথা হল মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি। উৎপাদন এবং উৎপাদিত পণ্যের ভোগ (consumption) থেকে বর্জ্য নিঃসৃত হয়ে পরিবেশ দূষণ ঘটায়। অন্যদিকে উৎপাদন বাড়তে থাকলে প্রাকৃতিক সম্পদসহ উৎপাদনের সব উপাদানগুলিকেই বেশি করে ব্যবহার করতে হয়। সাম্প্রতিককালে প্রাকৃতিক সম্পদের অতিব্যবহার হচ্ছে বলে অধিকাংশ বিজ্ঞানীর অভিমত। বিশ্বের সম্পদ ভাণ্ডার অফুরান নয়। অপূরণীয় সম্পদগুলির ভাণ্ডার অত্যধিক ব্যবহারের ফলে দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে। তা হলে আগামী প্রজন্মের জন্য কিছুই তো থাকবে না বর্তমান শতকের শেষ পাদে। পূরণীয় সম্পদগুলিও অতিকর্ষণ, অতি বৃক্ষচ্ছেদন, অতি মৎস্যসংগ্রহ, অতি গোচারণ এবং অতি শিকারের ফলে অপূরণীয় সম্পদগুলির মতোই অনেক ক্ষেত্রে নিঃশেষিত প্রায়। অতি উৎপাদন এবং ভোগে জীবনমান উন্নত হলেও অতিরিক্ত বর্জ্য উৎপন্ন হয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের অবনয়ন ঘটিয়ে মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে। পরিবেশ দূষণের জন্য কিছু সংখ্যক মারাত্মক রোগের (ক্যানসার, হৃদরোগ এবং ফুসফুসের রোগ বিশেষ করে) প্রাদুর্ভাব বেড়ে চলেছে। সুতরাং আর্থ বিকাশেব সীমা থাকবেই। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার ক্লাব অব্ রোমের কাছে প্রেরিত মেডোসদের ‘বৃদ্ধির সীমানা’ শীর্ষক প্রতিবেদনে প্রাকৃতিক সম্পদের অতি ব্যবহারের কারণ ও কুফলগুলি যুক্তি দিয়ে প্রতিপন্ন করা হয় এবং পরিণামে মানবজাতি যে ঘোর বিপদে পড়তে যাচ্ছে তারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। হতাশাবাদী মেডোসদের অভিমতের অনেক সমালোচনা আশাবাদী বিজ্ঞানীরা করলেও আশির দশকে সম্পদ নিঃশেষ হবার সম্ভাবনা এবং পরিবেশবিনাশের কথা মাথায় রেখে সর্বোচ্চ হারে উন্নয়নের বদলে ধারণযোগ্য উন্নয়নের আদর্শকেই ক্রমশ সর্বত্র গ্রহণ করা হয়। অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেরও একাধিক সম্পদ এবং পরিবেশ-সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে।

৪.৮ অনুশীলনী

(১) অতি সংক্ষেপে (একটি কিংবা দুটি বাক্যে) নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) অত্যধিক উন্নয়নের সঙ্গে অপূরণীয় প্রাকৃতিক সম্পদগুলির সম্পর্ক কী?

(খ) পূরণীয় প্রাকৃতিক সম্পদ কি নিঃশেষ হতে পারে?

(গ) সর্বপ্রথম কোন্ প্রকাশনায় সম্পদ-পরিবেশ সমস্যার যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ মেলে?

(ঘ) 'দূষণ' বলতে কী বোঝায়?

(ঙ) অম্লবৃষ্টি কী?

(চ) ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ সম্পদ-পরিবেশ পাঠে কেন বিখ্যাত?

(ছ) ঘনবসতিপূর্ণ শহরাঞ্চলের দুটি উল্লেখযোগ্য পরিবেশ সমস্যার নাম করুন।

(জ) দুটি সংকটবলয়স্থিত পূরণীয় প্রাকৃতিক সম্পদের নামোল্লেখ করুন।

(ঝ) বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফল কী হয়?

(ঞ) ক্লাব অফ রোমের দ্বিতীয় প্রতিবেদন কারা লিখেছিলেন?

(ট) ধারণযোগ্য উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?

(২) সংক্ষেপে মেডোসদের প্রতিবেদনের মূল বক্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ করুন। ওই বক্তব্যের মুখ্য সমলোচনাগুলি কী কী ছিল?

(৩) উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া যদি মানবজাতির জীবনমান ঊর্ধ্বমুখী করা না যায়, তাহলে যেন তেল উৎপাদন বৃদ্ধির হারকে সর্বোচ্চ করা কেন বাঞ্ছনীয় হবে না?

(৪) নানা জাতের পরিবেশ দূষণের ফলাফল সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচনা করুন।

(৫) (ক) অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সীমারেখা থাকবে কেন? (খ) ভারতবর্ষের পরিবেশ সমস্যাগুলি নিয়ে সংক্ষেপে কিছু লিখুন।

(৬) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) অম্লবৃষ্টির মুখ্য অংশ ——— অ্যাসিডবিন্দু।

(খ) ওজোন গ্যাসবলয়ের ক্ষতি হলে বায়ুমণ্ডলের ——— বাড়বে।

(গ) ভূমিবিন্যাসের একটি রূপ হল ————।

(ঘ) বৃহত্তম উন্নয়ন নয়, ——— উন্নয়নই আজকের আদর্শ।

(ঙ) ——— একটি সংকটবলয়স্থিত পূরণীয় প্রাকৃতিক সম্পদ।

(৭) নীচের বাক্যগুলিকে ভুল সংশোধন করে আবার লিখুন ঃ—

(ক) প্রকৃতি পরিবেশদূষণ ঘটায় না।

(খ) ভারতে কোনও প্রাকৃতিক সম্পদেরই অভাব নেই।

(গ) অম্লবৃষ্টির প্রধান অংশীদার কার্বলিক অ্যাসিডবিন্দু।

(ঘ) সম্পদ-পরিবেশ দ্বৈত সমস্যার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি মূলত দায়ী নয়।

(ঙ) সমুন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার খুবই বেশি।

(৮) নীচের স্তম্ভ দুটির শব্দগুচ্ছের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করুন ঃ

ধারণযোগ্য উন্নয়ন	অম্লবৃষ্টি
গন্ধক	হতাশাবাদী মহল
মেডোস প্রতিবেদন	ব্রান্ড কমিশন

৪.৯ উত্তর সংকেত

(১) (ক) অত্যধিক উন্নয়নে অনেক পূরণীয় প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষ হতে পারে। (খ) নিজে চেষ্টা করুন। (গ) মেডোসদের প্রতিবেদন। (ঘ) ৪.২ দেখুন। (ঙ) নিজে চেষ্টা করুন। (চ) সম্পদ-পরিবেশ সম্পর্কে মেডোসদের প্রতিবেদন প্রকাশ এবং স্টকহোম ঘোষণার জন্য। (ছ) নিজে চেষ্টা করুন। (জ) নিজে চেষ্টা করুন। (ঝ) নিজে চেষ্টা করুন। (ঞ) ৪.৪.১ দেখুন (ট) ৪.৫ দেখুন।

(২) ৪.৪.১ দেখুন। (৩) ৪.১, ৪.২, ৪.৪, ৪.৫ মিলিয়ে উত্তর তৈরি করুন। (৪) ৪.৩ দেখে উত্তর লিখুন। (৫) ৪.৪, ৪.৫, ও ৪.৬ দেখুন। (৬) (ক) সালফিউরিক (খ) উষ্ণতা (গ) ভূমিক্ষয় (ঘ) ধারণযোগ্য (ঙ) অরণ্য (৭) (ক) প্রকৃতি পরিবেশ দূষণ ঘটায় (খ) ভারতে কোনও কোনও প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব আছে। (গ) অম্লবৃষ্টির প্রধান অংশীদার সালফিউরিক অ্যাসিডবিন্দু। (ঘ) নিজে লিখুন। (ঙ) নিজে লিখুন।

(৮)

ধারণযোগ্য উন্নয়ন	ব্রান্ড কমিশন
গন্ধক	অম্লবৃষ্টি
মেডোস প্রতিবেদন	হতাশাবাদী মহল

৪.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১. তরুণ বন্দোপাধ্যায় ও গৌতম মল্লিক, **অর্থনৈতিক সম্পদ সমীক্ষা** (১৯৯৮), ছায়া প্রকাশনী, কলি-৯

২. সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, **সম্পদ সমীক্ষা** (১৯৯৮), ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোম্পানি, কলি-৭

৩. অজিতকুমার শীল, **সম্পদ সমীক্ষা** (১৯৯৮), শ্রীধর পাবলিশার্স, কলি-৬,

৪. A. K. Datta Gupta, **Resource Study** (1993), New Central Book Agency, Cal-9.

৫. A. Mitra, **Resource Studies** (2000), Sreedhar Publishers, Cal-6.

একক ৫ ❑ সম্পদ-সংরক্ষণ (Resource Conservation)

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য

৫.১ প্রস্তাবনা

৫.২ সম্পদ সংরক্ষণের সংজ্ঞা ও ধারণা

৫.৩ ভারতে সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থা

৫.৪ সারাংশ

৫.৫ অনুশীলনী

৫.৬ উত্তর সংকেত

৫.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন —

- সম্পদ সংরক্ষণের ধারণা ;
- সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ;
- ভারতে সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ।

৫.১ প্রস্তাবনা

প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাসের সম্ভাবনা উনিশ শতক থেকেই কোনও কোনও অর্থবিজ্ঞানীর চিন্তায় প্রকাশ পেয়েছে। ভাল জাতের জমি যে সুলভ নয় সেকথা তো রিকার্ডো তাঁর খাজনাতত্ত্বেই দেখিয়েছেন। পরিবেশ দূষণের (অর্থাৎ পরিবেশ সম্পদ বিনাশের) কথা তো কেম্ব্রিজের অধ্যাপক পিগু তাঁর 'কল্যাণের অর্থনীতি' (Economics of Welfare, ১৯২০) শীর্ষক গ্রন্থে ব্যক্ত করে গেছেন (ব্যক্তিগত খরচ এবং সমাজের খরচের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে গিয়ে)। ইংরেজ অর্থবিজ্ঞানী হটেলিং ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে এক প্রবন্ধে অপূরণীয় সম্পদের নিঃশেষীকরণ প্রক্রিয়ারোধে কী করা সম্ভব তা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৭২ সালের আগে পর্যন্ত সম্পদ হ্রাস এবং দূষণ নিয়ে তেমন একটা মাথাব্যথা অধিকাংশ মহলে দেখা যায়নি। বর্তমানে গোটা দুনিয়া জুড়ে দুর্লভ প্রাকৃতিক সম্পদ (পরিবেশসহ) সংরক্ষণের প্রয়াস চলছে। প্রাকৃতিক সম্পদের অতি ব্যবহারে সম্পদ ভাণ্ডার নিঃশেষিত হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ক্ষতি, আর অতিরিক্ত উৎপাদনে পরিবেশ ধ্বংস হলে শরীর ও মনের ক্ষতি হবে বর্তমান প্রজন্মেরই।

৫.২ সম্পদ সংরক্ষণের সংজ্ঞা ও ধারণা

সম্পদ সংরক্ষণ কী? অবশ্যই অপচয় নিবারণ, কেননা এর ফলে উৎপাদনে সম্পদের বর্তমান ব্যবহার কমে গিয়ে অনেক সম্পদ বেঁচে যাবে। বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার (insulation) উন্নতি ঘটিয়ে আশির দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘর গরম রাখার জন্য জ্বালানি ব্যবহারকে প্রায় অর্ধেকেরও বেশি নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল। ইস্পাত উৎপাদনে জাপান ও সুইডেনের প্রযুক্তিতে জ্বালানির সাশ্রয় হয় অনেক বেশি। সুতরাং ইস্পাত উৎপাদনে মার্কিন প্রযুক্তি ছেড়ে জাপ-সুইডেন প্রযুক্তিতে চলে গেলে এক অর্থে সেটা জ্বালানির অপচয় বন্ধ করারই সামিল হবে।

তা বলে অপচয় নিবারণই সংরক্ষণের শেষ কথা নয়। কেউ কেউ সংরক্ষণ বলতে সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়িতা বুঝিয়েছেন। সম্পদের ব্যবহার কমিয়ে দেওয়াটা হল সম্পদের মিতব্যয়িতা। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, সম্পদ বিশেষকে বর্তমান কালে কম ব্যবহার করে লাভ নেই, কেন না ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ওই সম্পদটিকে একাধিক কারণে আর কাজেই লাগাবে না। ব্যাপকহারে যদি পরমাণু শক্তি ভাবীকালে ব্যবহৃত হতে পারে, তবে বর্তমানে তেলসমৃদ্ধ দেশে তেলের ব্যবহার কমিয়ে জনগণকে কষ্টে ফেলে লাভ কি? সম্পদ সংরক্ষণের আসল ব্যাপারটা হচ্ছে সম্পদ বিশেষের ব্যবহার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয়কালের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দেওয়া যাতে উভয় প্রজন্মই সর্বাধিক উপকৃত হয়। সম্পদ সংরক্ষণের সঙ্গে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রশ্নটিও এসে যায়। যে সম্পদের ব্যবহারে পরিবেশের ক্ষতি বেশি হয় তার ব্যবহার অবশ্যই কমাতে হবে। তেলসমৃদ্ধ দেশে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বেশি ভাবনার দরকার না থাকলেও তেলদহন জাত দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত প্রযুক্তি না থাকলে যথেচ্ছ তেলব্যবহার বাঞ্ছনীয় হবে না, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাধ্য হয়ে বেশি তেল রেখে দিতে হবে। আমরা জানি যে, সম্পদ ব্যবহার থেকেই পরিবেশবিনাশ সমস্যার উৎপত্তি হয়। অনেক পরিবেশ সম্পদ (যথা জীবজন্তু, পক্ষীকুল ও গাছপালা) অন্য সম্পদ আহরণের ফলে (যথা খনিজ উত্তোলন) হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

সুতরাং সম্পদ সংরক্ষণ কথাটি বর্তমানে পরিবেশ সংরক্ষণকেও বোঝায়। আসলে পরিবেশও একটি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সংরক্ষণ মানেই সম্পদের ব্যবহার বর্তমানে কমিয়ে দেওয়া নয়। অপূরণীয় সম্পদের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ যতটা জরুরি, পূরণীয় সম্পদের ক্ষেত্রে ততটা নয়, কেননা পূরণীয় সম্পদ ভাণ্ডার প্রাকৃতিক নিয়মে পূরণীয়। কিন্তু অতি ব্যবহারে অনেক পূরণীয় সম্পদের ভাণ্ডার আজ নিঃশেষিত প্রায়। সত্তরের দশকের এক সমীক্ষায় প্রকাশ যে, ভারতের রয়েল বেঙ্গল বাঘসহ প্রায় ১০০০ স্তন্যপায়ী জন্তুর প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হবার মুখে সমাগত। বিশ্বে আমরা নাকি রোজ ১০০ পক্ষীপ্রজাতির বিলুপ্তি ঘটাচ্ছি। অতিকর্ষণ এবং অতিগোচারণে আফ্রিকার পশ্চিমে এবং পূর্বে অনেক এলাকা মরুভূমি হয়ে আসছে। সুতরাং পরিবেশসহ পূরণীয় এবং অপূরণীয় দুধরনের সম্পদেরই সংরক্ষণ দরকার।

৫.৩ ভারতে সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থা

ভারতে সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থায় সরকারের সঙ্গে বেসরকারি উদ্যোগেরও ভূমিকা রয়েছে। অপূরণীয় সম্পদ সংরক্ষণে সরকারি উদ্যোগ প্রধানত কয়লা সংরক্ষণের ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য। উচ্চমানের কয়লার ভাণ্ডার দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখে ভারত সরকার রেলপথের বৈদ্যুতিকীকরণ দ্বারা কয়লার

ব্যবহার অনেকখানি কমিয়ে এনেছেন। যেখানে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন চলে না, সেখানেও কয়লার বদলে ডিজেল চালিত ইঞ্জিনে ট্রেন চলছে। জ্বালানি গবেষণার জন্য জ্বালানি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Fuel Research Institute) নামে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট হয়েছে। স্কুটার ও মোটর বাইকে তেলের সাশ্রয় ঘটাবার জন্য প্রস্তুতকারক বেসরকারি সংস্থাগুলি নতুন নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসছে। তেল ব্যবহারে অপচয় নিবারণের জন্য সরকার জনসাধারণকে নানা উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন উন্নতমানের উনুন ব্যবহারের অনুরোধ জানিয়ে। সরকারি উদ্যোগ প্রধানত পূরণীয় সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রেই সুবিস্তৃত। ১৯৮৫ সালে সৃষ্ট কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ, অরণ্য ও বন্যপ্রাণী বিভাগ এই কাজে মুখ্য সঞ্চালকের ভূমিকায় আছেন। এই বিভাগ কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও অরণ্য মন্ত্রকের অধীন। এই বিভাগের প্রধান কাজকর্ম হচ্ছে পরিবেশ এবং অরণ্য সংক্রান্ত কর্মসূচী প্রণয়ন এবং দেশের যাবতীয় পরিবেশ ও অরণ্য সংক্রান্ত কর্মসূচীর সমর্থন ও সমন্বয় সাধন। সরকারের নিজস্ব কর্মসূচীতে প্রাধান্য পায় প্রাকৃতিক সম্পদের সমীক্ষা ও সংরক্ষণ, পরিবেশের সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন। উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি সাধনের জন্য সরকার যেসব কর্মে ব্রতী হন সেগুলি হচ্ছে ঃ সম্পদ সমীক্ষা, পরিবেশের উপর বৃহৎ প্রকল্পগুলির প্রভাব নিরূপণ (Environmental Impact Assessment), ১৯৭২ সালের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন (Wild Life Protection Act) মোতাবেক নির্বিচারে বাঘ, গণ্ডার, বাইসন প্রভৃতি বন্যপ্রাণীর হত্যার উপর বিধিনিষেধ আরোপ, ১৯৮০ সালের অরণ্য সংরক্ষণ আইন (Forest Conservation Act) মোতাবেক নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ, তিনটি কেন্দ্রীয় আইনের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ [আইন তিনটি হল ঃ ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের জলদূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন (Water, Prevention and Control of Pollution, Act), ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের বায়ুদূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন (Air, Prevention and Control of Pollution, Act), এবং ১৯৮৬ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (Environment Protection Act)], সম্পদ পুনরুজ্জীবন কর্মসূচী, সম্পদ সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের কাজে ব্রতী সংস্থাদের ওই কর্মসূচী রূপায়ণে সাহায্য প্রদান, বিভিন্ন সম্পদ-পরিবেশ সমস্যার সমাধানে গবেষণায় উৎসাহ প্রদান, পরিবেশ কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা এবং পরিবেশ চেতনা জাগানোর জন্য প্রয়াস।

সমীক্ষা — দুটি কেন্দ্রীয় সংস্থার নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ একটি হল বোটানিকেল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (১৮৯০), অন্যটি জুলোজিকেল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (১৯১৬)। প্রথমটি গাছপালার প্রজাতি নির্ণয় এবং সংখ্যা নিরূপণের কাজে নিযুক্ত। দ্বিতীয়টি জীবজন্তু বিষয়ক সমীক্ষায় রত।

সংরক্ষণ — সংরক্ষণের অঙ্গ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আরো কিছুসংখ্যক বিদেশি রাষ্ট্রের মত ভারতেও বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পগুলির অনুমোদনের আগে পরিবেশের উপর সেগুলির সম্ভাব্য ভাল ও মন্দ প্রতিক্রিয়াগুলির এক খতিয়ান তৈরি করে যদি দেখা যায় যে, মোটের ভাল প্রতিক্রিয়াগুলিই বেশি জোরদার তবেই তাদের রূপায়ণের অনুমতি দেওয়া হয়। ওই সব খতিয়ানে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয় ঃ জল ও বায়ু দূষণ, ভূমির ক্ষতি, শব্দ দূষণ, প্রকল্প নির্মাণের ফলে বাস্তুচ্যুত নরনারীর পুনর্বাসন, এবং প্রকল্প এলাকার জীবজন্তু ও গাছপালার উপর প্রতিক্রিয়া। ১৯৭৮-৮৮ সময়ে ২৫৫টি বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অনুমোদন চাওয়া হলেও সর্দার সরোবর ও নর্মদা সাগর সহ মাত্র ৮৯টিকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫২ সালের জাতীয় অরণ্যনীতিতে দেশের মোট ভূমিখণ্ডের অন্তত $\frac{১}{৩}$ অরণ্যাবৃত করার আদর্শ ঘোষিত হলেও ১৯৮৩ সালে অরণ্য সমীক্ষায় দেখা যায় যে, দেশের ১৯% মাত্র অরণ্যঘেরা। তারপর থেকে অরণ্য সংরক্ষণ এবং অরণ্য প্রসারের জন্য সংরক্ষিত বনসৃষ্টি, সামাজিক বনসৃজন, বড় বড় গাছকাটার উপর বিধিনিষেধ আরোপ, আধুনিক দাবানল ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে, রেলপথের স্লিপারে ও রেলকামরাগুলিতে কাঠের ব্যবহার ন্যূনতম করে কাষ্ঠ সম্পদের উপর চাপ কমানো হয়েছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য নীলগিরিতে, সুন্দরবন

প্রভৃতি স্থানে সংরক্ষিত এলাকা (reserve) সৃষ্টি করা হয়েছে। জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সুন্দরবন প্রভৃতি উপকূলবর্তী এলাকায় জলমগ্ন ম্যানগ্রোভ অরণ্য বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে।

দূষণ নিয়ন্ত্রণের আইনগুলি দীর্ঘদিন বলবৎ করা হচ্ছিল না, কিন্তু নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে হচ্ছে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পর্যায়ে এ উদ্দেশ্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড কাজ করছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণে দেশের বিচার ব্যবস্থাও এগিয়ে এসেছে। যেমন ধরুন, কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতায় গঙ্গাতীরবর্তী শিল্পাঞ্চলে একাধিক শিল্প সংস্থাকে ভালভাবে শোধন না করে গঙ্গায় বর্জ্য নিক্ষেপ করতে মানা করা হয়েছে আদালতের তরফে।

সম্পদ পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে গঙ্গা প্রকল্পের (Ganga Action Plan, 1985) নামোল্লেখ প্রথমেই করতে হয়। গঙ্গাজলের দূষণ কমাবার জন্য একাধিক ব্যবস্থা এই প্রকল্পে করা হচ্ছে। অনাবাদী পতিত জমি বৃক্ষরোপণের মারফত উৎপাদিকা করে তোলবার জন্য জাতীয় পতিত জমি উন্নয়ন বোর্ড (National Wasteland Development Board, 1985) কাজ করছে। পতিত জমিতে কোথাও কোথাও গোচারণ ক্ষেত্র তৈরি করবার চেষ্টাও চলছে।

গবেষণা চলছে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের সাহায্যপুষ্ট একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে। শুধুমাত্র অরণ্য সম্পদের উপরে গবেষণার জন্য রয়েছে কোয়াম্বাতুর, পিচি এবং দেরাদুনে অরণ্য গবেষণা সংস্থা (Forest Research Institute)। পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের উপর গবেষণার জন্য রয়েছে তিনটি উচ্চ পর্যায়ের কেন্দ্র—একটি আমেদাবাদে, একটি বাঙ্গালোরে এবং একটি ধানবাদে।

পরিবেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের। বনাধিকারিকদের শিক্ষণের জন্য রয়েছে অরণ্য কলেজ। বনসম্পদ পরিচালনার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ভূপালের Indian Institute of Forest Management। জাতীয় পার্ক এবং অন্যান্য জায়গায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজে নিয়োগের যোগ্যতা অর্জনের জন্য দেরাদুনে Wildlife Institute of India সংস্থায় ৯ মাসের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে।

৫.৪ সারাংশ

সম্পদ সংরক্ষণ মানে সম্পদের ব্যবহার খুব কমিয়ে দেওয়া নয়। অপূরণীয় সম্পদের সংরক্ষণ বলতে বোঝায় সেই সম্পদের লভ্য ভাণ্ডারকে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দেওয়া যাতে দুই প্রজন্মের উপকার সর্বাধিক হয়। যখন সম্পদ বিশেষের প্রান্তিক উপযোগ উভয় প্রজন্মের কাছে সমান হবে তখন উভয় প্রজন্মের মোট উপযোগ বা উপকার সর্বাধিক হবে। শিক্ষার্থীরা এটা বোঝাবার জন্য অর্থনীতির প্রান্তিক উপযোগ তত্ত্বের সাহায্য নিতে পারেন। অর্থাৎ কোন প্রজন্মই যেন বলতে না পারে যে, তারা কম পেয়ে ঠকেছে। পূরণীয় সম্পদের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ মানে ব্যবহারের হারকে উচ্চ সমতল থেকে নামিয়ে এমন জায়গায় রাখা যেখানে সেটা প্রাকৃতিক পূরণীয়তার হারের অন্তত সমান থাকে এবং ফলে পূরণীয় সম্পদটির সংখ্যা/পরিমাণ কমে না আসে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতেও সম্পদ সংরক্ষণের জন্য নানা ব্যবস্থা (প্রধানত সরকারি উদ্যোগে) গৃহীত হয়েছে।

৫.৫ অনুশীলনী

(১) নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর অতিসংক্ষেপে (১টি কিংবা ২টি বাক্যে) লিখুন ঃ

(ক) পরিবেশদূষণের কথা সর্বপ্রথম কোন্ লেখক অর্থবিজ্ঞানের তত্ত্বে অন্তর্ভুক্ত করেন?

(খ) ভাল জমির সম্ভাব্য দুষ্প্রাপ্যতা কোন্ অর্থবিজ্ঞানীদের তত্ত্বে প্রকাশ পেয়েছিল?

(গ) সংরক্ষণ বলতে কী মিতব্যয়িতা বোঝায়?

(ঘ) পূরণীয় সম্পদের ক্ষেত্রে কী সংরক্ষণের প্রশ্ন ওঠে?

(ঙ) নদীজল কী অপূরণীয় সম্পদ?

(চ) অরণ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত কোনও আইন ভারতবর্ষে আছে কী?

(২) সম্পদ সংরক্ষণ বলতে যা যা বোঝায় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করুন। সম্পদ সংরক্ষণ না করলে কী আসে যায়?

(৩) ভারতের সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

(৪) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) পরিবেশও একটি প্রাকৃতিক ———।

(খ) জলদূষণ প্রতিরোধের আইন ভারতে চালু হয় ——— খৃস্টাব্দে।

(গ) অরণ্য গবেষণা কেন্দ্র ভারতের ——— শহরে অবস্থিত।

(৫) নীচের বাক্যগুলিকে ভুল সংশোধন করে লিখুন ঃ

(ক) ভারতে সম্পদ-পরিবেশ সমস্যাগুলির মোকাবিলার জন্য বলতে গেলে কোনও পদক্ষেপই নেওয়া হয়নি। (খ) পরিবেশ দূষণে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (গ) জ্বালানির সাশ্রয় করা মানে এক ধরনের সংরক্ষণ নয়।

(৬) নীচের স্তম্ভদুটির শব্দগুচ্ছের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করুন ঃ

পরিবেশদূষণ	সম্পদ সংরক্ষণ
অপচয় নিবারণ	বর্তমান প্রজন্মের ক্ষতি

৫.৬ উত্তর সংকেত

(১) (ক) পিগু (খ) রিকার্ডো (গ) শুধু মিতব্যয়িতা বোঝায় না। (ঘ) নিজে চেষ্টা করুন। (ঙ) না। (চ) নিজে চেষ্টা করুন।

(২) ৫.২ দেখুন।

(৩) ৫.৩ দেখুন।

(৪) (ক) 'সম্পদ' (খ) নিজে চেষ্টা করুন (গ) দেরাদুন।

(৫) (ক) কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। (খ) 'নয়' শব্দটি বাদ দিন।

(৬) পরিবেশ দূষণ ⟶ বর্তমান প্রজন্মের ক্ষতি

অপচয় নিবারণ ⟶ সম্পদ সংরক্ষণ

৫.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১. তরুণ বন্দোপাধ্যায় ও গৌতম মল্লিক, **অর্থনৈতিক সম্পদ সমীক্ষা** (১৯৯৮), ছায়া প্রকাশনা, কলি-৯

২. সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, **সম্পদ সমীক্ষা** (১৯৯৮), ইন্ডিয়ান প্রোগেসিভ পাবলিশিং কোম্পানি, কলি-৭।

৩. অজিত কুমার শীল, **সম্পদ-সমীক্ষা** (১৯৯৮), শ্রীধর পাবলিশার্স, কলি-৬,

৪. A. K. Datta Gupta, **Resource Study** (1993), New Central Book Agency, Cal-9

৫. A. Mitra, **Resource Studies** (2000), Sreedhar Publishers Cal-6.